তৃতীয় অধ্যায়

অর্জ্জুন তখন জিজ্ঞসা করিলেন, যদি কর্ম্মযোগ অপেক্ষা জ্ঞান-যোগ শ্রেষ্ঠ, তবে আমাকে কেন এই ঘোর কর্ম্মে নিয়োজিত করিতেছেন ?

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, লোকে কর্ম্ম না করিয়া কখনই নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারে না—স্ব স্ব প্রকৃতির গুণে বাধ্য হইয়া কর্ম্ম করিতেই হইবে। শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কর্ম্ম আবশ্যক। যজ্ঞার্থে কর্ম্ম প্রয়োজন। সেই যজ্ঞকর্ম্ম সকল স্বার্থসাধন জন্য নয়, কিন্তু দেবতাদের প্রীত্যর্থ অনুষ্ঠিত হইলে তাহাতে শ্রেয়োলাভ হয়। তদ্ভিন্ন লোকশিক্ষার জন্যও কর্ম্ম করা উচিত, স্বয়ং ঈশ্বর কর্ম্মোদ্যমে নিযুক্ত। কিন্তু যে ব্যক্তি আত্ম-তৃপ্ত, আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট, তাহার কোন কার্য্য নাই। যতদিন সেই নৈষ্কর্ম্ম্যের অবস্থা না হইবে, ততদিন নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে। ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিতেছে, আমি কর্ত্তা নহি, স্বার্থাভিমান পরিত্যাগ করিয়া এইরূপ নির্লিপ্তভাবে কার্য্য করিবে। স্বধর্ম্মানুরূপ কর্ম্ম করিবে। পরধর্ম্ম যেমনই হউক না কেন,—ব্রাহ্মণের ক্ষমাধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ হইতে পারে—তথাপি ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম যে ধর্ম্মযুদ্ধ করা, তুমি তাহাতে ব্রতী হও।

"স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়, পরধর্ম্ম ভয়াবহ অতি।"

কামনাই লোকের শাস্ত্রজ্ঞান, আত্মজ্ঞান অভিভূত করে, অতএব এই মহারিপু সংহার করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন কর।

কর্ম্ম-যোগ।

অর্জ্জুন।

কর্ম্ম হতে বুদ্ধি বড়, বল যদি তুমি, জনার্দ্দন,
তবে কি অঘোর কৃত্যে মজাইলে আমারে এখন। ১
দ্ব্যর্থবাক্য বলি কেন কর মোর বুদ্ধি কলুষিত,
এক পথ বলে দেও, শ্রেয় যাহে লভিব নিশ্চিত। ২

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

তৃতীয় অধ্যায়

অর্জ্জুন তখন জিজ্ঞসা করিলেন, যদি কর্ম্মযোগ অপেক্ষা জ্ঞান-যোগ শ্রেষ্ঠ, তবে আমাকে কেন এই ঘোর কর্ম্মে নিয়োজিত করিতেছেন ?

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, লোকে কর্ম্ম না করিয়া কখনই নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারে না—স্ব স্ব প্রকৃতির গুণে বাধ্য হইয়া কর্ম্ম করিতেই হইবে। শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কর্ম্ম আবশ্যক। যজ্ঞার্থে কর্ম্ম প্রয়োজন। সেই যজ্ঞকর্ম্ম সকল স্বার্থসাধন জন্য নয়, কিন্তু দেবতাদের প্রীত্যর্থ অনুষ্ঠিত হইলে তাহাতে শ্রেয়োলাভ হয়। তদ্ভিন্ন লোকশিক্ষার জন্যও কর্ম্ম করা উচিত, স্বয়ং ঈশ্বর কর্ম্মোদ্যমে নিযুক্ত। কিন্তু যে ব্যক্তি আত্ম-তৃপ্ত, আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট, তাহার কোন কার্য্য নাই। যতদিন সেই নৈষ্কর্ম্ম্যের অবস্থা না হইবে, ততদিন নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে। ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিতেছে, আমি কর্ত্তা নহি, স্বার্থাভিমান পরিত্যাগ করিয়া এইরূপ নির্লিপ্তভাবে কার্য্য করিবে। স্বধর্ম্মানুরূপ কর্ম্ম করিবে। পরধর্ম্ম যেমনই হউক না কেন,—ব্রাহ্মণের ক্ষমাধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ হইতে পারে—তথাপি ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম যে ধর্ম্মযুদ্ধ করা, তুমি তাহাতে ব্রতী হও।

"স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়, পরধর্ম্ম ভয়াবহ অতি।"

কামনাই লোকের শাস্ত্রজ্ঞান, আত্মজ্ঞান অভিভূত করে, অতএব এই মহারিপু সংহার করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন কর।

কর্ম্ম-যোগ।

অর্জ্জুন।

কর্ম্ম হতে বুদ্ধি বড়, বল যদি তুমি, জনার্দ্দন,
তবে কি অঘোর কৃত্যে মজাইলে আমারে এখন। ১
দ্ব্যর্থবাক্য বলি কেন কর মোর বুদ্ধি কলুষিত,
এক পথ বলে দেও, শ্রেয় যাহে লভিব নিশ্চিত। ২

শ্রীকৃষ্ণ।

সাংখ্য-যোগ লোকের দ্বিবিধ নিষ্ঠা হয়েছে কথিত,

কর্ম্ম-যোগ। জ্ঞানযোগে, কর্ম্মযোগে, রহে সমাশ্রিত।

জ্ঞানযোগে সেই নিষ্ঠা লভে জ্ঞানিগণ,

কর্ম্ম-যোগে লভে যোগী মোক্ষ-পরায়ণ। ৩

কর্ম্ম-অনুষ্ঠান বিনা কেহ না কখন

নিবৃত্তি-শিখরে, পার্থ, করে আরোহণ।

আসক্তি তেয়াগি চিত্ত-শুদ্ধি না হইলে

সন্ন্যাস গ্রহণে সিদ্ধি কভু নাহি মিলে। ৪

কর্ম্ম ছাড়ি ক্ষণকাল থাকা নাহি যায়,

স্বাভাবিক গুণে কর্ম্ম আপনি করায়। ৫

কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযমনে করি মনে মন

বিষয়ে প্রমত্ত থাকা কপটী লক্ষণ। ৬

মনেতে ইন্দ্রিয়গণ করিয়া সংযত,

আসক্তি ছাড়িয়া যেই রহে কর্ম্মে রত,

ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য যার করম উদ্যম,

সেই হয়, ধনঞ্জয়, যোগীর উত্তম। ৭

হও কর্ম্মী, কর্ম্মবান্ তুল্য কোন্ জন,

কর্ম্ম বিনা দেহযাত্রা চলে কতক্ষণ? ৮

যজ্ঞার্থ সাধিয়া কর্ম্ম তরে জীবগণ,

অন্য কার্য্য জেন ভবে বন্ধন-কারণ;

যে যে কর্ম্ম আচরিবে, ইথে তুমি, পার্থ,

নিষ্কাম যজ্ঞার্থ করি লভ পুরুষার্থ। ৯

যজ্ঞ-বিধান। যজ্ঞসহ প্রজাসৃষ্টি

করি কহে প্রজাপতি, পুরা,

"কামধুক্ যজ্ঞ এই,

বৃদ্ধি হোক্ যজ্ঞে বসুন্ধরা।" ১০

"দেবতায় তুষ যজ্ঞে,
তোমাদের তুষুন দেবতা,
উভয়ে লভিবে শ্রেয়
পরস্পর ধরিয়ে মমতা।" ১১
"যজ্ঞতৃপ্ত দেবগণ
ধন ধান্য দিবেন সবারে,
না দিয়ে নৈবেদ্য দেবে
ভুঞ্জে যেই চৌর বলি তারে।" ১২
যজ্ঞ কর্ম্ম অবশিষ্ট
অন্ন পানে পাপ-বিমোচন,
পাপ ফল ভোগে নর
স্বার্থে করি উদর পূরণ। ১৩
অন্ন হতে জন্মে জীব,
বৃষ্টি হতে অন্নের সম্ভব,
যজ্ঞ হতে হয় বৃষ্টি,
কর্ম্ম হতে যজ্ঞের উদ্ভব। ১৪
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভব জেনো,
ব্রহ্মাক্ষর হইতে উদিত,
তেঁই সর্ব্বগত ব্রহ্ম,
যজ্ঞে হন নিত্য প্রতিষ্ঠিত। ১৫
হেন প্রবর্ত্তিত চক্র
হেলায় যে নাহি অনুসরে,
সেই পাপী স্বেচ্ছাচারী,
বৃথা হেথা এ জনম ধরে। ১৬
আত্মায় যাহার প্রীতি, আত্মাতেই রতি,
আত্মায় সন্তুষ্ট সদা যেই শুদ্ধমতি,
না চাহে অপর কিছু পার্থিব যে ধন,
ঘুচে যায় সব তার করম বন্ধন। ১৭

কৃতাকৃতে উদাসীন, বিচরে স্বাধীন,
আশ্রয় না চাহে কারো, নাহি রাখে ঋণ;
অনাসক্ত সাধ কার্য্য তাই বলি, পার্থ,
নিষ্কাম করম-ব্রতী লভে পুরুষার্থ। ১৮-১৯

জনকাদি করমে লভিলা সিদ্ধি-যশ,
লোকস্থিতি কর্ম্মোপরি—লোকে কর্ম্মবশ। ২০
জ্ঞানীর আচার দেখি চলে গো অপরে,
সে যাহা প্রমাণ করে তাই অনুসরে। ২১
ত্রিলোকে কি দেখ, পার্থ, কর্ত্তব্য আমার,
কি আছে পাই নি যাহা, আছে কি পাবার?

স্বয়ং ঈশ্বর কর্ম্মশীল।

তবু যদি তন্দ্রাহীন কর্ম্ম নাহি করি,
লোকে যায় অধঃপাতে সেই পথ ধরি। ২২-২৩
আমি না করিলে কর্ম্ম সবে কর্ম্ম ছাড়ে,
কর্ম্মলোপে ধর্ম্মলোপ হয় এ সংসারে,
বরণ সঙ্করে হয় ভ্রষ্ট প্রজাকুল—
কর্ম্মেতে ঔদাস্য যত অনর্থের মূল। ২৪
ফল কামনায় যথা লৌকিক অজ্ঞান
আসক্ত হইয়া করে কর্ম্ম অনুষ্ঠান,
লোক-রক্ষা হেতু তথা বিদ্বান যে জন
অনাসক্ত মনে করে কর্ত্তব্য-পালন। ২৫
নানা তর্ক বিতর্কের প্রক্রিয়া বল,
না করিবে কর্ম্মীদের মতি বিশৃঙ্খল,
কর্ম্মোদ্যমে হয়ে যুক্ত জ্ঞানিজন ভবে
করিবেন কর্ম্মে রত অজ্ঞান মানবে।
মূঢ় যবে করে কার্য্য প্রকৃতির গুণে,
অহঙ্কারে "আমি কর্ত্তা" ভাবে মনে মনে
গুণ কর্ম্ম ভাগ করি যথা পরিমাণ,
তত্ত্বজ্ঞানী ছাড়ি দেয় কর্তৃত্বাভিমান

ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয় কর্ম্ম, পৃথক্ জানিয়া
আপনি নিরস্ত রহে নির্লিপ্ত থাকিয়া। ২৭-২৮
মূঢ়মতি প্রকৃতির গুণে বিমোহিত,
আসক্তি ধরিয়া রহে বিষয় ব্যাপৃত,
এ সব ভ্রমান্ধে নরে বিদ্বান যে জন
নিরর্থক বিচলিত না করে কখন। ২৯
আমাতেই সর্ব্ব কর্ম্ম করি সমর্পণ,
অধ্যাত্ম জ্ঞানের যোগে অবিচল মন,
কামনা, মমতা, শোক করি পরিহার,
মাত এ সমরে, বীর, কি কহিব আর। ৩০
এ আদেশে ধরি শ্রদ্ধা অসূয়া বর্জ্জিত,
করম-বন্ধন মুক্ত হইবে নিশ্চিত ;
দোষ দৃষ্টে যুক্তি মম না করি গ্রহণ
সমূলে বিনাশ পায় মূঢ় অচেতন। ৩১-৩২
স্বভাব যাহার যাহা, শুন ধনঞ্জয়,
কর্ম্মের গতিও তার তাই অবিকল,
প্রকৃতিই বলবতী সকল সময়,
নিগ্রহে সহস্র চেষ্টা হইবে বিফল। ৩৩
ইন্দ্রিয় বিষয় ভেদে জন্মে অনুরাগ,
অথবা প্রবৃত্তি-বশে জনমে বিরাগ,
রাগ দ্বেষ উভয়েই মোক্ষ বিঘ্নকর,
না হয় তাদের বশ মুমুক্ষু যে নর। ৩৪

স্বধর্ম্ম পরধর্ম্ম। পরধর্ম্ম সুখসেব্য
হয় যদি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর,
তাহাও জানিবে ত্যাজ্য,
নহে তাহা কভু শ্রেয়স্কর।
স্বধর্ম্ম যদিও হয় অঙ্গহীন,
না ছাড়ে সুমতি,

স্বধর্ম্মে নিধন ভাল,
　　পরধর্ম্ম ভয়াবহ অতি। ৩৫

অর্জ্জুন।

মানুষে যে করে পাপ, কে তাহে করে প্রবর্ত্তন,
স্বেচ্ছার বিরুদ্ধে, প্রভু, সবলে করি আকর্ষণ? ৩৬

।

রজোগুণোদ্ভব কাম কৃষ্ণ-সাপ

কাম রিপু।
　　কভু আসে ক্রোধ রূপ ধরি,
সর্ব্বভুক্ দুষ্পূর সে মহাপাপ,
　　তাহার সমান নাই অরি। ৩৭
বহ্নি যথা ধূমাচ্ছন্ন,
　　আদর্শ বা কলঙ্কে আবৃত,
জরায়ু-আবৃত গর্ভ,
　　এই পাপে জগত ছাদিত। ৩৮

দুষ্পূর অনল সম　　তার তৃষা মেটে কিরে?
জ্ঞানীর সে চিরশত্রু　　জ্ঞানেরে আসিয়া ঘিরে।
মনোবুদ্ধি সর্ব্বেন্দ্রিয়ে　　করিয়া সে অধিষ্ঠান,
মোহ-পাশে ফেলি নাশে　　দেহীর বিবেক-জ্ঞান। ৩৯-৪০

আগেই সংযমি তাই ইন্দ্রিয়-নিচয়,
পাপরূপী কাম-রিপু কর পরাজয়—
যেই রিপু, মানব-হৃদয়ে করি বাস,
শাস্ত্রজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, উভে করে নাশ। ৪১
দেহাদি বিষয় মাঝে ইন্দ্রিয় প্রবর,

আত্মা গরীয়ান্।
তেমনি ইন্দ্রিয় হতে, মন মহত্তর,
বুদ্ধি-অনুগত মন, বুদ্ধিই প্রধান,
বুদ্ধি হতে, বুধ কহে, আত্মা গরীয়ান্। ৪২

গরীয়ান্ জানি আত্মা　　আত্মাতে করি নির্ভর,
কাম যে দুর্দ্ধর্ষ অরি　　হান তারে বীরবর। ৪৩

ইতি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

টিপ্পনী।

২৭—সাংখ্যমতে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিই কর্ম্মকর্ত্তা; পুরুষ কর্ত্তৃত্ববিহীন, উদাসীন, সাক্ষীস্বরূপ। প্রকৃতিই কার্য্য করে, পুরুষ কর্ত্তৃত্বাভিমানে ভাবে "আমি কর্ত্তা," তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি আত্মাকে ইন্দ্রিয় ও কর্ম্ম হইতে পৃথক্ জানিয়া এই অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষয়ে অনাসক্ত থাকেন।

৩২—অসূয়া=পরগুণে দোষারোপ করা।

৩৪—যে যে বিষয় ইন্দ্রিয়ের অনুকূল, তত্তদ্বিষয়ে সেই সেই ইন্দ্রিয়ের অনুরাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে বিদ্বেষ। এই রাগদ্বেষ উভয়ই মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তির বিরোধী, অতএব উভয় বর্জ্জনীয়।

৪০—ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধিতে কামনার অধিষ্ঠান।

কামনা উদ্রেকের পূর্ব্বে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ করে, মন সঙ্কল্প করে, বুদ্ধি বিবেচনা করিয়া স্থির করে। এইহেতু এই তিনেতেই কামনার অধিষ্ঠান বলা হইয়াছে।

৪২-৪৩—ইন্দ্রিয়গণ দেহাদি বিষয়ের প্রকাশক, এজন্য দেহাদি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ। মন ইন্দ্রিয়গণকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে—মন নিয়ন্তা, ইন্দ্রিয় মনের অধীন, এজন্য ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধির সদসৎ-বিচার ও গ্রহণশক্তি আছে, এজন্য সংকল্পাত্মক মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। আত্মা পরমার্থ তত্ত্বদর্শী, এজন্য বুদ্ধি হইতেও গরীয়ান্। এই আত্মার আশ্রয়ে সর্ব্ব সংহারক কামরিপু দমন করিবেক।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তীর্থযাত্রা।

কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের 'সীতারাম' পাঠ করি। লেখক হিন্দুরাজা সীতারাম রায়ের রাজধানী মহম্মদপুরের উপর নব্যবঙ্গের অশ্রদ্ধার বিষয় উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গালী এক্ষণে দেশভ্রমণ উদ্দেশে দার্জ্জিলিঙ্ ও সিমলা গমন করেন, কিন্তু যে স্থানে দাঁড়াইলে তাঁহার ললাটকলঙ্ক ধৌত হয়, সেই

বাঙ্গালীর বীরত্বের লীলাভূমি মহম্মদপুর দর্শনের ইচ্ছা ভ্রমেও মনে উদয় হয় না। কথা কয়টী আমার হৃদয়ে আঘাত করে, সঙ্কল্প করি একবার এই পবিত্র স্থান দর্শন করিয়া চক্ষু সার্থক তাই আমার জীবনের প্রথম তীর্থযাত্রা বাঙ্গালার এই পুণ্য তী মুখেই হইয়াছিল।

যাইব ঠিক করিলাম বটে, কিন্তু মহম্মদপুর কোথায়, কো যাইতে হয়, কিছুই জানা ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে যশোহর নিবাসী আমার এক সহাধ্যায়ী মহাশয়কে এই সঙ্কল্পের কথা তিনি এ বিষয়ে কিছু সংবাদ দিলেন। মহম্মদপুর তাঁহার মাসালিয়া গ্রাম হইতে ১৬।১৭ ক্রোশ। তিনি বৃদ্ধ লোকে সীতারামের গল্প শুনিয়াছেন, কিন্তু তিনি বলিলেন মহম্মদপুর ঘন জঙ্গলে আবৃত এবং ব্যাঘ্রবরাহাদি হিংস্র জন্তুর আবাস তবে বন্ধুবর আমরা দুই তিন জন যাইলে আমাদের সঙ্গে সম্মত হইলেন।

এই সংবাদে অনেকটা দমিয়া গেলাম। তাহার পর বন্ধুবা মধ্যে যাঁহার নিকটই এই প্রস্তাব উত্থাপন করি, তিনিই বলেন, সেখানে কি মানুষে যায়—হয় বাঘে খাবে, না হয় সাপে কাম আবার আজকাল পল্লীগ্রামে ভয়ানক কলেরা, ম্যালেরিয়া ত চি বন্দোবস্ত করিয়াছে, আমরা ভাই, প্রাণের মায়া এখনও সম্পূ বিসর্জ্জন করিতে পারি নাই। (বন্ধুবর নব বিবাহিত)।

যাহা হউক, অনেক চেষ্টার পর একজন প্রাণের মমতাশূন্য সহ লাভ হইল, তাঁহার বাড়ীর দরওয়ানও তাঁহার সঙ্গ হইল। আম যশোহরস্থিত বন্ধু পূর্ব্বেই দেশে গিয়াছিলেন। কথা ছিল প্রথমে তাঁহার বাড়ী যাইব।

কথামত আমার বন্ধু তাঁহার দরওয়ান এবং আমি ৮ই এপ্রেল

বার ১০টার গোয়ালন্দ মেলে উঠিলাম। প্রথমে কুমারখালির টিকিট করি, সেখান হইতে কাদিরপুরে আমাদের এক পরিচিত ভদ্রলোকের বাটী যাইবার কথা হয়, তিনি আমাদের মাসালিয়া পর্য্যন্ত নৌকা ভাড়া করিয়া দিবেন।

রাত্রি দুই ঘণ্টা থাকিতে গাড়ী আমাদের তিনজনকে কুমারখালিতে নামাইয়া দিল। ষ্টেশনে বসিয়া রাত্রিটুকু অতিবাহিত করিতে হইল। বাড়ী হইতে কিছু জলখাবার লইয়া গিয়াছিলাম, তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া কাদিরপুরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। খোকসায় নামিলে আমাদের সুবিধা হইত, কিন্তু রেল গাড়ী সেখানে থামে না, তজ্জন্য কুমারখালির টিকিট করিতে হইয়াছিল। সেখান হইতে কাদির প্রায় ৫ মাইল পথ।

উচ্চ রেলের রাস্তা ধরিয়া উভয় পার্শ্বে বিস্তৃত প্রান্তরশোভা সন্দর্শন করিতে করিতে পথ অতিবাহন বড়ই মনোরম। অধিক ক্ষেত্রেই কৃষক লাঙ্গল দিতেছে, কোন কোন ক্ষেত্র আগাছায় হইয়া পুষ্পশোভিত হইয়াছে, মধ্যে কোনও ক্ষেত্রে ইক্ষুর চারা যাইতেছে। ক্বচিৎ একটা ক্ষেত্রে এখনও গম কাটা হয় নাই, তাহা মাথা দোলাইয়া যা আমাদের একটু অভ্যর্থনা করিল। নিক একটা বিলে কতকগুলা মাছরাঙ্গা পাখী উড়িয়া উড়িয়া হঠাৎ ছোঁ মারিতেছিল। ঝোপের মধ্য হইতে কোকিল, দোয়েল, পাখি প্রভৃতি সমবেত চেষ্টায় ঐক্যতান বাদন আরম্ভ করিয়া দিল। প্রা সমীরণ রহিয়া রহিয়া পথিপার্শ্বস্থ বাবলাগাছের ফলগুলি ঈষৎ দোলা আমাদের চাদর ফুর্‌ফুর করিয়া উড়াইয়া দিতেছিল। স্থানে স্থ আকাশের প্রান্তসীমায় পাদপরাশির গাঢ় শ্যামল রেখা গ্রামের অ ঘোষণা করিতেছিল।

কাদিরপুরে ভদ্রলোকের বাড়ী পৌঁছিবার কিছু পরেই ভদ্র

বাঙ্গালীর বীরত্বের লীলাভূমি মহম্মদপুর দর্শনের ইচ্ছা ভ্রমেও তাঁহাদের মনে উদয় হয় না। কথা কয়টী আমার হৃদয়ে আঘাত করে, তখনই সঙ্কল্প করি একবার এই পবিত্র স্থান দর্শন করিয়া চক্ষু সার্থক করিব। তাই আমার জীবনের প্রথম তীর্থযাত্রা বাঙ্গালার এই পুণ্য তীর্থাভিমুখেই হইয়াছিল।

যাইব ঠিক করিলাম বটে, কিন্তু মহম্মদপুর কোথায়, কোন্ পথে যাইতে হয়, কিছুই জানা ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে যশোহর জেলা নিবাসী আমার এক সহাধ্যায়ী মহাশয়কে এই সঙ্কল্পের কথা বলিলে তিনি এ বিষয়ে কিছু সংবাদ দিলেন। মহম্মদপুর তাঁহার জন্মভূমি মাসালিয়া গ্রাম হইতে ১২।১১ ক্রোশ। তিনি বৃদ্ধ লোকের মুখে সীতারামের গল্প শুনিয়াছেন, কিন্তু তিনি বলিলেন মহম্মদপুর এক্ষণে ঘন জঙ্গলে আবৃত এবং ব্যাঘ্রবরাহাদি হিংস্র জন্তুর আবাস স্থান। তবে বন্ধুবর আমরা দুই তিন জন যাইলে আমাদের সঙ্গে যাইতে সম্মত হইলেন।

এই সংবাদে অনেকটাংশ দমিয়া গেলাম। তাহার পর বন্ধুবান্ধবের মধ্যে যাঁহার নিকটই এই প্রস্তাব উত্থাপন করি, তিনিই বলেন, আরে সেখানে কি মানুষে যায়—হয় বাঘে খাবে, না হয় সাপে কামড়াবে। আবার আজকাল পল্লীগ্রামে ভয়ানক কলেরা, ম্যালেরিয়া ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছে, আমরা ভাই, প্রাণের মায়া এখনও সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন করিতে পারি নাই। (বন্ধুবর নব বিবাহিত)।

যাহা হউক, অনেক চেষ্টার পর একজন প্রাণের মমতাশূন্য সহযাত্রী লাভ হইল, তাঁহার বাড়ীর দরওয়ানও তাঁহার সঙ্গ হইল। আমাদের যশোহরস্থিত বন্ধু পূর্ব্বেই দেশে গিয়াছিলেন। কথা ছিল, আমরা প্রথমে তাঁহার বাড়ী যাইব।

কথামত আমার বন্ধু তাঁহার দরওয়ান এবং আমি ৮ই এপ্রেল মঙ্গল

বার ১০টার গোয়ালন্দ মেলে উঠিলাম। প্রথমে কুমারখালির টিকিট করি, সেখান হইতে কাদিরপুরে আমাদের এক পরিচিত ভদ্রলোকের বাটী যাইবার কথা হয়, তিনি আমাদের মাসালিয়া পর্য্যন্ত নৌকা ভাড়া করিয়া দিবেন।

রাত্রি দুই ঘণ্টা থাকিতে গাড়ী আমাদের তিনজনকে কুমারখালিতে নামাইয়া দিল। ষ্টেশনে বসিয়া রাত্রিটুকু অতিবাহিত করিতে হইল। বাড়ী হইতে কিছু জলখাবার লইয়া গিয়াছিলাম, তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া কাদিরপুরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। খোকসায় নামিলেই আমাদের সুবিধা হইত, কিন্তু রেল গাড়ী সেখানে থামে না, তজ্জন্য কুমারখালির টিকিট করিতে হইয়াছিল। সেখান হইতে কাদিরপুর প্রায় ৫ মাইল পথ।

উচ্চ রেলের রাস্তা ধরিয়া উভয় পার্শ্বে বিস্তৃত প্রান্তরশোভা-সন্দর্শন করিতে করিতে পথ অতিবাহন বড়ই মনোরম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষক লাঙ্গল দিতেছে, কোন কোন ক্ষেত্র আগাছায় পূর্ণ হইয়া পুষ্পশোভিত হইয়াছে, মধ্যে কোনও ক্ষেত্রে ইক্ষুর চারা দেখা যাইতেছে। ক্বচিৎ একটা ক্ষেত্রে এখনও গম কাটা হয় নাই, তাহারাই মাথা দোলাইয়া যা আমাদের একটু অভ্যর্থনা করিল। নিকটস্থ একটা বিলে কতকগুলা মাছরাঙ্গা পাখী উড়িয়া উড়িয়া হঠাৎ জলে ছোঁ মারিতেছিল। ঝোপের মধ্য হইতে কোকিল, দোয়েল, পাপিয়া প্রভৃতি সমবেত চেষ্টায় ঐক্যতান বাদন আরম্ভ করিয়া দিল। প্রাতঃ-সমীরণ রহিয়া রহিয়া পথিপার্শ্বস্থ বাবলাগাছের ফলগুলি ঈষৎ দোলাইয়া আমাদের চাদর ফুরফুর করিয়া উড়াইয়া দিতেছিল। স্থানে স্থানে আকাশের প্রান্তসীমায় পাদপরাশির গাঢ় শ্যামল রেখা গ্রামের অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছিল।

কাদিরপুরে ভদ্রলোকের বাড়ী পৌঁছিবার কিছু পরেই ভয়ানক

ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আমাদের সেদিন আর নৌকারোহণ হইল না।

সেদিন তাঁহাদের বাড়ী দুইজন পুরীর পাণ্ডাঠাকুর অতিথি হইয়াছিলেন, তাঁহারাই আমাদের পাক করিয়া দিলেন। শুনিলাম নিকটস্থ সমস্ত গ্রামেই এই সকল পাণ্ডাগণ জগন্নাথক্ষেত্রের যাত্রী সংগ্রহ করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়ান, সকলেই তাঁহাদিগকে আদর করিয়া দুই তিন দিনের জন্য গৃহে স্থান দেন। পাণ্ডা ঠাকুর অনেকটা দেশী হইয়া গিয়াছেন--তিনি বাঙ্গালা লেখাপড়া জানেন এবং ম্যালেরিয়ায় ভোগেন। পার্শ্ববর্ত্তী সমুদায় গ্রামের ভদ্রলোকের নাম ও সম্পর্ক তাঁহার কণ্ঠস্থ। মধ্যে একজন দুষ্ট লোক পাণ্ডা মহোদয়গণকে মহা বিপদে ফেলিয়াছিল। তাঁহারা একাদশীর উপবাসের পৌরাণিক ইতিহাস বলিতে অনুরুদ্ধ হইয়া, অনেক অসংলগ্ন প্রলাপ বকিয়া অজ্ঞানতা গোপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া খোকসার ঘাটে নৌকারোহণ করিলাম, লাঙ্গলবাঁধ পর্য্যন্ত ভাড়া হইল এক টাকা। মধুমতীর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে এবং পরস্পর কথাবার্ত্তায় কর্ম্মবিহীন ঘণ্টা কয়টা কাটান গেল। মধুমতী পদ্মার শাখাবিশেষ, ইহাতে জোয়ার ভাঁটা নাই কেবল নীচেরদিকে একটানা স্রোত। নদীটি কলিকাতার নিকটস্থ ভাগীরথীর অপেক্ষা কিছু কম প্রশস্ত, কিন্তু এই গ্রীষ্মকালে ইহার এক চতুর্থাংশ মাত্র জল; অবশিষ্ট ভাগে চড়া পড়িয়াছে। ইহাতে কুমীরের বেশ প্রাদুর্ভাব, আমরা একস্থানে দুইটা কুমীরকে চড়ায় শুইয়া রৌদ্র পোহাইতে দেখিলাম। নদীর পাড় কোনও স্থানে একেবারে খাড়া, সেখানে শত শত শালিকের বাসা, প্রাচীরগাত্রে পায়রার খোপের ন্যায় দেখায়; স্থানে স্থানে পরিত্যক্ত নীলকুঠির ভগ্ন অট্টালিকা নদীগর্ভে অর্দ্ধনিমজ্জিত হইয়া কালের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। বেলা তৃতীয়

প্রহরের সময় নৌকা লাঙ্গলবাধ পৌঁছিল। লাঙ্গলবাঁধ হইতে প্রায় ক্রোশ খানেক পথ হাঁটিয়া মাসেলিয়ায় বন্ধুর বাড়া যাইয়া উঠিলাম। সেদিন বৃহস্পতিবার, মাসালিয়ার হাট হইতে দোকানি পসারি কেহ হাঁড়ি মাথায় করিয়া, কেহ বাঁক কাঁধে, কেহ গরুর গাড়ীর সঙ্গে বাড়ী ফিরিতেছে। তিন চার ক্রোশ দূরের গ্রামবাসীরাও এই হাট করিয়া থাকে। বৃহস্পতিবার ও রবিবার হাট বসিয়া থাকে।

বন্ধুর বাটী একদিন বিশ্রাম করিয়া মহম্মদপুর অভিমুখে রওনা হইলাম, এইখানে দুই একটী কৃষকের সহিত পরিচয় হয়। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত পরিবার আপনারা চাষ করেন না, মুসলমান বা চণ্ডাল চাষার সহিত আধাআধি বখরায় জমি বিলি করিয়া থাকেন। এই চাষারা দেনায় ডুবিয়া আছে, ভাল ফসল হইলেও ছয় মাসের অধিক আহার সংগ্রহ হয় না—এক বৎসর অজন্মা হইলে ইহারা দাঁড়াইয়া মারা যাইবে। এ অঞ্চলে হিন্দুমুসলমানে বেশ সম্প্রীতি দেখা যায়। আমার বন্ধুর এক মুসলমান প্রজার প্রভুভক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। সে লাঠিখেলা জানে, বন্ধু তাহার নিকট লাঠিখেলা শিখিতে চায়। কিন্তু সে কিছুতেই রাজি হইল না—কেবল হাসে আর বলে, “আপনি মুনিব—আপনার গায়ে বাড়ি মারব ক্যাম্‌বাই।”

এ অঞ্চলের গ্রামবাসীদের বিষয়ে যাহা দেখিলাম ও বন্ধুর নিকট শুনিলাম তাহাতে বড় দুঃখ হইল। প্রতিবেশিগণের মধ্যে সদ্ভাব নাই —সকলেই অপরের মন্দচেষ্টা করিয়া থাকেন। মিথ্যা মোকদ্দমা সাজাইতে ও পরের কুৎসা রটাইতে সকলেই সুপটু।

কিছুদিন পূর্ব্বে লাঠি সড়কি লইয়া দলবদ্ধ হইয়া গ্রামে গ্রামে দাঙ্গা হইত, এক্ষণে পুলিসের শাসনে সকলে লাঠি ছাড়িয়া মোকদ্দমা ধরিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে এই স্থানের চাষারা অত্যাচারী নীলকরদিগকে সময়ে সময়ে লাঠ্যৌষধি প্রদান করিত, কিন্তু হায়, বাঙ্গালী সে

বীর্য্য ক্রমশঃ হারাইতেছে। যাহা হউক দুইশত বৎসর পূর্ব্বে যে, এই দেশের লোক নবাবের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল তাহা বেশ বিশ্বাস যোগ্য। এক্ষণে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আমাদের এমনই শান্তিতে রাখিয়াছেন যে, আমাদের সমস্ত শৌর্য্যবীর্য্য একবারে লোপ পাইতে বসিয়াছে

শনিবার ভোর থাকিতে থাকিতে উঠিয়া মাগুরার পথ ধরিলাম একটা বড় মাঠ পার হইয়া কুমার নদীর তীরবর্ত্তী হইলাম। পথে এক গ্রামে জন কয়েক জোলা এক প্রকার মোটা কাপড় বুনিতেছে দেখিলাম। এখানকার কৃষকেরা এই কাপড় পরিয়া থাকে। এই সময়ে জগৎপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালার বস্ত্রব্যবসা এক্ষণে এইরূপ হীন দশা প্রাপ্ত হইয়াছে—অথচ তাহাতে আমাদের যুগান্তব্যাপী নিদ্রার কোনও ব্যাঘাত ঘটে নাই! পরমেশ্বর এদেশকে রক্ষা করুন।

ঘাটে আসিয়া দেখি হালবিহীন একখানি একমাত্র দাঁড়বিশিষ্ট নৌকায় পাটনী দাঁড়াইয়া আছে। মাসালিয়ার বন্ধু তাহাকে গিয়া বলিলেন, আমরা মাসালিয়ার হালদারের'—শুনিয়া পাটনী তাঁহাকে নৌকা ছাড়িয়া দিয়া আপনার কাজে চলিয়া গেল। তখন আমার সুযোগ্য সহযাত্রী সেই কাষ্ঠদণ্ড চালাইয়া দাঁড় ও হাল উভয়ের কাজ করিয়া আমাদের পার করিয়া দিলেন—নৌকাটা টানিয়া কাদায় আট্‌কাইয়া রাখিয়া দিলেন। শুনিলাম এই পাটনী নিকটবর্ত্তী গ্রামের ভদ্রপরিবারের নিকট হইতে প্রতি বৎসর এবং বিবাহ শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে আট আনা এক টাকা করিয়া বিদায় পাইয়া থাকে—যখন এই পরিবারের কোনও লোক বা তাহাদের কুটুম্ব নদীপার হয়, পাটনী তাহাদের বিনাপয়সায় নৌকা ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যায়। অবশ্য নদী অপ্রশস্ত না হইলে এইরূপ হওয়া অসম্ভব।

বিস্তৃত চাষের ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া, কখন বা গ্রামের পার্শ্ব দিয়া, চাষাদের মাগুরার পথ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে আমরা অগ্রসর হইতে

লাগিলাম। ক্রমে সূর্য্যের উত্তাপ প্রখর হইয়া উঠিল, ছোট ছোট চাষার ছেলে বড় বড় বাঁক কাঁধে করিয়া ক্ষেতে চাষার জন্য ভাত ডাল লইয়া চলিতে লাগিল। তথাপি মাগুরা আর আসে না, সকলেই বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। আমার অন্তরতর বন্ধু মনের দুঃখে গান ধরিলেন,

সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে

'গগনে গরজে ঘন বহে খর সমীরণ
কুল ত্যজি এলাম কেন মরিতে আতঙ্গে।'

মাসালিয়ার বন্ধু বলিলেন 'এত যদি ভয় তবে বাড়ী ছেড়ে এলে কেন?' গায়ক গাহিলেন—

'ভাসল তরী সকাল বেলা, ভাবিলাম এ জল খেলা
মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে।'

যাহা হউক অবশেষে উরুদেশ পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া পার হইয়া মাগুরার হাটে উপস্থিত হইলাম। মাগুরা এই স্থানের মহকুমা আদালত, এণ্ট্রান্স স্কুল প্রভৃতি কয়েকখান কোঠাবাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়—এ অঞ্চলে কোঠা বাড়ী বড়ই দুর্লভ—কুঁড়েঘরগুলিও কেবল ছাঁচা বেড়ার—মাটির প্রাচীর নাই। এই গ্রীষ্মকালে গ্রামে প্রায়ই স্থানে স্থানে অগ্নিকাণ্ড হইয়া অনেক ক্ষতি করে। খোলার চালের ঘর হইলে ও মাটীর প্রাচীর দিলে অগ্নি হইতে বিশেষ অনিষ্ট হয় না।

এক হোটেলে আমরা আশ্রয় লইলাম। দশ পয়সা দিয়া নামমাত্র মৎস্যযুক্ত মোটা চালের ভাত উদরস্থ করিতে হইল, আবার পূর্ব্ব বঙ্গের অতিরিক্ত লঙ্কা, কলিকাতার জিহ্বাকে কিছু প্রপীড়িত করিল। আমার কলিকাতার বন্ধু সুবর্ণবণিক-সম্প্রদায়ভুক্ত; এই সম্প্রদায় অল্পাহারী বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি ত আহারের যোগাড় দেখিয়া নাম

মাত্র হাতে মুখে করিলেন। আমরা ঠাট্টা করিয়া বলিলাম, 'এইরূপ আহার করিলেই তুমি একজন বীর হইয়া উঠিবে!' তদুত্তরে বন্ধু বলিলেন, 'তা বুঝি জান না,—আজকালকার দিনে অল্পাহারী জাতিই বীর হয়। জাপানীদের দেখ না?'

মধ্যাহ্নে সেই হোটেলে বিশ্রাম করিয়া বৈকালে বিনোদপুরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। মাগুরা হইতে মহম্মদপুর পর্য্যন্ত মাইলষ্টোনযুক্ত পাকা রাস্তা দৈর্ঘ্যে ১৪ মাইল। তথাকার লোকের মতে মাসালিয়া হইতে মাগুরা ১০ মাইল। মাসালিয়া হইতে মহম্মদপুর ২৪ মাইল পথ।

সেই চটী হইতে বিনোদপুর-নিবাসী একজন অল্পবয়স্ক ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গ লইলেন। তিনি বোধ হয় একবার রঙ্গপুরে গিয়াছিলেন—তাই কথায় কথায় তিনি বলিতেন, 'য়্যাখানে এমন, কিন্তু রঙ্‌পুরে এই রকম।' তারপর যখন তিনি শুনিলেন আমরা নিরাশ্রয় অবস্থায় বিনোদপুরে যাইতেছি, তাঁহার বোধ হইল আমরা তাঁহার বাড়ী উপস্থিত হইব—তিনি রাস্তার মধ্যে কোন স্থানে বসিয়া রহিলেন—কিছু পরে বাড়ী যাইবেন। আমরা চলিতে লাগিলাম। পথে একজন কাঁচা দুধ বিক্রয় করিতে যাইতেছিল, তাহার নিকট হইতে প্রায় দুই সের দুগ্ধ, ছয় পয়সায় কিনিয়া তিনজনে খাইলাম।

প্রায় সন্ধ্যার সময় কুমারনদ পুনরায় পার হইয়া বিনোদপুর পৌঁছিলাম। সেখানে মাসালিয়ার এক ব্রাহ্মণের কুটুম্ব বাস করেন, তাঁহার নামমাত্র জানা ছিল। দায়ে পড়িয়া তাঁহারই বাড়ী অতিথি হইলাম। তিনি কেমন অপ্রসন্নভাবে আমাদের কিছু মুড়ি, কিছু কথাবার্ত্তার পর কিছু চিড়ে ও বাতাসা দিলেন, (এখানে ইহাই হইতেছে জলযোগ) ও একটা ঘর খুলিয়া দিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন। তাঁহার এইরূপ ব্যবহার মাসালিয়ার বন্ধুর বিবেচনায় নিতান্ত অভদ্রোচিত (পল্লীগ্রামে

কোনও ভদ্রলোক এরূপ করেন না)—কিন্তু আমি ভাবিলাম তবুত আশ্রয় পাইয়াছি—তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে হয়।

পরদিন প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া মহম্মদপুরের পাকা রাস্তা ধরিলাম। ইহারই মধ্যে দুই একজন কৃষক, ক্ষেত্রে আসিয়া হলচালনা আরম্ভ করিয়াছে। রাস্তার উভয় পার্শ্বের বিস্তীর্ণ মাঠ দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, একদিন এই সকল স্থানেই বাঙ্গালী ও মোগলে ভীষণ যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।—কিন্তু এক্ষণে তাহার চিহ্নমাত্র লোপ পাইয়াছে। ঐ যে কৃষক আপনার মনে চাষ দিতেছে, উহাকেও জিজ্ঞাসা করিলে সে সীতারামের কাহিনী বলিবে ও সেই স্বাধীন রাজার প্রশংসা করিবে। কিন্তু তাহার মনে কোনও ভাবতরঙ্গ উঠিবে না—বাঙ্গালী স্বাধীনতার মর্য্যাদা বুঝে না। আমাদের উদ্দাম কল্পনায় কিন্তু মহম্মদপুরের সেই দিন সম্মুখে দেখিতে পাইলাম, যে দিনের বিষয় কবি অবস্থান্তরে লিখিয়াছেন—

এসেছে সে একদিন।
লক্ষ পরাণে,　শঙ্কা না জানে
না রাখে কাহারও ঋণ।
জীবন মৃত্যু　পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনা হীন।
পঞ্চ নদীর　ঘিরি দশ তীর
এসেছে সে এক দিন!

এই সকল মাঠ যেন স্বাধীনতার সমরক্ষেত্র বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, যুযুৎসু বীরগণকে যেন চক্ষের সম্মুখে দেখিতে লাগিলাম—শত্রু-বিমর্দ্দী বাঙ্গালী বীরের সিংহনাদ যেন কর্ণে প্রবেশ করিয়া শরীর কণ্টকিত করিয়া দিল—দেশ-কাল-পাত্র বিস্মৃত হইলাম, অজ্ঞাতসারে আমাদের মুখ হইতে 'জয় রাজা সীতারাম কি জয়' শব্দ বাহির হইল।

বেলা দশটার সময়, একহারা একটা বাঁশের বেড়ু পার হ মহম্মদপুর গ্রামে উপস্থিত হইলাম। এই গ্রামে একটা বাজার বসে—কিন্তু হোটেলের মত কিছুই নাই। সুতরাং, এখানে আমরা স্থানীয় ভদ্রলোকের আতিথেয়তার উপর নির্ভর করিলা আমাদের পরিচিত কোন ব্যক্তির এক আত্মীয় মাসালিয়ার উত্তরব চাকদহ গ্রামে বাস করিতেন। চাকদহ হইতেই তাঁহার নাম আম শুনিয়াছিলাম—এক্ষণে তাঁহারই বাটী অতিথি হইলাম। দত্ত মহা তখন পীড়িত, তাঁহার স্ত্রীও তখন রুগ্নাবস্থায়। তথাপি তিনি আমাদে পিতৃতুল্য স্নেহের সহিত যেরূপ সুন্দর আহারের ও বিশ্রামের আয়োজ করিয়াছিলেন—তাহাতে আমরা মুগ্ধ হইয়া গেলাম। যাঁহার পল্লীগ্রামে কিছুদিন ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন—ভদ্রলোকের বাড়ীতে অতিথির কিরূপ যত্ন হইয়া থাকে। এই কারণেই হোটেল না থাকিলেও গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিতে বিশেষ কষ্ট হয় না।

আমাদের মহম্মদপুর আগমনের উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া, তিনি তথাকার পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু বরদাকান্ত দে মহাশয়ের লিখিত এবং যশোহরের হিন্দু পত্রিকায় প্রকাশিত 'সীতারাম' প্রবন্ধ পাঠ করিতে দিলেন, তাহাতে স্থানীয় অনেক প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া দে মহাশয় আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে, দে মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হইল, তিনি আমাদের সদুদ্দেশ্যের প্রশংসা করিয়া কষ্টস্বীকারপূর্ব্বক সেই হিন্দু রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ সমূহ দেখাইয়া দিলেন।

মহম্মদপুর এককালে, বহুজনাকীর্ণ সমৃদ্ধ নগর ছিল। রাজা সীতারাম রায়ের উদ্দেশ্য ছিল যে, এই নগরের মধ্যেই সমুদায় সম্প্রদায়ের লোক বাস করিবে, যাহাতে কিছুকাল মোগলকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া থাকিলেও, সমাজের মধ্যে কোন বিষয়ের অভাব অনুভূত

হইবে না। তিনি নানাস্থান হইতে শিল্পী, পণ্ডিত, যোদ্ধা প্রভৃতি আনয়ন করিয়া যত্নপূর্ব্বক নিজ রাজধানীর মধ্যে বাস করাইয়াছিলেন। এখনও মহম্মদপুরে, নানা সম্প্রদায়ের বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, উত্তর রাঢ়ী, দক্ষিণ রাঢ়ী, বারেন্দ্র, ও বঙ্গজ এই চারি প্রকার কায়স্থ, রাজপুত, কনৌজি ব্রাহ্মণ, নানা জাতীয় শিল্পী প্রভৃতি দেখা যায়। চতুর্দ্দিকে পুষ্করিণী খনন করিয়া, নানা সুদৃশ্য সৌধ ও মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া তিনি এই স্থানটী পরম-রমণীয় করিয়া তুলেন। চতুর্দ্দিকে গড় নির্ম্মাণ করিয়া ও মৃণ্ময় প্রাচীর তুলিয়া তিনি ইহাকে শত্রুর অভেদ্য করিয়াছিলেন। সেই গড় এখনও বর্ত্তমান আছে।

যখন এই স্বাধীন নগর মুসলামনকবলে পতিত হইল, তখন নবাব মুরসিদকুলি খাঁ এই স্থান তাঁহার দেওয়ান নাটোর-রাজ রঘুনন্দনকে জায়গীরস্বরূপ প্রদান করেন। এই সময় হইতে মহম্মদপুরেই এই অঞ্চলের নাটোরের সদর কাছারি হইয়া আসিতেছে। তখনও নগরের সমৃদ্ধির কোন হানি হয় নাই। পরে উনবিংশতি শতাব্দীর মধ্যভাগে এক মহামারী আসিয়া জনাকীর্ণ রাজধানীকে হিংস্র জন্তুর আবাসভূমিতে পরিণত করিয়াছে। এক্ষণে জঙ্গল অনেকটা পরিষ্কার করা হইয়াছে—বাসস্থানও সংখ্যায় বাড়িয়াছে। বাঘ এখনও দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহারা মানুষ খায় না।

এক্ষণে দ্রষ্টব্যের মধ্যে আছে রামসাগর, কৃষ্ণসাগর প্রভৃতি কয়েকটী অতি প্রকাণ্ড পুষ্করিণী, নগরপ্রদক্ষিণকারী গড়খাই এবং কয়েকটী ভগ্ন মন্দির এবং রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ মাত্র।

রামসাগরের মত প্রকাণ্ড পুষ্করিণী নাকি নিম্নবঙ্গে আর নাই। প্রবাদ আছে বীরসেনাপতি মেনাহাতীর তীর যতদূর গিয়াছিল, তাহার অর্দ্ধেক পথ অবলম্বন করিয়া এই পুষ্করিণী খনন করা হয়। আমরা যে সময়ে এই অঞ্চলে বেড়াইতে আসি, তখন নদীর পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলি

বেলা দশটার সময়, একহারা একটি বাঁশের সেতু পার হইয়া মহম্মদপুর গ্রামে উপস্থিত হইলাম। এই গ্রামে একটী ছোট বাজার আছে—কিন্তু হোটেলের মত কিছুই নাই। সুতরাং, এবারেও আমরা স্থানীয় ভদ্রলোকের আতিথেয়তার উপর নির্ভর করিলাম। আমাদের পরিচিত কোন ব্যক্তির এক আত্মীয় মাসালিয়ার উত্তরবর্ত্তী চাকদহ গ্রামে বাস করিতেন। চাঁকদহ হইতেই তাঁহার নাম আমরা শুনিয়াছিলাম—এক্ষণে তাঁহারই বাটী অতিথি হইলাম। দত্ত মহাশয় তখন পীড়িত, তাঁহার স্ত্রীও তখন রুগ্নাবস্থায়। তথাপি তিনি আমাদের পিতৃতুল্য স্নেহের সহিত যেরূপ সুন্দর আহারের ও বিশ্রামের আয়োজন করিয়াছিলেন—তাহাতে আমরা মুগ্ধ হইয়া গেলাম। যাঁহারা পল্লীগ্রামে কিছুদিন ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন—ভদ্রলোকের বাড়ীতে অতিথির কিরূপ যত্ন হইয়া থাকে। এই কারণেই হোটেল না থাকিলেও গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিতে বিশেষ কষ্ট হয় না।

আমাদের মহম্মদপুর আগমনের উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া, তিনি তথাকার পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু বরদাকান্ত দে মহাশয়ের লিখিত এবং যশোহরের হিন্দু পত্রিকায় প্রকাশিত 'সীতারাম' প্রবন্ধ পাঠ করিতে দিলেন, তাহাতে স্থানীয় অনেক প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া দে মহাশয় আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে, দে মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হইল, তিনি আমাদের সদুদ্দেশ্যের প্রশংসা করিয়া কষ্টস্বীকারপূর্ব্বক সেই হিন্দু রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ সমূহ দেখাইয়া দিলেন।

মহম্মদপুর এককালে বহুজনাকীর্ণ 'সমৃদ্ধ নগর' ছিল। রাজা সীতারাম রায়ের উদ্দেশ্য ছিল যে, এই নগরের মধ্যেই সমুদায় সম্প্রদায়ের লোক বাস করিবে, যাহাতে কিছুকাল মোগলকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া থাকিলেও, সমাজের মধ্যে কোন বিষয়ের অভাব অনুভূত-

হইবে না। তিনি নানাস্থান হইতে শিল্পী, পণ্ডিত, যোদ্ধা প্রভৃতি আনয়ন করিয়া যত্নপূর্ব্বক নিজ রাজধানীর মধ্যে বাস করাইয়াছিলেন। এখনও মহম্মদপুরে, নানা সম্প্রদায়ের বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, উত্তর রাঢ়ী, দক্ষিণ রাঢ়ী, বারেন্দ্র, ও বঙ্গজ এই চারি প্রকার কায়স্থ, রাজপুত, কনৌজি ব্রাহ্মণ, নানা জাতীয় শিল্পী প্রভৃতি দেখা যায়। চতুর্দ্দিকে পুষ্করিণী খনন করিয়া, নানা সুদৃশ্য সৌধ ও মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া তিনি এই স্থানটী পরমরমণীয় করিয়া তুলেন। চতুর্দ্দিকে গড় নির্ম্মাণ করিয়া ও মৃণ্ময় প্রাচীর তুলিয়া তিনি ইহাকে শত্রুর অভেদ্য করিয়াছিলেন। সেই গড় এখনও বর্ত্তমান আছে।

যখন এই স্বাধীন নগর মুসলামনকবলে পতিত হইল, তখন নবাব মুরসিদকুলি খাঁ এই স্থান তাঁহার দেওয়ান নাটোর-রাজ রঘুনন্দনকে জায়গীরস্বরূপ প্রদান করেন। এই সময় হইতে মহম্মদপুরেই এই অঞ্চলের নাটোরের সদর কাছারি হইয়া আসিতেছে। তখনও নগরের সমৃদ্ধির কোন হানি হয় নাই। পরে উনবিংশতি শতাব্দীর মধ্যভাগে এক মহামারী আসিয়া জনাকীর্ণ রাজধানীকে হিংস্র জন্তুর আবাসভূমিতে পরিণত করিয়াছে। এক্ষণে জঙ্গল অনেকটা পরিষ্কার করা হইয়াছে— বাসস্থানও সংখ্যায় বাড়িয়াছে। বাঘ এখনও দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহারা মানুষ খায় না।

এক্ষণে দ্রষ্টব্যের মধ্যে আছে রামসাগর, কৃষ্ণসাগর প্রভৃতি কয়েকটী অতি প্রকাণ্ড পুষ্করিণী, নগরপ্রদক্ষিণকারী গড়খাই এবং কয়েকটী ভগ্ন মন্দির এবং রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ মাত্র।

রামসাগরের মত প্রকাণ্ড পুষ্করিণী নাকি নিম্নবঙ্গে আর নাই। প্রবাদ আছে বীরসেনাপতি মেনাহাতীর তীর যতদূর গিয়াছিল, তাহার অর্দ্ধেক পথ অবলম্বন করিয়া এই পুষ্করিণী খনন করা হয়। আমরা যে সময়ে এই অঞ্চলে বেড়াইতে আসি, তখন নদীর পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলি

ভিন্ন সর্ব্বত্র বড়ই জলাভাব। মাসালিয়ায় আমরা যেরূপ অপরিষ্কার জলে স্নান করিয়াছিলাম তাহার কথা মনে হইলে এখনও ঘৃণা হয়। কিন্তু রামসাগরের কল্যাণে মহম্মদপুরের লোক বড়ই সুখে আছে—ইহার জলই তাহাদের স্নান, পান ও পাকের একমাত্র ও অতি উত্তম অবলম্বন। অনেক দিন পর রামসাগরের জল খাইয়া (ছোট পুকুরের জল খাওয়ায়) অপূর্ব্ব তৃপ্তিলাভ করিলাম। দুই শত বৎসর গত হইল বঙ্গের এক স্বাধীন রাজা প্রজামণ্ডলীর উপকারের জন্য যে মহদনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, আজও শত শত লোক তদ্দ্বারা উপকৃত, সেই স্বর্গগত মহাপুরুষের পুণ্যকাহিনী ঘোষণা করিতেছে। পৃথিবীর এক সভ্যতাভিমানী জাতি এক্ষণে বঙ্গের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এই কৃষি-বহুল ও জলকষ্টপীড়িত দেশে তাঁহারা কয়টী খাল বা কয়টা পুষ্করিণী খনন করিয়া প্রজার কষ্ট নিবারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন? বরঞ্চ রেলপথ বিস্তার করিয়া স্বাভাবিক জলনিকাশের পথ বন্ধ করিয়া দেশে ম্যালেরিয়া ডাকিয়া আনিয়াছেন!

বড়ই দুঃখের বিষয় এই, রামসাগর যত্নাভাবে ক্রমশই খারাপ হইয়া যাইতেছে। চতুর্দ্দিকের পাড়ের জঙ্গল জলে পড়িয়াছে—ধোপা এই জলে কাপড় কাচিতেছে, লোকে এই জলে গরু ঝাঁপাইতেছে (নাওয়াইতেছে)। মহম্মদপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সীতারামপ্রদত্ত দেবোত্তর-সম্পত্তির অন্তর্গত, নাটোরের বড় তরফের রাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় এক্ষণে সেবাইৎ। তাঁহার কর্ম্মচারিবর্গের দোষে এমন উপকারী ও এমন প্রসিদ্ধ জলাশয় নষ্ট হইতে বসিয়াছে, সে বিষয়ে আমরা স্বদেশহিতৈষী মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

শুধু রামসাগর কেন, কৃষ্ণসাগর, পদ্মপুষ্করিণী, সুখসাগর প্রভৃতি অসংখ্য ছোটবড় জলাশয়—সেই পুণ্যশ্লোক মহারাজের কীর্ত্তিচিহ্নস্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রবাদ আছে—মহারাজের সঙ্গে সর্ব্বদাই

২২০০ কোঁড়দার অর্থাৎ পুষ্করিণীখননস্থায়ী থাকিত—যুদ্ধাভিযানে অথবা যশোর-পাবনাব্যাপী বিস্তৃত রাজ্যপরিদর্শনে গমন করিলে যেখানেই জলাভাব দেখিতেন তথায়ই পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিতেন। মাসালিয়ার নিকটেও তাঁহার খনিত একটী জলাশয় দেখিতে পাওয়া যায়।

সুখসাগর, নগরের বহির্ভাগে অবস্থিত। ইহার মধ্যস্থলে মহারাজের গ্রীষ্মকালের বিশ্রাম প্রাসাদ (হিম গৃহ) ছিল—এক্ষণে পুষ্করিণীর মধ্যভাগে একটী জঙ্গলময় দ্বীপ দেখা যায় মাত্র।

এই সুখসাগর ও সুন্দর রাজপুরী দেখাইয়া, জনরব, মহাত্মা সীতারামকে বিলাসী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহে। আমার বোধ হয় এ অঞ্চলের লোক কখনও রাজপ্রাসাদ দেখে নাই, তাই, সীতারামের রাজৈশ্বর্য্য দেখিয়া তাঁহাকে বিলাসপরায়ণ বলিয়া ঠিক করিয়াছে। তিনি যে চতুর্দ্দশ বৎসর নবাবের সহিত ঘোর যুদ্ধে ব্যস্ত থাকিয়া বিলাসপরায়ণ ছিলেন এরূপ কিছুতেই বোধ হয় না।

সেই দিন বৈকালে আমরা সীতারামের রাজপুরী দেখিতে বাহির হইলাম। বাজার হইতে একটী রাস্তা সেই রাজপুরী অভিমুখে গিয়াছে। রাস্তার উভয় পার্শ্বেই জঙ্গল—মাঝে মাঝে বহুকালের ভগ্ন প্রাচীর গাছের ভিতর হইতে উঁকি মারিতেছে। রাস্তার শেষে রাজপ্রাসাদের বৃহৎ তোরণদ্বার এখনও ভগ্নদশায় বর্ত্তমান আছে, রাজপুরীর ইষ্টকপ্রাচীর এখনও সম্পূর্ণরূপে ধূলিসাৎ হয় নাই। তোরণসম্মুখে দাঁড়াইলে দক্ষিণ দিকে সুদৃশ্য দোলমঞ্চ এবং বাম দিকে রাণী ও রাণীর কন্যা রাণী তারা ঠাকুরাণীর প্রতিষ্ঠিত রামচন্দ্রের মনোরম মন্দির দেখিতে বড়ই সুন্দর। কিন্তু আমরা তখন এ সকল দেখিতেছিলাম না। বিখ্যাতনামা সেনাপতি মেনাহাতী সমস্ত দিন নগর-রক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া, সৈন্যদিগকে যুদ্ধশিক্ষা দিয়া রজনীতে এই তোরণের সম্মুখে নিদ্রা যাইতেন।

আমাদের মস্তিষ্কে তখন এই ভাব জাগিতেছিল, আমাদের হৃদয়ে বেগে রক্ত প্রবাহিত হইতেছিল।"

পুরী প্রবেশ করিয়া গুটিকয়েক ভগ্ন অট্টালিকা ও মন্দির পার হইয়া ৺ দশভুজার মন্দিরের সম্মুখে প্রণত হইলাম। ইহার নিকটেই নাকি একটী শিবমন্দির (একটী জোড় বাঙ্গালা) ছিল—তাহা এক্ষণে অত্যন্ত ভগ্নদশাগ্রস্ত। এই দশভুজার প্রতিমাসম্বন্ধে একটি গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। রাজা সীতারাম শিল্পী প্রভৃতি লোকের বড়ই আদর করিতেন। দশভুজার স্বর্ণময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবার জন্য যখন তিনি শিল্পিগণকে আহ্বান করিলেন, তখন এক যুবক বলিল, 'মহারাজ! আমি আপনার মনোমত মূর্ত্তি গড়িয়া দিব; তবে আমার একটি বক্তব্য আছে, আমি আপনার অজ্ঞাতসারে সমুদয় স্বর্ণ চুরি করিব।' মহারাজ বলিলেন, "কিন্তু যদি তুমি ধরা পড় তোমার যথোচিত শাস্তি হইবে।' শিল্পী তাহাতেই সম্মত হইল। প্রতিদিন রাজবাটীতে আসিয়া কাজ করে, যাইবার সময় দ্বাররক্ষক তাহাকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখে কিছু লইয়া যাইতেছে কি না। পরে, মূর্ত্তি সম্পূর্ণ হইল এবং অভিষেকের পর বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হইল। রাজা শিল্পীকে বলিলেন, "কৈ, তুমি ত এক রতি স্বর্ণও চুরি করিতে পারিলে না।" শিল্পী বিনীতভাবে বলিল, "মহারাজ সমুদয় স্বর্ণই আমি চুরি করিয়াছি। এখানে যেমন স্বর্ণের মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতাম, বাটীতে ঠিক তদনুরূপ পিত্তলের এক মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতাম। বিগ্রহ অভিষেকের দিন আমিই রামসাগরে মূর্ত্তিস্নান করাইয়া আনি। যে স্থানে স্বর্ণময়ী মূর্ত্তি নিমজ্জিত করি, তথায় পূর্ব্বাহ্নে পিত্তলময়ী মূর্ত্তি ডুবাইয়া রাখিয়াছিলাম, তুলিবার সময় স্বর্ণের পরিবর্ত্তে পিত্তলের মূর্ত্তি উঠাইলাম। কেহ সন্দেহ করিতে পারিল না। সেই জন্য বর্ত্তমান দশভুজামূর্ত্তি পিত্তলের।'

মহারাজ সীতারাম বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁহার একাধিক বিষ্ণুমন্দির

দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল বিগ্রহের দেবোত্তর সম্পত্তিও বিস্তর। এই একমাত্র দুর্গামন্দির—ইহারও শুনিলাম দেবোত্তর নাই (?)। আমার বোধ হয়, শাক্ত প্রজাগণের মনোরঞ্জনার্থ শেষে তিনি এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন—দেবোত্তরের বন্দোবস্ত করিবার সময় পান নাই।

ইহার পরেই ৺লক্ষ্মীনারায়ণ জীর অষ্টকোণ দ্বিতল মন্দির। এই বিগ্রহপ্রাপ্তির পর হইতেই শুনা যায়—সীতারামের ভাগ্যোদয় হয়। এত দেবোত্তর সত্ত্বেও জীর্ণসংস্কারের অভাবে মন্দিরের মধ্যে জল পড়ে।

মন্দিরের পার্শ্বস্থ এক ইষ্টকস্তূপে দেখিলাম কারুকার্য্যযুক্ত সুন্দর ইষ্টক পড়িয়া রহিয়াছে—আমরা আগ্রহের সহিত কতকগুলি সংগ্রহ করিয়া লইলাম। এই তীর্থদর্শনের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ আমরা সেগুলি সযত্নে বাড়ীতে বহন করিয়া আনিয়াছি।

সেই ইষ্টকস্তূপের উপর উঠিলে রাজান্তঃপুরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ঘন জঙ্গলের মাঝে মাঝে এক একটী ভগ্ন দালান, ভগ্ন গৃহ দেখিতে পাইলাম। কিন্তু সেই বিস্তীর্ণ জঙ্গল দেখিয়া অনুমান হয়, এক সময় তথায় অনেক অট্টালিকা বিরাজ করিত। মন্দিরের পশ্চাতে অন্তঃপুরের পুষ্করিণীর পার্শ্বদেশ ও তলদেশ ইষ্টক বাঁধান রহিয়াছে। ইহারই মধ্যে মহারাজের গুপ্ত কোষাগার ছিল। এক সময়ে ইহার চতুর্দ্দিকে আলোকমালা শোভা পাইত—জলাশয়ে তাহার প্রতিবিম্ব পড়িয়া অন্তঃপুরে স্বর্গের শ্রী আনয়ন করিত। সুরম্য অট্টালিকারাজি এক দিন পুরাঙ্গনার সৌন্দর্য্যালোকে উদ্ভাসিত ও মধুর কলকণ্ঠে মুখরিত ছিল। এই শ্মশানের মধ্যে দাঁড়াইয়া আমরা সেই দিনের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম।

রাজপুরী হইতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক আমরা মহম্মদপুরের নিকটস্থ

কানাইনগর গ্রামে ৺হরেকৃষ্ণ রায়ের মন্দির দেখিতে গেলাম। যে রাস্তা ধরিয়া আমরা যাইতেছিলাম, তাহাকে 'রথের রাস্তা' বলে—রথ-যাত্রার সময় এই পথে রথ চলে। [illegible] স্থানে এই প্রকাণ্ড রথটা রাখা হইয়াছে, দেখিলাম—দুঃখের বিষয় রথের অন্যান্য সুন্দর চিত্রের সহিত দুই একটি [illegible]শ্লীল চিত্র রহিয়াছে। মহম্মদপুরে দোল-দুর্গোৎসব সমস্ত হিন্দু পালপার্ব্বণেই ধূম ধাম হইয়া থাকে—মহারাজ সীতারামের নাকি এইরূপ ব্যবস্থা আছে।

অপরাহ্নকালে আমরা কানাইনগরের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। মন্দিরটী এক কালে যে অতি সুন্দর কারুকার্য্যে খচিত ছিল, তাহার প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়। পাঁচটি চূড়ার মধ্যে দুটী তিনটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অবশিষ্টগুলিও কখন ভাঙ্গিয়া যাইবে তাহার পরামর্শ করিতেছে। একটি চূড়া ভাঙ্গিবার সঙ্গে, রাজা সীতারামের সংস্কৃত শ্লোকাঙ্কিত শিলালিপি পড়িয়া যায়, তাহা এক্ষণে মহম্মদপুরের কাছারিতে রক্ষিত আছে, দেখিয়া আসিয়াছি। ভাঙ্গা মন্দিরের মধ্যে *দলে দলে পায়রা বাসা করিয়া বড়ই অপরিষ্কৃত করিয়াছে। এরূপ অযত্নে আর কিছুকাল থাকিলে স্বাধীন রাজা সীতারামের শেষ স্মৃতি-*চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ পাইবে!

পার্শ্বে বলরামজির মন্দির; এটি সীতারামের পরে অন্য কোনও লোকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। দুইজন উড়িয়া ব্রাহ্মণ এই মন্দিরের দেব-সেবাকার্য্যে নিযুক্ত। অন্যান্য মন্দিরেও উড়িয়া ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা সেদিনকার রাত্রির জন্য এই মন্দিরেই বেগার দিলাম—অর্থাৎ সে রাত্রি সেখানে প্রসাদ পাইবার জন্য পাণ্ডাঠাকুরের নিকট আবেদন করিলাম। পাণ্ডাঠাকুর গম্ভীরমুখে আমাদের বসিতে বলিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু বসিবার আসন কোথায়? অগত্যা আমাদের সমভিব্যাহারী মহম্মদপুরের এক মিস্ত্রীর পরামর্শ মতে আমরা

নিকটবর্ত্তী এক গোপভবনে।

সীতারাম এই স্থানে দ্বিতীয় বৃন্দাবন নির্ম্মাণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাই এই কানাইনগরে বৃন্দাবনের ন্যায় তিনি গোপপল্লী স্থাপন করিয়াছিলেন; চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামগুলির নাম রাখিয়াছিলেন—মথুরানগর, গোপালপুর ইত্যাদি।

এই সময় প্রতিগ্রামে চৈত্রসংক্রান্তির উৎসব। কোনও বিগ্রহ বা শিবলিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় না। একখণ্ড কারুকার্য্যযুক্ত কাষ্ঠের উপর একটি ত্রিশূল প্রোথিত করিয়া তাহাকেই মহাদেবের আসন বলিয়া পূজা করা হয়। গ্রাম্য কৃষকগণের কয়দিন ধরিয়া বড়ই আমোদ প্রমোদ দৃষ্ট হয়। তবে কলিকাতায় যেমন কাঁটাঝাঁপ, বঁটিঝাঁপ প্রভৃতি হইয়া থাকে সেরূপ কিছু হয় না। বর্দ্ধমান অঞ্চলের মত চৈত্রসংক্রান্তির উপলক্ষে আতসবাজিও পোড়ান হয় না। তবে এখানে নৃত্যগীতের খুব ধূম। দুই প্রকারের গীত শুনিতে পাওয়া যায়—এক, বয়স্ক পুরুষগণ ঢাকের বাদ্যের সঙ্গে সুর করিয়া হরপার্ব্বতীসম্বন্ধীয় কবিতা *আবৃত্তি করিতে থাকে। আর এক প্রকার আছে, কৃষকবালকগণ সখী সাজিয়া রাধার বিরহসঙ্গীত গান করে।*

গোপভবনে যাইয়া দেখিলাম, তাহাদের সেখানে বিরহসঙ্গীত হইতেছে। গোপকর্ত্তা আসিয়া আমাদের খাতির করিয়া বসাইলেন। যখন স্বল্পভূষণ নটীরূপী কৃষকবালকগণ, গ্রাম্য নৃত্যগীতে স্বল্পসন্তুষ্ট, সরলচিত্ত কৃষক শ্রোতৃবর্গের আনন্দবিধান করিতেছিল, তখন আমাদের হৃদয়ে প্রীতির রাজ্য প্রসারিত হইতেছিল, এবং সেই যৎসামান্য নৃত্য গীতও আমাদের নিকট হৃদয়ের স্বাভাবিক সঙ্গীতরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল।

কিছুক্ষণ পরে আমরা মন্দিরে প্রসাদ পাইয়া আসিলাম। এই মন্দিরগুলির বন্দোবস্ত বড়ই শোচনীয়। স্থানীয় ভদ্রলোকের নিকট

[illegible] সকল মন্দিরের সীতারামপ্রভুর অনেক দেবোত্তর সম্পত্তি আছে। পূর্ব্বে অনেকগুলি অতিথির সেবা হইত, এক্ষণে অতিথির প্রতি যত্নাভাবে আর কেহ আসে না, কাছারির আমলাবর্গই এক্ষণে নিয়মিতরূপে প্রসাদ পাইয়া থাকে। আমার বিশ্বাস যদি ভদ্রলোকে এই স্থানপরিদর্শনে আসেন, তাঁহারা দুই এক দিন এই সকল মন্দিরে প্রসাদ পাইতে পারেন, এবং তাহা হইলেই লজ্জায় পড়িয়া নাটোরের মহারাজার কর্ম্মচারীরা সুবন্দোবস্তের প্রতি লক্ষ্য করিবেন।

সে রাত্রে দত্ত মহাশয়ের বাড়ী নিদ্রা গেলাম। পরদিন প্রাতে মহম্মদপুর হইতে এক মাইল দূরবর্ত্তী মধুমতী নদী দেখিতে গেলাম। আমাদের অনেকবার নদী পার হইতে হইয়াছিল। এই দেশ নদী-বহুল—আক্রমণকারী সৈন্যের পক্ষে এ দেশ বড়ই দুর্গম। বর্ষাকালে যখন মাঠ জলে ডুবিয়া যায়, তখন যুদ্ধ করা একরূপ অসম্ভব। এক্ষণে নদীটী শীর্ণকায়া ও শান্তস্বভাবা—এই বর্ত্তমান বঙ্গদেশেরই মত। কিন্তু এক সময়ে বজরার পর বজরা মোগলসৈন্য আনয়ন করিয়া এ নদীটীকে ভীষণ মূর্ত্তি দান করিয়াছিল। কবির কথা মনে পড়িল—

তব জলকল্লোল সহ কত সেনা
গরজিল সে দিন যমুনে (৩)।

তৎপরে আমরা বীরশ্রেষ্ঠ মেনাহাতীর সমাধিস্থান দেখিতে চলিলাম। এটা কি দুঃখের বিষয়, ভাবিয়া দেখুন যে, মহম্মদপুরের অর্দ্ধেক লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি তাহারা কেহই সমাধিস্থান ঠিক করিয়া বলিতে পারে নাই। যাহা হউক, অনেক অনুসন্ধানের পর, এক বৃদ্ধ ধোপা একটি স্থান দেখাইয়া দিয়া বলিল—"আমরা ছেলেবেলায় এই স্থানে কবর দেখিয়াছি, পরে ভাঙ্গা ইঁটগুলি গ্রামের লোকে লইয়া গিয়াছে, তাহার উপর দিয়া রাস্তা তৈয়ারি হইয়াছে।" বৃদ্ধের কথায় অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই, আরও দুই তিনটী বৃদ্ধলোক তাহার কথার সমর্থন করিল।

মহারাজ সীতারামের চতুর্দ্দশবর্ষব্যাপী ভীষণ স্বাধীনতার সময়ে যিনি তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ, যাঁহার অসাধারণ শৌর্য্যে নবাব-জামাতা আবুতোরাপ সসৈন্যে প্রাণ হারাইয়াছিল, বাঙ্গালীর স্বাধীনতা রক্ষা করিতে গিয়া, যিনি ঘাতকের গুপ্ত অস্ত্রাঘাতে যন্ত্রণাময় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, মহারাজ সীতারামের প্রিয়তম সেই দেশপ্রসিদ্ধ মুসলমান বীরের সমাধির এইরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া কি চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হয় না? যে দেশ বীরের আদর করিতে শিখিল না তাহাদের আর উন্নতির আশা কোথায়?

আমি জানিনা ইহা সম্ভব হইবে কি না, আমার বন্ধু প্রস্তাব করেন যে, দেশের লোকের নিকট চাঁদা সংগ্রহ করিয়া মেনাহাতির কবরটী পুনঃ নির্ম্মাণ করা উচিত। সুযোগ্য পাঠক এ বিষয়ে চিন্তা করিবেন।

আমাদের নিকট ভক্ত্যুপহার কিছুই ছিল না, কেবল নিকটস্থ বিল হইতে কয়টী রক্তকমল তুলিয়া আনিয়াছিলাম। হৃদয়ের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার যৎসামান্য বাহ্যনিদর্শনস্বরূপ আমরা সেই কয়টী কমল কবরের উপর স্থাপন করিলাম।

সে দিন মধ্যাহ্নে দশভুজার মন্দিরে প্রসাদ পাইলাম। পূর্ব্বে রাণী ও রাণীর বিধবা কন্যা রাণী তারার প্রতিষ্ঠিত রামচন্দ্রের মন্দিরের কথা উল্লেখ করিয়াছি। তাহারই দালানে এক্ষণ নাটোরের কাছারি হইয়া থাকে। অলোকসামান্যা সুন্দরী বিধবার প্রতি যখন ইন্দ্রিয়লালসামত্ত সিরাজুদ্দৌলা পাপদৃষ্টিনিক্ষেপ করে, তখন তাহার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তারা ঠাকুরাণী এই মন্দিরে গুপ্তভাবে অবস্থান করেন। সেই কাছারির ঐক আমিনের সহিত আমাদের বড় ভাব হইল। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আপনাদের মত ইংরাজী জানা লোক, আমাদের সঙ্গে এরূপ ভাবে মিশিতেছেন, ইহাতে আমি অবাক হইয়াছি—আমাদের দেশে ত দুটা একটা ইংরাজী পাশ

দিলে, সে আর কাহারও সঙ্গে গুমরে কথা কয় না।" আমরা এত হাঁটিয়া আসিয়াছি শুনিয়া বলিলেন "দাঁড়ানি মহাশয়, এম, এ, পাশ হলে আপনারা পাল্‌কি না হলে এক.পা যেতে পারিবেন না।" সেই ভদ্র লোকের আগ্রহাতিশয্যে আমরা সে রাত্রি কাছারিতে আহার ও শয়ন করিলাম।

সে রাত্রি রামচন্দ্রের মন্দিরে বসিয়া হৃদয়ে যেরূপ কবিত্বের উচ্ছ্বাস অনুভব করিয়াছিলাম, আমার ভাষায় এরূপ দক্ষতা নাই যে, তাহা বর্ণনা করি। জ্যোৎস্নালোকে সুন্দর মন্দিরটী ফুট্ ফুট্ করিতে ছিল, বসন্তানিল প্রাঙ্গনরোপিত জুঁই ও বেল ফুলের গন্ধে মনঃপ্রাণ স্নিগ্ধ করিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে আমার মন কয় শত বৎসর অতিক্রম করিয়া তারা ঠাকুরাণীর সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতেছিল। একদিকে সেই দেবদুর্ল্লভ রূপের লোভে ইন্দ্রিয়পরায়ণ নবাব মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্য মহোরগের ন্যায় মাথা কুটাকুটি করিতেছে, আর অন্যদিকে শুক্লবসনা ব্রহ্মচারিণী স্বর্গগত স্বীয় স্বামীকে ইষ্টদেবতারূপে পূজা করিতেছেন। (বালবিধবা তারার স্বামীর নাম ছিল রামচন্দ্র লাহিড়ী, তাঁহারই নামানুসারে, যেন তাঁহারই প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ রাণী তারা রামচন্দ্রবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন।)

পরদিন প্রত্যূষে আমরা বাড়ী রওনা হইলাম। চারি ক্রোশ পথ হাঁটিয়া আমরা নওহাটায় ষ্টীমারে চড়িলাম। এই পথই সোজা। যাইবার সময় বড় ঘুরিয়া গিয়াছিলাম।

সে দিন ১৩১০ সালের ১লা বৈশাখ। এই নববর্ষের প্রথম প্রাতে রাস্তা চলিতে চলিতে আমরা একটা বিসদৃশ দৃশ্য দেখিলাম। একটা ভাগাড়ে একটা মরা গরু পড়িয়া রহিয়াছে, দুই তিনটী কুকুর তাহাই খাইতেছে, একটা কুকুর তাহাদিগের হইয়া চৌকি দিতেছে। একধারে একপাল শকুনী বসিয়া আছে, কিন্তু সেই চৌকিদার কুকুরের গর্জ্জনে

ও তাড়নায় অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। এমন সময় একটা শৃগাল এক গ্রাস মাংস চুরি করিবার আশায় লুকাইয়া গরুটার কাছে আসিল, কিন্তু তাহার সে সাধে বাদ পড়িল। চৌকিদার সাহেব বিষম বিক্রমে তাহাকে অনেক দূর পর্য্যন্ত তাড়াইয়া আসিল। এই দৃশ্য দেখিয়া লোভী বর্ত্তমান মানবসমাজের জাতিতে জাতিতে খেয়োখেয়ির কথা মনে পড়িল। বোধ হইল অতীতের মহিমামণ্ডিত কবিত্বময় মহম্মদপুর ত্যাগ করিয়া স্বার্থপর বিবাদপরায়ণ বর্ত্তমান জগতে আসিয়া পড়িয়াছি।

বেলা আটটার সময় 'গণেশ' ষ্টীমারে উঠিলাম। সে দিন বড় গরম, তাহাতে আবার এঞ্জিনের তাপ। দুপুর বেলায় ষ্টীমার হইতে নড়াইলের হোটেলে ভাত খাইয়া লইলাম। সন্ধ্যার সময় 'গণেশ' দৌলতপুরের (খুলনার আগের ষ্টেসনে) ঘাটে পৌঁছিল। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে 'গণেশ' সে দিন গজেন্দ্রগমনে চলিতে আরম্ভ করিয়া, আমাদিগকে ৫টার এক্সপ্রেস্ ট্রেন ধরিতে দিল না। কাজেই দশটার ট্রেনের জন্য ষ্টেসনে বসিয়া থাকিতে হইল।

ষ্টেসনে বড় ক্ষুধাতৃষ্ণার উদ্রেক হইল, কিন্তু খাবার জল পাইব কোথায়? একজন ভদ্রলোক (পরে শুনিলাম তিনি ছুতরের কাজ করেন) ষ্টেসনে বেড়াইতেছিলেন, তাঁহার নিকট জল চাহিলে তিনি পরম সমাদরে আমাদিগকে তাঁহার বাসায় লইয়া গিয়া এক রাশি কাঁকুড়, চিনি ও জল দিয়া পরিতৃপ্ত করিলেন। আমি বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই সকল ভদ্রলোকের উপকারের কি প্রত্যুপকার আমরা করিতে পারি। আমাদের সঙ্গে তাঁহাদের হয়ত আর সাক্ষাৎ হইবেনা। বন্ধু বলিলেন "আমরা ঠিক তাঁহাদেরই উপকার না করিতে পারি, কিন্তু আমরা আরও ভাল এক কাজ করিতে পারি, যাহাতে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির উন্নতি হয় সেই জন্য আমরা পরিশ্রম করিতে পারি।"

রাত্রি সাড়ে দশটার সময় গাড়ী চড়িলাম, ভোরবেলায় শিয়ালদহ

পৌঁছিলাম। এক দিন ও এক রাত্রির মধ্যে মহম্মদপুর হইতে কলিকাতা এবং কলিকাতা হইতে মহম্মদপুর যাওয়া যায়, এবং চারি ক্রোশের অধিক হাঁটিতে হয় না জানিলে, আমাদের যাইবার সময় কত সুবিধা হইত। যদি কোন ভদ্রলোক মহম্মদপুর দেখিতে আইসেন, তিনি সহজেই এই রাস্তা ধরিয়া আসিতে পারেন। অবশ্য মহম্মদপুরে ভদ্রলোকের আহার ও বাসের ভাল বন্দোবস্ত নাই সত্য, কিন্তু পাঁচজন লোক আসিতে আসিতেই ক্রমে সমস্ত বন্দোবস্ত আপনা হইতে হইবে। সার্ ওয়াল্টার স্কট তাঁহার জগদ্বিখ্যাত নভেলে জনমানবশূন্য, জঙ্গলময় কয়টীস্থানের বর্ণনা করিবার পর, দলে দলে লোক সেই সকল স্থান দেখিতে আসিতে লাগিল। কিছু কালের মধ্যেই সেই সব স্থানে রেল, ষ্টীমার, হোটেল প্রভৃতির আবির্ভাব হইল।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ষ্ট্র্যাট্‌ফর্ড-অন্‌-এভ্‌নে একবেলা।

অনেক দিন হইতে পরামর্শ হইয়া ছিল, আজ আমরা ষ্ট্র্যাট্‌ফর্ড-অন্‌-এভন্‌ দেখিতে যাইব। আমরা দলটি বড় ক্ষুদ্র নহি,—শত্রুর মুখে ছাই দিয়া অর্দ্ধডজন নর-নারী।

প্রাতরাশের পর আমরা পুরুষরা ধূমপান করিতে লাগিলাম;—মেয়েরা পথের উপযোগী খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইলেন। বেলা ১১টা ৫০ মিনিটে আমাদের ট্রেণ ছাড়িবে,—পথে পুরা তিন ঘণ্টা; সুতরাং গাড়ীতেই আমাদের মধ্যাহ্নভোজন সমাধা করিতে হইবে। মাংস, ডিম্ব, স্যাণ্ডুয়িচ্,—সুইস্ রোল্,—চেরি, ষ্ট্রবেরি, 'ডেভন্‌শেয়ার্ ক্রীম্,' ইত্যাদি ইত্যাদি, দুই প্রকার পানীয় (জলটা ধরিলে

তিন প্রকার)—দেখিতে দেখিতে আমাদের হ্যাম্পর্‌টি পূর্ণ হইয়া উঠিল; পথে অপর দুর্দ্দৈব যাহাই ঘটুক্‌, ক্ষুৎপিপাসায় প্রাণত্যাগের আর কোনই সম্ভাবনা রহিল না।

আয়োজন শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, ট্রেণেরও সময় উপস্থিত হইল। আমরা ছয়জনে প্যাডিংটন্‌ ষ্টেশনে গিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। যথাসময়ে, ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

পাঠকের কল্পনাশক্তির সাহায্যকল্পে, —আমার সঙ্গীদের একটি '*সংক্ষিপ্ত বর্ণনা*' দেওয়া আবশ্যক। পুরুষ আমরা দুইজন মাত্র,—কিন্তু 'ladies first!' মিস্‌ অ—, ইনিই বলিতে গেলে আমাদের পথ-প্রদর্শিকা। ইনি পূর্ব্বে কয়েকবার ষ্ট্র্যাট্‌ফর্ডে গিয়াছেন,—কখনও বা রেলে,—কখনও বা বাইসিক্লে। মিস্‌ অ—কথায় বার্ত্তায় অত্যন্ত পটীয়সী,—সাহিত্যরসগ্রাহিণী,—এবং স্বয়ং ইংরাজি ও জর্ম্মণ পত্রাদিতে প্রবন্ধও লিখিয়া থাকেন। মিস্‌ ডি—, ইনি কথা বেশী কহেন না,—কিন্তু গভীর কৌতূহলের সহিত সকল জিনিষের আলোচনায় যত্নবতী। মুখখানি সদাই হাসি হাসি। দুটি বোন্‌, মিস্‌ শ—; বড়টি অত্যন্ত ক্ষীণপ্রাণ,—অসহায় লতাটির মত। ছোটটি ঠিক ইহার বিপরীত, উৎসাহে উদ্যমে পরিপূর্ণ। কোথাও যাইতে হইলে ইনিই সর্ব্বাগ্রে প্রস্তুত হইয়া 'হলে' অপেক্ষা করিয়া থাকেন,—কিছু দেখিতে গেলে,—আর পাঁচজনে যাহা দেখিয়া আসিয়াছে, ইনি তাহার অনেক অধিক দেখিয়া আসিয়া লোককে চমৎকৃত করিয়া দেন। ইনিই আমাদের দলের সর্ব্বকনিষ্ঠা।—পুরুষপক্ষে, মিষ্টর্‌ ব—, ইনি একটি চশমাধারী যুবক,—কিঞ্চিৎ কৌতুকপ্রিয়,। লোকটি—যাহাকে বলে jolly good fellow,—এবং জীবনের প্রতিবিন্দুটিতে যেখানে একটু আমোদ আছে,—সমস্ত নিষ্কাসিত করিয়া লইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

ষ্টেশন ছাড়িয়া, গাড়ী অনেকদূর পর্য্যন্ত লণ্ডনের নগরসীমা

অতিক্রম করিতে পারিল না। যখন লণ্ডনের জনতা ও কোলাহল ও ধূমোদগার পশ্চাতে ফেলিয়া আমরা বাহিরের বিশুদ্ধ মুক্তবায়ুতে প্রবেশ করিলাম,—যখন অগণ্য গৃহসারির পরিবর্ত্তে দুই পার্শ্বে সবুজ মাঠ দেখা গেল,—তখন আমাদের জীবাত্মা যেন বলিয়া উঠিল—বাঁচিলাম।

পথে তিন ঘণ্টা সংবাদ পত্র ও সচিত্র মাসিক পত্র পড়িয়া, প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া, গল্প করিয়া কাটিয়া গেল। 'ভোজন ব্যাপারে' নিতান্ত অল্প সময় যায় নাই। আমাদের পরস্পরের স্বাস্থ্যপান করিবার পর, আমি মিস্ অ'—র নাম প্রস্তাব করিলাম—"Our Guide, Philosopher and Friend."

যখন গাড়ী ষ্ট্রাট্‌ফর্ডে আসিয়া থামিল, তখন তিনটা বাজিয়া গিয়াছে। সেদিন বেশ রৌদ্র—গ্রীষ্মটাও একটু প্রবল ছিল। মেয়েদের অনাবশ্যক গাত্রবস্ত্রাদি এবং খাবারের হ্যাম্পর্ ক্লোক্‌রুমে রাখিয়া আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম।

কিন্তু প্রথমেই একটা নিরাশা,—এত নূতন অট্টালিকা কেন? আমি প্রাচীনতার অন্বেষণে আসিয়াছি;—আমি শেক্ষপীয়রের ষ্ট্র্যাট্‌ফর্ড দেখিব,—তিনশত বৎসরের পুরাতন একখানি গ্রাম,—যাহার প্রত্যেক বৃক্ষ প্রত্যেক প্রস্তর আমাকে শেক্ষপীয়রের সংবাদ বলিতে পারিবে! গ্রামে প্রবেশমাত্র এই একালের গৃহগুলি যেন আমার দুইটি চক্ষুকে সজোরে আসিয়া আঘাত করিল।

গ্রামখানি ক্ষুদ্র,—ষ্টেশন পরিত্যাগের পাঁচমিনিট পরেই হেন্‌লি ষ্ট্রীটে প্রবেশ করিলাম। এই হেনলি ষ্ট্রীটেই শেক্ষপীয়রের জন্মগৃহ। পথ মাত্রকে আমরা রাজপথ বলিয়া থাকি। হয়ত ইহাকে কবিপথ বলিলে অন্যায় হইবে না।

পথে প্রবেশ করিবার এক মিনিট পরেই শেক্ষপীয়রের গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। হাঁ,—এই বাড়ীখানি পুরাতন বটে! আর, এই

বাড়ীই বটে,—দেশে থাকিতেও, চিত্রে এই বাড়ীখানি শতবার দর্শন করিয়াছি!

বাড়ীটির উপরিভাগ, সেকালের প্রথা অনুসারে নির্ম্মিত। সম্মুখে তিনটি "গেব্‌ল্", —প্রত্যেক গেব্লের মাঝখানে একটি করিয়া ক্ষুদ্র জানালা। বাড়ীটি দুই তালা। বহির্ভাগ "চূণবালি ধরান"—কালক্রমে প্রায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আসিয়াছে। স্থানে স্থানে কাঠের পঞ্জর দিয়া দৃঢ়ীকৃত। কাঠও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে। প্রবেশের দ্বারটি বাড়ীর মধ্যভাগে নহে,—বাড়ীর বামদিক ঘেঁসিয়া। দ্বারটি বেশী উচ্চ নহে, মাথাটি হয়ত একটু নীচু করিয়া ঢুকিতে হয়।

মিষ্টর ব—একটু পশ্চাতে পড়িয়াছিলেন। আমাদের নিকট আসিয়া চশমাটি চক্ষে লাগাইয়া, গৃহখানির প্রতি নেত্রপাত করিয়া বলিলেন— "Wasn't it good of him to be born in this poky little hole."—কি আশ্চর্য্য! লোকটির মনে কি ভক্তির লেশমাত্র নাই?—ইনি যদি আমাদের ভারতবর্ষে জন্মিতেন, তবে নিশ্চয় বলিতে পারি, ইনি দেবতা ব্রাহ্মণ মানিতেন না এবং গুরুপুরোহিতকে "ওল্ডফুল" উপাধিতে ভূষিত করিতেন।

সেদিন আমাদের মত অনেক যাত্রী দর্শনার্থী; বস্তুতঃ, আমরা যে ট্রেণে আসিয়াছি তাহা একখানি Excursion Train; ট্রেণসুদ্ধ সকলেই দর্শনার্থী। অনেক লোকের সঙ্গে আমরাও প্রবেশ করিলাম। এক সিলিং দিয়া দুইখানি টিকিট কিনিলাম;—একখানি জন্মকক্ষের জন্য, একখানি মিউজিয়ম ও পুস্তকাগারের জন্য।

যে কক্ষটিতে আমরা প্রথমে প্রবেশ করিলাম—অর্থাৎ যেখানে টিকিট ক্রয় করিলাম, সেটি নাকি পূর্ব্বে রন্ধনশালা ছিল। এই কক্ষটির মধ্যে প্রবেশ করিলে, সম্মুখে একটি এবং দক্ষিণ হস্তে একটি দুয়ার দেখা যায়। সম্মুখের দুয়ারটি পার হইলে, বসিবার ঘর। এই কক্ষের কোণে একটি

সিঁড়ি আছে, তাহা দিয়া জন্মকক্ষে উঠিতে হয়। রান্নাঘরের অপর দুয়ারটি পার হইলে, পরে পরে দুইটি কক্ষ, সে দুইটি মিউজিয়াম। মিউজিয়মের প্রথম কক্ষটির প্রান্তে সিঁড়ি আছে, তাহা দিয়া উঠিলে উপরে লাইব্রেরির দুইটি কক্ষ পাওয়া যায়।

আমরা দেখিলাম, জনস্রোত জন্মকক্ষের প্রতি ধাবিত হইতেছে; সুতরাং, পরামর্শ করিলাম, এই বেলা মিউজিয়ম ও লাইব্রেরি একটু নিরিবিলিতে দেখিয়া লই,—পরে জন্মকক্ষে যাওয়া যাইবে। মিউজিয়মে শেক্ষপীয়রের জীবনকালের অনেক দ্রব্য সংরক্ষিত আছে। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ওয়াসিংটন্ আর্ভিং এই মিউজিয়ম দেখিয়া তাঁহার "স্কেচবুকে" বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেখানে তিনি কতকগুলি জালদ্রব্যের উল্লেখ করিয়াছেন,—যথা শেক্ষপীয়রের হরিণমারা বন্দুক প্রভৃতি, সে সকল এখন স্থানান্তরিত হইয়াছে। যে সমস্ত দ্রব্য সংশয়ের দায়মুক্ত তাহাই কেবল এখন রক্ষিত আছে। বিষয় হস্তান্তর সম্বন্ধীয় দলিল পত্র, W. S. অঙ্কিত একটি অঙ্গুরীয়,—কয়েক খানি পুস্তকের প্রথম সংস্করণ, সেকালের থিয়েটারের প্রোগ্রাম প্রভৃতি। একখণ্ড কাষ্ঠ আছে, ইহা শেক্ষপীয়রের স্বহস্ত-প্রোথিত মলবেরি বৃক্ষ হইতে কর্ত্তিত। একটি কোণে একটি পুরাতন ডেস্ক আছে। প্রবাদ, ইহা পাঠশালায় বালক শেক্ষপীয়র কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইত। আর্ভিং যখন ষ্ট্রাটফর্ড দেখিয়াছিলেন, তখন ইহা "গ্রামার-স্কুলে" সংরক্ষিত ছিল। সে স্থান হইতে আনিয়া এখন ইহা মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। ডেস্কটির অবস্থা অতীব শোচনীয়। প্রথমতঃ, ইহা দেখিতে অত্যন্ত স্থূল, যেন "ঘরে তৈরিকরা" গোছ। তাহার পর ইহার পায়াটায়া অধিকাংশই লোপ পাইয়াছে;—ইহা যখন স্কুলে ছিল, তখন ইহাকে শেক্ষপীয়রের ডেস্ক জানিয়া, দর্শকগণ ইহার কাষ্ঠ একটু একটু কাটিয়া গৃহে লইয়া যাইত। ইহার সর্ব্বাঙ্গে বালকগণের নাম খোদাই করা;—

কিন্তু অনেকক্ষণ ধরিয়া অন্বেষণ করিলাম, W. S. খুঁজিয়া পাইলাম না। হয়ত বালক শেক্ষপীয়র ভাবিয়াছিলেন,—অমর হইবার এই পন্থা গ্রহণ না করিলেও তাঁহার চলিবে।

মিউজিয়মের উপর যে দুইটি কক্ষ, তাহা লাইব্রেরি। এখানে শেক্ষপীয়রের গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে বহুসংখ্যক পুস্তক সংগৃহীত আছে। ভিত্তিগাত্রে, সে কালের খোদিত, অনেক চিত্রাদি। একটি বৃদ্ধা এই কক্ষদ্বয়ের দর্শয়িত্রী স্বরূপ নিযুক্ত। তাহাকে দেখিয়া, আর্ভিং বর্ণিত garrulous old lady"-টির কথা মনে পড়িল। এই বৃদ্ধা হয়ত সেই বৃদ্ধারই বংশধরী!

দ্বিতীয় কক্ষটিতে একটি ওক-কাষ্ঠনির্ম্মিত পুরাতন চেয়ার রক্ষিত। কথিত আছে, ইহাতে শেক্ষপীয়র উপবেশন করিতেন। দর্শকগণ ই চেয়ারটিতে ইচ্ছা করিলে একবার বসিতে পায়। আমার সঙ্গিগণ কে একে সকলেই একবার বসিয়া লইলেন। আমি এদিকে তকগুলি পুস্তক দেখিতেছিলাম, ফিরিয়া দেখিলাম, মিষ্টর ব—চেয়ারে নিতে বসিয়া রহিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি রকম মনে চ্চে?" ব—বলিলেন—"মনে হচ্চে, আমি হ্যামলেট্।"—বলিয়াই, র্বস্ রবর্টসনের * অনুকরণে আরম্ভ করিলেন,—"To be or not be, that is the question." মিষ্টর ব—উঠিলে, ছোট মিস্ —তথায় উপবেশন করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি গো? জুলিয়েট্ না মিরাণ্ডা?"

মিস্ শ—অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলিলেন—"আমি লেডি ম্যাক্‌বেথ্।"

সর্ব্বনাশ!

এ কক্ষ দেখিয়া, অপর সকলে প্রথম কক্ষটিতে ফিরিলেন। আমি

* বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডের রঙ্গমঞ্চে, ফর্বস্ রবর্টসনের আসন, সর্ হেনরি আর্ভিংয়ের ই। তাঁহার হ্যামলেট্-অভিনয় লোকপ্রসিদ্ধ।—লেখক।

সিঁড়ি আছে, তাহা দিয়া জন্মকক্ষে উঠিতে হয়। রান্নাঘরের অপর দুয়ারটি পার হইলে, পরে পরে দুইটি কক্ষ, সে দুইটি মিউজিয়াম। মিউজিয়মের প্রথম কক্ষটির প্রান্তে সিঁড়ি আছে, তাহা দিয়া উঠিলে উপরে লাইব্রেরির দুইটি কক্ষ পাওয়া যায়।

আমরা দেখিলাম, জনস্রোত জন্মকক্ষের প্রতি ধাবিত হইতেছে; সুতরাং, পরামর্শ করিলাম, এই বেলা মিউজিয়ম ও লাইব্রেরি একটু নিরিবিলিতে দেখিয়া লই,—পরে জন্মকক্ষে যাওয়া যাইবে। মিউজিয়মে শেক্ষপীয়রের জীবনকালের অনেক দ্রব্য সংরক্ষিত আছে। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ওয়াসিংটন্ আর্ভিং এই মিউজিয়ম দেখিয়া তাঁহার "স্কেচবুকে" বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেখানে তিনি কতকগুলি জালদ্রব্যের উল্লেখ করিয়াছেন,—যথা শেক্ষপীয়রের হরিণমারা বন্দুক প্রভৃতি, সে সকল এখন স্থানান্তরিত হইয়াছে। যে সমস্ত দ্রব্য সংশয়ের দায়মুক্ত তাহাই কেবল এখন রক্ষিত আছে। বিষয় হস্তান্তর সম্বন্ধীয় দলিল পত্র, W. S. অঙ্কিত একটি অঙ্গুরীয়,—কয়েক খানি পুস্তকের প্রথম সংস্করণ, সেকালের থিয়েটারের প্রোগ্রাম প্রভৃতি। একখণ্ড কাষ্ঠ আছে, ইহা শেক্ষপীয়রের স্বহস্ত-প্রোথিত মলবেরি বৃক্ষ হইতে কর্ত্তিত। একটি কোণে একটি পুরাতন ডেস্ক আছে। প্রবাদ, ইহা পাঠশালায় বালক শেক্ষপীয়র কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইত। আর্ভিং যখন ষ্ট্র্যাটফর্ড দেখিয়াছিলেন, তখন ইহা "গ্রামার-স্কুলে" সংরক্ষিত ছিল। সে স্থান হইতে আনিয়া এখন ইহা মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। ডেস্কটির অবস্থা অতীব শোচনীয়। প্রথমতঃ, ইহা দেখিতে অত্যন্ত স্থূল, যেন "ঘরে তৈরিকরা" গোছ। তাহার পর ইহার পায়াটায়া অধিকাংশই লোপ পাইয়াছে;—ইহা যখন স্কুলে ছিল, তখন ইহাকে শেক্ষপীয়রের ডেস্ক জানিয়া, দর্শকগণ ইহার কাষ্ঠ একটু একটু কাটিয়া গৃহে লইয়া যাইত। ইহার সর্ব্বাঙ্গে বালকগণের নাম খোদাই করা;—

কিন্তু অনেকক্ষণ ধরিয়া অন্বেষণ করিলাম, W. S. খুঁজিয়া পাইলাম না। হয়ত বালক শেক্ষপীয়র ভাবিয়াছিলেন,—অমর হইবার এই পন্থা গ্রহণ না করিলেও তাঁহার চলিবে।

মিউজিয়মের উপর যে দুইটি কক্ষ, তাহা লাইব্রেরি। এখানে শেক্ষপীয়রের গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে বহুসংখ্যক পুস্তক সংগৃহীত আছে। ভিত্তিগাত্রে, সে কালের খোদিত, অনেক চিত্রাদি। একটি বৃদ্ধা এই কক্ষদ্বয়ের দর্শয়িত্রী স্বরূপ নিযুক্ত। তাহাকে দেখিয়া, আভিং বর্ণিত "garrulous old lady"-টির কথা মনে পড়িল। এই বৃদ্ধা হয়ত সেই বৃদ্ধারই বংশধরী!

দ্বিতীয় কক্ষটিতে একটি ওক-কাষ্ঠনির্ম্মিত পুরাতন চেয়ার রক্ষিত। কথিত আছে, ইহাতে শেক্ষপীয়র উপবেশন করিতেন। দর্শকগণ এই চেয়ারটিতে ইচ্ছা করিলে একবার বসিতে পায়। আমার সঙ্গিগণ একে একে সকলেই একবার বসিয়া লইলেন। আমি এদিকে কতকগুলি পুস্তক দেখিতেছিলাম, ফিরিয়া দেখিলাম, মিষ্টর ব—চেয়ার খানিতে বসিয়া রহিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি রকম মনে হচ্চে?" ব—বলিলেন—"মনে হচ্চে, আমি হ্যামলেট্।"—বলিয়াই, ফর্বস্ রবর্টসনের * অনুকরণে আরম্ভ করিলেন,—"To be or not to be, that is the question." মিষ্টর ব—উঠিলে, ছোট মিস্ শ—তথায় উপবেশন করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি কে গো? জুলিয়েট্ না মিরাণ্ডা?"

মিস্ শ—অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলিলেন—"আমি লেডি ম্যাক্‌বেথ্।"

সর্ব্বনাশ!

এ কক্ষ দেখিয়া, অপর সকলে প্রথম কক্ষটিতে ফিরিলেন। আমি

* বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডের রঙ্গমঞ্চে, ফর্বস্ রবর্টসনের আসন, সর্ হেনরি আর্ভিংয়ের নিম্নেই। তাঁহার হ্যামলেট্-অভিনয় লোকপ্রসিদ্ধ।—লেখক।

তখনও কতকগুলি পুস্তক দেখিতেছিলাম। পূর্ব্বকথিক বৃদ্ধাটি ধীরে ধীরে আমার কাছে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল।

"মশায়,—আপনি চেয়ারটিতে একবার বসেছেন কি ?"

"না।"

"ও চেয়ারটিতে দর্শকদের আমরা বসতে দিই।"

আমি কেবলমাত্র বলিলাম—"ওঃ।"—বলিয়া আমি অন্য পুস্তক দেখিতে লাগিলাম।

কিন্তু বৃদ্ধা ছাড়িবার পাত্রী নহে।—"মশায়, আপনি একবার বসবেন না ?"

আমি তাহার মুখের পানে কিঞ্চিৎ দৃষ্টি করিয়া বলিলাম—"না।"

"সকলেই বসে কিন্তু।"—দেখিলাম, বৃদ্ধার আগ্রহ প্রবল। আর,—আমি বসিতেছি না বলিয়া, তাহার মনে কিঞ্চিৎ ক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে। তখন একটু হাসিয়া তাহাকে বলিলাম—"দেখ, আমি এ চেয়ারে বসব না। আমি শুধু টুপী খুলে এ চেয়ারকে সসম্মান অভিবাদন করছি।"

বৃদ্ধা কি ভাবিল বলিতে পারি না। ভবিল হয়ত, "পৌত্তলিক" জাতিগণের চরিত্রই স্বতন্ত্র!

লাইব্রেরিতে লোকে আসিতে আরম্ভ করিতেছে দেখিয়া আমরা সকলে নামিয়া গেলাম। মিউজিয়ম পার হইয়া, "রান্নাঘর" পার হইয়া, "বসিবার ঘরে" উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, এই কক্ষ তখনও লোকে লোকারণ্য। যেখানে জন্মকক্ষে উঠিবার সিঁড়ি, সেখানে প্রহরী দাঁড়াইয়া আছে। কুড়ীজন করিয়া লোক গণিয়া উপরে উঠিতে দিতেছে। তাহারা নামিয়া আসিলে তবে আবার কুড়ীজনকে উঠিতে দিতেছে। আমরা সেই জনতার মধ্যে দাঁড়াইয়া আমাদের পালা প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

জানালা দিয়া, বাটীর পশ্চাতে একখানি বাগান দেখা যাইতে লাগিল। এই বাগানে, শেক্ষপীয়রের গ্রন্থে উল্লিখিত সমস্ত বৃক্ষলতাদি জন্মাইবার চেষ্টা করা হইয়া থাকে।

বিলম্ব দেখিয়া, জনতার গ্রীষ্মে, ব—অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—"চল, যাওয়া যাক্—কি হবে জন্মকক্ষ দেখে? এই রকমই একটা ঘর ত? বোঝাই যাচ্চে। চল, পালান যাক্।"

আমি ব—র মুখপানে কটাক্ষ করিলাম। বলিলাম—"কি জন্যে এসেছ?"

জনতাপেষিত ব—, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"আমি কি তোমার শেক্ষপীয়র দেখ্‌তে এসেছি? আমি এসেছি একটু ফাঁকা হাওয়ায় বেড়াতে।"

আমি রাগ করিয়া বলিলাম—"তুমি গিয়ে ফাঁকা হাওয়ায় বেড়াতে পার। আমি না দেখে যাচ্চিনে।"

ব—আমাকে "Sentimental ass" বলিয়া গালি দিয়া, "গোঁজ" হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে ভিড় ঠেলিয়া বাহির হইবার সাধ্যও তাহার হইল না। যথাসময়ে, হোঁচটে পড়িয়া "গঙ্গালাভও" হইয়া গেল।

আমরা সিঁড়ি উঠিয়া, জন্মকক্ষে প্রবেশ করিলাম। এ কক্ষটিতে পুরাতন দুই চারিটি আসবাব মাত্র রক্ষিত আছে—তাহা ছাড়া, ইহা একেবারে খালি। বোধ হয় কর্ত্তৃপক্ষগণ ইচ্ছা করিয়াই ইহাকে খালি রাখিয়াছেন—অন্যান্য দ্রব্যাদি থাকিলে দর্শকচিত্তকে অযথা উদ্‌ভ্রান্ত করিবে মাত্র।

কক্ষের চারিটি দেওয়াল, দর্শকের নাম স্বাক্ষরে পরিপূর্ণ। দূর হইতে দেখিলে মাকড়সার জালের মত মনে হয়। এ সকল স্বাক্ষরই পুরাতন। যখন দেওয়াল পূর্ণ হইয়া গেল,—তিল রাখিবার স্থানও

যখন আর রহিল না, কর্ত্তৃপক্ষগণ তখন নাম লেখার বিরুদ্ধে নিয়ম ঘোষণা করিলেন। "দর্শকের পুস্তক" আছে—তাহাতেই নাম লিখিয়া এখনকার যাত্রিগণ মনোক্ষোভ নিবারণ করিয়া থাকেন।

জানালার কাচে, হীরক দিয়া বহুসংখ্যক নাম খোদিত আছে। তাহার মধ্যে সর্ ওয়াল্টার স্কট, বায়রণ, ও ওয়াসিংটন্ আভিংয়ের নাম দেখা গেল।

যখন রেল ছিল না,—তখনও প্রত্যহ এই কক্ষদর্শন করিবার জন্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র হইতে ভক্তসমাগম হইত। তখন এখনকার মত ভিড় হইত না। তখন অনেকে, রক্ষকগণকে পারিতোষিক দিয়া, এক রাত্রি এই কক্ষে শয়ন করিয়া যাইত।

কতলোক, এই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র, ঝর ঝর করিয়া অশ্রুত্যাগ করিয়াছে। কতলোক, প্রবেশমাত্র, নতজানু হইয়া এই কক্ষের মেঝেকে চুম্বন করিয়াছে।

অগ্নিস্থানের উপরিভাগে, ওক-নির্ম্মিত "ম্যাণ্টেল্‌পিস্।" তাহার একটি কোণ কাটা।—ইহা একটি আমেরিকান্ মহিলার কীর্ত্তি। সে বহুবৎসরের কথা, তখন রেল খোলে নাই। দুইটি আমেরিকান্ মহিলা ষ্ট্রাট্‌ফর্ড দেখিতে আসিয়াছিলেন। দর্শয়িত্রী দুইজনকে উপরে দেখাইতে আনিল। একজন একটা ছুতা করিয়া, দর্শয়িত্রীকে নিম্নে লইয়া গেলেন। যিনি কক্ষে রহিলেন,—তিনি তৎক্ষণাৎ বস্ত্রমধ্যে লুকাইত একটি ক্ষুদ্র করাৎ বাহির করিয়া, ক্ষিপ্রহস্তে উক্ত কোণটি কাটিয়া লইলেন।—সেই অবধি রক্ষকগণ সাবধান হইয়াছে,—আর কাহাকেও সে কক্ষে একাকী রাখিয়া যায় না।

এই কক্ষটি "খাবারঘরের" উপরিস্থিত। "বসিবার ঘরের" উপরিস্থিত কক্ষের নাম "চিত্রকক্ষ"। এটি পূর্ব্বে বালক শেক্ষপীয়রের শয়নকক্ষ ছিল।

আমরা অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলাম না। নিম্নে কতলোক অপেক্ষা করিয়া আছে! আমাদিগকে অবতরণ করিতে হইল।

এই গৃহ হইতে বাহির হইয়া ভাবিতে লাগিলাম,—হ্যালিওয়েলকে ধন্যবাদ,—আর একটু হইলেই,—এ গৃহদর্শন আমার ভাগ্যে ঘটিত না। আর একটু হইলেই,—ইংলণ্ড হইতে এই গৃহ বিদায়লাভ করিয়াছিল। ধ্বংস হইত বলিতেছি না,—ইংলণ্ড হইতে অদৃশ্য হইত। আমেরিকান্‌গণ দিব্য যোগাড় যন্ত্রটি করিয়া তুলিয়াছিল। শেক্ষপীয়রের মৃত্যুর পরে এই গৃহ তাঁহার একটি ভগ্নীর সম্পত্তি হয়। সে অবধি এই সম্পত্তি সেই ভগ্নীর বংশধরগণের হস্তে থাকে। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ইহা বিক্রয়ার্থ বিজ্ঞাপিত হয়। ইহা শুনিয়া আমেরিকানগণ পরামর্শ করিল,—আমরা ইহা ক্রয় করিয়া,—সবসুদ্ধ উঠাইয়া জাহাজে করিয়া নিউ-ইয়র্কে লইয়া আসিব।”—এই সংবাদ পাইবামাত্র, বিখ্যাত শেক্ষপীরীয় টীকাকার হ্যালিওয়েল্‌, উদ্যোক্তা হইয়া, চাঁদা তুলিয়া, এই গৃহ কিনিয়া ফেলেন। *

হেন্‌লি ষ্ট্রীট্‌ ছাড়িয়া আমরা ক্রমে ব্রিজ্‌ ষ্ট্রীটে পড়িলাম। এভ্‌ন্‌ নদীর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম। নদীতীরে একটি নবনির্ম্মিত অট্টালিকা। ইহার নাম “মেমোরিয়ল্‌ থিয়েটর”—শেক্ষপীয়রের স্মরণার্থ পঁয়ত্রিশ বৎসর হইল ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কবিবরের জন্মসপ্তাহে প্রতিবৎসর এখানে তাঁহার নাটকের অভিনয় ও অন্যান্য উৎসব হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া, একটি চিত্রশালা ও লাইব্রেরী আছে। চিত্রশালায় শেক্ষপীয়রের ছবি,—বিখ্যাত শেক্ষপীরীয় অভিনেতৃগণের ছবি, এবং

* সম্প্রতি আমেরিকানগণ, Dickens কর্ত্তৃক অমরীকৃত “Old Curiosity Shop” নামক লণ্ডনের পুরাতন দোকানটী কিনিয়া ফেলিয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ উপাড়িয়া লইয়া আমেরিকায় গিয়া তাহা পুঁতিবার বন্দোবস্ত করিতে এখন তাহারা ব্যস্ত আছে।—লেখক।

শেক্ষপীয়রের নাটকের গল্পের চিত্রাবলী রক্ষিত আছে। লাইব্রেরিতে শেক্ষপীয়রের গ্রন্থের যত প্রকার সংস্করণ হইয়াছে, তৎসমুদয় সংগৃহীত আছে। তাহা ছাড়া, পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায় শেক্ষপীয়রের যত অনুবাদ হইয়াছে, তাহাও সংগৃহীত আছে। এই লাইব্রেরীতে রক্ষিত বাঙ্গলা শেক্ষপীয়রের একটি তালিকা নিম্নে দিলাম।

Tempest—ঝটিকা, ৩ ভাগ। প্রকৃতি নাটক। নলিনী বসন্ত।

Macbeth—কর্ণবীর। রুদ্রপাল নাটক।

Merchant of Venice—সুরলতা নাটক।

Comedy of Errors—ভ্রান্তিবিলাস।

Midsummer Nights Dream—শরৎশশী নাটক।

Hamlet—অমরসিংহ।

Twelfth Night—সুশীলা চন্দ্রকেতু।

Cymbeline—কুসুমকুমারী নাটক। সুশীলা বীরসিংহ নাটক।

Alls Well That Ends Well—ভীষকুদুহিতা উপন্যাস।

Romeo and Juliet—রোমিও জুলিয়েট উপন্যাস।

শেক্ষপীয়রের গল্প প্রথম ভাগ।*

মেমোরিয়ল্ থিয়েটর দেখিয়া নদীর তীরে তীরে আমরা হোলি ট্রিনিটি চর্চ্চ দেখিতে অগ্রসর হইলাম। এই মন্দিরের অভ্যন্তরে শেক্ষপীয়রের সমাধি আছে।

---

* এই তালিকা দেখিলে বুঝা যায়, সংগ্রহ সম্পূর্ণ নহে। সেক্ষপীয়রের অনুবাদ আরও অনেক বাঙ্গলা গ্রন্থ দেখিয়াছি। যদি কোনও গ্রন্থকার বা তাঁহার বংশধরগণ স্বীয় অথবা পূর্ব্বপুরুষ রচিত শেক্ষপীয়রের অনুবাদ এই তালিকায় না দেখিতে পান,—তবে তিনি সে পুস্তক—"To the Librarian, Shakespeare Memorial Theatre, Stratford on Avon"—এই ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন। গ্রন্থের মলাটে ইংরাজী অক্ষরে গ্রন্থের নাম, কোন্ গ্রন্থের অনুবাদ, তাহার নাম ইত্যাদি লিখিয়া দেওয়া আবশ্যক, কারণ লাইব্রেরীতে বঙ্গভাষাভিজ্ঞ কেহ আছেন বলিয়া বোধ হয় না।—লেখক।

নদীটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র। আমাদের দেশে কোনও নদী এত ক্ষুদ্র হইলে ভূগোলে বা মানচিত্রে স্থান পায় না।

নদীর উভয়তীর বৃক্ষসারির দ্বারা ছায়াকৃত। আমরা ছায়ায় ছায়ায় ক্রমে চর্চ্চের নিকট উপস্থিত হইলাম। অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, একটি স্থানে ঘাসের মধ্যে বিস্তর "ডেজি" ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। আমরা অনেকগুলি ফুল চয়ন করিয়া লইলাম।

মন্দিরদ্বারে আসিয়া দেখি,—উপাসনা আরম্ভ হইবার সময় উপস্থিত। এখন কোনও যাত্রী প্রবেশ করিয়া বেড়াইয়া বেড়াইতে পারিবে না। একঘণ্টা পরে আসিতে হইবে।

সুতরাং আমাদিগকে ফিরিতে হইল।

চর্চ্চ হইতে বাহির হইয়া একটুকু আসিয়াই প্রসিদ্ধ উপন্যাসলেখিকা মেরি করেলির গৃহ দেখিতে পাইলাম। গৃহখানি নূতন, কিন্তু পুরাতনের ছাঁচে নির্ম্মিত। মেরি করেলি এই নিভৃত গ্রামে বসিয়া নির্জ্জনে সাহিত্যসেবা করিয়া থাকেন। ষ্ট্র্যাট্‌ফর্ড তাঁহার জন্মস্থান নহে। তিনি কয়েকবৎসর হইতে স্বেচ্ছাক্রমে এই তীর্থবাস করিয়াছেন। তাঁহার জানালাগুলি লাল পর্দ্দা দিয়া আবৃত। সেই একটি পর্দ্দার অন্তরালে বসিয়া হয়ত তিনি সেই মুহূর্ত্তেই লেখনীচালনায় ব্যাপৃত ছিলেন। কি লিখিতেছিলেন? সেই ক্ষুদ্র গৃহটিতে বসিয়া তিনি যাহা লিখিতেছিলেন, তাহা বোধ হয় অচিরকালমধ্যেই সমস্ত পৃথিবীর উপর ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে।*

কিয়দ্দূর আসিয়া "গ্রামার স্কুল" দর্শন করিলাম। এই পাঠশালায় বালক শেক্ষপীয়র শিক্ষালাভ করেন। ইহা এখনও একটি পাঠশালা,—

* এই ভাগ্যবতী ললনার শেষ উপন্যাস "Temporal Power" প্রথম সংস্করণে একলক্ষ বিংশ সহস্র খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছিল। এখনও একবৎসর হয় নাই,—ইতিমধ্যেই "দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ।"

ষ্ট্র্যাটফর্ডবাসী বালকগণ প্রত্যহ বহি শেলেট্ লইয়া এখানে পড়িতে আসে। বর্ত্তমান ইংলণ্ডের উদীয়মান কবি, "পাওলো ও ফ্রাঞ্চেস্কা" প্রভৃতি প্রণেতা ষ্টীভ্‌ন্ ফিলিপস্‌ও এই পাঠশালায় ক খ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

আর কিছুদূরে আসিয়া একটি বাগান দেখিলাম,—ইহার নাম "নিউ প্লেস্"। এইখানে একটি বাড়ী ছিল,—মধ্যবয়সে শেক্ষপীয়র তাহা নিজ বসবাসের জন্য ক্রয় করেন। সেই বাড়ীতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। সেই বাড়ীর পশ্চাতেই তাঁহার স্বহস্তপ্রোথিত মল্‌বেরি বৃক্ষটি ছিল,—যাহার একখণ্ড কাষ্ঠ জন্মগৃহের মিউজিয়মে আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি।

বাড়ীটি কোথায়?—না, আমেরিকানরা উপাড়িয়া লইয়া যায় নাই। তাহার ইতিহাস বলিতেছি।

শেক্ষপীয়রের মৃত্যুর পর, এই গৃহ তাঁহার বংশধরগণের হস্তে থাকে। ১৭৫৩ সালে ইহা বিক্রয় হইয়া যায়। রেভারেণ্ড এফ্, গ্যাষ্ট্রেল্ নামক একজন ধার্ম্মিক ব্যক্তি বাড়ীটি ক্রয় করিয়া, তাহাতে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন।

কিন্তু শেক্ষপীয়র-প্রোথিত সেই মলবেরি বৃক্ষটিই তাঁহার কাল হইল। তাঁহার (অ)শুভ গৃহপ্রবেশের পরদিনই, পৃথিবীর কোন্ অংশ হইতে জানি না, এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল—"ঠাকুর, প্রণাম হই।"

"জয় হোক্। কি চাও বাপু?"

"আজ্ঞে সেই মলবেরি গাছটি একবার দেখতে এসেছি।"

"গাছ দেখ্‌বে? বেশ ত, এস।"

কিন্তু গাছ দেখান একদিনেই শেষ হইল না। দিনের পর দিন ক্রমাগত যাত্রী আসিয়া বলিতে লাগিল—"আজ্ঞে, গাছটি একবার দেখতে পাই কি?"—তাহারা শুধু গাছটি দেখিয়াই ক্ষান্ত

হইত না,—গাছটির জীবনচরিত সম্বন্ধে বেচারি গ্যাষ্ট্রেল্‌কে সহস্র প্রশ্ন করিত। ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মেজাজে আর কত সহে ? এক দিন উদ্বাস্ত হইয়া,—রাগের মাথায়,—গ্যাষ্ট্রেল্‌ তাঁহার ভৃত্যগণকে বলিলেন—"ওরে, নিয়ে আয় ত একটা কুড়ুল। ফ্যাল্‌ গাছ কেটে। গাছের জ্বালায় কি আমি দেশত্যাগী হব ?"

দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ ভূমিসাৎ হইয়া গেল।* কিন্তু গ্যাষ্ট্রেলের জ্বালা কমিল না,—বাড়িয়া গেল। গ্রামের লোক এই সংবাদ শুনিয়া আগুন হইয়া উঠিল। পথে বাহির হইলে তাঁহার গায়ে তাহারা ধূলা দিতে লাগিল। শেষে গ্যাষ্ট্রেলকে দেশত্যাগীই হইতে হইল, গ্রাম হইতে পলায়ন করিয়া তবে তিনি নিষ্কৃতি পাইলেন।

গ্রাম ত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু বাড়ীটি তাঁহারই রহিল। বিক্রয় করিলে মাথা নীচু করা হয়; সুতরাং, বাড়ী তিনি বিক্রয় করিতে পারিলেন না। অথচ রীতিমত ট্যাক্স গণিয়া যাইতে হইল। কয়েক বৎসর পরে

* এই বৃক্ষটি ষ্ট্র্যাট্‌ফর্ডবাসী একজন ঘড়িমেরামতকারী তৎক্ষণাৎ কিনিয়া লয়। সে, সেই কাষ্ঠ হইতে ছোট বড় বহুসংখ্যক নানা প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া, কয়েক বৎসর ধরিয়া ধনী ব্যক্তিগণের নিকট উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিয়াছিল। কালক্রমে সেই সমস্ত দ্রব্য পৃথিবীর নানা স্থানে ব্যাপ্ত হইয়াছে।

আর্ভিং তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত প্রবন্ধে বলিয়াছেন—"পৃথিবীর অনেক স্থানেই ত শুনা যায়, সেই মলবেরিকাষ্ঠের টুকরা আছে—সে সকল কখনই যথার্থ হইতে পারে না, অংশতঃ জাল।" ঘড়িমেরামতকারীর এই ব্যবসায়বুদ্ধিটুকুর সংবাদ আর্ভিং পাইয়াছিলেন কি না জানি না, পাইলে হয়ত বুঝিতে পারিতেন, একটি মলবেরি বৃক্ষের অংশ পৃথিবীময় কি করিয়া ছড়াইয়া পড়িল। আমি এই বৃত্তান্ত ব্রিটিশ্‌ মিউজিয়মে একখানি পুরাতন পুস্তকে পাঠ করিয়াছি। পুস্তকখানির নাম "Stratford Upon Avon Guide," published by Whittaker & Co., London. পুস্তকখানিতে তারিখ নাই। তবে তাহাতে ১৮৩৭ সালের কথা লিখিত আছে—সুতরাং তাহা ঐ তারিখের পর মুদ্রিত। ইহা আর্ভিংয়ের প্রবন্ধরচনার অন্ততঃ ১৭ বৎসর পরে প্রকাশিত। ব্রিটিশ মিউজিয়মের ছাপ দেখিয়া জানিতে পারিলাম, পুস্তকখানি তথায় ১৮৫০ সালে সংগৃহীত হইয়াছিল।—লেখক।

এক দিন চটিয়া মটিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—"বাড়ীতে থাকতেও না, টেক্‌শোও গুণে মরব! ফ্যাল্‌ বাড়ী ভেঙ্গে।"

পাড়াপ্রতিবেশীরা আসিয়া হাঁ হাঁ করিয়া পড়িল। তাহারা বা —"এ বাড়ী ভেঙ্গ না। আমরা কিনব।"

গ্যাষ্ট্রেল্‌ চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন—"আমি বেচব না।"

"না বেচ না বেচবে ;—কিন্তু ঐ বাড়ী ভাঙ্গতে পাবে না।"

গ্যাষ্ট্রেল্‌ বলিলেন—"তোমরা কে হে বাপু! এ বাড়ী আমার খুসী আমি ভাঙ্গব। আমার ছাগল, আমি লেজের দিকে কাটব তোমাদের কি?"

বাড়ী রক্ষা পাইল না। তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙ্গি তবে গ্যাষ্ট্রেল্‌ নিশ্চিন্ত হইলেন।

নিউপ্লেস্‌ বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমরা কিঞ্চিৎ বেড়াইলাম তথা হইতে বাহির হইয়া পরামর্শ করা গেল,—চা পান করিয়া আবার গির্জ্জার অভিমুখে যাওয়া যাউক।

রৌদ্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমরা সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। চায়ের স্থানে গিয়া,—একে একে আমরা সাবান জলের রীতিমত সদ্ব্যবহার করিয়া চা পান করিতে বসিলাম।

ছোট মিস্‌ শ—সর্ব্বপ্রথমে চা পান সমাধা করিয়া বলিলেন—"চল।" আমরা একটু ত্বরা করিয়া শেষ করিলাম। মিস্‌ অ—বলিলেন— "আমি ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—তোমরা দেখে এস,—আমি ততক্ষণ এইখানে থাকি।"

তাহা শুনিয়া মিষ্টর ব—বলিলেন—"আমিও থাকি।"

আমি বলিলাম—"কি আশ্চর্য্য! তুমি যাবে না? মিস্‌ অ— অনেকবার দেখেছেন না হয়,—তুমি ত কখনও দেখ নি! এস এস।"

পাষণ্ড [লোকটা একটুকরা কেক্‌ মুখের নিকট ধারণ করিয়া

অনায়াসে বলিল—"আরে কি হবে সমাধি দেখে? আচ্ছা পাগল ততক্ষণ আমরা নদীতে বোট্ নিয়ে একটু বেড়াইগে।"

কথা হইল, আমরা সমাধি দেখিয়া ফেরিঘাটে যাইব,—তাঁহারাও সেইখানে আসিবেন। তখন সকলে মিলিয়া ষ্টেশনে ফেরা যাইবে।

আমি মিস্ ডি—ও ছুটি মিস্ শ—কে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম; অল্পক্ষণেই চর্চ্চের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

চর্চ্চটি বহু পুরাতন—নর্ম্মাণদের আমলের। ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই দেখিলাম একটি গ্লাসকেসের মধ্যে দুই খানি সেকালের প্যারিশ্ রেজিষ্টর খোলা রহিয়াছে। একখানি দীক্ষার (Baptism) এবং একখানি সমাধির। প্রথম খানিতে রাম, শ্যাম, হরির সহিত নবজাত শেক্সপীয়রের দীক্ষা ও নামকরণের তারিখ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে:—

1564.

April 26. Gülielmüs Filius Johannes Shakspere—
*অর্থাৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে দিবসে John Shakespeare*এর নবকুমারের দীক্ষা ও 'William' নামকরণ হইল।

অপর পুস্তকখানিতে পৃষ্ঠাভরা বিস্মৃতগণের সমাধি তারিখের সহিত রহিয়াছে:—

1616.

April 25. Will Shakspere, gent.
—ডিউকও নহেন, আর্লও নহেন, লর্ডও নহেন, কেবলমাত্র জেণ্টল্মান্—একটি মধ্যবিত্ত লোক।

ইহা দেখিয়া আমরা ভিতরের দিকে অগ্রসর হইলাম। পুরাতন ফাউণ্ট—অর্থাৎ প্রস্তর নির্ম্মিত পবিত্র জলাধার, যেখানে শিশু শেক্-

পীয়রকে নামকরণের পূর্ব্বে স্নান করান হইয়াছিল,—তাহা রক্ষিত আছে, তাহা এখন ভাঙ্গা,—জল ঢালিলে গড়াইয়া পড়ে। এখনকার শিশুগণকে তাহাতে আর স্নান করান হয় না।

মন্দিরের শেষসীমায় "চান্সেল্।" বামদিকে, কিঞ্চিৎ উচ্চে, শেক্ষপীয়রের একটি প্রস্তরমূর্ত্তি রক্ষিত আছে। জেরার্ড জন্সন্ নামক একজন ভাস্কর শেক্ষপীয়রের জীবিতকালে ইহা প্রস্তুত করে। কবিবরের মৃত্যুর পর এটি এখানে আনিয়া বসান হয়। তাহার নিম্নে খোদিত আছে :—

Jvdicio Pylivm Genio Socratem, arte Maronem
Terra tegit, popvlvs Mæret, Olympvs habet.

Stay passenger,* why goest thou by so fast.
Read, if thov cans't, whom envio*v*s death hath plas
Within this monvment, Shakespeare, with whome
Qvick natvre dide; whose name doth deck ys. tombe
Far more than cost, sich all yt. writt,
Leaves living art bvt page to serve his witt.
Obüt ano. Doi 1616; Ætatis 53, die 23 Ap.

এই প্রতিমূর্ত্তির নিম্নে, মেঝের উপর, চত্বরাকৃতি অনেকগুলি সমাধি। প্রথমটি কবিবরের স্ত্রীর; দ্বিতীয়টি তাঁহার নিজের, তৎপরের গুলি কন্যা, জামাতা প্রভৃতি পরিবারবর্গের।

আমি শেক্ষপীয়রের সমাধির উপরি আমার দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

---

* পাঠকগণ, মাইকেলের সমাধির উপর "দাঁড়াও পথিকবর" স্মরণ করুন।—লেখক।

প্রস্তরফলকটির উপর নিম্নলিখিত কয়েকটি পংক্তি খোদিত রহিয়াছে :—

GOOD FREND FOR JESVS SAKE FORBEARE
TO DIGG THE DVST ENCLOSED HEARE
BLESE BE YE MAN YT SPARES THES STONES
AND CVRST BE HE YT MOVES MY BONES.

এই কয়েকটি পংক্তি লইয়া বহুকালাবধি পণ্ডিতগণের মধ্যে বাদানুবাদ চলিয়াছিল। কেহ কেহ এই কবিতাকে doggerel আখ্যা দিতে ক্রটি করেন নাই। ভুবনবিজয়ী কবির সমাধির উপর একি অপরূপ কবিতা। তাঁহারা বলিতেন, শেক্ষপীয়রের মৃত্যুর পর, কোনও গ্রাম্য কবি এই "উচ্চদরের" কবিতাটি "ভণিয়া" দেন,—কেবল কতকগুলা বাজে শব্দের অক্ষরসমষ্টি।

কিন্তু বিশ বৎসর হইতে এই বাদানুবাদ কতকটা নিরস্ত হইয়াছে অক্সফর্ডের বড্‌লিয়ন্‌ লাইব্রেরীতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে লিখিত একখানি চিঠি আবিষ্কৃত হইয়াছে। অক্সফর্ডের একটি ছাত্র ষ্ট্র্যাটফর্ড্‌ দর্শন করিয়া তাঁহার বন্ধুকে চিঠিতে বর্ণনা লিখিতেছেন। তাঁহার পত্রের মর্ম্ম এই,—"গির্জ্জার একটি স্থানে একটি ঘর আছে, তাহার মধ্যে রাশি রাশি মনুষ্যাস্থি। এই অস্থিগুলি পুরাতন কবর খুঁড়িয়া বাহির করা। (গির্জ্জা ও তাহার অঙ্গনে স্থান পরিমিত। শত শত বৎসর ধরিয়া সমস্ত কবর যদি যথাস্থানে থাকিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে নবাগতগণের জন্য আর স্থান থাকে না। সেই কারণে বহু শতাব্দী ধরিয়া এই গির্জ্জার প্রথা যে, কবর খুব পুরাতন হইলে তাহা খুঁড়িয়া হাড় তুলিয়া রাখা হয়।) পাছে শেক্ষপীয়রের হাড় ভবিষ্যতে কেহ এইরূপ খুঁড়িয়া স্থানান্তরিত করে, এই আশঙ্কায় কবিবর জীবিতকালে স্বীয় সমাধির জন্য এই অভিশাপ রচনা করিয়া যান। খননকারী ইতর

ব্যক্তিরা যাহাতে বুঝিতে পারে এই অভিপ্রায়েই কবিচূড়ামণি ওরূপ করিয়া রচনা করিয়াছিলেন।*"

অক্সফর্ডের ছাত্র পত্রে এই যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আসলে সত্য হউক বা মিথ্যা হউক,—সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ষ্ট্র্যাটফর্ডের জনশ্রুতির যে ইহা অবিকল বর্ণনা, তাহার আর সন্দেহ নাই। কবিবরের মৃত্যুর পর তখন ৮০ বৎসর মাত্র অতীত হইয়াছে। তাঁহার বংশধরেরা গ্রামেই তখন বাস করিতেছেন। সুতরাং ইহা সত্য হইবারই সম্ভাবনা।—মৃতের অস্থি খনন করার সম্বন্ধে শেক্ষপীয়রের যে কিরূপ আপত্তি ছিল, তাহার প্রমাণ হ্যামলেট্ এবং রোমিও ও জুলিয়েট্ গ্রন্থে আছে।

---

* সিড্নিলি তাঁহার নব-প্রকাশিত শেক্ষপীয়রের জীবনচরিতে, অক্সফর্ড ছাত্রের এই পত্রোল্লেখ করিতে গিয়া একটু ভুল করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, এই পত্রের একটি প্রতিলিপি ১৮৮৪ সালে "লণ্ডনে প্রকাশিত হইয়াছে।"—তাহা ঠিক নহে। এই পত্র আবিষ্কৃত হইবার পর হ্যালিওয়েল্ বন্ধুসমাজে বিতরণের জন্য ব্রাইটন্ নগরে ৫০ খানি "privately" মুদ্রিত করেন, তাহা ১৮৮৪ সালেই বটে। এই পঞ্চাশখানির একখানি তিনি ব্রিটিশ্ মিউজিয়মে দান করেন। আমি ব্রিটিশ্ মিউজিয়মের তালিকা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্বেষণ করিয়াছি। Act of Parliament অনুসারে, United Kingdomএ প্রকাশিত প্রত্যেক গ্রন্থ বা কাগজ ব্রিটিশ্ মিউজিয়ম একখানি পাইয়া থাকেন। ঐ পত্র যদি প্রকাশিত হইত, তবে ব্রিটিশ্ মিউজিয়মে আর একখানি থাকিত।

আমি ব্রিটিশ মিউজিয়মের সেই পুস্তক হইতে উক্ত পত্রের আবশ্যক অংশটুকু নকল করিয়া আনিয়াছি। তাহা এইরূপ :—"Dear Neddy.........There is in this church a place which they cal' the bone-house, a repository of all bones they dig up, which are so many that they would load a great number of waggons. The poet, being willing to preserve his bones unmoved and haveing to do with clerks and sextons for the most part a very ignorant sort of people, he descends to the meanest of their capacitys and disrobes himself of that art which none of his contemporaries wore in greater perfection."

Extract from a letter written by William Hall of Queen's College, Oxford to Edward Thwaites (the well-known Anglo-Saxon scholar). Undated. But supposed from extraneous evidence to have been written about December 1694.—লেখক।

কবিবরের সমাধির সমক্ষে কিছুক্ষণ নতনেত্রে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, সঙ্গে যে "ডেজি" ফুল ছিল,—তাঁহাই কয়েকটি দিয়া পূজা করিয়া আমরা বিদায় লইলাম।

আমরা চারিজনে ফেরিঘাটে যখন আসিলাম, তখন ৭টা বাজিতে আর ২০ মিনিট মাত্র আছে;—৭টার সময় গাড়ী ছাড়িবে। কিন্তু তাহারা কোথায়?—মিস্ অ—এবং ব—র ত কোন চিহ্নই দেখা যাইতেছে না! তবে কি তাহারা আমাদের বিলম্ব দেখিয়া, ষ্টেশন অভিমুখে অগ্রবর্ত্তী হইয়াছে?

মিস্ ডি—বলিলেন—এরূপ অবস্থায় ষ্টেশনই যথার্থ সম্মিলনস্থান—সুতরাং ষ্টেশনে গিয়া দেখা যাউক।

ষ্টেশনে আসিলাম, তাহারা কৈ? ওপারে ট্রেণ প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে;—এঞ্জিন হইতে ব্রেকভ্যান পর্য্যন্ত খুঁজিলাম, তাহারা কোথায়?

তখন আমরা চারিজনে গাড়ীতে উঠিলাম। সাতটা বাজিতে আর পাঁচ মিনিট মাত্র বাকী—আর দুই মিনিট—আর এক মিনিট মাত্র আছে। ঐ তাহারা আসিল। ওপারের প্ল্যাটফর্ম্মে তাহাদিগকে দেখিতে পাইলাম। তাহারা চঞ্চলনেত্রে আমাদিগকে খুঁজিতেছে!

ইচ্ছা হইল, জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া, দুই হাত সজোরে নাড়িয়া সপ্তমে বলি "আরে শিগ্‌গির এস, শিগ্‌গির এস"—কিন্তু মনে পড়িল ইহা ভারতবর্ষ নহে—য়ুরোপ। সুতরাং শিশ দিয়া তাহাদিগকে সঙ্কেত করিলাম মাত্র।

কিন্তু তাহারা পৌঁছিবার পূর্ব্বে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আমাদের দেশের মত এদেশে সমারোহ করিয়া 'ছাড়িবার ঘণ্টা' পড়ে না। যথা-

সময় হইলে নিঃশব্দে গাড়ীটি ছাড়িয়া যায়। গাড়ী চলিতে লাগিল, যখন ব্রিজের সিঁড়ির কাছে আসিলাম, তখন দেখিলাম ব—মহাশয় গজেন্দ্রগমনে নামিতেছেন।

মনে মনে বলিলাম—যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল! ব—তুমি আমাদের শেক্ষপীয়রকে তাচ্ছিল্য করিয়াছিলে।—বেশ হইয়াছে—বেশ হইয়াছে!

উত্তেজনা কতকটা প্রশমিত হইলে,—বন্ধুবিচ্ছেদশোকে আমরা অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া কেবল হাসিতে লাগিলাম। সেই গভীর শোকের মধ্যেও, তাহাদের অংশের খাদ্যদ্রব্যগুলি বাধ্য হইয়া আমাদিগকেই শেষ করিতে হইল।—ক্রমে ক্রমে আমরা অকাফড পার হইলাম,—আকাশে চন্দ্র উঠিল,—তখন শোকভরে আমি আমার সঙ্গিনীগণকে গান গাহিতে অনুরোধ করিলাম। সে কামরায় আমরা ভিন্ন আর কেহই ছিল না—সুতরাং আমাদের শোকচর্চ্চার কোনই ব্যাঘাত ঘটে নাই।

পরের গাড়ীতে তাঁহারা আসিয়া পৌঁছিলেন।—বলিলেন—গাড়ী 'মিস্' হইল দেখিয়া আবার তাঁহারা নদীতে ফিরিয়া গিয়া বোট্ লইয়া একটু সান্ধ্যবায়ু সেবন করিয়াছিলেন। আমরা যতক্ষণ তাঁহাদের জন্য শোকে বিলাপ করিতেছিলাম,—তাঁহারা ততক্ষণ এইরূপে কালাতিপাত করিয়াছেন!—সেটা কি তাঁহাদের উচিত হইয়াছিল?

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

সকল দেশের সাহিত্যে ও নাট্যের রচনা-পদ্ধতিতে কতকগুলি সাধারণ ও কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়।

নাটক বলিলে আমরা সাধারণতঃ কি বুঝিয়া থাকি? নাটক কাহাকে বলে? যখন কবি নিজমুখে কিছু বর্ণনা না করিয়া, কোন আখ্যায়িকায় কতকগুলি পাত্রকে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়া, তাহাদের নিজমুখে নিজকথা কথোপকথনচ্ছলে ব্যক্ত করান, তখনই তাহা নাটকের আকার ধারণ করে। কিন্তু উহা কেবল নাটকের বাহ্য আকার মাত্র। ঐ সকল পাত্রগণ পরস্পরের সহিত এমন ভাবেও কথা কহিতে পারে, যাহাতে পরস্পরের মনে কোন প্রকার বিকার উৎপন্ন হয় না—উহাকে কি নাটক বলা যাইতে পারে? "তুমি কেমন আছ?—আমি ভাল আছি" ইত্যাকার কথাবার্ত্তায় নাটকীয় ভাব প্রকাশ পায় না—উহাকে নাটক বলা যায় না। এই প্রকার কথোপকথন, অন্য হিসাবে যতই মনোরম হউক না, নাটকের হিসাবে উহা ফলপ্রদ নহে। প্রধান পাত্রদিগের পরস্পরের মনে কোন প্রকার বিকার উৎপাদন করাই নাটকের প্রধান কার্য্য, এবং তাহার উপরেই নাটকের নাটকত্ব নির্ভর করে। এই মানসিক বিকারের সমষ্টিই মনুষ্যের প্রকৃত জীবন। এই সুখদুঃখময় জীবনে, মানুষ সুখকে আলিঙ্গন ও দুঃখকে পরিহার করিবার জন্য সতত চেষ্টা করে, এবং ভবিতব্যতার সহিত সংগ্রাম করিয়া, নিজ পুরুষকার প্রকটিত করে। এই মানসিক জীবন-সংগ্রামে মানুষ উচ্চতর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, নিজ স্বার্থকেও বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না। তাই, নাটকে আমরা দেখিতে পাই, মানুষ পরস্পরের সহিত নানা সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়া, কখন শত্রুভাবে, কখন মিত্রভাবে পরস্পরের সহিত

ব্যবহার করিতেছে। এই কার্য্যশীলতাই নাটকের প্রাণ। নাট্য-কবি জীবনের সামান্য দৈনিক ঘটনাগুলি বাদ দিয়া, যে গুলি প্রধান ঘটনা যাহা পরস্পরের মনোবিকার উৎপাদনে সমর্থ—তাহাই নির্দ্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে, মুখ্যরূপে প্রদর্শন করেন এবং এমন ভাবে প্রদর্শন করেন যাহাতে তাঁহার নাটকীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। ইহার উপরে নাট্য-কবির গুণপনা নির্ভর করে।

আধুনিক উপন্যাসেও এইরূপ কথোপকথন মধ্যে মধ্যে থাকে বটে, কিন্তু সেই কথাবার্ত্তার মধ্যে কখন কখন যে ফাঁক পড়িয়া যায়, আখ্যান-কবি তাহা নিজ কথায় পূরণ করিয়া দেন; অর্থাৎ সেই আনুষঙ্গিক অবস্থা ও ঘটনাগুলি তাঁহার নিজ মুখে বর্ণনা করেন। কিন্তু নাট্য-কবি এরূপ উপায় অবলম্বন করেন না। তিনি সকল স্থলেই তাঁহার পাত্রগণকে জীবন্ত ব্যক্তিরূপে সাজাইয়া আসরে আনয়ন করেন; এবং তাহাদের অবস্থার অনুরূপ কথাবার্ত্তা তাহাদের নিজের মুখ দিয়াই ব্যক্ত করেন। উপন্যাস ও নাটকের রচনায় এই মুখ্য প্রভেদটি স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হয়। এই জন্যই রঙ্গপীঠের আবশ্যকতা। অভিনয় প্রদর্শন করাই নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য। অনুকরণবৃত্তিই অভিনয়ের মূল। কোন নাট্য-রচনাকে দুই হিসাবে বিচার ও পরীক্ষা করা যাইতে পারে। এক, উহার কাব্যাংশ লইয়া, আর এক, উহার নাট্যাংশ লইয়া। নাটক দৃশ্য-কাব্যের অন্তর্গত; অভিনয়ই উহার প্রাণ। উৎকৃষ্ট নাটক মাত্রই কতকটা কাব্যরসাত্মক। এ স্থলে শুধু ছন্দোবদ্ধ লেখাকেই আমি কবিতা বলিতেছি না। কি গদ্য, কি পদ্য, উভয়েতেই কাব্য-রস থাকিতে পারে। নাট্য-রচনার ভাবে ও বস্তু-কল্পনার মধ্যে যে কাব্য-রস প্রকাশ পায়, তাহা কাব্যাংশেরই সামিল। নাটকের নাট্যকলা বিশেষরূপে কিসের উপর নির্ভর করে? যখন সমস্ত নাটকের মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন অখণ্ড স্বসম্পূর্ণ যোগ প্রকাশ পায়, তখনই উহা

কলার মধ্যে পরিগণিত হয়। শিল্পকলা মাত্রেরই এইরূপ প্রকৃতি। প্রত্যেক ললিত কলার বিশেষ সৌন্দর্য্য একএকটি বিশেষ-বিশেষ আকারে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। এই আকার-রচনা, এই রূপ-কল্পনা প্রত্যেক কলা-বিদ্যার ভিত্তিভূমি। যখন কোন কলা-কবি স্বকীয় কোন সুন্দর মানস-প্রতিমাকে বাহিরে মূর্ত্তিমান করিয়া প্রকাশ করেন, তখনই তাহা ললিত কলার অন্তর্গত হয়। তাজমহলের গঠনে যে রূপ-কল্পনা লক্ষিত হয়, তাহার বিচিত্রতার মধ্যেও একটি সুন্দর একতা আছে। এই বিচিত্রতার মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য ও একতা রক্ষিত হইয়াছে বলিয়াই, তাহার শিল্প-নৈপুণ্যের এত প্রশংসা। গ্রীশদেশীয় নাট্য-সমালোচকগণ এইজন্য নাট্য-কলার তিনটি একতার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করেন। প্রথম—কালের একতা, দ্বিতীয়—স্থানের একতা, তৃতীয়—আখ্যান-বস্তুর একতা। কিন্তু সেক্সপিয়ার প্রভৃতি কতকগুলি য়ুরোপীয় নাটকে দেশকালের একতা ততটা রক্ষিত হয় না। আধুনিক য়ুরোপীয় সমালোচকগণ, বস্তুগত একতা ও উদ্দেশ্যগত একতাকেই বিশেষ প্রাধান্য দিয়া থাকেন। আমাদের সাহিত্য-দর্পণও কতকটা এই মতের পক্ষপাতী। সাহিত্য-দর্পণ বলেন—

"বিচ্ছিন্নাবস্তরৈ- কার্থঃ কিঞ্চিৎ সংলগ্নবিন্দুকঃ।
যুক্তোন বহুভিঃ কার্য্যৈর্বীজসংহৃতিমান্ ন চ॥"

অর্থাৎ "নাটকের বিচ্ছিন্ন অবান্তর অংশগুলির মধ্যে মূল উদ্দেশ্যের সমতা রক্ষিত হওয়া চাই; বিন্দুগুলি—অর্থাৎ মুখ্য ঘটনার অংশগুলিও কিঞ্চিৎ সংলগ্ন হওয়া চাই; নাটকে বহু ব্যাপার থাকা সঙ্গত নহে এবং বীজ অর্থাৎ গ্রন্থের প্রকৃতিরূপ মূল কারণেই যাহাতে সংহার না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা চাই।" নাটকের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আধুনিক য়ুরোপীয় সমালোচকগণ যাহা বলেন, আমাদের প্রাচীন সমালোচকগণও ঠিক তাহাই প্রতিপাদন করেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে অভিনয়ই নাট্যকলার প্রাণ। নাট্যশা[illegible] চারি প্রকার অভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়,—বাচিক, আহা[illegible] সাত্ত্বিক ও আঙ্গিক। গদ্য পদ্যাদির দ্বারা অর্থযুক্ত রচিত বাক্যের দ্বা[illegible] যে অভিনয় হয়, তাহাকে বাচিক অভিনয় বলে। নেপথ্য-বিধানে দ্বারা যে অভিনয় হয়, তাহাকে আহার্য্য অভিনয় বলে। নেপথ্য-বি[illegible] চারি প্রকার,—পুস্ত, অলঙ্কার, সংজীব ও অঙ্গ-রচনা। শৈল, যান বিমান, চর্ম্ম, বর্ম্ম, অস্ত্র, ধ্বজ, পতাকা, এই সকলের নাম পুস্ত। মাল্য আভরণ ও বস্ত্রাদি দ্বারা যথাযোগ্যরূপে অঙ্গাদি ভূষিত করাকে অলঙ্কার নেপথ্য কহে। নেপথ্য হইতে যে প্রাণী প্রবেশ হয়, তাহার নাম সংজীব। পূর্ব্বোক্ত মাল্যাভরণাদি ও বিবিধ বর্ণের দ্বারা সাজানকে অঙ্গরচনা বলে। সুখদুঃখাদি মনোবিকারকে সত্ত্ব বলে। এই মনোবিকার আট প্রকার। যথা,—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু, বিবর্ণতা, অশ্রু ও প্রলয়। এই সকল ভাব প্রকাশ করিয়া যে অভিনয় হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক অভিনয় বলে।

বস্ত্র বা চর্ম্মাদি দ্বারা যে দৃশ্য নির্ম্মাণ করা যায়, তাহার নাম সান্ধিমা; সেই দৃশ্য যদি যন্ত্রঘটিত হয়, তবে তাহাকে ভঙ্গিমা বলে; যে দৃশ্য চেষ্টমান থাকে তাহা চেষ্টমান। ইহার মধ্যে সচিত্র দৃশ্যের কোন উল্লেখ নাই। কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বে চিত্রপটের দৃশ্যও রঙ্গালয়ে ব্যবহৃত হইত; তাঁহারা বলেন যে, ভবভূতীর "উত্তর রাম-চরিতে," সীতাকে লক্ষ্মণ তাঁহাদের পূর্ব্বতন ভ্রমণ-পথের যে চিত্র প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতেই প্রমাণ হয় যে সেকালে সচিত্র দৃশ্যও ছিল। কিন্তু এই যে চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহা আখ্যান-বস্তুরই অঙ্গীভূত, তাহা নাট্যদৃশ্যের হিসাবে প্রদর্শিত হয় নাই। আর এক কথা, সেকালের চিত্রকলার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায় বটে, কিন্তু দূরনৈকট্য-সূচক পরিপ্রেক্ষিত চিত্রলেখা-পদ্ধতি জানা ছিল কি না, কিম্বা

প্রচলিত ছিল কি না, সে বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। বাস্তবের কতকটা অনুকরণ করিয়া, দর্শকের চিত্ত-বিভ্রম উৎপাদন করাই অভিনয়ের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু যে দৃশ্য-চিত্রে দূরনৈকট্যের কৌশল প্রকটিত না হয়, তাহা বাস্তবিক বলিয়া ভ্রম হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই বোধ হয়, তখনকার নাট্যাভিনয়ে সচিত্র দৃশ্যের ব্যবহার ছিল না। রথ, বিমান, জীবজন্তু প্রভৃতি রঙ্গপীঠে আনীত হইত, কিন্তু কোন প্রকার সচিত্র দৃশ্য প্রদর্শিত হইত না। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার আবশ্যক হইলে দৃশ্য পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইত না—রঙ্গপীঠের উপর চতুর্দ্দিকে পরিক্রমণ করিয়াই তাহা সূচিত হইত। ফলকথা এখনকার ন্যায় সেকালে দৃশ্যাদির আড়ম্বর ছিল না, অনেকটা দর্শকদের কল্পনার উপরেই নির্ভর করা হইত। একালে, সর্ব্বদেশের রঙ্গালয়েই দৃশ্য প্রদর্শনের আড়ম্বর বাড়িতেছে এবং প্রকৃত অভিনয়ের ক্রমশই অবনতি হইতেছে। প্রাচীন ভারতের রঙ্গালয়ে দৃশ্য আড়ম্বর ছিল না, কিন্তু অভিনয়-বিদ্যা চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। অভিনয়-বিদ্যার কতটা উন্নতি হইয়াছিল, তাহা ভরতের নাট্যশাস্ত্র পাঠ করিলেই উপলব্ধি হয়। আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্যে expression—অর্থাৎ অনুভাব সম্বন্ধে অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বাহির হইয়াছে, কিন্তু আমাদের নাট্যশাস্ত্রের ভাবপ্রকাশের ব্যাপারসমূহ যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত হইয়াছে, সেরূপ আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। আমাদের নাট্যশাস্ত্রে ভাবপ্রকাশসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম দর্শনের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। নাট্যশাস্ত্রের আলোচনা-পদ্ধতিও অতি বিশুদ্ধ। উহাতে বিভাব, ভাব, অনুভাব ও রস এই চারিটি তথ্য অনুসরণ করিয়া অভিনয়-বিদ্যার তত্ত্ব সকল নিরূপিত হইয়াছে।

বিভাব কি?—না, যে বাহ্য অবস্থা ও ঘটনা হইতে মনুষ্যহৃদয়ে ভাব উদ্দীপিত হয় তাহাই বিভাব; এবং এই হৃদয়-ভাবের বাহ্য

লক্ষণ সকল যাহা মুখাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রকটিত হয়, তাহাই অনুভাব। ভাব ও রসে বিশেষ কিছু প্রভেদ নাই। ভাবগুলি যখন উপভোগ করা যায়, অথবা আস্বাদন করা যায়, তখনই তাহা রস নামে অভিহিত হয়। নাট্যব্যাপারে এই রস, স্বাভাবিক অভিনয়ের দ্বারা, প্রেক্ষক-মণ্ডলীর হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। যে ভাবের অভিনয় হইতেছে, সেই ভাব যখন উপস্থিত দর্শক মণ্ডলীর মনে উদ্দীপিত হয় সেই অভিনয়কেই উৎকৃষ্ট অভিনয়,—সরস অভিনয় বলা যায়। নাট্যশাস্ত্রোল্লিখিত এই রস আট প্রকার,—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত; এবং ইহারই অনুরূপ আট প্রকার স্থায়ী ভাব, যথা :—রতি, হাস, শোক, ক্রোধ উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময়। নাট্যশাস্ত্র বলেন, "যেমন মনুষ্যের মধ্যে রাজা, শিষ্যের মধ্যে গুরু, সমস্ত ভাবের মধ্যে স্থায়ীভাবগুলি সেইরূপ। যেমন রাজা বহুজন-পরিবৃত হইলেও রাজা এই নাম পাইয়া থাকেন, অন্য কোন পুরুষ তাহা পায় না, সেইরূপ বিভাব ও ব্যভিচারী-পরিবৃত স্থায়ী ভাবই রসত্ব লাভ করিয়া থাকে।" এই সকল স্থায়ী ভাব হইতে যে সকল গৌণভাব অবস্থানুসারে উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে ব্যভিচারী বা সঞ্চারীভাব বলা যায়। নির্ব্বেদ, গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া, মদ, শ্রম, আলস্য, দৈন্য, চিন্তা, মোহ, স্মৃতি, ধৃতি, ব্রীড়া, চপলতা, হর্ষ, আবেগ, জড়তা, গর্ব্ব, বিষাদ, ঔৎসুক্য, নিদ্রা, অপস্মার, সুপ্তি, জাগরণ, অমর্ষ, অবহিত্থ, উগ্রতা, মতি, ব্যাধি, উন্মাদ, মরণ, ত্রাস ও বিতর্ক এইগুলি ব্যভিচারী ভাব। এইগুলি সর্ব্বসমেত তেত্রিশটি। সাত্ত্বিক ভাব আটটি, যথা :—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়। কিন্তু আমার বিবেচনায়, এই সাত্ত্বিক ভাবগুলিকে অনুভাবের শ্রেণীতে ধরিলেই সঙ্গত হইত; কারণ, এই সকল ভাবও ভাবেরই শারীরিক বাহ্য লক্ষণ মাত্র। বিভাব, অনুভাব, ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগেই রসের নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। ভরতমুনি

বলেন, "যেমন নানা ব্যঞ্জন ও ঔষধিদ্রব্য সংযোগে রসের সমাবেশ হয়, সেইরূপ স্থায়ীভাব সকল নানা ভাব দ্বারা অনুগত হইয়া রসত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রস কিরূপ—না, যাহা আস্বাদ্য। যেমন লোকে নানা ব্যঞ্জন যুক্ত সুসংস্কৃত অন্নভোজন করিয়া রস আস্বাদন করে, সেইরূপ মনস্বী নাট্যদর্শকেরা নানা ভাবাভিনয়-প্রকাশিত স্থায়ীভাব-সকল আস্বাদন করিয়া থাকেন। ভাবহীন রস নাই, এবং ভাবও রসহীন নহে; অভিনয়ে উভয়ের সিদ্ধি পরস্পরকৃত জানিবে। যেমন ব্যঞ্জন ও ওষধি সংযোগে অন্ন স্বাদু হয়, রসভাবকে সেইরূপ জানিবে; ফলতঃ এই দুই অন্যোন্যাপেক্ষ।" ভরতমুনি বলেন, শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর ও বীভৎস এই চারিটি অন্যান্য রসের মূল। শৃঙ্গার হইতে হাস্য, রৌদ্র হইতে করুণ, বীর হইতে অদ্ভুত, এবং বীভৎস হইতে ভয়ানক উৎপন্ন হয়। শৃঙ্গারের যাহা কার্য্য তাহা হাস্য; রৌদ্রের যাহা কার্য্য তাহা করুণ, বীরের যাহা কার্য্য তাহা অদ্ভুত; আর যাহা বীভৎসদর্শন তাহা ভয়ানক।

এই সকল বিভাব, ভাব, ও অনুভাব অনুসরণ করিয়া নাট্যশাস্ত্রে নাট্যাভিনয়ের কিরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; তাহার দুই একটি দৃষ্টান্ত এইখানে উদ্ধৃত করি,—তাহা হইতেই বুঝা যাইবে, অভিনয় সম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্রকারের কতটা সূক্ষ্মদর্শিতা ছিল। শোক-অভিনয়ের এইরূপ উপদেশ আছে:—"প্রিয়-বিয়োগ, বিভব-নাশ, বধ বন্ধন ইত্যাদি বিভাব হইতে শোক জন্মে। অশ্রুপাত, বিলাপ, পরিদেবন, বিবর্ণতা, স্বরভঙ্গ, দেহ-শৈথিল্য, ভূমিপাত, ক্রন্দন, দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ইত্যাদি অনুভাব দ্বারা ইহার অভিনয় করিবে। রোদন তিন প্রকার:—আনন্দজ, কাতরতা-জনিত, ও ঈর্ষাকৃত। তন্মধ্যে যাহা আনন্দজ তাহাতে গণ্ড হর্ষে উৎফুল্ল, এবং অনুস্মরণহেতু অপাঙ্গ হইতে অশ্রুপাত ও রোমাঞ্চাদি হয়। যাহা কাতরতা-জনিত, তাহাতে পর্য্যায়ক্রমে অশ্রুপাত

মুক্তকণ্ঠতা, অঙ্গস্থদেহের নানারূপ চেষ্টা, ভূমিসাত, ও বিলাপাদি হয়। যাহা স্ত্রীলোকের ঈর্ষাকৃত তাহাতে গণ্ড ও ওষ্ঠ স্ফূরণ, শিরঃকম্প, ভ্রূকুটি, ও কটাক্ষের কুটিলতা ইত্যাদি হইয়া থাকে। স্ত্রী ও নীচ-প্রকৃতি মনুষ্যের দুঃখজ শোক হয়; উত্তম ও মধ্যমের ধৈর্য্যের সহিত এবং নীচের রোদনের সহিত ইহার অভিব্যক্তি হইবে।"

ক্রোধ সম্বন্ধে ভরতমুনি এইরূপ বলিয়াছেন :—"বিবাদ, কলহ ও প্রতিকূলাচরণাদিদ্বারা ক্রোধ জন্মে। শত্রু নির্য্যাতন করিবার সময়ে ক্রোধে মুখ কুটিল ও উৎকট হইবে, কর-পরামর্ষণ, ঘনঘন ভুজদণ্ডে দৃষ্টি নিক্ষেপ, ও দন্ত প্রকাশ করিবে। কোন গুরুলোকের উপর ক্রোধ হইলে দৃষ্টিটা কিঞ্চিৎ অধোমুখ হইবে, দেহের অল্প অল্প ঘর্ম্ম মুছিতে থাকিবে, এবং কঠোর চেষ্টা অব্যক্ত রাখিবে। কোন প্রণয়ীর ক্রোধ হইলে বিচরণ স্বল্পতর হইবে, অপাঙ্গ বিক্ষেপের সহিত অশ্রুপাত, ভ্রূকুটি ও ওষ্ঠস্ফূরণ করিবে। পরিজনের উপর ক্রোধ হইলে ক্রূরতা-রহিত হইয়া তর্জ্জন, ভৎর্সনা, নেত্র-বিস্ফারণ ও বিবিধ প্রকার দৃষ্টিপাত করিবে।" বাহুল্যভয়ে আর উদ্ধৃত করিলাম না। এই দুইটি দৃষ্টান্ত হইতেই উপলব্ধি হইবে, নাট্যশাস্ত্রকারের কতটা ভূয়োদর্শন ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-শক্তি ছিল।

এক্ষণে, প্রাচীন ভারতে নাট্য রচনাপদ্ধতি কিরূপ ছিল তাহার আলোচনা করা যাউক।

দৃশ্য ও শ্রাব্য ভেদে কাব্য দুই প্রকার। দৃশ্যকাব্যই অভিনয়ের যোগ্য। দৃশ্যকাব্যকে রূপক বলে; কারণ তাহার পাত্রাদিতে ব্যক্তি বিশেষের রূপ আরোপ করা হয়। রূপকের ভেদ এইগুলি :—নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, অঙ্ক, বীথী, প্রহসন—এই দশ প্রকার। উপরূপক এইগুলি :—নাটিকা, ত্রোটক, গোষ্ঠি, সট্টক, নাট্যরাসক, প্রস্থান, উল্লাপ্য, কাব্য, প্রেঙ্খন, রাসক, সংলাপক, শ্রীগদিত,

শিল্পক, বিলাসিকা, দুর্ম্মলিকা, প্রকরণী, হল্লীশ, ও ভাণিক ;—এই অষ্টাদশ উপরূপক। এই উপরূপক ও রূপক স্বরূপতঃ একই, এবং নাটিকা প্রভৃতি নাটকাদিরই মত। আমরা এই প্রবন্ধে নাটকেরই সাধারণলক্ষণগুলি বিবৃত করিব। রূপকের সমস্ত ভেদগুলির বিশেষ লক্ষণ বিবৃত করিতে হইলে বাহুল্য হইয়া পড়িবে, সেইজন্য এই প্রবন্ধে বিরত হইলাম।

কোন প্রসিদ্ধ বৃত্তান্ত লইয়া নাটক রচিত হয়। স্বকপোল-কল্পিত বৃত্তান্ত লইয়া নাটক রচিত হয় না। ইহা পঞ্চসন্ধিযুক্ত ; বিলাস, ঋদ্ধি, বিভূতি আদি গুণ ইহাতে থাকা চাই। বিলাস, অর্থাৎ ধীরদৃষ্টি, বিচিত্র গতি, সস্মিত বাক্য,—এই প্রকারযুক্ত পুরুষের গুণ। ঋদ্ধি-আদি কি ?—না, অভ্যুন্নতি, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি। বিভূতি কি ?—না, কথন সুখ, কথন দুঃখ উদ্ভূত হইয়া নানাপ্রকার রসের আবির্ভাব। নাটকে পাঁচ হইতে দশ অঙ্ক থাকে। ইহার নায়ক, গুণবান, প্রখ্যাতবংশ, প্রতাপ-বান্, ধীরোদাত্ত, রাজর্ষি, যথা দুষ্মন্তাদি ; দিব্য নায়ক, যথা শ্রীকৃষ্ণাদি ; দিব্যাদিব্য নায়ক অর্থাৎ নরাভিমানী দেবতা নায়ক, যথা রামচন্দ্রাদি। হয় শৃঙ্গার, নয় বীর—এই দুই রসের মধ্যে একটি রস ইহাতে অঙ্গী অর্থাৎ প্রধান হইবে ; আর সমস্ত রস ইহার অঙ্গ, অর্থাৎ সহকারী হইবে। আর নির্ব্বহণ, অর্থাৎ উপসংহার কালে ইহার কার্য্য অদ্ভুত হওয়া চাই। ইহার মুখ্যপাত্র—অর্থাৎ কার্য্য-ব্যাপৃত পুরুষ চারিটি কিম্বা পাঁচটি হইবে। ইহার আকার গোপুচ্ছাদির ন্যায়, অর্থাৎ ইহার অঙ্কগুলি ক্রমসূক্ষ্ম হইবে। কেহ বলেন, যেমন গোপুচ্ছের কতকগুলি লোম দীর্ঘ ও কতকগুলি হ্রস্ব—ইহাও সেইরূপ। নাটকে নায়ক-চরিত্র প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইবে, রসভাব সমুজ্জ্বল হইবে, শব্দার্থ স্পষ্ট ও পরিপুষ্ট হইবে। ক্ষুদ্র চূর্ণক—অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে প্রাঞ্জল গদ্যও সন্নিবিষ্ট থাকিবে। বিচ্ছিন্ন অবান্তর অংশগুলির

মধ্যে মূল উদ্দেশ্যের মমতা রক্ষিত হইবে, বিন্দুগুলি, অর্থাৎ প্রধান ঘটনাগুলিও কিঞ্চিৎ সংলগ্ন হইবে। ইহাতে বহু ব্যাপার থাকা সঙ্গত নহে। বীজ অর্থাৎ প্রকৃতিরূপ মূলকারণের সংহার না হয়, তৎপ্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নানা বিধান-সংযুক্ত হইবে। পদ্যের অতি প্রাচুর্য্য না থাকে, আবশ্যক কার্য্যের কোন ব্যাঘাত না হয় তাহাও দেখিতে হইবে, যে আখ্যান বা কথা অনেক দিনে সম্পাদিত না হয়, সেইরূপ আখ্যান বা কথা ইহাতে সংযুক্ত হইবে। ইহাতে নায়ক আসন্ন অথবা সমীপবর্ত্তী থাকা চাই, এবং তিন চারিটি পাত্রও ইহাতে সন্নিবেশিত করা চাই। দূরাহ্বান, বধ, যুদ্ধ, রাজ্যদেশাদির বিপ্লব, বিবাহ, ভোজন শাপ, উৎসর্গ, মৃত্যু, রতি, দন্তচ্ছেদন, যাহা ব্রীড়াজনক, শয়ন, অধরপান, নগরাদি অবরোধ, স্নান, অনুলেপনাদি ইহাতে বিবর্জ্জিত হইবে। অঙ্কের শেষে সমস্ত পাত্র নিষ্ক্রান্ত হইবে। (অঙ্কের এই নিয়মটি ফরাসী নাটকের বিশেষত্ব)।

নাটকের প্রথমেই পূর্ব্বরঙ্গ; তারপর সভাপূজা অর্থাৎ সভা-প্রশংসন; তারপর কবির নামাদি কীর্ত্তন, তাহার পর প্রস্তাবনা নিবদ্ধ করিবে। নাট্যবস্তুর পূর্ব্বে নটেরা যাহা করে তাহাকে পূর্ব্বরঙ্গ অথবা মঙ্গলাচরণ বলে। পূর্ব্বরঙ্গে বিঘ্নোপশান্তির জন্য নান্দী অবশ্যকর্ত্তব্য। দেব দ্বিজ নৃপ প্রভৃতির আনন্দদায়িনী স্তুতি কিম্বা আশীর্ব্বাদকেই নান্দী বলে।

পূর্ব্বরঙ্গবিধান সমাধা করিয়া সূত্রধর রঙ্গস্থলে ফিরিয়া আইসেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি কাব্যস্থাপনা করেন, বীজ, মুখ বা পাত্রের সূচনা করেন; উপস্থিত অভিনয়ের প্রশংসা করিয়া শ্রোতৃবর্গের প্ররোচনা করেন। যিনি এই সকল কার্য্য করেন, তিনি স্থাপক নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। সূত্রধর কিম্বা স্থাপকের সহকারীকে পারিপার্শ্বিক কহে —তাহার নীচে নট।

সূত্রধরের বাক্যে যখন কোন পাত্র প্রবেশ করে, তখন তাহাকে কথোদ্ঘাৎ কহে। যদি এক প্রয়োগে অন্য প্রয়োগ প্রযোজিত হয় এবং সেই দ্বিতীয় প্রবেশে পাত্রের প্রবেশ হয়, তাহাকে প্রয়োগাতিশয় কহে। উপস্থিত কালকে আশ্রয় করিয়া সূত্রধার যে বর্ণনা করে, সেই বর্ণনা অবলম্বন করিয়া যখন কোন পাত্র প্রবেশ করে, তখন তাহাকে প্রবর্ত্তক কহে সাদৃশ্য উদ্ভাবনা হইতে যখন পাত্র প্রবেশরূপ অন্য কার্য্য সাধিত হয়, তখন তাহাকে আসাগিত কহে। নেপথ্য-ভাষিত ও আকাশভাষিত অবলম্বন করিয়া প্রস্তাবনা কর্ত্তব্য। প্রস্তাবনা করিয়া সূত্রধর রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করে, তাহার পর বস্তু আরম্ভ হয়।

এই বস্তু দুই প্রকার ; এক আধিকারিক, আর এক প্রাসঙ্গিক। আধিকারিক অর্থাৎ মুখ্য ইতিবৃত্তের আনুষঙ্গিক যে চরিত বর্ণিত হয়, তাহাই প্রাসঙ্গিক।

কোন এক কার্য্য চিন্তা করিবার সময়, তাহার লক্ষণান্বিত অন্য কার্য্য আগন্তুক ভাবে—অতর্কিত ভাবে প্রযোজিত হইলে তাহাকে পতাকাস্থান কহে।

যে কার্য্য সম্পূর্ণ একদিবসের মধ্যে সম্পাদিত হয় সেইখানে অঙ্কচ্ছেদ করিয়া, দিবাবসানে অর্থোপক্ষেপে বাক্য প্রযুক্ত হয়। কার্য্যের উপক্ষেপ পাঁচটী :—বিষ্কম্ভক, প্রবেশক, চূলিকা, অঙ্কাবতার ও অঙ্কমুখ।

অতীত কিম্বা আগামী কথাংশের সূচনা করিয়া অঙ্কের প্রথমে যাহা সংক্ষেপে উক্ত হয়, সেই কথাবিভাগকে বিষ্কম্ভক কহে। নীচ পাত্র প্রয়োজিত প্রাকৃত ভাষায় রচিত কথাবিভাগকে প্রবেশক কহে। উহা দুই অঙ্কের মধ্যস্থলে বিষ্কম্ভের ন্যায় সংক্ষেপে উক্ত হয়। যবনিকার অন্তরাল হইতে যে কার্য্যের সূচনা হয় তাহাকে চূলিকা কহে। কোন অঙ্কের অন্তে, সেই অঙ্কের অবিচ্ছেদে অর্থাৎ যোগ রক্ষা করিয়া, পাত্রাদি

সূচিত হইলে তাহাকে অঙ্কাবতার কহে। যে অঙ্কের মধ্যে সমস্ত অঙ্কের মূল ঘটনা অর্থাৎ সমস্ত নাটকের বীজার্থ সূচিত হয়, তাহাকে অঙ্কমুখ কহে।

বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী, ও কার্য্য এই পাঁচটি অর্থপ্রকৃতি অর্থাৎ প্রয়োজন-সিদ্ধি-হেতু।

(১) যে মূল ঘটনার উপর সমস্ত আখ্যান-বস্তু স্থাপিত, তাহাকে বীজ কহে।

(২) নাটকের অবান্তর বিচ্ছেদ স্থলগুলির শেষে যে অবিচ্ছেদের কারণ বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ যে ঘটনাগুলি থাকায় সমস্ত নাটকের মধ্যে উদ্দেশ্যগত অবিচ্ছিন্নতা ও যোগ রক্ষিত হয়, তাহাকেই বিন্দু কহে।

(৩) নির্ব্বহণ অর্থাৎ উপসংহারপর্য্যন্তস্থায়ী প্রাসঙ্গিক চরিত্রকে পতাকা কহে; যথা রাম চরিতে—সুগ্রীবাদি, শকুন্তলায়—বিদূষকাদি।

(৪) যে সাধনীয় ব্যাপার আকাঙ্খিত ও অপেক্ষিত, যাহা প্রাসঙ্গিক নহে, যাহার সিদ্ধির জন্য আরম্ভ, উদ্যোগ ও উপসংহার হইয়া থাকে তাহাই নাটকের কার্য্য।

এই কার্য্যের পঞ্চ অবস্থা :—আরম্ভ, যত্ন, প্রত্যাশা নিয়তাপ্তি ও ফলাগম।

নিয়তাপ্তি কি ?—না, বিঘ্নের অপগমে নিশ্চিত প্রাপ্তি অর্থাৎ ফললাভ। এই অবস্থায়, বিঘ্নেরই প্রধান্য সূচিত হয়। এই কার্য্যগত পঞ্চ অবস্থার যোগে আখ্যানবস্তুর পঞ্চ সন্ধি অর্থাৎ পঞ্চ প্রকার বিভাগ কল্পিত হইয়াছে। যথা :—মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ ও উপসংহৃতি।

(১) যেখানে বীজের অর্থাৎ মূল কারণের উৎপত্তি তাহাকে মুখ-সন্ধি কহে।

(২) প্রধান উপায়ে প্রধান ফলের যেখানে ঈষৎ উদ্ভেদ হয়, তাহাকে প্রতি মুখ কহে।

(৩) সেই উপায় ঈষৎ প্রকাশিত হইয়া যখন পুনঃপুনঃ তিরোহিত ও আবার তাহার সন্ধান পাওয়া যায়, তখন তাহাকে গর্ভসন্ধি কহে।

(৪) যখন সেই প্রধান উপায় গর্ভ হইতে উদ্ভিন্ন হইয়া, সান্তরায় অর্থাৎ সবিঘ্ন হয় তখন তাহাকে বিমর্ষ কহে।

(৫) যখন মুখাদি সকল সন্ধিগুলি এক প্রয়োজনসাধনে পর্য্যবসিত হয়, তাহাকে নির্ব্বহণ কহে।

এই পঞ্চসন্ধি সর্ব্বজাতীয় নাটকের স্বাভাবিক মুখ্য বিভাগ। এমন কি কোন য়ুরোপীয় নাটককে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে এই পঞ্চ সন্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। রোমীও জুলিয়েট নাটককে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ক্যাপুলেটের গৃহে নৃত্য-ব্যাপারই উক্ত নাটকের মুখসন্ধি; জুলিয়েটের সহিত রোমিওর সাক্ষাৎকারই প্রতিমুখসন্ধি; প্যারিসের সহিত বিবাহে জুলিয়েটের বাহ্যিক সম্মতি—ইহাই গর্ভসন্ধি; জুলিয়েটের প্রকৃত প্রেমনিষ্ঠা রক্ষা করিবার জন্য যে কৌশল অবলম্বিত হয়, তাহাতে রোমিওর যে নৈরাশ্য—তাহাই বিমর্ষ সন্ধি; তাহার পর, যে শেষফল হইল, তাহাই উপসংহৃতি। পূর্ব্বোক্ত অর্থপ্রকৃতির সহিত কার্য্যের পঞ্চ অবস্থা, ও পঞ্চসন্ধির কিরূপ মিল আছে, ঐ তিনটীকে উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত করিলেই তাহা সহজে উপলব্ধি হইবে।

অর্থপ্রকৃতি।—বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী, কার্য্য।

পঞ্চাবস্থা।—আরম্ভ, যত্ন, প্রত্যাশা, নিয়তাপ্তি, ফলাগম।

পঞ্চসন্ধি।—মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ, উপসংহৃতি।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর।

কিঞ্চিৎ উত্তম-মধ্যম।

(বিলাতী ঘুসি বনাম দেশী কিল।)

কবি বলেনঃ—"কেন ডর, ভীরু, কর সাহস আশ্রয়"। এই কবিবাক্য অনেক সময় সত্য বলিয়াই বোধ হয়। দেহে বল না থাকিলেও অনেক সময় অনেকে অনেক অসম-সাহসিক কার্য্যও সম্পন্ন করিয়া থাকেন। বাঙ্গালীর সাহস নাই বলিয়া বাঙ্গালী "ভীরু কাপুরুষ" বলিয়া পাশ্চাত্য জাতির নিকট অভিহিত হইতেছেন; নচেৎ বাঙ্গালী যে বলহীন একথা আমারা স্বীকার করিতে পারি না। কেন না, দেখিয়াছি বলপ্রকাশের স্থলে যে কেহ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে, সেখানে সে ব্যক্তি কখন অকৃতকার্য্য হয় নাই। এরূপ ঘটনা বঙ্গদেশে বিরল নহে। নিম্নের লিখিত ৬টী ঘটনা আমাদের একথা সমর্থন করিতেছেঃ—

১। "চাবুক-পরিপাক"—ইলবার্ট বিল পাস হইবার পর হইতেই সাদায় কালায় যেন আদায় কাঁচকলায় সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে। আপিসে, রেলওয়ে, ট্রামওয়ে, চা-বাগানে, পথে-ঘাটে-মাঠে সর্ব্বত্রই শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা সেই অবধি কথায় কথায় নেটীভ-বিদ্বেষের পরিচয় দিতেছেন। উক্ত বিল পাস হইবার কিছুকাল পরে গড়ের মাঠে একদিন আমরা উইল্‌সন্ সাহেবের সার্কাস দেখিতে যাই। সার্কাসের স্বত্বাধিকারী একদিন তৎকালীন রাজপ্রতিনিধি মহোদয়কে সার্কাস দেখিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সার্কাসের তাঁবু ও তাহার আশ পাশ লোকে লোকারণ্য। সার্কাস-প্রবেশপথে দর্শকগণের ভয়ানক ভীড়। সকলেই পূর্ব্বাহ্নে টিকিট ক্রয় করিয়া ভীড় ঠেলিয়া সার্কাসে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সার্কাস আরম্ভ হইবার বড় বিলম্ব নাই;

এমন সময় সেই স্থানে কতকগুলি ফিরিঙ্গীনন্দন আগমন করিয়া বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং তজ্জন্য অকারণে সকলকে প্রহার করিতে লাগিল, কখন বা দুই হস্ত দ্বারা ধাক্কা দিয়া অথবা কনুয়ের গুঁতা দিয়া বাঙ্গালী দর্শকবৃন্দকে অস্থির করিতে লাগিল। লোকালয়ে ব্যাঘ্র আসিলে যেমন সকলে ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পলায়ন করিতে থাকে, এক্ষেত্রেও ঠিক সেইরূপ হইতে লাগিল। দলে দলে বাঙ্গালী পলায়নপর হইলে ইউরেশিয়ানের বংশধরেরা হাসির ফোয়ারা তুলিতে লাগিল। এমন সময় জনৈক বাঙ্গালী যুবক সাহসে ভর করিয়া আস্তিন গুটাইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, জনৈক ফিরিঙ্গীনন্দন কালা নেটিভের এতাদৃশ সাহস দেখিয়া সক্রোধে তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য যেমন তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইল, অমনি বাঙ্গালী যুবকটী হস্তস্থিত বেত্রদ্বারা "সপাং সপাং" করিয়া ২। ৪ ঘা দিলেন। সাহেবটীর এবম্বিধ দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহার সহযাত্রী আরও জনকয়েক তাহার সাহায্যার্থ নেটীভ যুবককে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিলে, যুবকটী তাহাদের মধ্যে অতি নিকটবর্ত্তী দুইজনকে প্রহারের সুবিধা ও অবসর না দিয়া, তাহাদেরই উপর ছড়ির সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপারে সেখানকার লোকতরঙ্গ যেন কিয়ৎ কালের জন্য স্তম্ভিত হইল। সে হুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলি মারামারির অন্ত নাই! সাদায় কালায় সংঘর্ষ বিষম ব্যাপার বিবেচনায় বাবুবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা বাক্যবীর তাঁহারা সমস্ত জাতিকে বিদেশীয়ের নিকট "ভীরু কাপুরুষ" বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্যই যেন তথা হইতে সরিয়া পড়িলেন। রহিলেন কেবল কতকগুলি স্কুলের ছেলে আর যুবকের আত্মীয়গণ। সাহেবেরা সঙ্গিগণের এবম্ভূত দুর্দ্দশা দেখিয়া ক্রোধে লজ্জায় ও কৃপায় সার্কাস-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। অন্যান্য দর্শকগণও তাহাদের অনুসরণ করিল। আর সেই বীর যুবক তখন যেন দিগ্বিজয়ী বীরের ন্যায় আত্মীয়গণ সমভিব্যাহারে

সার্কাসক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। সার্কাস শেষ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে যুবকের আত্মীয়গণ সাহেবপুঙ্গবদের ভাব ভঙ্গী বুঝিতে পারিয়া যুবককে লইয়া সরিয়া পড়িলেন। হায়! ইউরোপের কামজ সন্তানগণ সার্কাস ভাঙ্গিবার পর যুবককে সপ্তরথী কর্ত্তৃক বালক বীর অভিমন্যুর বধের ন্যায় বধ করিবেন বলিয়া, এতক্ষণ মনে মনে "শিয়ালের যুক্তি" আঁটিতেছিলেন, বস্তুতঃ তাহা যুক্তি মাত্রেই *পর্য্যবসিত হইল! অধিকন্তু তাঁহারা সর্ব্বজনসমক্ষে কালা আদমি* কর্ত্তৃক যে লাঞ্ছিত অপমানিত ও উত্তম-মধ্যমরূপে প্রহৃত হইলেন, তাহার প্রতিশোধ লইতে না পারিয়া অগত্যা নেটীভের "চাবুক পরিপাক" করিলেন।

সহৃদয় পাঠক! এই যুবক কে জানেন? ইনি এক্ষণে সার্কাস ব্যবসায়ে বিলক্ষণ দু পয়সা উপার্জ্জন করিতেছেন। এই পর্য্যন্ত বলিলেই ইহাঁর যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া হয়।

২। "ঠন্‌ঠনের নিমকী"—চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক জনৈক তেজস্বী ব্রাহ্মণ, কলিকাতায় কোন সওদাগরী আপিসে জেটী সরকারী কাজ করিতেন। আপিসের বড় সাহেব তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন এবং তাঁহার সমগ্র নামটী উচ্চারণ করিতে পারিতেন না বলিয়া তাঁহাকে "চট্টু" বলিয়া ডাকিতেন। আপিসের লোকে তাঁহাকে "চাটুর্য্যে মশাই" বলিত। আমরা এই আখ্যায়িকায় তাঁহাকে "চাটুর্য্যে মশাই" বলিয়া অভিহিত করিব। সরকারীগিরী কাজে তাঁহার প্রশংসাও বড় কম ছিল না। প্রায় ২০।২৫ বৎসর কাজ করিতেছেন কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহার কাজে কেহ কখন কোন গলদ বাহির করিতে পারেন নাই; বিশেষতঃ তিনি যে কাজে ছুঁচ না চলে, সে কাজে বেটে চালাইয়া কাজ হাঁসিল করিতেন। এজন্য বড় সাহেব তাঁহাকে আপিসের হেড সরকার করিয়া দিয়াছিলেন। চাটুর্য্যে মশাইও

"ধাড়ী" না মারিয়া ব্যাপারীদিগের নিকট বিলক্ষণ দুপয়সা রোজগার করিতেন; এজন্য তাঁহার হাতে দু'পয়সাও ছিল। একবার বড় সাহেব তাঁহার আপিস চালাইবার জন্য অপর একটী সাহেবকে রাখিয়া বিলাতযাত্রা করেন। এই নবাগত সাহেবটীর নাম রিচমণ্ড। রিচমণ্ড মফস্বলবাসী সাহেব—অল্পদিন হইল কলিকাতায় আসিয়াছেন। আপিসের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই প্রথমে গরীব কেরাণী-নির্য্যাতনে মনোনিবেশ করেন। বিশেষতঃ তাঁহার নানা উপসর্গের মধ্যে "জুতাতঙ্ক" নামক মহা উপসর্গটী গরীব কেরাণীকুলকে আকুল করিতে লাগিল। তিনি তাঁহার খাস চাপরাশিকে হুকুম দিলেন, যে কেরাণী জুতা পায়ে দিয়া আমার গৃহে প্রবেশ করিবে তাহার কাণ ধরিয়া আপিস হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে। চাপরাশি প্রথম প্রথম তাঁহার এই অভদ্রোচিত অনুজ্ঞাপালনে ইতস্ততঃ করিত। সাহেব একথা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে প্রথম প্রথম জরিমানা শেষে বিলক্ষণ প্রহার করিয়াছিলেন। শেষে সাহেব-নির্য্যাতন হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য চাপরাশি সাহেবের হুকুম তামিল করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইত না। আপিসের কেরাণীকুল ভাবিয়া মহা আকুল হইল। বড় সাহেবের আসিতে এখনও বিলম্ব আছে, এত দিন কিরূপে তাঁহারা সম্ভ্রম বাঁচাইয়া চলিবেন, সেই ভাবনায় তাঁহাদের পেটের ভাত চাল হইতে লাগিল। আমাদের চাটুর্য্যে মশাই কিন্তু সাহেবের এই বর্ব্বর আদেশ গ্রাহ্য করিতেন না। তিনি বড় সাহেবের পেয়ারের লোক, বাজে সাহেবকে তিনি গ্রাহ্য করিবেন কেন? তাহাতে সাহেবও মনে মনে মহা অসন্তুষ্ট। আপিসের বড় বাবু পর্য্যন্ত যাহার আদেশ শিরোধার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হন না, সে আদেশ একজন জেটী-সরকার অমান্য করিবে? বিশেষতঃ সে চটী জুতা পায়ে দিয়া ফটর্ ফটর্ করিয়া ধূলা উড়ায় এবং তজ্জন্য তাহার পা দুখানি সর্ব্বদাই ধূলা কাদায়

মাথামাথি। 'এরূপ অসভ্য লোককে আমার ঘরে ঢুকিতে দেওয়া কথনই উচিত নয়। এই বেয়াড়া বেয়াদব্‌কে শাসন না করিলে কি আর রক্ষা আছে! এই ভাবিয়া সাহেব তাঁহার ছিদ্রান্বেষণ করিতে লাগিলেন, উদ্দেশ্য, বড় সাহেব আসিবার পূর্ব্বে চাটুর্য্যে মশাইকে আপিস হইতে তাড়াইতে হইবে। চাটুয্যে মশাই [illegible] বুঝিয়াছিলেন, তাই সর্ব্বদা গৌরব করিয়া বলিতেন যে "আমার ক[illegible] যখন গলদ নাই তখন আমায় তাড়ায় কাহার সাধ্য।" এই ভরসায় তিনি বীরের ন্যায় আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেন।

একদিন বিচ্‌মণ্ড সাহেব আপিসে আসিয়া বেজায় বাড়াবাড়ি করিতে লাগিলেন; সম্ভবতঃ সেদিন কিছু মাত্রার আধিক্য হইয়া থাকিবে। সামান্য সামান্য দোষে কেরাণীদের জরিমানা করিতে লাগিলেন। কখন কখন কাহাকে বা তাড়া করিয়া মারিতে উদ্যত হইলেন। সাহেবের ঘরে যাইতে আজ কাহারও সাহস হইতেছে না। চাপরাশির দ্বারা চিঠিপত্র সমস্তই সহি হইতেছে। চাটুর্য্যেমশাই তখনও পর্য্যন্ত আপিসে আইসেন নাই, পরে আসিয়া সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া বলিলেন "তোমরা মায়ের দুধ খেয়ে মানুষ হও নাই। সাহেবের ঘরে যাইতে আমাদের এত ভয় কি।" এমন সময় সাহেবের পিয়াদা আসিয়া বলিল "সাহেব্‌ আপ্‌কো বোলাতা হায়"। এই বলিয়া চাপরাশি চলিয়া গেল। চাটুর্য্যেমশাই বীরের ন্যায় বুক ফুলাইয়া সেই এক হাঁটু ধূলাপায়ে চটি জুতা ফটর ফটর করিতে করিতে সাহেবের ঘরে প্রবেশ করিলেন। চাটুর্য্যেমশাইকে চটি জুতা পায়ে দিয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সাহেব মহাক্রুদ্ধ হইলেন। চাটুর্য্যেমশাই সাহেবের রাগের কোন কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া বলিলেন "সাহেব রাগ করেন কেন? ভদ্রলোকের ছেলে জুতাপায়ে না দিয়া এক পা যে হাঁটিতে পারি না। বড় সাহেব তো এ নিয়ম কথন"—কথায় বাধা দিয়া

সাহেব বলিল "বেয়াদব ব্রাহ্মণ! আমার উপর কথা! আর নেটীভরা ইংরাজ মনিবের সাম্‌নে জুতা পায়ে দিয়া আসিবে কেন?" চাটুর্য্যেমশাই উত্তেজিত স্বরে বলিলেন "আমাদের জুতা পায়ে দিতে দোষ কি? ইংরাজ-রাজ্যে এমন কোন নিয়ম নাই, যদ্বারা নেটীভেরা জুতা পায়ে না দিয়া বেড়াইবে।" সাহেব সক্রোধে বলিল "কালা আদমি আবার জুতা পায়ে দিবে কেন?" এই বলিয়া স্বীয় পা হইতে জুতা খুলিয়া চাপ্‌রাশিকে বলিল এই "বেয়াদব্ লোকটার মাথায় জুতা রাখিয়া সারা আপিস ঘুরাইয়া লইয়া আইস।" চাপরাশি চাটুর্য্যে মশাইকে বিলক্ষণ জানিত্। নীচ জাতীয় লোকের গায়ে হাজার বল থাকিলেও সহসা ভদ্রলোককে অপমান করিতে সাহস করে না। একারণ সে ইতস্ততঃ করিতেছিল দেখিয়া সাহেবপুঙ্গব গালি দিতে দিতে জুতা লইয়া তাহাকে তাড়া করিয়া গেলেন। চাপরাশি প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। সাহেব চাপরাশিকে প্রহার করিতে না পাইয়া চাটুর্য্যেমশাইকে শাসন করিবার উদ্দেশে তাহার দিকে ধাবিত হইল। তেজস্বী ব্রাহ্মণও ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া পায়ের জুতা হাতে তুলিয়া বলিলেন "সাহেব! বাপের ন্যায় মনিব পাইয়াছিলাম বলিয়া এ আপিসে আমার চুল পাকিয়াছে। ব্রাহ্মণ বলিয়া সকলে সম্মানও করিত, কিন্তু আজ তোমা হ'তে আমার সে মান, সে তেজ নষ্ট হইয়াছে। অবশ্য, আদালতে আইনের আমলে আনিয়া এ অপমানের প্রতিশোধ লইতে পারিতাম; কিন্তু এদেশের লোক বিশেষতঃ ব্রাহ্মণে আদালতে যাওয়াকে পাপ জ্ঞান করে, পরন্তু এখনকার দিনে, তোমার ন্যায় অভদ্রলোকের প্রতাপ-বৃদ্ধির দিনে, লোকের প্রথমে স্বহস্তে শাসন ভার লওয়া উচিত। দুর্ব্বল হস্তই আদালতের সাহায্য প্রার্থনা করে। (চটি জুতাসহ দুই হস্ত তুলিয়া) আমার এই হস্ত দুর্ব্বল নহে। তোমার ন্যায় অভদ্র সাহেবকে শাসন করিতে এবং তোমার 'জুতাতঙ্ক'

রোগ বিদূরিত করিতে (দুই হস্তে দুইখানি চটিজুতা তুলিয়া ধরিয়া ঠন্‌ঠনের এই নিমকীই মহা মহৌষধ” !

চাটুর্য্যে মশাইয়ের সেই উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া বোধ হয় সাহেব ভাবি “এ বড় কঠিন ঠাঁই” এবং এইজন্য দ্বিরুক্তি না করিয়া আপন চেয়ারে গিয়া বসিল। চাটুর্য্যে মশাই শেষে বলিলেন “তুমি এ আপিসের যতদিন কর্ত্তা থাকিবে, ততদিন আর এখানে আসিব না, আবার মনি আসে তখন আসিব।” এই বলিতে বলিতে তেজস্বী ব্রাহ্মণ নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

শ্রীরমেশ চন্দ্র বসু।

(২)

১। গত মার্চ মাসে একজন ডাক্তার বাবু দার্জিলিং মেলে উত্তর বঙ্গে যাইতেছিলেন। সারাঘাট ষ্টেশনে তিনি দার্জিলিং মেলে উঠিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় একজন ইম্‌পিরিয়াল এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান আসিয়া ডাক্তার বাবুকে হুকুম করিলেন “‘তুমি গাড়ী হইতে নাম’— ডাক্তার বাবুই সম্মুখে বসিয়াছিলেন। ডাক্তার বাবু কারণ জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলেন যে, হুজুর স্বয়ং সেই গাড়ীতে যাইবেন; রাজার জাতি ‘নেটিভের’ সহিত একাসনে বসিয়া যাইবে কেমন করিয়া? তাই তাঁহাকে সেই গাড়ী হইতে নামিয়া যাইতে হইবে! ডাক্তার বাবু কিন্তু এই ন্যায়সঙ্গত কারণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না! তিনি বলিলেন “গাড়ীতে যথেষ্ট স্থান আছে, ইচ্ছা করিলে আপনি স্বচ্ছন্দে যাইতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া আমি নামিতে বাধ্য নই।” নেটিভের এত বড় অবাধ্যতা, এত বড় আস্পর্দ্ধা সাহেব সহ্য করিতে পারিল না। ডাক্তার বাবুর উপর এক ঘুসি চালাইল। দুঃখের বিষয় ডাক্তার বাবু সাধারণ নেটিভের ন্যায় ঘুসি হজম না করিয়া তাহা সুদ

স্কন্ধ প্রত্যর্পণ করিলেন। সাহেবের কপাল কাটিয়া দর দর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। অনেক লোক জমিল; হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। সাহেব যাত্রীরাও আসিয়া জুটিল। আহত সাহেবটী জাতভাইদিগকে দেখিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে পুনরায় গাড়ীর ফুট বোর্ডের পাদানের উপর উঠিয়া ডাক্তার বাবুকে খুব গালাগালি দিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল "Coward! just come out and I shall see you." ডাক্তার বাবু বাহিরে আসিবার জন্য দরজা খুলিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু কয়েকজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক তাঁহাকে জোর করিয়া গাড়ীর মধ্যে ধরিয়া রাখিলেন—তাঁহারা তাঁহাকে কিছুতেই বাহির হইতে দিবেন না। ডাক্তার বাবু বলিতে লাগিলেন "মহাশয়, আমাকে ছাড়িয়া দিন, বেটাদের নেটিভ মারিয়া মারিয়া আস্পর্দ্ধা বাড়িয়া গিয়াছে। আপনারা আমাকে ছাড়িয়া দিয়া দেখুন বেটাকে আমি কি করি। আমাকে দেখিয়া আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন না যে I can simply kill him?" কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন না। এদিকে সাহেব গাড়ীর পাদানের উপর দাঁড়াইয়া খুব লম্ফ ঝম্ফ দিতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে মুখ খিঁচাইতে লাগিল। ডাক্তার বাবু ঐ রকম অবস্থায় থাকিতে থাকিতে দরজার জানালার ফাঁক দিয়া সাহেবের বক্ষে এক ভীষণ পদাঘাত করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর হ্যাণ্ডেল চ্যুত হইয়া সাহেবও ভূপতিত হইলেন। সাহেব কষ্টে আত্মসংবরণ করিলেন কিন্তু মুখে কথা নাই একেবারে নির্ব্বাক। কয়েকজন কলেজের ছাত্র উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সাহেব যাত্রীদিগকে প্রকৃত ঘটনা বুঝাইয়া দিলে, তাঁহারা যথাস্থানে চলিয়া গেলেন। পরে ষ্টেশন মাষ্টার আসিয়া উভয়কে বুঝাইয়া আপোস করিয়া দিলেন এবং সাহেবকে সেই গাড়ীতেই উঠাইয়া দিলেন। সাহেব রুমাল ভিজাইয়া মাথা বাঁধিল এবং নির্ব্বিঘ্নে যাইয়া গাড়ীতে বসিল। কয়েকজন সাহেব

অথবা "ট্যাস" পূর্ব্বোক্ত সাহেবকে ডাক্তার বাবুর বিরুদ্ধে সাহায্য করিতে আসিয়াছিল কিন্তু একজন বাঙ্গালী টিকেট কলেক্টর প্রকারান্তরে তাঁহাদিগকে সরাইয়া লইয়া যাইয়া খুব ভদ্রতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

২। মণীন্দ্রনাথ বসু নামক একজন ভদ্রলোক দেওঘর যাইতেছিলেন—সঙ্গে তাঁহার পরিবারস্থ কয়জন মহিলা ছিলেন। আসানশোল ষ্টেশনে দুইজন গোরা সেই গাড়ীতে উঠিতে যাওয়ায় ভদ্রলোকটী বাধা দিয়া বলিলেন 'এ গাড়ীতে স্ত্রীলোক আছে, অন্য গাড়ীতে যদি তাঁহারা যান তাহা হইলে সুবিধা হয়।' কিন্তু "চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী;" তাহারা ঐ গাড়ীতেই উঠিবে। ভদ্রলোকটী যেমন দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাধা প্রদান করিবেন অমনি তাঁহার বক্ষে এক বিলাতী ঘুসি পতিত হইল। তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন 'সাহেব এইবার দেশী চড় একটী খাও দেখি।' এই বলিয়াই সাহেবের গণ্ডদেশে এক দারুণ চপেটাঘাত করিলেন। সাহেব চড় খাইয়া জগৎ অন্ধকারময় দেখিল এবং তৎক্ষণাৎ গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। এমন সময় ট্রেণও ছাড়িয়া দিল। যে সাহেবটি গাড়ীর উপর রহিল, সে তখন বাবুটীর হস্তমর্দ্দন করিয়া তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং উভয়ে একই গাড়ীতে বন্ধুজনোচিত গল্প করিতে করিতে যাইতে লাগিল।

৩। কিছুদিন পূর্ব্বে সুখময় চট্টোপাধ্যায় নামক একজন কলেজের ছাত্র চাটগাঁ মেলে তাঁহার একজন বন্ধু আসিবেন বলিয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনে গিয়াছিলেন। প্ল্যাটফরমে যে বসিবার বেঞ্চ আছে তাহার একখানিতে তিনি এবং আর একখানিতে আর ৩।৪ জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। একজন সাহেব (ডাইলুসন ১০নং) আসিয়া নিতান্ত অভদ্রোচিত ভাষায় তাঁহাদিগকে উঠিয়া যাইতে হুকুম করিল এবং ইহাও বলিল যে এই বসিবার স্থান তাঁহাদের জন্য নয়। সুখময় বাবু

তাহার এ হুকুম ততটা গ্রাহ্য করিলেন না। কিন্তু আর কয়টী ভদ্রলোক বিনা বাক্যব্যয়ে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। কয়েকজন নেটিভ বলামাত্র হুকুম তামিল করিল, আর একজন করিল না, এ ঔদ্ধত্য সাহেবের নিকট বড়ই বিসদৃশ বোধ হইল। সে সুখময় বাবুর নিকট কৈফিয়ৎ চাহিল যে, কেন এতক্ষণ হুকুম তামিল করা হয় নাই এবং এতক্ষণ এখান হইতে না যাওয়ার অর্থ কি? তাঁহার উত্তরটা সাহেবের শ্রুতিসুখকর হইল না। সে সুখময় বাবুর গণ্ডদেশে একটী বিলাতী ঘুসি চালাইল। সুখের বিষয় সুখময় বাবু খুব বলিষ্ঠ এবং একজন রীতিমত জিমনাষ্ট্। তিনিও বিলাতী ঘুসি প্রাপ্তিমাত্র গোটাকতক দেশী কিলের বিনিময় করিলেন। সাহেবের নিকট এ বিনিময় লাভজনক বোধ হইল না। সে আঁ আঁ শব্দে চীৎকার করিতে করিতে ৫।৭ হাত দূরে গিয়া দাঁড়াইল এবং "পোলিস পোলিস" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। প্রথমতঃ দুইজন কনষ্টেবল আসিয়া সুখময় বাবুকে ধরিতে চেষ্টা করিল কিন্তু তাহারা বিশেষরূপে আহত হইল, পরে আরও ৩।৪ জন আসিয়া যোগ দিল। ইতিমধ্যে সুখময় বাবুর পরিধেয় বস্ত্র আকর্ষিত হইল, কাজেই বাধ্য হইয়া তাঁহাকে হারি মানিতে হইল। দুইজন কনষ্টেবল তাঁহাকে ধরিয়া থাকিল। চাটগাঁ মেল আসিলে প্যাসেঞ্জারদের গোল মিটিয়া গেল; পরে তাঁহাকে কনষ্টেবলদ্বয় ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট লইয়া গেল। সেখানে অনেক বাঙ্গালী কেরাণী উপস্থিত ছিল। একজন বলিল 'কিহে, কতখানি মদ খাওয়া হ'য়েছিল?' আর একজন বলিল 'তোমার কপাল ভাল যে তুমি অন্য কোন সাহেবের হাতে পড়নি।' অনেকে অনেক রকম বলিতে লাগিল। কেহ কেহ পরামর্শ দিল 'সাহেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, সব চুকিয়া যাইবে।' সুখময় বাবু এ উপদেশ উপযুক্ত মনে করিলেন না। তাঁহাকে পুলিশ হাজতে রাখিয়া দিল। পরে শ্রীযুক্ত হেরম্ব মৈত্র মহাশয় জামিন হইয়া তাঁহাকে

লইয়া আইসেন। সুখময় বাবুকে উকীল ব্যারিষ্টার পর্য্যন্ত ঠিক করিতে হইয়াছিল কিন্তু কি কারণে জানি না রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ মোকর্দ্দমা চালাইতে মত দিলেন না। সব গোল মিটিয়া গেল।

৪। গত বৎসর মোহন বাগান ও মেডিক্যাল কলেজে যে ফুটবল ম্যাচ হয় তাহাতে সাহেবেরা হারিয়া যায়। কয়েক জন বাঙ্গালী দর্শক ইহা লইয়া একটু উপহাস করে। সাহেবেরা উত্তেজিত হইয়া বাঙ্গালীদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করে। তখন সব বাঙ্গালী পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল, কেবল পূর্ব্বোক্ত সুখময় বাবু, রবীন্দ্রনাথ মল্লিক এবং আরও ২।১ জন কলেজের ছাত্র পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করিয়া আত্মসম্মান রক্ষার্থ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কতকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন।

৫। একবার ময়দানে একটী বড় নিলাম হইতেছিল। চতুর্দ্দিকে লোক ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে ভিতরে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। এমন সময় একজন সাহেব যেদিকে নেটিভ ভদ্রলোকেরা দাঁড়াইয়াছিলেন সেই দিকে আসিয়া মুষ্ট্যাঘাত-পদাঘাত দাঁত খিচাঁনী প্রভৃতির সাহায্যে রাস্তা করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল। এমন সময় একজন বাঙ্গালী বলিষ্ঠকায় যুবক এক লম্ফে আসিয়া এক হাতে সাহেবের এক কাণ অন্য হাতে সাহেবের এক হাত ধরিয়া সাহেবকে দুই তিন পাক দিয়া বলিল "সাহেব, এই ভদ্রলোকদিগকে কেন অপমানিত করিতেছ বল দেখি?" সাহেবত অবাক্! পরক্ষণেই আরও অনেক সাহেব জুটিয়া গেল—সকলে যুবকটীকে আক্রমণ করিবে এই ইচ্ছা। যুবকটী বলিল "দেখ, তোমরা অনেক, আমি একাকী; উপস্থিত দেশীয়েরা কেহই আমাকে সাহায্য করিবে না ইহা নিশ্চয়। তোমরা যদি কাপুরুষ না হও, একে একে আইস, এক সঙ্গে আক্রমণ করিও না।" সাহেবেরাও তাহাতেই স্বীকৃত হইল এবং প্রথম পালা সেই অপমানিত সাহেবের উপরই পড়িল। যুবক কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই সাহেবকে

বিশেষরূপে আহত করিল। তখন অন্যান্য সাহেবেরা 'Oh, he really did injustice to the native gentlemen,' বলিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

৬। একদিন দুই তিন জন কলেজের ছাত্র ময়দানে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। চৌরঙ্গী দিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন এমন সময় একজন গোরা সৈনিকপুরুষ একই ফুটপথে দিয়া অপরদিক হইতে আসিতেছিল। যেমন নিকটে আসিয়াছে অমনি সৈনিকপুরুষ হস্তস্থিত বেত্র দ্বারা যুবকদিগের একজনের পৃষ্ঠদেশে সপাৎ করিয়া একঘা বসাইয়া দিল। যুবকটী কারণ জিজ্ঞাসা করায় সৈনিকপুরুষটী সহাস্যে উত্তর দিলেন 'nothing but a practical joke.' যুবকটীও এক লম্ফে সৈনিকপুরুষের শৃগালপুচ্ছবৎ লম্বমান গুম্ফযুগ দুই হাতে ধরিয়া সজোরে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। সাহেব 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' ডাকিতে লাগিল। তখন যুবকটী বলিল 'never mind, this is a practical joke.' তখন সাহেব ক্ষমা চাহিয়া নিষ্কৃতি পাইল এবং হাঁগুশেক করিয়া যুবকসমূহে বন্ধু বলিয়া সম্ভাষণ করিল। পরে অনেক বার যুবকের সহিত অত্যাবশ্যক সাক্ষাৎ হইয়াছিল,—যখনই সাক্ষাৎ হইত তখনই সৈনিকপুরুষ বলিতেন 'Good morning, Mr. Hercules.'

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী।

রত্নাবলী।

সংস্কৃত সাহিত্যে রত্নাবলী নাটিকা সুবিদিত। ইহার রচয়িতা ও প্রণয়নকালসম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে ঘোর মতভেদ দৃষ্ট হয়। পণ্ডিতের মতে ইহা খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর প্রারম্ভে কাশ্মীরের রাজা শ্রীহর্ষ কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। কেহ বলেন খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে কান্যকুব্জরাজ হর্ষবর্দ্ধন রত্নাবলী প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কাহারও মতে নৈষধচরিত প্রণেতা শ্রীহর্ষই রত্নাবলীর রচয়িতা। কেহ বলেন রত্নাবলী বাণভট্টের লেখনীপ্রসূত। প্রাচীন কিংবদন্তী অনুসারে জানা যায় ধাবক কবি রত্নাবলী রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল মতের মধ্যে কোন্‌টী ঠিক তাহা নির্ণয় করা নিতান্ত দুরূহ। সংপ্রতি রত্নাবলী নাটিকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষার অন্যতম দিকে উ পুস্তক* নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় ইহার আলোচনা সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত করিয়াছে। আমার মতে এই গ্রন্থের রচনাকাল নির্দ্ধারণ করিবার বলিষ্ঠকার প্রধান উপায় এই—কোন্ কোন্ গ্রন্থে রত্নাবলীর ঘটনা বা অন্য হাংশে ঘটনা বর্ণিত আছে? উক্ত ঘটনা সমূহের আপেক্ষিক প্রাচীনত্ব বলিয়া স্থির করিতে পারিলেই রত্নাবলীর বয়ঃক্রম নিঃসন্দেহে নির্দ্ধারণ করা যাইবে। এই উদ্দেশ্যে আমি নিম্নে দিব্যাবদানে, কথাসরিৎসাগর, কর্পূরমঞ্জরী প্রভৃতি গ্রন্থের মূল ঘটনা বিবৃত করিলাম। রত্নাবলী নাটিকার ঘটনাও অনেকের জানা নাই। এই হেতু সর্ব্বাগ্রে তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রদান করিলাম। পরিশেষে, রত্নাবলীর রচনাকাল সম্বন্ধে যে সকল সাক্ষাৎ প্রমাণ আছে তাহা বিবৃত করিব।

---

* সংপ্রতি আমি বি,এ, পরীক্ষার্থী ছাত্রবৃন্দের নিমিত্ত "Notes on Ratnavali" নামে এক পুস্তক বাহির করিয়াছি। ইহাতে রত্নাবলীসংক্রান্ত সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। ইংরেজী অনুবাদ, বঙ্গানুবাদ ইত্যাদিও আছে।

রত্নাবলী নাটিকার ঘটনা।

কৌশাম্বীর রাজা উদয়ন-বৎসরাজের সহ সিংহলের রাজকন্যা রত্নাবলীর বিবাহ, রত্নাবলী নাটিকার অভিনেতব্য বিষয়। কোন সিদ্ধ-পুরুষ বলিয়াছিলেন, "যিনি রত্নাবলীর পাণিগ্রহণ করিবেন তিনি সার্ব্বভৌম রাজা হইবেন।". এই সিদ্ধবচনে বিশ্বাস করিয়া উদয়নের প্রধান অমাত্য যৌগন্ধরায়ণ স্বীয় প্রভুর সহ রত্নাবলীর বিবাহ সংঘটনে কৃতসঙ্কল্প হন। ইতিপূর্ব্বে উজ্জয়িনীর রাজা চণ্ড-মহাসেনের কন্যা বাসবদত্তার সহ উদয়নের আর এক বিবাহ হইয়াছিল। পাছে বাসব-দত্তার মনোবেদনা উপস্থিত হয় এই আশঙ্কায় সিংহলেশ্বর উদয়নকে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিতে সম্মত হইলেন না। তদনন্তর, "দেবী বাসবদত্তা অগ্নিদাহে দগ্ধ হইয়াছেন," এই প্রবাদ প্রচারিত করিয়া যৌগন্ধরায়ণ সিংহলে এক দূত প্রেরণ করেন। তখন সিংহলেশ্বর উদয়নকে কন্যা সম্প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। তিনি স্বীয় অমাত্য বসুভূতির সহ রত্নাবলীকে কৌশাম্বীতে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু সমুদ্রে যান ভগ্ন হওয়ায় রত্নাবলী প্রভৃতি জলমগ্ন হন। দৈবযোগে রত্নাবলী ও বসুভূতির প্রাণরক্ষা হয়। সাগর হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া রত্নাবলী এই সময়ে সাগরিকা নামে পরিচিতা হন। সাগরিকা কৌশাম্বীতে উপস্থিত হইলে যৌগন্ধরায়ণ তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার বাসবদত্তার হস্তে অর্পণ করেন। যখন সাগরিকা অন্তঃপুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন তখন তাঁহার সহ উদয়নের গুপ্ত প্রণয় জন্মে। এক দিন মদন-চতুর্দ্দশীতে সাগরিকা বাসবদত্তার বেশ পরিধান করিয়া উদ্যানস্থিত কদলীগৃহে উদয়নের সহ কথোপকথন করিতেছেন এমন সময়ে বাসবদত্তা স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হন। উদয়ন বাসদত্তার চরণে নিপতিত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করেন, কিন্তু বাসবদত্তা সাগরিকাকে নিগড়ে বদ্ধ করিয়া অন্তঃপুরে রাখিয়া দেন। এই সময়ে বাসবদত্তা

বা উদয়ন কেহই সাগরিকার বংশবৃত্তান্ত জানিতেন না। এক দিন উজ্জয়িনী হইতে সম্বরসিদ্ধি নামক ঐন্দ্রজালিক কৌশাম্বীতে আগমন করে। রাজা উদয়ন ও রাজ্ঞী বাসবদত্তা উভয়ে তাঁহার প্রদর্শিত বহুবিধ ইন্দ্রজাল দেখিতেছেন, এমন সময়ে, সিংহলরাজের অমাত্য বসুভূতি সেই স্থানে উপস্থিত হন। উদয়ন ঐন্দ্রজালিককে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিয়া বসুভূতির সহ কথালাপ আরম্ভ করেন। এই সময়ে উক্ত ঐন্দ্রজালিকের কৌশলে কৌশাম্বী নগরীতে অগ্নি জ্বলিয়া উঠে। রাজা উদয়ন অগ্নি নির্ব্বাণ করিবার জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন। সেখানে তাঁহার সহ সাগরিকার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। ঐন্দ্রজালিক স্বীয় কৌশল প্রতিনিবৃত্ত করিয়া লইলে শীঘ্রই অগ্নি নিবিয়া গেল। সিংহলরাজের অমাত্য বসুভূতি রত্নমালাসাদৃশ্যে সাগরিকাকে রত্নাবলী বলিয়া চিনিতে পারিলেন। বাসবদত্তাও তাঁহাকে সিংহলরাজের কন্যা বলিয়া জানিতে পারিয়া, তাঁহার বন্ধন উন্মোচন করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে ও বাসবদত্তার অনুজ্ঞায় এবং যৌগন্ধরায়ণের উদ্যোগে উদয়নের সহ রত্নাবলীর বিবাহ হইল।

দিব্যাবদানে উল্লিখিত গল্প।

দিব্যাবদান গ্রন্থে উল্লিখিত গল্প নিম্নে লিখিত হইল। দিব্যাবদান গ্রন্থ অতি প্রাচীন। খৃষ্টীয় ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শতাব্দীতে ইহার ৩০শ অধ্যায় চারিবার চীন ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে উদয়ন-বৎসরাজের সম্বন্ধে যে গল্প লিপিবদ্ধ আছে, তাহাই বোধ হয় সর্ব্ব প্রাচীন। দিব্যাবদানের গল্প এইরূপ—এক সময়ে ভগবান্ বুদ্ধ কুরু জনপদের কল্মাষদম্য নগরে বিহার করিতেছিলেন। ঐ নগরে মাকন্দিক নামে এক পরিব্রাজক বাস করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম শাকলি। তাঁহাদের অনুপমা নামে এক পরম রমণীয়

কন্যা জন্মে। উক্ত কন্যা ক্রমে ক্রমে উন্নীত ও বর্দ্ধিত হইল। মাকন্দিক ভাবিলেন "আমার কন্যা অভিরূপা, দর্শনীয়া, প্রাসাদিকা ও সর্ব্বাঙ্গপ্রত্যঙ্গোপেতা; ইহার অস্থিসকল সূক্ষ্ম ও সুসূক্ষ্ম; সৌন্দর্য্যে ইহার সহ কাহারও উপমা হয় না। আমি বরের কুল, ধন বা বিদ্যা দেখিয়া কন্যা সম্প্রদান করিব না; যে যুবক রূপে ইহার তুল্য বা অধিক হইবে তাহাকেই কন্যা অর্পণ করিব।"

এই সময়ে বুদ্ধদেব কল্মাষদম্য নগরে বিহার করিতেছিলেন। তাঁহার প্রাসাদিক, প্রদর্শনীয়, ও সর্ব্বজনমনোহারী রূপ দেখিয়া মাকন্দিক তাঁহার সহ স্বায় কন্যার বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিলেন। তিনি গৃহে আসিয়া পত্নীকে বলিলেন, "ভদ্রে, সুযোগ্য জামাতা পাইয়াছি, অনুপমাকে অলঙ্কারে ভূষিত কর।" মাকন্দিক কন্যাকে অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া বুদ্ধের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ভগবন্, আমার কন্যার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন। রূপবতী, অলঙ্কৃতা, কামার্থিনী ও প্রফুল্লবদনা এই কন্যা আপনাকে অর্পণ করিতেছি। আকাশে চন্দ্র যেমন রোহিণীর সহ বিচরণ করেন, আপনিও সেইরূপ এই কন্যার সহ বাস করুন।" ভগবান্ বুদ্ধ সংসারবন্ধন একেবারে ছিন্ন করিয়াছেন, তিনি পার্থিব সুখে নিমগ্ন হইবার নহেন। তিনি ভাবিলেন যদি আমি অনুপমাকে সবিনয়ে বলি, আমি সংসারত্যাগী লোক, আমার কামসুখে অনুরাগ নাই, আপনি আমার নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হউন; তাহা হইলে হয়ত: অনুপমা আমার প্রতি আরও অনুরাগিণী হইবেন এবং পরিশেষে ব্যর্থ অনুরাগ বশতঃ খিন্নকলেবরে প্রাণত্যাগ করিবেন। অতএব আমি কর্কশ বাক্যে মাকন্দিক ও অনুপমাকে এই স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে বলি। এইরূপ স্থির করিয়া ভগবান্ বলিলেন—"হে বিপ্র, আমি অনেক কন্দর্পদুহিতা দেখিয়াছি। তাহাতে আমার রতি বা তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় নাই। রূপরসাদি বিষয়ে আমার

কোন প্রকার আসক্তি নাই। অতএব আপনার এই মূত্রপুরীষপূর্ণ কন্যার সহ আমি কথা বলিতেও ইচ্ছা করি না।" মাকন্দিক ভগবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন—"আমার এই কন্যা কিংহীনাঙ্গিনী, না রূপগুণবিহীনা? কামভোগী লোক যেমন বিবিক্তভাবে মনোনিবেশ করে না, সেইরূপ আপনিও এই চারুরূপা কন্যায় অভিলাষ করিতেছেন না। ইহার কারণ কি?" ভগবান্ উত্তর করিলেন—"হে বিপ্র, যাহারা বিষয়াসক্ত সেই মূঢ় লোক সকল আপনার এই কন্যার জন্য প্রার্থী হইতে পারে। আমি বুদ্ধ, মুনিসত্তম ও কৃতী। আমি সর্ব্বোত্তম ও মঙ্গলময় বুদ্ধত্বলাভ করিয়াছি। পদ্ম যেমন জলবিন্দু দ্বারা লিপ্ত হয় না, সেইরূপ আমিও অলিপ্তভাবে এই সংসারে বিচরণ করিতেছি।" অনুপমা, ভগবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষণ্ণা হইলেন। বুদ্ধদেব যখন অনুপমাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছিলেন তখন তাঁহার কোন শিষ্য (একটী বৃদ্ধ ভিক্ষু) মাকন্দিকের নিকট আসিয়া বলিল, "মহাশয়, আমার সহ আপনার কন্যার বিবাহ দেন।" মাকন্দিক বিরক্ত হইয়া বলিলেন "হে বৃদ্ধ ভিক্ষু, আমি তোমাকে আমার কন্যার দিকে তাকাইতেও দিব না, বিবাহ ত দূরের কথা।" এই কথা শুনিয়া সেই ভিক্ষুর মনে এমন ধিক্কার জন্মিল যে, সে তৎক্ষণাৎ উষ্ণ শোণিত বমন করিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

সেই সময়ে সেখানে যে সকল বৌদ্ধ শিষ্য বসিয়াছিলেন তাঁহারা বিস্ময়াপন্ন হইয়া সকল সংশয়ের উচ্ছেদক ভগবান্ বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্, এই ভিক্ষু অনুপমার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিল, ইহার কারণ কি?" ভগবান্ উত্তর করিলেন, "পূর্ব্বজন্মেও এ ব্যক্তি অনুপমার রূপে আকৃষ্ট হইয়া—দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিল।" ইহার পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত শ্রবণ কর—

পূর্ব্বকালে মহাসমৃদ্ধ সিংহকল্পা নগরীতে সিংহকেশরী নামে এক

ধার্ম্মিক রাজা রাজত্ব করিতেন। সেই নগরীতে সিংহক নামে এক মহা আঢ্য সার্থবাহ বাস করিত। সিংহকের সিংহল নামে এক পুত্র জন্মে। সিংহল বাণিজ্য করিবার আশয়ে সমুদ্রযাত্রা করিবার অভিলাষ করেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলেন, "বৎস, আমার প্রভূত ধন আছে, যদি তুমি তিল-তণ্ডুল-কুলত্থ ইত্যাদি ভোগ্য বস্তু ক্রয় করিয়া আমার রত্নরাশি অজস্র ব্যয় করিতে থাক, তবুও উহা কখনও ক্ষয় পাইবে না। অতএব যতদিন আমি বাঁচিয়া থাকি, ক্রীড়া কর, কৌতুক কর, ইতস্ততঃ বিচরণ কর, আমার মৃত্যুর পর ধন উপার্জ্জন করিতে চাও, করিও।" সিংহল পিতার কথা না শুনিয়া পাঁচ শত বণিক্ পুত্র সহ সমুদ্রযাত্রা করিলেন। তাঁহারা অনেক রাষ্ট্র, নগর, গ্রাম ইত্যাদি পরিভ্রমণ করিয়া লঙ্কাদ্বীপের সমীপে সমুদ্রতীরে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিলেন। লঙ্কার রাক্ষসী সমূহ নানা উপায়ে উক্ত বণিক্ পুত্রগণকে বশীভূত করিয়া উহাঁদিগকে বিবাহ করিল। তাঁহারা অচিরাৎ রাক্ষসীসমূহ দ্বারা ভক্ষিত হইলেন। কেবল সিংহল রাক্ষসীমায়ায় বশীভূত হন নাই। তিনি একাকী নির্ব্বিঘ্নে ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। যে রাক্ষসী এতকাল সিংহলকে বিমূঢ় করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাকে সম্বোধন করিয়া অন্য রাক্ষসীগণ বলিল—"ভগিনি, আমরা সকলেই নিজ নিজ স্বামী ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছি, তুমিই কেবল তোমার স্বামীকে নির্ব্বাহিত করিতে পার নাই।" এই কথা শুনিয়া সেই রাক্ষসী পরম ভীষণরূপ ধারণ করিয়া সিংহল সার্থবাহের সমক্ষে উপস্থিত হইল, কিন্তু তাঁহার নিষ্কোশ অসি দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। তদনন্তর সে মনোরম রূপ ধারণ করিয়া সিংহকেশরী রাজার নিকট গমন করিল। রাজা তাহার রূপযৌবন দর্শন করতঃ বিমুগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? এখানে আগমনের প্রয়োজন কি?" রাক্ষসী উক্ত রাজার

পাদদেশে নিপতিত হইয়া নিবেদন করিল—“আমি [illegible] দুহিতা, আমার পিতা আমার বিবাহের নিমিত্ত আমাকে সিংহল নামক বণিকের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন; উক্ত বণিকের যানপাত্র মহা-সমুদ্রে মগ্ন হওয়ায় তিনি আমার প্রতি কুপিত হইয়া আমাকে দুর্ভাগিনা [illegible] করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন; আমি অনেক কষ্টে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। রাজা [illegible]র রূপে বিমোহিত হইয়া উহাকে বিবাহ করিলেন। সে অনতিবিলম্বে পরম ভৈরব রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। বুদ্ধদেব তখন শিষ্যমণ্ডলীকে বলিলেন,—“আপনারা যে সিংহল বণিকের কথা শুনিলেন, আমি স্বয়ংই পূর্ব্বকালে উক্ত বণিক্‌রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম; যে বৃদ্ধ ভিক্ষু অনুপমার রূপে বিমূঢ় হইয়া প্রাণত্যাগ করিল, সে পূর্ব্বকালে রাজা সিংহকেশরী নামে পরিচিত ছিল। যে, রাক্ষসীর মায়ায় সিংহ কেশরীর প্রাণাত্যয় ঘটিয়াছে, সেই রাক্ষসীই সংপ্রতি অনুপমারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।”

পরিব্রাজক মাকন্দিক তখন অনুপমাকে লইয়া কোশাম্বী নগরীতে গমন করেন। কোশাম্বীর রাজা উদয়ন-বৎসরাজ অনুপমার রূপ-লাবণ্য দর্শন করিয়া আক্ষিপ্ত হৃদয়ে উক্ত পরিব্রাজককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই কন্যাটী কাহার?” মাকন্দিক উত্তর করিলেন, “মহারাজ, এটী আমার দুহিতা, অপর কাহারও নহে।” রাজা বলিলেন “আমাকে সম্প্রদান করুন।” মাকন্দিক উত্তর করিলেন “বেশ”। অনুপমার সহ উদয়নের বিবাহ হইল। ইতিপূর্ব্বে উদয়ন যে সকল দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্যামাবতী শ্রেষ্ঠা। এক্ষণে উক্ত শ্যামাবতী ও অনুপমা এতদুভয়ই উদয়নের অগ্রমহিষী হইলেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার যৌগন্ধরায়ণ ও ঘোষিল নামে দুই প্রধান অমাত্য ছিল। এক্ষণে মাকন্দিক তৃতীয় প্রধান অমাত্য নিযুক্ত

শ্যামাবতী বলিলেন, "বুদ্ধদেবের নমস্কার।" অনুপমা বলিলেন "মহারাজ উদয়নের নমস্কার।" তদনন্তর অনুপমা উদয়নের নিকট বলিলেন "মহারাজ, শ্যামাবতী আপনার অন্নে প্রতিপালিত, কিন্তু বুদ্ধের নমস্কার করে।" তখন উদয়ন বলিলেন, "অনুপমে, তুমি ওরূপ ভাবিওনা, শ্যামাবতী উপাসিকা, এইহেতু বুদ্ধদেবকে নমস্কার করে।" এইরূপ নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় শ্যামাবতীর প্রতি অনুপমার ঘোর ঈর্ষ্যা প্রকাশ পাইয়াছিল।

তাহার পর এক সময়ে স্ত্রী, পুত্র, অমাত্যাদি রাজধানীতে রাখিয়া উদয়ন বহির্জনপদে গমন করেন। এই সময়ে শ্যামাবতীকে বধ করিবার জন্য অনুপমা মাকন্দিককে অনুরোধ করেন। মাকন্দিক নানা বিতর্কের পর ভীত হইয়া অগত্যা কন্যার ইচ্ছাপূর্ণ করিতে প্রয়াস করিলেন। মাকন্দিক শ্যামাবতীর নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কোন দ্রব্যের অভাব আছে কি?" শ্যামাবতী উত্তর করিলেন—"আমার ছাত্রীগণ রাত্রিতে বুদ্ধবচন পাঠ করে, তজ্জন্য ভূর্জ, তৈল, তুলা, মসি, কলম ইত্যাদি কয়েকটী দ্রব্যের প্রয়োজন।" মাকন্দিক বলিলেন "বেশ, আমি সমস্তই আনিয়া দিতেছি।" শীঘ্রই শ্যামাবতীর গৃহে প্রচুর পরিমাণে তুলা, ভূর্জ, ও তৈল আনীত হইল। রাত্রিতে মাকন্দিক সেই গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিলেন। উদয়নের শ্যামাবতী প্রভৃতি পাঁচ শত স্ত্রী তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া গেল। মৃত্যুকালে শ্যামাবতী বলিলেন "অন্তরীক্ষে, সমুদ্রমধ্যে বা পর্ব্বত-বিবরে এমন কোন স্থান নাই যেখানে কর্ম্ম লোককে অভিভূত না করে।" অনন্তর ভগবান্ বুদ্ধ শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে সেখানে আসিয়া বলিলেন, "এই সেই পাঁচশত স্ত্রী-কলেবর; উদয়ন-বৎসরাজ

এত দিন এই পাঁচশত দেহে রক্ত সক্ত গৃধ্র গ্রথিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। একণে কেহ এই সকল দেহকে পাদ দ্বারাও স্পর্শ করে না। অতএব হে শিষ্যগণ, দগ্ধকাষ্ঠ ও বিজ্ঞানময় শরীর উভয়কেই সমজ্ঞান করিবে। ইহার কিছুতেই অনুরক্ত বা বিরক্ত হইবে না।

অনন্তর কৌশাম্বীর জনগণ বলিতে লাগিল "মহারাজ উদয়নের গৃহ দগ্ধ হইয়াছে, স্ত্রীপুত্রাদি বিনষ্ট হইয়াছে; এই মহাবিপদ্-সংবাদ তাঁহাকে কে বলিবে?" তখন একজন বৃদ্ধ রাজভৃত্য সমস্ত বৃত্তান্ত পত্রে লিখিল এবং উদয়নের নিকট লোক পাঠাইয়া বলিল "মহারাজ আমি অমুক দেশের রাজা; আমার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে; আমি যমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব; আমাকে সাহায্য করুন।" তখন উদয়ন তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন "তুমি মূর্খ, যমের সহ কি কেহ যুদ্ধ করিতে পারে?" তখন সেই লোক বলিল "আমি রাজাও নহি, রাজপুত্রও নহি, অপ্রিয় সংবাদ আপনাকে বলিবার জন্য আমি এইরূপ ভাব ধারণ করিয়াছি। যম যদি অজেয় হয়, তাহা হইলে এই পত্রখানি পাঠ করুন। উদয়ন পত্র পাঠ করিয়া দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইলেন। রাজা কৌশাম্বীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া যৌগন্ধরায়ণকে বলিলেন "মাকন্দিক ও অনুপমাকে যন্ত্রগৃহে আবদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেল।" যৌগন্ধরায়ণ উহাদিগকে যন্ত্রগৃহে বদ্ধ না করিয়া, অপর একটা ভূমিগৃহে রাখিয়া দিলেন, সাতদিন পরে উদয়নের শোক দূর হইল। তিনি বিগতশোক হইয়া বলিলেন "অনুপমা কোথায়? যৌগন্ধরায়ণ অনুপমাকে বধ করিয়াছে, আমি যৌগন্ধরায়ণকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিতেছি।" যৌগন্ধরায়ণ বলিলেন "মহারাজ, পাছে আপনি অনুপমাকে পুনরায় দেখিতে চান, এইজন্য আমি উহাঁকে বধ না করিয়া ভূমি-গৃহে রাখিয়া দিয়াছি। দেখি, উনি জীবিত আছেন কি না?

তখন যৌগন্ধরায়ণ অনুপমাকে ভূমিগৃহ হইতে বাহিরে আনিলেন। অনুপমা পূর্ব্বের ন্যায় অম্লানশরীরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। উদয়ন সংসারের কুটিলতা দেখিয়া অনুপমার সহ বুদ্ধদেবের ধর্ম্মের আশ্রয় লইলেন।”

[ক্রমশঃ]

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

মাতৃহীনের প্রার্থনা।

মোরা মাতৃহীন!
তাই এই জগতের পথপাশে পড়ে আছি এত দীনহীন!
বহুদিন পাই নাই জননীর অঞ্চল-বাতাস,
বহুদিন স্তন্যরসে মিটে নাই হৃদয় পিয়াষ,—
ক্ষুধায় ক্ষিপ্তের মত তাই নিজ রক্ত মাংস করিতেছি গ্রাস
একি সর্ব্বনাশ!

মোরা মাতৃহীন!
ভিক্ষা ঝুলি নিয়ে সবে বাহিরিছি রাজপথে, নহে বহুদিন,
ওগো সবে বিশ্বজন, চেয়ে দেখ মোদের শরীরে,
ঢাকা শত বিদেশের শ্বেতপীত বহুজীর্ণ চীরে,
এখনো রয়েছে চিহ্ন হেথা হোথা, যাহে মনে পড়ে জননীরে
এ অন্ধ তিমিরে!

মোরা মাতৃহীন !
সবে মিলি' সাজিয়াছি বিচিত্র নির্লজ্জ মাঝে ভিখারী নবীন ;
ছিল সাধ রাজদ্বারে নানা ছন্দে মুষ্টি ভিক্ষা করি' ,
শতছলে মেগে' ল'ব বহুরত্ন, প্রাসাদ, নগরী ;
সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেছে, দ্বার রুধি' রহিয়াছে রাজার প্রহরী
দিবা বিভাবরী !

মোরা মাতৃহীন !
হাসে তাই বিশ্ববাসী মোদেরে দেখিয়া এত বিরূপ, মলিন ;
উপেক্ষা করেছি কত জননীরে মত্ত দেহ বলে ;—
সেই পাপে—শতরূপে লুটাইয়া সর্ব্বপদতলে
মরিতেছি দ্বারে দ্বারে অনশনে অপমানে প্রতি পলে পলে
তপ্ত অশ্রুজলে !

আমরা কুলীন—
এই গর্ব্বে, স্ফীতবক্ষে ভুলেছিনু মাতৃসেবা পবিত্র প্রাচীন ;
জননী মরিয়া গেছে ; ঘনায়েছে অন্ধকার রাতি,
একে একে নিবে' গেছে কক্ষে কক্ষে তৈলহীন বাতি ;
মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছি নহি শুধু মাতৃহীন—মোরা মাতৃঘাতী
অভিনব জাতি ।

"মা তুমি কোথায় ?"
দূর দিগ্বলয় যুড়ি' আসিয়াছে অনলরাশি গ্রাসিতে ধরায় ;
ধক্ ধক্ বহ্নিশিখা চারিভিতে মেলিছে রসনা,
ভয়াতুর মোরা সবে করিতেছি প্রলয় রচনা,—
ঘুরিতেছি দিগ্বিদিক্ প্রতিপদে আপনারে ডুবায়ে আপনা
হারায়ে চেতনা !

হে সৌম্যা জননি!

তব পুত্র-পৌত্রগণ পরস্পর না চিনিয়া ডুবায় ধরণী;
সবল শুষিছে রক্ত শতবাহু পুরুভুজ সম,
দুর্ব্বলেরে পাকে পাকে শতবন্ধে করিয়া বেষ্টন;
এরুদ্র পিপাসা মাগো! নিবাও নিবাও দেবি! নয় এ ভূতল
যায় রসাতল!

করগো আহ্বান
আদিম জননী কণ্ঠে, সরল স্নেহের বলে সকল সন্তান;
জননীর সার্ব্বভৌম পরিপূর্ণ হৃদয়ের বলে
সকলে ডাকিয়া আন জগতের এক সমতলে
উঠুক সকল কণ্ঠে 'জননি! জননি!' ধ্বনি, একাকাশতলে
জাগুক্ সকলে।

"কোথায় জননী?"
আর্ত্তকণ্ঠে এদুর্দ্দিনে ডাকিতেছি তোমা মাগো, দিবস রজনী;
মোদেরে রাখিয়াছিলে জগতের রত্নবেদীবুকে,
বহুরত্ন মুকুতায় সাজাইয়া দেবশিশুরূপে
সে উচ্চ আসন হ'তে ভিন্ন হয়ে', ভ্রষ্ট হয়ে' কোটি অন্ধকূপে
(আজ) মরি চুপে চুপে!

"কোথায় জননী?"
মোদের এ আর্ত্তনাদে এস ওগো, বাহিরিয়ে ভারত রমণী!
তোমাদের কাছে চাহি জননীর অঞ্চল অভয়;
অবিরাম ক্ষীর ধারে পুষ্ট কর বিশুষ্ক হৃদয়;
ধাত্রীরূপে, মাতৃরূপে, দুহিতা-ভগিনীরূপে আন বরাভয়
পূরিয়া হৃদয়।

তোমরা জননী!

অগ্নিপিণ্ডসম তপ্ত অমূল্য হৃদয় বলে শিশুর ধমনী
যেমনি পূরিয়া দিতে মহাব্রত মাতৃসেবা রসে,
শিশুরা যেমন করি মত্ত হ'ত সংগ্রাম রভসে,
ঢালগো আবার দেবি! সেই তেজ আমাদের হৃদয় কলসে
উন্মত্ত হরষে!

দাওগো অভয়;
তোমরা জননী জাতি; তোমাদের সুধাভরা জননী হৃদয়;
যুগান্তের অনাহারে কদাহারে কদর্য্য শয়নে,
পশিয়াছে ধহুবিষ, বহুরোগ সর্ব্বদেহ মনে;
প্রাণপণ শুশ্রূষায় মোদের মানুষ কর জীবনে মরণে
রণে, গৃহাঙ্গনে!

মা তোরা সবার
শত শত জীর্ণতরী; এখনো লঙ্ঘিতে হবে বহু পারাবার
মাগো তোরা কত আর র'বি পড়ে অলস শয়নে
স্বর্ণ প্রতিমার মত প্রাণহীন ক্ষুদ্র গৃহকোণে,
ফে'লে দিয়ে' আপনার মেধাবী, সবল, সুস্থ কোটি পুত্রগণে
বিলাসে ব্যসনে।

তোমরা জননী!
উদার ললাটতলে নির্ম্মল সিন্দুর রাগে সাজিয়া যেমনি
মৃত্যুরে করিয়া দিতে নিরঞ্জন, সহজ, সুন্দর;
তেমনি শিখাও দেবি, আত্ম'পরে করিয়া নির্ভর
যেন মোরা অকাতরে দুর্ল্লভ মরণতীর্থে হ'য়ে অগ্রসর
হইগো অমর।

ভারত রমণি!

এ ঘোর দুর্দ্দিনে ওগো, তোমরা ভরসা শুধু, আশার তরণী;

মাগো আর দিন নাহি, দেখ চাহি খুলিয়া নয়ন;

এ নব গোধূলি লগ্নে দীক্ষা দাও মন্ত্রে সঞ্জীবন;

পারি যেন প্রাণপণে কমনীয় মরণেরে করিতে বরণ—

সর্ব্ব সমর্পণ;

তোমরা জননীরূপে ধন্যা হও; পায় যেন তব পুত্রগণ

মরণে জীবন।

শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত।

নারায়ণী।

অবতরণিকা।

(১)

ছোটনাগপুরের ভিতরে জনার জঙ্গল প্রসিদ্ধ। কলিকাতা হইতে পুরুলিয়ার পথ দিয়া রাঁচি যাইতে হইলে, এই জনার জঙ্গলের পার্শ্ব ভেদ করিয়া যাইতে হয়। আগে পথে বড়ই বাঘের উপদ্রব ছিল, এখন এ রকম নাই বলিলেই হয়,—মাঝে মাঝে দুই একটা উপদ্রবের কথা শুনা যায় এইমাত্র। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ একটা উপদ্রব ঘটিয়াছিল। একটা নরখাদক ব্যাঘ্রের দৌরাত্ম্যে দিন কয়েক পথিকের এই পথে চলা ভার হইয়াছিল।

রাঁচির একজন হাকিম সাহেব, সেই ব্যাঘ্র শীকারে কৃতসঙ্কল্প হন। তিনি কতকগুলি কোল অনুচর, ও গোটাকয়েক কুকুর লইয়া জনার

জঙ্গলে প্রবেশ করেন। জঙ্গলের ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া সুবর্ণরেখার তীরস্থ একটা স্থানে উপস্থিত হইলে, সহসা সাহেবের কুকুরগুলা চীৎকার করিয়া উঠিল। ব্যাঘ্রের সন্নিধান অনুমান করিয়া সাহেব ভৃত্যগুলাকে কারণনির্দ্ধারণে আদেশ করিলেন। অনুসন্ধান করিতে যাইয়া সোমরা কোল বিকট চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। লছুয়া বিকৃত মস্তিষ্কের ভাব দেখাইল, আর কুরুয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য বোবা হইয়া গেল। সাহেব হস্তিপৃষ্ঠে ছিলেন,—হস্তীও সহসা গমনে বিরত হইল। মাহুতের প্রহার অগ্রাহ্য করিয়া এক স্থানে দাঁড়াইয়া শুণ্ড তুলিয়া প্রহারজনিত কাতরতা দেখাইতে লাগিল।

হইল কি! বাঘই যদি বাহির হইয়া থাকে ত সে বাঘ কোথায়? সম্মুখে সুবর্ণরেখার জল তর তর করিয়া বহিয়া যাইতেছে—বাঘ কই? পার্শ্বে যতদূর দেখা যায়, দেখা গেল কেবল, বিরল-সন্নিবিষ্ট সুবর্ণরেখা-তীর-শোভী শালতরু। অদূরে বাঘের অস্তিত্ব বুঝা গেল না।

সাহেব শুধু বিস্মিত হইলেন না, কিছু বিপন্নও হইলেন। কুকুর-গুলা সমভাবে চীৎকার করিতেছিল। মাতঙ্গেরও শুণ্ডচালনের বিরাম ছিল না। সোমরা তখনও উঠে নাই, সেই ভাবেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। কুরুয়ার তখনও পর্য্যন্ত বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় নাই লছুয়ারও প্রকৃতি-পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা যাইতেছিল না। কারণ-নির্দ্ধারণের জন্য সাহেব বন্দুকের আওয়াজ করিলেন। বন্দুকের শব্দে সোমরার সংজ্ঞা ফিরিল।

সাহেব সোমরাকে মূর্চ্ছিত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তর না করিয়া সে কেবল অঙ্গুলি নির্দ্দেশে সাহেবকে একটা প্রকাণ্ড শালগাছ দেখাইল। সাহেব দেখিলেন বৃক্ষচূড়ে পরস্পরাবলম্বী শাখার বেষ্টনে ঘন পত্রাবরণে কতকগুলি নরকঙ্কাল অবস্থিত রহিয়াছে।

সাহেব কারণনির্দ্ধারণে সমর্থ হইয়া তদ্দণ্ডেই প্রফুল্লতার কিঞ্চিৎ ভাব দেখাইলেন,—অর্থাৎ এক বিকট হাস্যে এবং সেই হাস্যরবের বিকটতর প্রতিধ্বনিতে সহসা সেই বনভূমি বিকম্পিত করিয়া তুলিলেন। কুক্কুরগুলা মুহূর্ত্তমধ্যে নীরব, মাতঙ্গ-শুণ্ড ভূমিসংলগ্ন। হতভাগ্য কোলগুলার পৃষ্ঠদেশ প্রভুর এ অত্যুৎকট আনন্দের অংশভোগে বিরত হইল না! সাহেব হস্তী হইতে অবতরণ করিয়া তাহাদের বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিলেন। প্রহার মদিরামত্ত হইয়া সকলে বৃক্ষারোহণ করিল।

কিন্তু বহু চেষ্টাতেও তাহারা কঙ্কাল কয়টী স্থানচ্যুত করিতে পারিল না।

অগত্যা সাহেব নিজে বৃক্ষারোহণ করিলেন। কঙ্কালগুলিকে বৃক্ষচ্যুত করিবার চেষ্টা করিলেন। চেষ্টা নিষ্ফল হইল। সাহেবের বোধ হইল যেন তস্করকর্ত্তৃক অপহৃত হইবার ভয়ে বৃক্ষ হৃদয়মণি-গুলিকে বাহুবল্লী দ্বারা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

শাখাচ্ছেদনোপযোগী অস্ত্র তিনি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা কতকগুলি শাখা ছিন্ন করিলেন এবং কঙ্কালগুলিকে বৃক্ষ হইতে পৃথক করিয়া ভূমিতে আনিলেন।

চারিটী নরকঙ্কালের মধ্যে তিনটী পরস্পরকে এমনি ভাবে বেষ্টিত করিয়াছিল যে সাহেব শত চেষ্টায়ও সে গুলিকে পৃথক করিতে পারিলেন না। যে কঙ্কালটী পৃথক, তাহার কটিতটে এক গাছি সূক্ষ্ম স্বর্ণশৃঙ্খলসম্বদ্ধ একটী রূপার ডিপা ছিল। সাহেব দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইলেন। ডিপাটী খুলিলেন। তাহার ভিতর হইতে অহিফেনের গন্ধ অনুভূত হইল।

সাহেবের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি অপর কঙ্কাল গুলিতেও কিছু না কিছু মিলে কি না দেখিবার জন্য সন্ধান আরম্ভ

করিলেন। সন্ধানের ফলে তিনি একটী কঙ্কালের অঙ্গুলিতে একটী স্বর্ণ অঙ্গুরীয়, আর একটীর গলদেশে বহুমূল্য মণিময় হার দেখিতে পাইলেন। সেই অপূর্ব্ব কণ্ঠভূষণের মধ্যমণি তখনও পর্য্যন্ত সমুজ্জ্বল ছিল। অপরটীর অঙ্গে কিছুই ছিল না। তবে তাহার অঙ্গুলিদ্বয়ে সংলগ্ন এক টুকরা জীর্ণকাগজ তখনও পর্য্যন্ত ধারণের দৃঢ়তার পরিচয় দিতেছিল।

সাহেব ভাবিলেন একি অদ্ভুত আবিষ্কার। তাঁহার বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নের সমক্ষে আরব্য উপন্যাসের সমস্ত ছবিগুলা যেন যুগপৎ জাগিয়া উঠিল। যেখানের যে জিনিষটী তদবস্থায় রাখিয়া সাহেব কঙ্কাল-গুলিকে গৃহে আনিলেন।

(২)

এই কঙ্কালচতুষ্টয় রাঁচি নগরীকে একদণ্ডে কোলাহলময়ী করিয়া তুলিল। কমিসনর সাহেবের হাতী ইহাদের মধ্যে একটা কঙ্কালের আঘ্রাণ লইবামাত্র বিকট চীৎকার করিতে করিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। সকলে শুনিল। নানা জনে নানা কথা কহিতে লাগিল। কমিসনর সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া একটা ক্ষুদ্র কোল-রমণী পর্য্যন্ত কঙ্কাল সম্বন্ধে কিছু না কিছু গল্প করিয়াছিল। কেহ হাসিয়াছিল, কেহ অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিল, কেহ-বা কঙ্কালের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়াছিল। কাহারাও বা আপনাআপনির ভিতরে দু দশটা ভূতের গল্প তুলিয়া মনের আবেগ মিটাইয়াছিল।

রাঁচি এমন হইল কেন? কঙ্কালচতুষ্টয়ের কি এমন বৈদ্যুতিক শক্তি ছিল? এ কঙ্কাল কাহাদের?

প্রত্নতত্ত্ববিৎ কতকগুলি পণ্ডিত সেই সময়ে কোলজাতির আদি পুরুষ নির্দ্ধারণের জন্য ছোটনাগপুরে গিয়াছিলেন। তাঁহারা রামগড়ের পাহাড় হইতে একখানা প্রকাণ্ড পাথর কুড়াইয়া, সেই খানাই কোল-

জাতির আদিপুরুষের ভগ্নাবশেষ স্থির করিয়া তাহার উপর চকমকি ঠুকিতেছিলেন। দেখিতেছিলেন, তাহার ভিতরে জীবন-বহ্নির একটী মাত্রও স্ফুলিঙ্গ আছে কি না। সকলে হতাশ হইতে যাইতে ছিলেন, এমন সময়ে সেই কঙ্কালচতুষ্টয়ের গন্ধ তাঁহাদের নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। আনন্দোৎফুল্ল হইয়া তাঁহারা রাঁচি আগমন করিলেন।

প্রবলবেগে পরীক্ষা চলিল। কেহ কঙ্কালহৃদয়াভ্যন্তরে গোলোকের *গান শুনিতে পাইলেন। কেহ বা সূক্ষ্মদর্শনে দেখিলেন, অস্থির ভিতরে আণবিক কম্পন লম্বভাবে না হইয়া আড়ে হইতেছে। সুতরাং উহা* গান নয় আদি কোলের প্রতিভার আলোক। কোন মহাত্মা তুষার-সন্নিভ অস্থি-অঙ্গে মসীবর্ণের ছায়া দেখিতে পাইলেন।

তখন স্থির হইল, স্বতন্ত্রাবস্থিত কঙ্কালটীই কোলজাতির আদি পুরুষ, নইলে সোণার শিকলে বাঁধা রূপার ডিবা হইতে আফিমের গন্ধ বাহির হইবে কেন? কঙ্কাল গাছে উঠিল কেমন করিয়া? অমন হয়। নহিলে প্রত্নতত্ত্ব চলিবে কেন? ছোটনাগপুরের সোণার খনি কঙ্কালের গায়ে লাগিয়া রাসায়ণিক প্রক্রিয়ায় শিকল হইয়া দৈবযোগে শালবীজে জড়াইয়াছিল। শেষে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া গাছের সঙ্গে ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়াছে। সকলে সব দেখিল, কিন্তু মূর্খ যদি কেহ সেখানে থাকিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত যে হাড়ে দূর্ব্বা গজাইয়াছে। কিছু দিন পরে কলিকাতার এক বিশিষ্ট ইংরাজী সংবাদপত্রে একটী বিস্ময়কর সংবাদ প্রকাশিত হয়। আমরা নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ দিলাম।

"এতদিন পরে অনন্তপুরের বিদ্রোহী রাজা বীরচন্দ্র সাহীদেবের কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইল। জনার ভীষণ জঙ্গলে একটী প্রকাণ্ড শালবৃক্ষ-শাখায় এই কঙ্কালটী বিলম্বিত ছিল। রাঁচির জ—সাহেব শীকার করিতে যাইয়া কঙ্কালটাকে দেখিতে পান। হতভাগ্যের মুখে নিষ্ঠুরতার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। পাপিষ্ঠের করাঙ্গুলি-কঙ্কালের শোণিতচিহ্ন

এখনও সম্যক্ বিলুপ্ত হয় নাই। ত্রিংশৎ বৎসরের ধারাবর্ষণেও সে কলঙ্ক প্রক্ষালিত করিতে পারে নাই। বিকৃত বদনের বিকট দন্তবিকাশ অবলোকন করিয়া, সাহসী বীরপুরুষ হইলেও আবিষ্কারককে ভয় পাইতে হইয়াছিল। হতভাগ্য দিন কয়েক বড়ই উপদ্রব করিয়াছিল। দিন কয়েক ছোটনাগপুরস্থ ইংরাজ পুরুষ ও মহিলাগণের প্রাণে উদ্বেগ তুলিয়া স্বহস্তে প্রজ্বলিত অনলে আপনাকে আহুতি দিয়াছিল।

"এই সঙ্গে আরও তিনটী কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। বড়ই বিস্ময়ের কথা। কঙ্কালত্রয় পরস্পর বিজড়িত ছিল! দুইটী স্ত্রীলোকের বলিয়াই অনুমিত হয়! অপরটী পুরুষের। কিন্তু দেশীয়ের নয়। তাহার অঙ্গুলি-কঙ্কালে যে অঙ্গুরীয় ছিল, তাহাতে ইংরাজী অক্ষর আবিষ্কৃত হইয়াছে। একটী অক্ষর সি, বোধ হয় চার্লসের আদ্যক্ষর। অপরটী এরূপ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে যে, তাহা হইতে কোনও কিছু রহস্য উদ্ঘাটিত হইল না। কেহ কেহ অনুমান করেন, ইহা সেই নিরুদ্দিষ্ট চার্লস ব্রাউন। ব্রাউন বিলাতের প্রসিদ্ধ লর্ড—এর ভাগিনেয়। সিপাহীবিদ্রোহের ইতিহাস লিখিতে তথ্যসংগ্রহের জন্য তিনি ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার খুড়া অমুক ব্রাউন তখন ছোটনাগপুরের কমিশনর। ব্রাউন খুড়ার গৃহেই অতিথি ছিলেন। সহসা একদিন তিনি নিরুদ্দিষ্ট হন। আর তাঁহার সন্ধান মেলে নাই। বুঝি এতদিন পরে মিলিল। কিন্তু ব্রাউন রমণীদ্বয় বিজড়িত হইয়া কেমন করিয়া গাছে উঠিল? বড়ই বিস্ময়ের কথা।"

আর একখানি সংবাদপত্রে এইরূপ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল:—

"ধন্য প্রেম! ধন্য তোমার মহিমা! তুমি মানুষকে কতই না উচ্চ করিতে পার! তোমার কৃপায় মহাত্মা ব্রাউনের দেহ মাটী ছাড়িয়া ত্রিশ হাত উপরে উঠিয়াছিল। গাছের ডালে বাধা না পাইলে এতদিন ব্রাউন কত উপরে উঠিতেন, তাহা কে বলিতে পারে?" ইত্যাদি।

তৃতীয় আর একখানি পত্রিকায় এইরূপ লিখিত ছিল ঃ—

"রমণী তোমার প্রেমের কি এতই আকর্ষণ! যে ইহার জন্য একজন বীরপুরুষ কঙ্কালাবশিষ্ট হইয়াও ত্রিশ বৎসর ধরিয়া একটা গাছের ডালে ঝুলিতেছিল!...কিন্তু এ মহিলা কে? অবশ্য তিনি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া। কেন না তাঁহার কণ্ঠে মণিময় হার ছিল। রমণীর প্রেমের কি এতই উত্তাপ! এই অজ্ঞাতনাম্নী প্রেমময়ীর কঙ্কলাবশিষ্ট হৃদয়োত্তাপে সেই অপূর্ব্ব হার এবং তৎসংলগ্ন মহামূল্য মণি অঙ্গারে পরিণত হইয়া গিয়াছে। মিথ্যাবাদী হতভাগ্য কৃষ্ণাঙ্গগুলা বোধ হয় এ তত্ত্বে বিশ্বাস করিবে না। তাহারা হয়ত বলিবে, আবিষ্কারক হারগাছটী আত্মসাৎ করিয়াছে। ঈশ্বর এই মিথ্যাবাদীগুলাকে রক্ষা করুন।"

আমরা এই ঘটনাটীসম্বন্ধে যে একটী গল্প শুনিয়াছি, তাহাই আজ পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ছোটনাগপুরের অন্তর্গত অনন্তপুর একটী পার্ব্বত্য গ্রাম। এই গ্রামে বীরচন্দ্র সাহীদেব বলিয়া একজন বড় জমীদার ছিলেন। তাঁহার সম্পত্তির তিন লক্ষ টাকার আয় ছিল। বীরচন্দ্র সাহী পূর্ব্বে নাগপুরের মহারাষ্ট্রীয় রাজা ভোঁসলার একজন সামন্ত রাজা ছিলেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে নাগপুরাধিপতির জন্য সৈন্য সরবরাহ করিতে হইত। নিজের জমীদারীর মধ্যে তাঁহার প্রজাশাসনেরও অধিকার ছিল। সুতরাং জমীদার হইলেও বাঙ্গালার জমীদারদিগের ন্যায় তিনি সম্পূর্ণ শক্তিশূন্য ছিলেন না।

অপুত্রক বলিয়া যে সময় নাগপুরাধিপতির রাজ্য ইংরাজ রাজ স্বাধিকারভুক্ত করেন, সেই সময় বীরচন্দ্রকেও ইংরাজের অধীনে

আসিতে হয়। ইংরাজের অধীনে আসিয়া তাঁহার পূর্ব্বক্ষমতা অনেকাংশে খর্ব্বীকৃত হয়। ইংরাজ তাঁহার হস্ত হইতে প্রজাশাসন-ক্ষমতাটী কাড়িয়া লয়েন, তবে কতকগুলি সিপাই রাখিবার অধিকার তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল।

বীরচন্দ্রের একমাত্র পুত্র, নাম রামচন্দ্র। অধিকারচ্যুত হইবার পর তিনি জমীদারী পর্য্যবেক্ষণের ভার পুত্রের হস্তে দিয়া ধর্ম্মকর্ম্মে মনোনিবেশ করেন।

আনন্দদেব নামে এক আত্মীয়পুত্রকে তিনি রামচন্দ্রের সহায়তায় নিয়োগ করেন। আনন্দদেবের চেষ্টায় রামচন্দ্রের অনেক ইংরাজের সহিত ঘনিষ্ঠতা হয়, এবং এই ঘনিষ্ঠতার ফলে অসভ্য রামচন্দ্র শীঘ্রই সভ্যতার চরম সীমায় উপনীত হন।

অল্পদিনের মধ্যেই আয় অপেক্ষা ব্যয়ের ভাগটা কিছু বেশি হইতে লাগিল। ক্রমে মাত্রা চড়িল। নৃত্য-ভোজ-মৃগয়াদি বিবিধ ব্যাপারে অল্পদিনের মধ্যেই বীরচন্দ্রের বাল্যাবধি সঞ্চিত প্রভূত ধনরাশি পুত্র রামচন্দ্র নিঃশেষিত করিলেন। বীরচন্দ্র বিষয়সম্বন্ধে কিছু দেখিতেন না বলিয়া পূর্ব্বে বিশেষ বুঝিতে পারেন নাই। তিনি কেবল পুত্রের ম্লেচ্ছসাহচর্য্য দেখিয়া মনে মনে বিরক্ত হইতেন। এবং তাহাকে ক্রমে ক্রমে অধিকতর ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইতে দেখিয়া মধ্যে মধ্যে নির্জনে ডাকিয়া তিরস্কারও করিতেন। কিন্তু তাঁহার ধনরাশি যে নিঃশেষিত হইতেছে এটা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। যখন বুঝিলেন, তখন তাঁহার জমীদারী ঋণজালে আবদ্ধ পুত্র সাজ্ঘাতিক পীড়াক্রান্ত অতিরিক্ত মদ্যাদি সেবনে রামচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া গেল। অবশেষে বৃদ্ধ পিতা ও মাতাকে শোকার্ত্ত করিয়া, একটী মাত্র বালিকা কন্যা রাখিয়া রামচন্দ্র দেহত্যাগ করিলেন। স্বামীর চরিত্রদোষে মর্ম্মাহত হইয়া ভগ্নহৃদয়া পত্নী ইতিপূর্ব্বেই পরলোকগতা হইয়াছিলেন।

অগত্যা বৃদ্ধ বীরচন্দ্রকে জমীদারীর কার্য্যভার পুনঃগ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হইল। আনন্দদেবই এই সর্ব্বনাশের মূল বুঝিয়া তিনি প্রথমেই তাহাকে পদচ্যুত করিলেন। আনন্দদেবের পুত্র মুকুন্দদেবের সঙ্গে পৌত্রী নারায়ণীর বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সংক্ষুব্ধ বীরচন্দ্র সে সঙ্কল্পও ত্যাগ করিলেন। পিতা, পুত্র উভয়েই অনন্তপুর হইতে তাড়িত হইল। বীরচন্দ্র পৌত্রীর জন্য অন্য পাত্রের সন্ধানে রহিলেন। কেননা পুত্রের অভাব পূরণ করিতে পুত্রস্থানীয় একটী যুবকের বড়ই প্রয়োজন। তিনি বৃদ্ধ, পুত্রশোকপীড়িত, আর কয়দিন বাঁচিবেন? তখন কে নারায়ণীর অভিভাবক হইয়া, তাঁহার অগাধ সম্পত্তি রক্ষা করিবে? জীবিত থাকিতে থাকিতে তাহাকে বিষয়কার্য্য বুঝাইয়া দিতে পারিলেই তিনি নিশ্চিন্ত। তাহা হইলে আবার স্বচ্ছন্দ মনে তিনি ধর্ম্মকর্ম্মে মনোযোগ দিতে পারেন। সৎপাত্রের সন্ধানে তিনি বিশ্বস্ত সহচর রতনকে নিযুক্ত করিলেন। কালবিলম্ব না করিয়া রতন অনন্তপুর পরিত্যাগ করিলেন।

বীরচন্দ্র অতি সাবধানতার সহিত জমীদারীর কার্য্য পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি জমীদারী ঋণে আবদ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং ঋণমুক্তির জন্য তাঁহাকে নানাদিকে ব্যয় সংক্ষেপ করিতে হইল। সামান্য দুই দশজন সিপাহী রাখিয়া অবশিষ্ট সমুদায়কে তিনি অবসর প্রদান করিলেন। পুত্রের মৃত্যুর পর হইতে শ্বেতাঙ্গোৎসব একরূপ উঠিয়াই গিয়াছে। কোনও বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে দুই একজন উচ্চপদস্থ সাহেব নিমন্ত্রিত হইতেন এই মাত্র।

রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর এক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। রাজার ঋণ পরিশোধের আর বিলম্ব নাই। রতনও সুপাত্রের সন্ধান করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। ঋণভীত রাজা শুধু ঋণমুক্তির শুভদিনের অপেক্ষা করিতেছেন। তাহা হইলেই মহাসমারোহে পৌত্রী নারায়ণীকে পাত্রস্থা

আসিতে হয়। ইংরাজের অধীনে আসিয়া তাঁহার পূর্ব্বক্ষমতা অনেকাংশে খর্ব্বীকৃত হয়। ইংরাজ তাঁহার হস্ত হইতে প্রজাশাসন-ক্ষমতাটা কাড়িয়া লয়েন, তবে কতকগুলি সিপাই রাখিবার অধিকার তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল।

বীরচন্দ্রের একমাত্র পুত্র, নাম রামচন্দ্র। অধিকারচ্যুত হইবার পর তিনি জমীদারী পর্য্যবেক্ষণের ভার পুত্রের হস্তে দিয়া ধর্ম্মকর্ম্মে মনোনিবেশ করেন।

আনন্দদেব নামে এক আত্মীয়পুত্রকে তিনি রামচন্দ্রের সহায়তায় নিয়োগ করেন। আনন্দদেবের চেষ্টায় রামচন্দ্রের অনেক ইংরাজের সহিত ঘনিষ্ঠতা হয়, এবং এই ঘনিষ্ঠতার ফলে অসভ্য রামচন্দ্র শীঘ্রই সভ্যতার চরম সীমায় উপনীত হন।

অল্পদিনের মধ্যেই আয় অপেক্ষা ব্যয়ের ভাগটা কিছু বেশি হইতে লাগিল। ক্রমে মাত্রা চড়িল। নৃত্য-ভোজ-মৃগয়াদি বিবিধ ব্যাপারে অল্পদিনের মধ্যেই বীরচন্দ্রের বাল্যাবধি সঞ্চিত প্রভূত ধনরাশি পুত্র রামচন্দ্র নিঃশেষিত করিলেন। বীরচন্দ্র বিষয়সম্বন্ধে কিছু দেখিতেন না বলিয়া পূর্ব্বে বিশেষ বুঝিতে পারেন নাই। তিনি কেবল পুত্রের ম্লেচ্ছসাহচর্য্য দেখিয়া মনে মনে বিরক্ত হইতেন। এবং তাহাকে ক্রমে ক্রমে অধিকতর ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইতে দেখিয়া মধ্যে মধ্যে নির্জ্জনে ডাকিয়া তিরস্কারও করিতেন। কিন্তু তাঁহার ধনরাশি যে নিঃশেষিত হইতেছে এটা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। যখন বুঝিলেন, তখন তাঁহার জমীদারী ঋণজালে আবদ্ধ পুত্র সাঙ্ঘাতিক পীড়াক্রান্ত। অতিরিক্ত মদ্যাদি সেবনে রামচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া গেল। অবশেষে বৃদ্ধ পিতা ও মাতাকে শোকার্ত্ত করিয়া, একটী মাত্র বালিকা কন্যা রাখিয়া রামচন্দ্র দেহত্যাগ করিলেন। স্বামীর চরিত্রদোষে মর্ম্মাহত হইয়া ভগ্নহৃদয়া পত্নী ইতিপূর্ব্বেই পরলোকগতা হইয়াছিলেন।

অগত্যা বৃদ্ধ বীরচন্দ্রকে জমীদারীর কার্য্যভার পুনঃগ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হইল। আনন্দদেবই এই সর্ব্বনাশের মূল বুঝিয়া তিনি প্রথমেই তাহাকে পদচ্যুত করিলেন। আনন্দদেবের পুত্র মুকুন্দদেবের সঙ্গে পৌত্রী নারায়ণীর বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সংক্ষুব্ধ বীরচন্দ্র সে সঙ্কল্পও ত্যাগ করিলেন। পিতা, পুত্র উভয়েই অনন্তপুর হইতে তাড়িত হইল। বীরচন্দ্র পৌত্রীর জন্য অন্য পাত্রের সন্ধানে রহিলেন। কেননা পুত্রের অভাব পূরণ করিতে পুত্রস্থানীয় একটী যুবকের বড়ই প্রয়োজন। তিনি বৃদ্ধ, পুত্রশোকপীড়িত, আর কয়দিন বাঁচিবেন? তখন কে নারায়ণীর অভিভাবক হইয়া, তাঁহার অগাধ সম্পত্তি রক্ষা করিবে? জীবিত থাকিতে থাকিতে তাহাকে বিষয়কার্য্য বুঝাইয়া দিতে পারিলেই তিনি নিশ্চিন্ত। তাহা হইলে আবার স্বচ্ছন্দ মনে তিনি ধর্ম্মকর্ম্মে মনোযোগ দিতে পারেন। সৎপাত্রের সন্ধানে তিনি বিশ্বস্ত সহচর রতনকে নিযুক্ত করিলেন। কালবিলম্ব না করিয়া রতন অনন্তপুর পরিত্যাগ করিলেন।

বীরচন্দ্র অতি সাবধানতার সহিত জমীদারীর কার্য্য পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি জমীদারী ঋণে আবদ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং ঋণমুক্তির জন্য তাঁহাকে নানাদিকে ব্যয় সংক্ষেপ করিতে হইল। সামান্য দুই দশজন সিপাহী রাখিয়া অবশিষ্ট সমুদায়কে তিনি অবসর প্রদান করিলেন। পুত্রের মৃত্যুর পর হইতে শ্বেতাঙ্গোৎসব একরূপ উঠিয়াই গিয়াছে। কোনও বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে দুই একজন উচ্চপদস্থ সাহেব নিমন্ত্রিত হইতেন এই মাত্র।

রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর এক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। রাজার ঋণ পরিশোধের আর বিলম্ব নাই। রতনও সুপাত্রের সন্ধান করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। ঋণ-জাত রাজা শুধু ঋণমুক্তির শুভদিনের অপেক্ষা করিতেছেন। তাহা হইলেই মহাসমারোহে পৌত্রী নারায়ণীকে পাত্রস্থা

করেন। এমন সময়ে সহসা একদিন প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া তিনি শুনিলেন, যে তিনি বিকৃতমস্তিষ্ক, সুতরাং জমীদারী পরিচালনে সম্পূর্ণ অক্ষম। রাঁচি হইতে কতকগুলি শান্তিরক্ষক সঙ্গে লইয়া স্বয়ং কমিসনর অনন্তপুরে আগমন করিলেন। বীরচন্দ্রের হস্ত হইতে কার্য্য-ভার অপহৃত হইল। এবং আনন্দদেবের হস্তে পরিচালনভার প্রদত্ত হইল। বীরচন্দ্র এই আকস্মিক বিপৎপাতে স্তম্ভিত হইলেন। যথাসাধ্য প্রতিবাদ করিলেন। কোনও কুচক্রী মিথ্যা অবাদে তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতেছে বুঝাইলেন। প্রতিবাদ নিস্ফল হইল। রাঁচির কলেক্টর সাহেব নিজে গোপনে আসিয়া রাজার এ উন্মত্ততা দেখিয়া গিয়াছেন। বীরচন্দ্র একদিন সুবর্ণরেখার তীরে বসিয়া সর্ব্বাঙ্গে মৃত্তিকালেপন করিয়া উন্মাদের ন্যায় অঙ্গভঙ্গী ও অর্থহীন শব্দোচ্চারণ করিতেছিলেন, ইহা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সুতরাং প্রতিবাদে ফল হইল না। আনন্দদেবের হস্তে জমীদারীর ভার সমর্পিত হইল। সপুত্র আনন্দদেব আবার অনন্তপুরে প্রবেশ করিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ ভিন্ন তাহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে অনন্তপুরে আর কেহ রহিল না। তবে কর্ত্তৃপক্ষ বৃদ্ধের প্রতি এই অনুগ্রহ করিলেন, যে বিশেষ প্রয়োজন না হইলে কেহ যেন তাঁহার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করে। তিনি অনন্তপুরের ভিতরে যথা ইচ্ছা গমনাগমন করিতে পারিবেন এবং সুবর্ণরেখার তীরে বসিয়া যত ইচ্ছা মাটী মাখিতে পারিবেন, কেহ তাঁহাকে বাধা দিতে পারিবে না। এবং বীরচন্দ্র নিজের জন্য প্রয়োজন মত যে সমস্ত ন্যায্য খরচ করিতে ইচ্ছা করিবেন, আনন্দদেবকে তৎক্ষণাৎ তাহা যোগাইতে হইবে। ইহা ভিন্ন উন্মত্ত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার যে কয়জন সঙ্গী ছিল, ইচ্ছা করিলে রাজা এখনও সেই কয়জন সঙ্গী রাখিতে পারিবেন।

[ক্রমশঃ]

জাপানী বীর।

(১)

জর্ম্মাণ-রুসিয়া-বল, ইংরাজ, ফরাসী,
সসাগরা-ধরাপতি আমেরিকাবাসী।
সবে মিলে মহোল্লাসে,
চলিয়াছে চীন নাশে
পদদর্পে হুহুঙ্কারে প্রলয় প্রকাশি।

(২)

জাপান নবীন মিত্র সঁপিল সে সনে
মুষ্টিমিত সেনা তার অরাতি দমনে।
য়ুরোপ গ্রহণ করে মহা অনুগ্রহ ভরে
যথালাভ গণি, রুদ্ধ অবজ্ঞার সনে।

(৩)

সুবখ্যাত পুরাতন চীনের প্রাচীর,
বেষ্টন করিল আসি যত মহাবীর।
বিষম সমরকোপ, মুহু মুহু পড়ে তোপ
শূন্যে উড়ে লক্ষ লক্ষ বেণী-বদ্ধশির।

(৪)

হঠাইতে নারে তবু সম্মিলিত সৈন্য,
লাখ চীন মরে, লাখ ঘুচায় সে দৈন্য।
না জানে কৌশল কল, অস্ত্রশস্ত্র হীনবল
তবু শত্রু সন্ত্রাসিত, কি সাহস ধন্য!

(৫)

রজনী তামসী ঘোরা, নিস্তব্ধ গম্ভীর,
জাগরিত সমুজ্জ্বল বৃহৎ শিবির।
মিলি যত সেনাপতি, সুকৌশলী মহারথী
কেমনে অন্তরে পশে করিতেছে স্থির।

(৬)

সহসা ইঙ্গিত ব্যাপ্ত সৈনিকের দলে,
সুপ্তসেনা জাগরিত, সুসজ্জিত পলে!
লঙ্ঘিয়া শত্রুর হস্ত, বারুদ করিল ন্যস্ত
পশ্চিম প্রাচীরস্থিত তোরণের তলে।

(৭)

দীর্ঘ রজ্জু লগ্ন করি অনল-পুরে,
দাঁড়াইল তারা আসি যথাযথ দূরে।
রজ্জুর অপর দেশে, অগ্নিদান করে শেষে
অনলউত্তপ্ত-চিতে যত সেনাশূরে।

(৮)

কিন্তু একি সর্ব্বনাশা কর্ম্মনাশা ভোগ
অর্দ্ধপথে নিভে রজ্জু কি হইল রোগ!
নব নব রজ্জু আনে বার বার অগ্নিদানে
বার বার নির্ব্বাপিত ব্যর্থ সব যোগ।

(৯)

রজনী নিঃশেষি আসে, বিস্ফুরিছে জ্যোতি ;
ব্যাকুল চিন্তিত ভীত যত সেনাপতি।
এখনি যতেক চীন, প্রাণের মমতাহীন,
লইবে বারুদ কাড়ি ঘটাবে দুর্গতি।

(১০)

কহিল জাপান যোদ্ধ্, "কেন কালব্যাজ,
কাছে গিয়া জ্বালিলেত সিদ্ধ হয় কাজ।"
'সত্য তাহা' কহে সবে, 'উঠ কে যাইবে তবে
স্বদেশের মুখোজ্জ্বল কে করিবে আজ ?'

(১১)

স্তম্ভিত চিত্রিত যেন যত সেনাগণ,
পালিতে অনুজ্ঞা কারো না সরে চরণ!
এ উহার মুখ চাহে,—সমরে নহে—
খণ্ড খণ্ড হবে দেহ অনলে ভীষণ!

(১২)

সহাস্যে জাপানী-বর উঠি ত্বরাগতি
কহিল, 'জ্বালিব অগ্নি চাহি অনুমতি।'
উঠে রব 'ধন্য ধন্য,' চলে বীর অগ্রগণ্য
নির্ভীক, আনন্দদীপ্ত প্রফুল্ল মূরতি!

(১৩)

প্রজ্জ্বলি উঠিল অগ্নি বিকট গর্জ্জিয়া,
বৃহৎ প্রাচীর চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া!
শূন্য ব্যোমপথ জুড়ে, অনল উদ্গার উড়ে
সর্ব্ব অগ্রে বীর দেহ স্বর্গে উড়াইয়া!

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

ঔপন্যাসিক বিবাহ।

(১)

পত্র পাঠে জানা গেল বন্ধুবর শ্রীপতি সান্যালের হঠাৎ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ব্যাপারটা নাকি কিছু ঔপন্যাসিক ধরণের। বিবাহ-বিরাগী সান্যেল যে শেষে একটা পদ্মাপারের মেয়ে বিয়ে ক'রে বস্‌ল, ইহাতে বন্ধুমহলে আশ্চর্য্যের আর সীমা রহিল না। কেহ মানুষের মনের অস্থিরতাসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তৃতা দিলেন, কেহ ভালবাসাসম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ পুরাতন তথ্য পুনরায় আবৃত্তি করিলেন; সকলেই নানা উপায়ে আপনাদের বিস্ময় এবং ব্যাপারটা যে কি তাহা ভালরূপে জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

আগ্রহের কারণ ছিল। পশ্চিমবঙ্গনিবাসী সহাধ্যায়িগণ সান্যালের পদ্মাতীর-নিবাসিনী, অপূর্ব্ব-ভাষিণী এবং অপূর্ব্ব-উপাধি-ধারিণী ভাবী পত্নীর উল্লেখ করিয়া এতবার ঠাট্টা করিয়াছিলেন, যে তাহাতে তাহার স্বদেশে বিবাহসম্বন্ধে অত্যন্ত বিরাগ জন্মিয়া গিয়াছিল। সান্যাল যে ঠিক বাঙ্গাল ছিল এবং বন্ধুগণের যে বাঙ্গালদিগের প্রতি কোন বিতৃষ্ণা ছিল তাহা নহে, তবে মাঝে মাঝে একটা ঠাট্টার লোভ তাঁহারা সম্বরণ করিতে পারিতেন না। পূর্ব্ববঙ্গে জন্ম হইলেও দীর্ঘকাল পশ্চিমবঙ্গে নিবাসনিবন্ধন সর্ব্ব বিষয়েই সে পশ্চিমবঙ্গীয় হইয়া গিয়াছিল ক্লাসের মধ্যে কবিত্বে ও রহস্যে সেই অদ্বিতীয় ছিল। যদিও প্রথম বর্ষে তাহার কোঁচা গুটান কাপড় পরার জন্য, এবং সর্ব্বাঙ্গে-জড়ান ব্যবহার মলিন ও বহুছিদ্র-বিশিষ্ট গাত্রাবরণ খানির জন্য তাহাকে কতকটা বুদ্ধের মত, কতকটা ধোপার মত ও কতকটা গম্ভীর-স্বভাব দার্শনিকের মত বোধ হইত; ও তাহার দূরদৃষ্টিশক্তিহীন, চসমাহীন, জ্যোতিহীন

ঢুলু ঢুলু নয়নদ্বয়ের পিট পিট চাহনির জন্য অনেকটা আফিং-খোরের মত মনে হইত; কিন্তু যখন দ্বিতীয় বর্ষে তাহার বেশভূষার রাজ্যে গুরুতর পরিবর্ত্তন হইল, (মনোরাজ্যে হইয়াছিল কিনা জানিনা) স্বদেশীয় দ্রব্য-ব্যবহার-সমিতির একজন কার্য্যদক্ষ সভ্য হইয়া নবীন উৎসাহে মাতিল, যখন সে স্বজাতীয় বেশভূষার সারল্য, সৌন্দর্য্য ও পরিচ্ছন্নতার উন্নতিবিধানজন্য বদ্ধপরিকর হইল যখন তাহার পরণে বঙ্গে কলজাত কাপড়ের কোঁচা ঝুলিতে লাগিল, গাত্রসংলগ্ন ফরিদপুরী টুইলের শ্বেত শার্ট আজানু বিলম্বিত হইল, এক মোটা চাদর (যাহা অন্যে বিছানার জন্য ব্যবহার করে) তাহার কক্ষ, বক্ষ ও পৃষ্ঠ বেষ্টন করিয়া তাহার বাম স্কন্ধোপরি শোভিতে লাগিল; যখন, একদিন কতিপয় লাঠি-হস্ত ফিরিঙ্গিনন্দনের সহ শূন্য-হস্ত যুদ্ধে পরাভূত হওয়ার পর তাহার হস্তে তালনির্ম্মিত সুদৃঢ় কৃষ্ণ লাঠী বিরাজমান হইল, যখন তাহার চক্ষু চসমিত হইল, বিরললোমশ্মশ্রু যথাসময়ে কামান হইতে লাগিল, কেশপাশ যখন যথাকালে সযতনে অবত্নীভূত হইতে লাগিল, তখন সেই দীর্ঘাকার গৌরবর্ণ যুবকের মুখে, কার্য্যে ও দেহে সৌন্দর্য্যের উৎসাহের ও সহৃদয়তার ভাব দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল। এই সময়ে সান্যেলের মনে ব্রাহ্মভাব প্রবল হইয়া উঠে। সে প্রতি রবিবারে সমাজে উপাসনা করিতে যাইত এবং ব্রাহ্ম হইবার কথাও অনেকের কাছে প্রকাশ করিত। কাজেই এ বিবাহে যে বন্ধুবর্গের আশ্চর্য্য হইবে, তাহাতে কোনও নূতনত্ব নাই।

যথাসময়ে সান্যেলকে ধরিয়া যে বিবরণ উদ্ধার করা গেল, তাহা তাহার নিজের ভাষায় বলিতে গেলে এই :—

(২)

"গত বর্ষের প্লেগের কথা তোমাদের মনে আছে বোধ হয়। যখন হোষ্টেলের ভিতর দুইটী ছেলের প্লেগ হইল, তখন ছাত্রমহলে একটা

ঔপন্যাসিক বিবাহ।

(১)

পত্র পাঠে জানা গেল বন্ধুবর শ্রীপতি সান্যালের হঠাৎ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ব্যাপারটা নাকি কিছু ঔপন্যাসিক ধরণের। বিবাহ-বিরাগী সান্যেল যে শেষে একটা পদ্মাপারের মেয়ে বিয়ে ক'রে বস্‌ল, ইহাতে বন্ধুমহলে আশ্চর্য্যের আর সীমা রহিল না। কেহ মানুষের মনের অস্থিরতাসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তৃতা দিলেন, কেহ ভালবাসাসম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ পুরাতন তথ্য পুনরায় আবৃত্তি করিলেন; সকলেই নানা উপায়ে আপনাদের বিস্ময় এবং ব্যাপারটা যে কি তাহা ভালরূপে জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

আগ্রহের কারণ ছিল। পশ্চিমবঙ্গনিবাসী সহাধ্যায়িগণ সান্যালের পদ্মাতীর-নিবাসিনী, অপূর্ব্ব-ভাষিণী এবং অপূর্ব্ব-উপাধি-ধারিণী ভাবী-পত্নীর উল্লেখ করিয়া এতবার ঠাট্টা করিয়াছিলেন, যে তাহাতে তাহার স্বদেশে বিবাহসম্বন্ধে অত্যন্ত বিরাগ জন্মিয়া গিয়াছিল। সান্যাল যে ঠিক বাঙ্গাল ছিল এবং বন্ধুগণের যে বাঙ্গালদিগের প্রতি কোন বিতৃষ্ণা ছিল তাহা নহে, তবে মাঝে মাঝে একটা ঠাট্টার লোভ তাঁহারা সম্বরণ করিতে পারিতেন না। পূর্ব্ববঙ্গে জন্ম হইলেও দীর্ঘকাল পশ্চিমবঙ্গে নিবাসনিবন্ধন সর্ব্ব বিষয়েই সে পশ্চিমবঙ্গীয় হইয়া গিয়াছিল। ক্লাসের মধ্যে কবিত্বে ও রহস্যে সেই অদ্বিতীয় ছিল। যদিও প্রথম বর্ষে তাহার কোঁচা গুটান কাপড় পরার জন্য, এবং সর্ব্বাঙ্গে-জড়ান ব্যবহার-মলিন ও বহুছিদ্র-বিশিষ্ট গাত্রাবরণ খানির জন্য তাহাকে কতকটা বুদ্ধের মত, কতকটা ধোপার মত ও কতকটা গম্ভীর-স্বভাব দার্শনিকের মত বোধ হইত; ও তাহার দূরদৃষ্টিশক্তিহীন, চসমাহীন, জ্যোতিহীন

ঢুলু ঢুলু নয়নদ্বয়ের পিট পিট চাহনির জন্য অনেকটা আফিং-খোরের মত মনে হইত; কিন্তু যখন দ্বিতীয় বর্ষে তাহার বেশভূষার রাজ্যে গুরুতর পরিবর্ত্তন হইল, (মনোরাজ্যে হইয়াছিল কিনা জানিনা) স্বদেশীয় দ্রব্য-ব্যবহার-সমিতির একজন কার্য্যদক্ষ সভ্য হইয়া নবীন উৎসাহে মাতিল, যখন সে স্বজাতীয় বেশভূষার সারল্য, সৌন্দর্য্য ও পরিচ্ছন্নতার উন্নতিবিধানজন্য বদ্ধপরিকর হইল যখন তাহার পরণে বম্বে কলজাত কাপড়ের কোঁচা ঝুলিতে লাগিল, গাত্রসংলগ্ন ফরিদপুরী টুইলের শ্বেত শার্ট আজানু বিলম্বিত হইল, এক মোটা চাদর (যাহা অন্যে বিছানার জন্য ব্যবহার করে) তাহার কক্ষ, বক্ষ ও পৃষ্ঠ বেষ্টন করিয়া তাহার বাম স্কন্ধোপরি শোভিতে লাগিল; যখন, একদিন কতিপয় লাঠি-হস্ত ফিরিঙ্গিনন্দনের সহ শূন্য-হস্ত যুদ্ধে পরাভূত হওয়ার পর তাহার হস্তে তালনির্ম্মিত সুদৃঢ় কৃষ্ণ লাঠী বিরাজমান হইল, যখন তাহার চক্ষু চসমিত হইল, বিরললোমশ্মশ্রু যথাসময়ে কামান হইতে লাগিল, কেশপাশ যখন যথাকালে সযতনে অবত্নীভূত হইতে লাগিল, তখন সেই দীর্ঘাকার গৌরবর্ণ যুবকের মুখে, কার্য্যে ও দেহে সৌন্দর্য্যের উৎসাহের ও সহৃদয়তার ভাব দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল। এই সময়ে সান্যেলের মনে ব্রাহ্মভাব প্রবল হইয়া উঠে। সে প্রতি রবিবারে সমাজে উপাসনা করিতে যাইত এবং ব্রাহ্ম হইবার কথাও অনেকের কাছে প্রকাশ করিত। কাজেই এ বিবাহে যে বন্ধুবর্গের আশ্চর্য্য হইবে, তাহাতে কোনও নূতনত্ব নাই।

যথাসময়ে সান্যেলকে ধরিয়া যে বিবরণ উদ্ধার করা গেল, তাহা তাহার নিজের ভাষায় বলিতে গেলে এই :—

(২)

"গত বর্ষের প্লেগের কথা তোমাদের মনে আছে বোধ হয়। যখন হোষ্টেলের ভিতর দুইটী ছেলের প্লেগ হইল; তখন ছাত্রমহলে একটা

ঘোর আশঙ্কা পড়িয়া গেল। যে সকল বালকের অভিভাবকগণ কলিকাতার সান্নিধ্যে বাস করেন, তাঁহারা নিজ নিজ বালকদিগকে টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম করিতে লাগিলেন। গাড়ীর ঘড়ঘড়ানি ও মুটের হাঁকাহাকিতে হোষ্টেল কয়েক ঘণ্টা খুব সরগরম হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহার পরেই সেই বিশাল অট্টালিকা প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িল। আমরা কয়েক জন, যাহাদিগের অভিভাবকগণ বহুদূরে অবস্থান করেন এবং আমাদিগের নিকট হইতে ভিন্ন অন্যস্থল হইতে সম্বাদ পাওয়া যাঁহাদিগের সম্ভব নয়,—তাহারা শেষ পর্য্যন্ত থাকিব বলিয়া প্রথমে স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু যখন হোষ্টেল প্রায় খালি হইয়া পড়িল, তখনতাহার সেই বিপুল নির্জনতা আমাদিগকে ভীত করিল। কিছুক্ষণের মধ্যে তল্পী-তল্পা বাঁধিয়া আমরাও স্ব স্ব দেশাভিমুখে প্রস্থান করিলাম।

কলিকাতা হইতে গোয়ালন্দ বেশ নিরাপদে কাটিল। পরদিন প্রাতঃকালে ষ্টীমারে চাপিলাম। সেই প্রাতঃসূর্য্যকিরণবিভাসিত পদ্মাবক্ষ বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। পদ্মার শ্বেত তরঙ্গায়িত জলরাশির উপরে প্রতিবিম্বসূর্য্য ও তাহার কিরণ সুন্দর নৃত্য করিতেছিল। হুস্ হুস্ শব্দে ষ্টীমার জলবক্ষ বিদারণ করিয়া চলিতে লাগিল। পদ্মার দুই তীরের কি বিপরীত দৃশ্য! একতীরে নূতন ভূমি গঠিত হইতেছে, স্তরে স্তরে শুভ্র বালুকারাশি পড়িয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে, অপর তীরে পুরাতন গ্রাম সকল ধ্বংস হইতেছে, কোথাও একটী বাগানের অর্দ্ধাংশ নদীগ্রস্ত হইয়াছে, কচিৎ উৎপাটিতমূল দুই একটী বৃক্ষ কতক জলে কতক বা স্থলে পড়িয়া আছে, কোথাও ভগ্ন অট্টালিকার শেষচিহ্ন বিদ্যমান, কোথাও একটী সুপরিচ্ছন্ন সুন্দর পুষ্পবাটীকাযুক্ত বাড়ীর দ্বারদেশে বুভুক্ষু নদী বসিয়া আছে। ষ্টীমারের এই কর্ম্মহীন জীবন যেমন চিন্তার অনুকূল তেমন আর কিছুই নহে। সামান্য কারণে মনে সহস্র চিন্তা আসিয়া উদিত হয়। জগতের এই সৃষ্টি-বৈচিত্র্য লইয়া কেমন

একটা বিষাদের চিন্তা আমার মনে আসিল ? জগতে এ বিষম বৈপরীত্য কেন ? একদিকে ক্ষুধাক্ষীণ দরিদ্রের ক্ষীণ কণ্ঠের আর্ত্তনাদ, অন্যদিকে পর্য্যাপ্তি-ক্রোড়ে লালিত ধনী সন্তানের প্রমোদ-কাননের তাণ্ডব হাস্য; একদিকে প্রকৃতির সৃষ্টির মনোমুগ্ধকারিণী মূর্ত্তি, অন্যদিকে প্রকৃতির ভীষণ প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি ; কেন এ নিদারুণ কষ্টকর বৈচিত্র্য ? বিজ্ঞানে পড়িতেছিলাম এই বৈচিত্র্যই জগতের সৌন্দর্য্যের ও যাবতীয় কষ্টের মূল। একদিকে উগ্রতাপ, অপর দিকে দারুণ শৈত্য ; এই বিভিন্নতার ফলে যাবতীয় সুন্দর ও কুৎসিৎ দ্রব্যের সৃষ্টি, যখন জগতের তাপ সর্ব্বত্র সমভাব হইবে তখন এ বৈচিত্র্যও চলিয়া যাইবে। জগত তখন অসাড়, নিস্পন্দ, জীবহীন, জীবের সুখদুঃখহীন। এই চিন্তার ফলে আমার কবিতার খাতাখানি খুলিয়া সৃষ্টি বৈচিত্র্য সম্বন্ধে একটী কবিতা লিখিলাম।

ক্রমশঃ যত বেলা বাড়িতে লাগিল, বাতাস বেগে বহিতে লাগিল। কলিকাতায় এ সময় নিদারুণ গ্রীষ্ম, আমি গ্রীষ্মের পোষাকেই সজ্জিত ছিলাম, এখানে ভয়ানক শীত করিতে লাগিল। ষ্টীমারে যে শীত করে তাহা আমার জানা ছিল, কিন্তু এত শীত হইবে তাহা ভাবি নাই। কাপড় চোপড় সমস্ত জড়াইয়া মুড়ি দিয়া এক জায়গায় শুইয়া পড়িলাম, দারুণ শীতে শরীরে কেমন একটা অবসাদ বোধ হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণের মধ্যে আমি নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। কতকক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম জানিনা, তবে অভদ্রভাবে নিদ্রা হইতে আমাকে উঠান হইল, তাহা বুঝিলাম। উঠিয়া দেখিলাম, অনেক লোক সেখানে জমিয়াছে, সারেং কয়েকজন খালাসীর সঙ্গে নিকটে দাঁড়াইয়া আছে ; আমি নিজেও শরীরে ভীষণ দুর্ব্বলতা ও জ্বর হইয়াছে বুঝিলাম ; উঠিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু উঠিতে পারিলাম না। সারেঙ্গ আমাকে বলিল "আপনি কলিকাতা হইতে আসিতেছেন, আপনার প্লেগ হইয়াছে, ষ্টীমারে কোন সংক্রামক রোগীকে লইবার নিয়ম নাই, অতএব আপনাকে এইখানে

নামাইয়া দেওয়া হইবে; ষ্টীমার ছাড়ান হইতেছে, আপনি নামিয়া যাউন।” তাহাদের পূর্ব্বের কথা শুনি নাই। রোগযন্ত্রণায় ও ভয়ে আমি এরূপ হইয়া গেলাম যে কোনও উত্তর দিতে পারিলাম না, উঠিবার জন্য একবার নিষ্ফল চেষ্টা করিলাম। এই নির্জন স্থানে যেন আমাকে না ফেলিয়া যায় তাহার জন্য অনুরোধও করিতে পারিলাম না। আমাকে উঠিতে অপরাগ দেখিয়া, সারেং দুইজন খালাসিকে আমাকে লইয়া যাইতে বলিল। তাহারা আমাকে ধরিয়া লইয়া চলিল। একজন ভদ্রলোক আমার শীতবস্ত্রের অভাব দেখিয়া অনুগ্রহ করিয়া একটা কম্বল দিলেন। লইয়া যাইবার সময়ে জনৈক খালাসী আমার পকেটে যাহা কিছু ছিল, হস্তগত করিল। আমার তখন প্রতিবাদ করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি ছিল না। অপর খালাসী কিছু দয়ালু, তাহার সঙ্গী আমাকে নামাইয়া দিয়াই চলিয়া যাইতে চাহিলে সে আমার কাপড় চোপড় লইয়া একটা বিছানা তৈয়ার করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। ষ্টীমারও চলিয়া গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে আমি আমার অবস্থা বুঝিতে পারিলাম। আমি সেখানে মরিবার জন্য পরিত্যক্ত হইয়াছি। আমার ব্যারাম প্লেগ না হইলেও হইতে পারে, কিন্তু ভয়ে আমি হতবুদ্ধি হইয়াছিলাম। এখন উপায়! অতিকষ্টে শয্যার উপরে বসিয়া চারিদিক দেখিতে লাগিলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। সূর্য্য ডুবিয়াছে। পদ্মার জলের উপর লাল মেঘের লাল আভা পড়িয়াছে। বাতাস তখন শান্ত, নদীবক্ষ স্থির। নিকটে জনপ্রাণী নাই। লোকালয় বহুদূরে। অতি দূরে কাল বৃক্ষের শ্রেণী দেখা যাইতেছিল, সেখানে আমার যাওয়া অসম্ভব। এই নির্জ্জন প্রান্তরে, অসহায় অবস্থায় আত্মীয়স্বজন হইতে বহুদূরে, হয়ত পশুর কবলে পড়িয়া মরিতে হইবে, এ চিন্তা বড়ই কষ্ট দিতে লাগিল। নূতন বয়স, কত আশা ছিল, সব বিলুপ্ত হইবে, এই সুন্দর পৃথিবীর সহিত সকল সম্পর্ক ঘুচিয়া যাইবে, এই সব চিন্তা আসিতে

লাগিল। বাস্তবিক পৃথিবী তখন বড়ই সুন্দর দেখাইতে লাগিল, সেই নক্ষত্রখচিত নীল আকাশ, সেই মৃদু জ্যোৎস্না-ভাসিত শ্যামল প্রান্তর, সেই স্থির, ধীর, প্রশান্ত মহানদীবক্ষ, সকলি বড়ই সুন্দর। এমন সময়ে কে মরিতে চায়। কিন্তু বিপদ মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা। ভবিতব্যের উপরে আমার আর কোন হাত নাই। ক্রমশঃ মন প্রস্তুত হইল, একবার দূরস্থ পিতৃদেবের চরণ স্মরণ করিলাম, একবার পরলোকগতা জননী দেবীর স্মৃতি মনোমধ্যে উদিত হইল, তারপর সেই অনন্ত আকাশের দিকে চাহিয়া, সেই অনন্তের যদি কেহ কর্ত্তা থাকে তাঁহার উদ্দেশে বলিলাম, "বিভো, তোমাকে কোন দিন চিনি নাই, এখনও চিনিলাম না, আমার জীবনে আমার যাহা সাধ্য করিয়াছি, এখন, আমি শক্তিহীন, তোমার চরণে আত্মসমর্পণ করিলাম।" বিবিধ চিন্তার ফলে শরীর আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, আর বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। শুইয়া পড়িলাম, তাহার পরে নিদ্রিত কি মূর্চ্ছিত হইলাম, বলিতে পারি না।

(৩)

কতক্ষণ বা কতদিন যে এরূপে ছিলাম বলিতে পারি না। মাঝে মাঝে যখন কিঞ্চিৎ জ্ঞানের উন্মেষ হইত তখন যেন মনে হইত এক দেববালা আমার শুশ্রূষা করিতেছেন। ভীষণ দাহে যখন আমার হস্তপদ পুড়িয়া যাইত তখন তিনি যেন আপনার সুকোমল সুশীতল হস্তে আমার উত্তপ্ত হস্তপদকে শীতল করিয়া দিতেন। আমার যন্ত্রণাক্লিষ্ট মস্তক যেন তাঁহার সুকুমার অঙ্গুলিস্পর্শে ক্ষণেক রোগ-যাতনা ভুলিয়া যাইত। আর মাঝে মাঝে এক প্রৌঢ়া মাতৃমূর্ত্তি আমার ঔষধ ও পথ্যাদি সেবন করাইতেন, তাহা মনে হইত। এবং এক ঋষিমূর্ত্তি শুভ্রবর্ণ, শুভ্রকেশ প্রাচীন ব্রাহ্মণ এক চিকিৎসকের সহিত গৃহে আসিতেন ও কি পরামর্শ করিতেন, তাহাও মনে আছে।

যে দিন প্রথম জ্ঞান হইল, তাহার পূর্ব্বরাত্রে খুব ঘুমাইয়াছিলাম। বেলা প্রায় ৮টার সময় জাগিলাম, দেখিলাম আমি এক প্রশস্ত, পরিচ্ছন্ন ও সুশৃঙ্খলভাবে সজ্জিত কুটীরে, একটী তক্তপোষের উপরে শায়িত আছি। নিকটে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ-বর্ষদেশীয়া বালিকা বসিয়া আছে। তাহার নিবিড় কৃষ্ণ-কেশরাশি সুবর্ণ-বর্ণ-অঙ্গের চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেই কেশের ভিতর দিয়া তাহার চম্পক অঙ্গুলিদাম অতি সৌষ্ঠবের সহিত দ্রুত পরিচালিত হইতেছিল। বালিকা দেখিতে বলিষ্ঠা কিন্তু তাহাতে কমনীয়তার কোনও হানি হয় নাই। নাক, মুখ, চক্ষু, বাহু আদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরস্পরের সহিত অতি সুন্দর অনুপাতে সুগঠিত। কিন্তু তাহার সেই শারীরিক সৌন্দর্য্য ব্যতীত আর একটা সৌন্দর্য্যে আমাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। তাহার সেই সুন্দর মুখের উপর তাহার হৃদয়ের ছবি যেন স্পষ্ট অঙ্কিত ছিল। সে মুখ সারল্য, করুণা, বুদ্ধিমত্তা এবং প্রীতির ভাবে পূর্ণ। কত সুন্দর মুখ দেখিয়াছি, নাক-মুখ-চোক সকলি অতুলনীয়, কিন্তু একটী স্বভাবের অভাবে সে মুখখানি যেন নষ্ট হইয়া গিয়াছে বোধ হয়। হয়ত তাহাতে এমন একটা অহঙ্কারের ভাব, নির্দ্দয়তার ভাব বা স্বার্থপরতার ভাব আছে, যে তাহা দেখিলে আর দ্বিতীয়বার দেখিতে ইচ্ছা হয় না। হয়ত মুখে এমন একটা নির্ব্বুদ্ধিতার ভাব আছে, যে তাহাতে দয়া হয় কিন্তু ভক্তি বা ভালবাসা আসে না। সুন্দর ও সুন্দরীগণ! সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য তোমরা কতই না সাজসজ্জা কর, কিন্তু তোমরা অনেকে জান না, একটী সদ্বৃত্তি, কত বহুমূল্য সাবান ও এসেন্স হইতে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

উঠিয়াই আমি নিতান্ত অধীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি কোথায় এবং আপনারা কে, অনুগ্রহ করিয়া বলুন"। বালিকা বলিল, "আপনি এখন ব্যস্ত হইবেন না, ক্রমশঃ সবই জানিতে পারিবেন। কবিরাজ মশায় আপনাকে কথা কহিতে বা কোনও চিন্তা আদি করিতে

বারণ করিয়াছেন। আপনি এখনও বড় দুর্ব্বল। আপনাকে ঔষধ খাওয়াইবার জন্য আমি এখানে বসিয়া আছি।” এই বলিয়া সে ঔষধটী প্রস্তুত করিতে লাগিল, আমি নীরবে সেই সুকুমার অঙ্গুলিগুলির দ্বারা খল মাড়া দেখিতে লাগিলাম।

ঔষধ প্রস্তুত হইলে তাহা খাইয়া আমি পুনরায় বলিলাম,

“আমায় সব কথা বল, না বলিলে আমার চিন্তা কম হইবে না বরং উৎকণ্ঠা বাড়িতে থাকিবে। আমি কিরূপে এখানে আসিলাম?”

“বাবা প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে নদীস্নান করিয়া তথায় সন্ধ্যা-বন্দনাদি করেন, সেদিন যখন সন্ধ্যার সময় ঘরে ফিরিতেছিলেন, তখন আপনাকে পথে অচৈতন্য অবস্থায় দেখিতে পান। তারপর আপনাকে আমাদের বাটীতে আনা হয়। কয়দিন আপনার অত্যন্ত জ্বর হইয়াছিল। আমরা বড়ই উদ্বিগ্ন থাকিতাম। এখানে ভাল ডাক্তার আদি পাওয়া যায় না, রোগীর পথ্যের জন্য বেঁদানা আদিও পাওয়া যায় না, অনেক কষ্টে দু একটা দাড়িম বাবা যোগাড় করিয়া আনিয়াছিলেন। আপনার বোধ হয় বড়ই কষ্ট হইয়াছে।” বালিকা নিতান্ত সরলভাবে এই কয়টী কথা বলিল। তাহার শেষের কথাটী শুনিয়া হাসি পাইল, কি বলিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু তখন কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস থামাইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম—

“আমার জিনিসপত্র সব কি চোরেরা চুরি করিয়া লইয়া গেছে, কিছুই রাখিয়া যায় নাই?” আমার বহুকষ্টে ও বহুকাল ধরিয়া লিখিত কবিতার খাতাখানি গিয়াছে ভাবিয়া মনে বড়ই দুঃখ হইতেছিল। বালিকা বলিল “আপনার সঙ্গে কেবল কয়েকখানি কাপড়, একটা কম্বল, দুইখানি ইংরাজী বহি—বাবা বলিলেন কি উদ্ভিদ বিদ্যার বহি—আর একখানা বাঙ্গালা বহি—“কথা,” আর আপনার কবিতার খাতা—”

"আমার কবিতার খাতা"—উচ্ছ্বাসভরে কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই আমি অপ্রস্তুত হইলাম। বুঝিতে পারি নাই যে, এখানে অন্য অর্থ হইবে। বালিকা একটু থতমত খাইয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল "আপনার কাগজ পত্র আমরা ইচ্ছা করিয়া দেখি নাই, বাবা বলিলেন আপনার জন্য আপনার বাপ মা হয়ত অত্যন্ত চিন্তিত আছেন, এক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে সংবাদ দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য, সেইজন্য তিনি বলিলেন যে এখন কাগজ পত্র দেখায় দোষ নাই।"

"বাবাকে কি খবর দেওয়া হইয়াছে ?"

"না, আমরা তাঁহার ঠিকানা জানিতে পারি নাই। আপনার বহি ও খাতায় আপনার নাম লিখা আছে, আর কলেজের নাম লিখা আছে। আর কিছুই নাই।" নিতান্ত অমনোযোগের সহিত আমি পূর্ব্বের প্রশ্ন করিয়াছিলাম। বালিকাকে অপ্রভিত করিয়া একটু দুঃখ হইল। বলিলাম—

"তোমরা যেরূপ কার্য্যের জন্য আমার খাতা দেখিয়াছ তাহাতে কোনও দোষ নাই। আর যদি ইচ্ছা করিয়াও দেখিতে তাহাতেও আমার আপত্তি ছিল না। তুমি বোধ হয় জাননা, নূতন লেখকদিগের লেখা যদি কেহ লুকাইয়া পড়ে, তাহাতে তাহাদের কত আনন্দ হয়।"

বালিকা প্রফুল্ল হইল। বলিল "আপনার কবিতা পড়িতে আমার বেশ লাগে"। আমি একটু হাসিলাম, বন্ধুবর্গ যদিচ আমার কবিতার কোনও দোষ দেখিতে পারিতেন না, তবুও বলিতেন, যে উহা রবিবাবুর অত্যন্ত নিকট অনুকরণ। বালিকা পুনরায় বলিল "আপনার বাপকে কি টেলিগ্রাম করিবেন ?" আমি বলিলাম "টেলিগ্রাম করিবার কোন আবশ্যক নাই, তিনি অনর্থক ব্যস্ত হইয়া পড়িবেন। আমি তাঁহাকে কোনও খবর না দিয়াই বাটী যাইতেছিলাম। ৭ দিন পূর্ব্বে একখানি চিঠি লিখিয়াছি। আমি তাঁহাকে ১০।১২ দিন অন্তর চিঠি লিখি,

সুতরাং আর ৪৫ দিন কোনও পত্র না পাইলে তিনি উদ্বিগ্ন হইবেন না। আমি কাল তাঁহাকে একখানি চিঠি লিখিব।" বালিকা বলিল "আপনি অনেকক্ষণ কথা কহিয়া ক্লান্ত হইয়াছেন এখন একটু ঘুমান, আমি স্নান করিয়া আসি। বুধি গাইকে দুধ দোয়াইতে হবে আমায়, আমি তাহার গলায় হাত না বুলাইলে দুধ দেয় না।" আমি বলিলাম "আর একটা কথা বলিয়া যাও—গ্রামের নাম কি? আমার আশ্রয়দাতার নাম ও পরিচয় দাও।"

বালিকা বলিল, "এ গ্রামের নাম—। আমার বাবার নাম শ্রীরামনাথ ভাদুড়ী। তিনি পূর্ব্বে গৌহাটীতে কাজ করিতেন, এক্ষণে কিছুদিন হইল পেন্‌সন লইয়া স্বগ্রামে বাস করিতেছেন। আমরা গৌহাটী হইতে মাস ছয় আসিয়াছি।" বালিকা শিশুর মত নৃত্যশীল পদবিক্ষেপে গৃহের বাহিরে চলিয়া গেল। যতক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল, আমি তাহাকে দেখিতে লাগিলাম।

রামনাথ ভাদুড়ী মহাশয়ের পরিচয়ে আমি আনন্দে ও বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়াছিলাম। তিনি পিতার বাল্যবন্ধু ছিলেন, উভয়ে একত্রে এক স্কুলে পড়িয়াছিলেন। তাহার পর উভয়ের বহুকাল হইতে দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। পরে বাবা যখন রংপুর হইতে দুই বৎসর হইল বদলী হইয়া গৌহাটীতে আসেন তখন তাঁহাদের পূর্ব্ব বন্ধুত্ব আবার পূর্ণরূপে সংস্থাপিত হয়। উভয়ে উভয়ের গুণে মুগ্ধ হইয়া বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে অভিলাষী হন। ভাদুড়ী মহাশয়ের কন্যার সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়। কিন্তু আমার পূর্ব্ববঙ্গে বিবাহের ইচ্ছা না থাকায়, এপর্য্যন্ত উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। আমি দুই বৎসর নানা ছলে বাবার সহিত সাক্ষাৎ করি নাই। তিনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ লোক, প্রথমে ক্রমে আমার মত ফিরিবে ভাবিয়া বিশেষ কিছু করেন নাই, কিন্তু ক্রমশঃ আমারও জেদ যত বাড়িতে লাগিল তিনি ততই

দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইতে লাগিলেন। ভাদুড়ী মহাশয়কে কথা দিয়া তাহার অন্যথা করা তাঁহার বড় অপমানজনক বোধ হইত। এই বৈশাখে তিনি আমার বিবাহ দিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। কড়া চিঠিও গিয়াছিল। পিতা পুত্রে মনান্তর হইবার উপক্রম হইতেছিল।

(৪)

ঔষধ খাওয়ার পরে প্রায় ঘণ্টা খানেক ঘুমাইয়াছিলাম। উঠিয়া দেখিলাম ভাদুড়ী মহাশয় ও তাঁহার গৃহিণী, হরপার্ব্বতীর মত দণ্ডায়মান আছেন। আমার সুস্থাবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের উভয়ের মুখ প্রফুল্ল। গৃহিণী আমার জন্য পথ্য আনিয়াছিলেন, আমারও ক্ষুধা পাইয়াছিল; খাদ্যদ্রব্য নিঃশেষ করিয়া কিছু সুস্থ হইলে, গৃহিণী বলিলেন "বাবা, তোমাকে সুস্থ দেখে আমাদের যে কি পর্য্যন্ত আনন্দ হইয়াছে, তাহা আর বলিতে পারি না। প্রথম দুই দিন তোমার যেরূপ জ্বর হইয়াছিল, তাহাতে আমাদের বড় ভয় হইয়াছিল। ভগবানের ইচ্ছায় সব বিপদ কাটিয়া গিয়া এখন শীঘ্র শীঘ্র সবল হইয়া উঠ এই প্রার্থনা"। ভাদুড়ী মহাশয় বলিলেন "তোমার পিতামাতাকে সম্বাদ দেওয়া সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য, আমরা তাঁহাদের ঠিকানা পাই নাই বলিয়া খবর দিতে পারি নাই, তাঁহারা হয়ত কত ভাবিতেছেন। ঠিকানাটা বল, আমি একটা টেলিগ্রাম পাঠাইয়া দি।" আমার মনে অনেক কথা আসিতেছিল, কিন্তু মুখে একটীও যোগাইল না। এই সময়ে আমার হৃদয়স্থিত যাবতীয় কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস যেন আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরস্থ বাষ্প ও দ্রব পদার্থের ন্যায় উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল। পিতার নাম বলিয়া তাঁহাদের পদধূলি লইলাম—বেশী কিছু বলিতে পারিলাম না, নয়নে বারিধারা বহিতে লাগিল। ভাদুড়ী মহাশয় আমাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। গৃহিণী পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে

লাগিলেন। আমাদের প্রিয়জনের ক্রন্দনে আমাদের পূর্ণ পরিচয় হইয়া গেল।

(৫)

আমি দিন দিন আরোগ্য হইতে লাগিলাম। ভাদুড়ী মহাশয় বাবাকে চিঠি লিখিয়া আমায় আরও কয়েক দিন রাখিবার বন্দোবস্ত করিলেন। আমারও অনুমাত্র আপত্তি ছিল না। মাতৃহীন হইবার পর হইতে জীবনে এমন যত্ন স্নেহ কখনও পাই নাই। মেসের হট্টগোলের মধ্যে মেস-জীবনের বিশেষ আমোদ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে যে কোনও স্নেহমমতা নাই, তাহা স্থির। ভাদুড়ী-দম্পতি আমার পরিচয়ের কথা সম্ভবত কাহারও কাছে ব্যক্ত করেন নাই। কারণ বালিকা পূর্ব্বের ন্যায় নিঃশঙ্কোচভাবে আমার নিকট আসিত। তাহার দৃষ্টিতে লজ্জার লেশমাত্র ছিল না, ছিল সেই সরলতা, সেইবুদ্ধি ও সেই অপার করুণা। তাহার সেই করুণা যেন যাবতীয় প্রাণীর উপরে নিবদ্ধ ছিল। গৃহস্থিত পশুগুলি সকলেই তাহাকে চিনিত এবং তাহার উপর নিজের কতটুকু দাবী তাহা বুঝিত। কুকুরটী তাহার আহারের পর ধীরে ধীরে তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিত, তাহার প্রত্যেক কথাটী বুঝিত। রাজহংসটী সুদীর্ঘ গ্রীবা বক্র করিয়া পাড়ার অন্যান্য ছেলেদের ভীতিপ্রদ ছিল, কিন্তু বালিকার কাছে সে নিতান্ত শান্ত ছিল। বুধিগাই ও তাহার ক্ষুদ্র বৎসটী তাহার একটী আদরে গলিয়া পড়িত। আমার কাছে আসিয়া কখনও সে গল্প করিত, তাহার পশুপক্ষী পাড়াপর্শিদের কথা বলিত, আর কখনও আমার কাছে আমার স্বরচিত ও অন্যান্য কবিতা পড়িত। "কথা" পড়িতে পড়িতে তাহার মুখশ্রী নানা ভাব ধারণ করিত—কখনও বা শিখবীর বন্দার ও মৈত্রিরাজকুমারের অপূর্ব্ব বীরত্বে তাহার হৃদয় উৎফুল্ল হইত, আবার তাহাদিগের শোচনীয় পরিণামে তাহার নয়নদ্বয় জল-

ভয়াক্রান্ত হইয়া পড়িত। কথা ও আমার কবিতার খাতার সমুদায় কবিতাই সে কয়দিনে মুখস্থ করিয়াছিল। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম তাহার বঙ্গসাহিত্যে দখল নিতান্ত কম নহে। পিতা তাহাকে ইংরাজী ও সংস্কৃত কিছু কিছু শিখাইয়াছিলেন। ভাদুড়ী-গৃহিণী তাঁহার রন্ধন কৌশলের পরিচয়ও মাঝে মাঝে দিতেন। কোনও দিন অন্যান্য রন্ধন নিজে করিয়া কন্যাকে একটা তরকারী করিতে বলিতেন। কোন দিন বলিতেন "মা শ্রীপতিকে তোমার—রান্নাটা খাওয়াও।" আমি এসব দেখিয়া তাহাকে বিজ্ঞানশিক্ষা দিতে উৎসুক হইলাম। বিজ্ঞানের সব আশ্চর্য্য ব্যাপারের কথা, বৈজ্ঞানিকদিগের শক্তির কথা, তাহাকে বলিতাম এবং কতকগুলি সহজ-বোধ্য বিষয় তাহাকে বুঝাইতাম। ছোট ছোট পরীক্ষা করিতাম—আরসী হইতে আলোক রেখা কিরূপে প্রতিফলিত হয়, কিপ্রকারে সেই প্রতিফলিত আলোককে সঙ্কেতে পরিণত করা যাইতে পারে এবং যুদ্ধেই বা তাহার দ্বারা কিরূপে সম্বাদ পাঠান যায়, তাহা এবং অন্যান্য ছোট ছোট আমোদজনক পরীক্ষা করিতাম। পাড়ার অন্যান্য কুতূহলী বালকবালিকাও ইহাতে যোগ দিত। এইরূপে কয়দিন বেশ আমোদেই কাটিতে লাগিল।

কিন্তু সত্বরই এই আনন্দের শেষ হইল। সেই রাত্রির প্রথমে খানিকটা সুন্দর জ্যোৎস্না ছিল। আমার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছিল। গল্পাদির পরে আমরা সকলে নিদ্রিত হইয়াছিলাম। আমি একটা আলাদা ঘরে ঘুমাইতেছিলাম। কত রাত্রি হইয়াছে বলিতে পারি না, সহসা বিকট চীৎকারে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সেই গভীর নীরব অন্ধকার রাত্রে সহসা রে রে ধ্বনি—কি ভয়ানক! অকস্মাৎ নিদ্রা ভাঙ্গিয়া একটা বিষম ভয় হইল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রবল হইল; আমার জীবনদাতার বাটীতে ডাকাইত পড়িয়াছে, তাহাদিগের কতই না অনিষ্ট করিবে, হয়ত প্রাণেই বিনষ্ট করিবে। এই ভাবিয়া আমি দ্রুতবেগে

দরজা খুলিতে গেলাম। বাহির হইতে দরজা বন্ধ। দস্যুগণ শিকল দিয়া আমাকে আবদ্ধ করিয়াছে। একবার অন্য ঘর হইতে বিষম ক্রন্দনপূর্ণ গোলযোগ শুনিতে পাইলাম। উন্মত্তের মত আমি দ্বারে সবেগে লাথি মারিতে লাগিলাম। শরীর তখনও দুর্ব্বল, নিস্ফল চেষ্টায় কিছুক্ষণ মধ্যে অচেতন হইলাম।

চৈতন্য পাইয়া দেখিলাম প্রতিবেশিগণ উপস্থিত হইয়াছে। আমি ভাদুড়ী-দম্পতির গৃহে গমন করিয়া দেখিলাম, শোকে, দুঃখে ও লজ্জায় তাঁহারা অত্যন্ত অধীর হইয়াছেন। গৃহিনী পুঃনপুঃন মূর্চ্ছা যাইতেছেন; প্রাণাধিকা কন্যাশোক-বিধুরা সেই দম্পতির রোদনে আমার প্রাণে দারুণ যন্ত্রণা হইতে লাগিল। আমি তখন কিছু চিত্তস্থির করিয়া ভাদুড়ী মহাশয় ও প্রতিবেশিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "এক্ষণে আমাদিগকে শোক পবিত্যাগ করিয়া যাহাতে কমলাকে শীঘ্র উদ্ধার করিতে পারি তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। আমার প্রাণ দিয়াও যদি তাহাকে উদ্ধার করিতে পারি, আমি তাহাতে প্রস্তুত আছি। আমাকে কি করিতে হইবে বলুন"। এক বৃদ্ধ প্রতিবেশী চিন্তিতভাবে বলিল "কি করিতে চাও?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "নিশ্চয়ই ভিতরে কোন বড়লোক আছে, কে ডাকাইতি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়? সাধারণ ডাকাইতে মেয়ে চুরি করে না"। ইহাতে ভাদুড়ী মহাশয় অত্যন্ত আবেগের সহিত বলিলেন "সন্দেহ— সন্দেহ কিছুমাত্র নাই, নিশ্চয়ই সেই দুরাত্মা রতনপুরের জমিদার-পুত্র প্রবোধ আমার কমলাকে অপহরণ করিয়াছে—ইহা নিশ্চয়ই সেই পাপিষ্ঠের কার্য্য"। তিনি এরূপ বিষম ক্রোধের সহিত এই কথা কয়টী বলিলেন, তাহাতে আমি স্তম্ভিত হইলাম, পুনশ্চ সেই বৃদ্ধ প্রতিবাসীর মুখের দিকে চাহিলাম। বৃদ্ধ বলিলেন "উনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ঠিক, ইহা সেই দুরাত্মারই কর্ম্ম। রামনাথের কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া

সেই দুষ্ট তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করে। কিন্তু তাদৃশ দুষ্কর্ম্মান্বিত পাষণ্ডের হস্তে কন্যাসম্প্রদান করা অপেক্ষা কন্যাকে জলে ফেলিয়া দেওয়া ভাল। বুদ্ধিমান রামনাথ তাহাতে স্বীকার পান নাই। দুরাত্মা এক্ষণে সেই রাগে এই অপকর্ম্ম করিয়াছে।" শুনিয়া আমি কিছু চিন্তিত হইলাম, "তবে এখন কি করা যায়, পুলিসেই কি প্রথমে খবর দিব?" ক্রমশঃ অনেক লোক জমিয়াছিল, তাহার মধ্যে হইতে একটা শ্রুতিকঠোর স্বর বলিয়া উঠিল "রতনপুরের জমিদারদের জাননা, পুলিস তাদের হাতধরা, পুলিসে খবর দিয়া কি করিবে?" বৃদ্ধও তাহাতে সায় দিলেন। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম "এখানে কি লোকজন যোগাড় করিয়া পুনরায় ডাকাতি করা যায় না?" বৃদ্ধ ইহাতেও ঘাড় নাড়িলেন। আর একটা ঠিক পূর্ব্বেরই মত অপ্রীতিকর কণ্ঠ বলিয়া উঠিল "ছেলে মানুষ—জমিদারের লাঠিয়ালদের চেনে না।" বক্তাদের কথা এরূপ সহানুভূতিশূন্য যে আমি বুঝিলাম, এখানে পরামর্শ করা উচিত নহে, শত্রু নিকটে আছে। তখন আমি বলিলাম "এখানে ত কিছু হইবে না দেখিতেছি, আমি বেলা ৯টার সময় এখান হইতে রওনা হইব, জেলা কোর্টে আমার কাকা বড় উকীল, তাঁহার সহিত পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের বিশেষ আলাপ আছে। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব যাহাতে স্বয়ং এবিষয় নিজে তদন্ত করেন, আমি তাহার বন্দোবস্ত করিব। বিশেষ এই দলের মধ্যে আমি কালকার ডাকাতিতে লিপ্ত কয়জনকে দেখিতেছি, সর্ব্বপ্রথম তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করাইয়া পীড়ন করিলেই সকল কথা বাহির হইয়া পড়িবে।" বলা বাহুল্য আমার পূর্ব্বোক্ত সব কয়টা কথাই বানান। অনাহূত, মজাদেখা শ্রোতৃবৃন্দের পক্ষে সে সকল কথার সত্যতা প্রমাণ করার সময় ছিল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই দোষী নির্দ্দোষী সকলেই সরিয়া পড়িল। কেবল জনকয়েক তথায় রহিল। তাহাদিগের সকলকে বিশ্বাস করা যাইতে পারে কি না

এ কথা আমি ভাদুড়ী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন ইহারা সকলেই আমার হিতাকাঙ্ক্ষী। ইহাদের মধ্যে সেই বৃদ্ধ, আর দুইটী ভদ্রসন্তান এবং তিনজন চাষীলোক। চাষী কয়জন তাঁহার, তাহাদের একজন মুসলমান। আমার তাহাদিগের উপর সন্দেহ হইতেছিল। তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ, পাকান পাকান সুদৃঢ় মাংসপেশীযুক্ত, যজ্ঞেশ্বর সিংহ বলিল "বাবু, আমাদের চিনেন না, আমরা কর্ত্তামশাইয়ের চিরকেলে রায়েৎ, দিদি ঠাকরুণের আমাদের উপর যে দয়া ছিল, আমাদের প্রাণ দিয়ে যদি তাঁকে উদ্ধার করা যায় তাতে আমরা প্রস্তুত আছি, বলেন ত আজই প্রবোধ লাহিড়ীর মুণ্ডুটা আপনার কাছে এনে দিতে পারি।" *আমার, সেই হাড়ি-নন্দনের সরল কথায় বিশ্বাস হইল,* বলিলাম— "আপাততঃ তাহার মুণ্ডু আনয়নে আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে, কিন্তু যাহার উদ্ধারের চেষ্টা হইতেছে তাহার কিছুই হইবে না।" আমি জানিতাম বেশী বিপদের কার্য্যে যে ভয় পায়, থতমত খায় তাহাদের উপরে লোকে নির্ভর করিতে পারে না। কাজেই আমি খুব সাহসের ভাব দেখাইলাম। আমি বলিলাম "আপনার কন্যাকে আমি যে প্রকারেই পারি শীঘ্র উদ্ধার করিয়া আনিব। জমিদার বাবু যতই দুর্দ্দান্ত হউন একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের উপর অত্যাচার করিয়া যে সহজে নিষ্কৃতি পাইবেন না, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানেন। ছোটলোক হইলে আপনার কন্যার উপর অত্যাচার করিতে পারিত। কিন্তু চিরকাল সুখক্রোড়ে-লালিত ধনিসন্তানের পক্ষে শ্রীঘরবাসের ভয় যে বেশী হইবে তাহাতেও সন্দেহ নাই। আমার বিশ্বাস সে আপনার কন্যাকে জোর করিয়া বিবাহ করিবে এবং বিবাহের পর আর আপনি কোনও গোলযোগ করিতে পারিবেন না, এই তাহার সাহস।" বিবাহের কথায় ভাদুড়ী মহাশয় আবার কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন "তাদৃশ

পামরের সহিত আমার সেই সুশীলা কন্যা বিবাহিত হইবার পূর্ব্বে যেন তাহার প্রাণান্ত হয়।” আমি তখন আমার কলিকাতাস্থ ব শরৎচন্দ্রকে এক টেলিগ্রাম করিলাম। টেলিগ্রামের মর্ম্ম এই যে “আমি এখানে বিপদে পতিত হইয়াছি তুমি শীঘ্র তোমার রাসায়নি উপকরণ সমূহ লইয়া এখানে আইস।” উপস্থিত জনৈক ভদ্রলো টেলিগ্রামখানি ষ্টেসনে গিয়া দিয়া আসিতে রাজি হইলেন। আমি তখন কিছু আহারাদি করিয়া যজ্ঞেশ্বরের সহিত রতনপুরাভিমুখে রওনা হইলাম। রতনপুর সেখান হইতে ৮ ক্রোশ দূরে। রাত্রিকালে পুনরা আসিব, এ কথা ভাদুড়ী মহাশয়কে বলিয়া গেলাম।

(৬)

আমার সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞেশ্বর আমার জিনিস পত্র লইয়া চলিল লোকটার ডাকাতের মত চেহারা হইলেও ক্রমশঃ কথাবার্ত্তায় তাহা উপর ভক্তি হইল। দেখিলাম লোকটার বেশ বুদ্ধি সুদ্ধিও আছে এবং তাদৃশ লোক যে প্রকৃতই প্রভুর কার্য্যে প্রাণ দিতে সক্ষম, ইহাতে আমার কোনও সন্দেহ রহিল না। তাহার নিকট হইতে রতনপুরে বাবুদের খবর লইতে লাগিলাম, যে সব খবর পাইলাম তাহাতে আমাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। কার্য্যটা যত শক্ত ভাবিয়াছিলাম দেখিলা তাহা অপেক্ষাও অনেক শক্ত। উভয়ে নীরবে চলিলাম। যদিও আমি দ্রুত হাঁটিতে পারিতাম, কিন্তু কোনও কালে আমার রৌদ্রে ভ্রম অভ্যাস ছিল না, কাজেই চলাটা দ্রুত হইতেছিল না। আমার এ অপটুতা দেখিয়া যজ্ঞেশ্বর যেন একটু বিরক্ত হইতেছিল। তাহা মুখ দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যে, আমি যে কোনও কাজের লোক তাহা তাহার ধারণা হইতে ছিল না। সে হয়ত ভাবিতেছিল “ে লোকটা এই আট ক্রোশ পথ চলিতে হাঁফাইয়া পড়ে, সে কিনা আগ্রহে সহিত এত বড় একটা কাজ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিল।”

যাহা হউক অতিকষ্টে দুইটা নাগাইদ রতনপুরে আসিয়া পঁহুছিলাম। রতনপুর একটী প্রকাণ্ড গণ্ডগ্রাম। গ্রামের প্রায় অর্দ্ধাংশই জমিদার-বাটী। বাকী সব কুঁড়ে ঘর। সমস্ত জমিদারবাটীর বেধ প্রায় তের ক্রোশ,—উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা। প্রাচীরের পর সুশ্রেণীবদ্ধ শাল, তমাল, কদম্ব, বকুল আদি বৃক্ষের সারি। বাটীর ভিতর বড় বড় পুষ্করিণী বাগান; দুই ধারে পুষ্পবাটীকা সংযুক্ত পথ, অনেক শিবমন্দির, বিষ্ণুমন্দির, কালীমন্দির ও বহু নিকুঞ্জ ও নিম্নে বসিবার স্থান আদি অবস্থিত। বাটীর তিনটা গেট এবং প্রত্যেক গেটে সশস্ত্র পাহারার বন্দোবস্ত আছে। অন্তঃপুর ব্যতীত আর সকল স্থানই বাহিরের লোককে দেখিতে দেওয়া হয়। আমরা বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া, বিস্ময়স্তিমিত লোচনে তাহার সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতে লাগিলাম। সেই প্রকাণ্ড প্রাসাদের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অট্টালিকা সংস্থাপিত। ইহার কোন্‌টীর ভিতরে কমলাকে লুক্কায়িত রাখিয়াছে তাহা বাহির করিব কি প্রকারে? এই চিন্তা আমার মনে অত্যন্ত কষ্ট দিতে লাগিল। চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে এবং প্রত্যেক অট্টালিকার গবাক্ষ মধ্য দিয়া নিস্ফল উঁকিঝুঁকি মারিতে মারিতে আমরা ক্রমশঃ অন্তঃপুর সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রথমেই জমিদার বাটীর কাহারও নিকট কোন কথা জিজ্ঞাসা করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। ঠিক করিলাম প্রথমে আমরা নিজে যতটা পারি চেষ্টা করিয়া দেখিব, তাহাতে যদি কোনও খবর বাহির করিতে না পারি, তখন অন্য লোককে জিজ্ঞাসা করিব, নচেৎ নহে।

অন্তঃপুরও প্রহরীরক্ষিত। গেটের পার্শ্বে একটী একতালা কোটা; ভৃত্যাদির আবাসস্থান ও প্রাচীরের কাজ এই দুই কাজ করিত। অন্তঃপুরের পশ্চিম দিকে বাহিরে একটী মাঝারী আকারের উত্তম জলযুক্ত পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর চারিধারে বাঁধান পাকা রাস্তা এবং রাস্তার ধারে

পামরের সহিত আমার সেই সুশীলা কন্যা বিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই যেন তাহার প্রাণান্ত হয়।” আমি তখন আমার কলিকাতাস্থ বন্ধু শরৎচন্দ্রকে এক টেলিগ্রাম করিলাম। টেলিগ্রামের মর্ম্ম এই যে, “আমি এখানে বিপদে পতিত হইয়াছি তুমি শীঘ্র তোমার রাসায়নিক উপকরণ সমূহ লইয়া এখানে আইস।” উপস্থিত জনৈক ভদ্রলোক টেলিগ্রামখানি ষ্টেসনে গিয়া দিয়া আসিতে রাজি হইলেন। আমি তখন কিছু আহারাদি করিয়া যজ্ঞেশ্বরের সহিত রতনপুরাভিমুখে রওনা হইলাম। রতনপুর সেখান হইতে ৮ ক্রোশ দূরে। রাত্রিকালে পুনরায় আসিব, এ কথা ভাদুড়ী মহাশয়কে বলিয়া গেলাম।

(৬)

আমার সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞেশ্বর আমার জিনিস পত্র লইয়া চলিল। লোকটার ডাকাতের মত চেহারা হইলেও ক্রমশঃ কথাবার্ত্তায় তাহার উপর ভক্তি হইল। দেখিলাম লোকটার বেশ বুদ্ধি সুদ্ধিও আছে। এবং তাদৃশ লোক যে প্রকৃতই প্রভুর কার্য্যে প্রাণ দিতে সক্ষম, ইহাতে আমার কোনও সন্দেহ রহিল না। তাহার নিকট হইতে রতনপুরের বাবুদের খবর লইতে লাগিলাম, যে সব খবর পাইলাম তাহাতে আমাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। কার্য্যটা যত শক্ত ভাবিয়াছিলাম দেখিলাম তাহা অপেক্ষাও অনেক শক্ত। উভয়ে নীরবে চলিলাম। যদিও আমি দ্রুত হাঁটিতে পারিতাম, কিন্তু কোনও কালে আমার রৌদ্রে ভ্রমণ অভ্যাস ছিল না, কাজেই চলাটা দ্রুত হইতেছিল না। আমার এই অপটুতা দেখিয়া যজ্ঞেশ্বর যেন একটু বিরক্ত হইতেছিল। তাহার মুখ দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যে, আমি যে কোনও কাজের লোক তাহা তাহার ধারণা হইতে ছিল না। সে হয়ত ভাবিতেছিল, “যে লোকটা এই আট ক্রোশ পথ চলিতে হাঁফাইয়া পড়ে, সে কিনা আগ্রহের সহিত এত বড় একটা কাজ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিল।”

যাহা হউক অতিকষ্টে ছুইটা নাগাইদ রতনপুরে আসিয়া পঁহু-ছিলাম। রতনপুর একটী প্রকাণ্ড গণ্ডগ্রাম। গ্রামের প্রায় অর্দ্ধাংশই জমিদার-বাটী। বাকী সব কুঁড়ে ঘর। সমস্ত জমিদারবাটীর বেধ প্রায় তের ক্রোশ,—উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা। প্রাচীরের পর সুশ্রেণীবদ্ধ শাল, তমাল, কদম্ব, বকুল আদি বৃক্ষের সারি। বাটীর ভিতর বড় বড় পুষ্করিণী বাগান; ছুই ধারে পুষ্পবাটীকা সংযুক্ত পথ, অনেক শিবমন্দির, বিষ্ণুমন্দির, কালীমন্দির ও বহু নিকুঞ্জ ও নিম্নে বসিবার স্থান আদি অবস্থিত। বাটীর তিনটা গেট এবং প্রত্যেক গেটে সশস্ত্র পাহারার বন্দোবস্ত আছে। অন্তঃপুর ব্যতীত আর সকল স্থানই বাহিরের লোককে দেখিতে দেওয়া হয়। আমরা বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া, বিস্ময়স্তিমিত লোচনে তাহার সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতে লাগিলাম। সেই প্রকাণ্ড প্রাসাদের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অট্টালিকা সংস্থাপিত। ইহার কোন্‌টীর ভিতরে কমলাকে লুক্কায়িত রাখিয়াছে তাহা বাহির করিব কি প্রকারে? এই চিন্তা আমার মনে অত্যন্ত কষ্ট দিতে লাগিল। চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে এবং প্রত্যেক অট্টালিকার গবাক্ষ মধ্য দিয়া নিষ্ফল উঁকিঝুঁকি মারিতে মারিতে আমরা ক্রমশঃ অন্তঃপুর সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রথমেই জমিদার বাটীর কাহারও নিকট কোন কথা জিজ্ঞাসা করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। ঠিক করিলাম প্রথমে আমরা নিজে যতটা পারি চেষ্টা করিয়া দেখিব, তাহাতে যদি কোনও খবর বাহির করিতে না পারি, তখন অন্য লোককে জিজ্ঞাসা করিব, নচেৎ নহে।

অন্তঃপুরও প্রহরীরক্ষিত। গেটের পার্শ্বে একটী একতালা কোটা, ভৃত্যাদির আবাসস্থান ও প্রাচীরের কাজ এই ছুই কাজ করিত। অন্তঃ-পুরের পশ্চিম দিকে বাহিরে একটী মাঝারী আকারের উত্তম জলযুক্ত পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর চারিধারে বাঁধান পাকা রাস্তা এবং রাস্তার ধারে

কতিপয় সুচ্ছায়াসমন্বিত বকুল ও অশোক বৃক্ষ, সান দ্বারা বাঁধান হইয়া পান্থদিগের বসিবার উপযোগী হইয়াছে। আমরা ঘাটে হাত মুখ ধুইয়া কিছু জলপান করিয়া পশ্চিমদিকের একটা সুন্দর বকুল গাছের সান বাঁধান তলায় বসিয়া পড়িলাম। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলাম, শীঘ্রই সেই রম্যস্থানে শীতল সমীরণস্পর্শে নিদ্রাভিভূত হইয়া শুইয়া পড়িলাম। যজ্ঞেশ্বর বসিয়া রহিল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে, যজ্ঞেশ্বর আমাকে নিদ্রা হইতে তুলিল। তাহার মুখে বিরক্তির চিহ্ন বিদ্যমান। আমাকে বলিল "বাবু, এখানে যদি ঘুমিয়েই সব সময়টা কাটিয়ে দেবেন, তবে যে কাজের জন্য এসেছেন তা করবেন কখন?" আমি একটু অপ্রতিভ হইয়া উঠিয়া হাত মুখ ধুইতে পুষ্করিণীর ঘাটে গমন করিলাম। তখন বেলা প্রায় চারিটা, সন্ধ্যা হইতে আর ঘণ্টাদেড় মাত্র সময় বাকী আছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে কেমন করিয়া কার্য্যসিদ্ধ হইবে, ইহা ভাবিতে ভাবিতে আমি কিছু অস্থির হইয়া উঠিলাম। ইতস্ততঃ চাহিতে চাহিতে সহসা দেখিতে পাইলাম, আমরা যে গাছটার তলায় বসিয়াছিলাম, তাহার শ্যাম পত্রাবলীর উপরে, কখনও বা তাহা হইতে ভূতলে, পরে পুষ্করিণীর জলে, ছোট একটু রৌদ্র পতিত হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতেছিল। বৃক্ষটার পশ্চিম দিকে অনতিদূরে রাসমঞ্চের প্রকাণ্ড অট্টালিকা। বৃক্ষ ও পুষ্করিণী তখন সেই অট্টালিকার ছায়ায় অবস্থিত ছিল। তাহাতে স্বাভাবিক সূর্য্যকিরণ পতিত হইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। কাজেই সেই ক্ষুদ্র রৌদ্রটুকু দেখিয়া আমার মনে হইল যে, উহা কোথাও হইতে প্রতিফলিত হইয়া আসিতেছে। কোন্ স্থান হইতে উহা আসিতেছে তাহা জানিবার জন্য আমি সত্বর হাতমুখ ধুইয়া পূর্ব্বের স্থানে আসিয়া বসিলাম। এইবার রৌদ্রটুকু পূর্ণরূপে আমার মুখের উপর পড়িল, আমার তথা হইতে বৃক্ষের উপর দিয়া রাজমঞ্চের অট্টালিকার উপর

পতিত হইল ও ঘুরিতে লাগিল। আমি তখন সেই ঘূর্ণ্যমান রৌদ্রের পথ ঠিক করিবার জন্য সেই রাসমঞ্চের নিকট উপস্থিত হইলাম। যজ্ঞেশ্বর অত্যন্ত অধীর হইতে লাগিল কিন্তু এখন সে দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম না। রৌদ্রের গতি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম সেগুলি অক্ষর হইতেছে। খানিকক্ষণ দেখিয়া বুঝিলাম গুটী কয়েক কথাই পুনঃপুনঃ লিখিত হইতেছে। সেগুলি সংগ্রহ করা হইল। "কমলা বন্দিনী, দু দিন পরে বিবাহ, শীঘ্র উদ্ধার, নতুবা আত্মহত্যা।" তবে ত কমলা এইখানেই অবরুদ্ধা আছে। এই প্রথম কৃতকার্য্যতায় অত্যন্ত আনন্দ হইল, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার উদ্ধার কিরূপ দুষ্কর তাহা ভাবিয়া মন দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হইল। অক্ষর কয়টী যেরূপ ভাবে পুনঃপুনঃ লিখিত হইতেছিল, তাহাতেও বোধ হইল, আমরা যে বর্ত্তমান সময়ে ঠিক উপস্থিত আছি, একথা কমলা নিশ্চিত না জানিতেও পারে। পুষ্করিণীর পশ্চিম পারে লোক দেখিয়াই সে এইরূপে দর্পণ দ্বারা আলোক প্রতিফলিত করিয়া সঙ্কেত করে। আশা যে আমরাও নিশ্চিত এক সময়ে না এক সময়ে আসিব। তাহার বুদ্ধিকৌশল দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। গিয়া যজ্ঞেশ্বরকে বলিলাম কমলার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সে ঐ অন্তঃপুরের ত্রিতল অট্টালিকায় বন্দী হইয়া আছে এবং শীঘ্র তাহাকে উদ্ধার করিতে হইবে। যজ্ঞেশ্বর আমার কথা শুনিয়া একটা দারুণ অবিশ্বাসের হাস্য হাসিল। সে একবার সেই দূরস্থ ত্রিতল অট্টালিকার প্রতি তীব্র দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিল "বাবু, আপনি যদি এখান হইতে ঐ অট্টালিকার ভিতরের লোক দেখিতে পান ও তাহাদের সহিত কথা কহিতে পারেন, তাহা হইলে আপনি মানুষ নহেন" বলিয়া পুনশ্চ একটু হাসিল। আমি তাহার কথায় কোনও উত্তর না দিয়া, চারিদিক দেখিয়া লইলাম। দেখিলাম কেহ নাই। তখন তাড়াতাড়ি আমার পুঁটুলিটি হইতে একটি দূরবীণটী

বাহির করিয়া, যজ্ঞেশ্বরকে বলিলাম "যদি কোন লোক বিশেষতঃ ভদ্রলোক এখানে আসে, তবে আমাকে সাবধান করিয়া দিবে।" দুরবীণ চক্ষে লাগাইয়া যাহা আশা করিয়াছিলাম তাহাই দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম কমলা আরসী লইয়া আলোক প্রতিফলিত করিতেছে। তাহার সেই সরলা বালিকা-মূর্ত্তি এই একদিনের মধ্যেই চিন্তামগ্না বিষাদিনী যুবতী-মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে। প্রাণ ভরিয়া তাহাকে দেখিবার আশা থাকিলেও বেশীক্ষণ দেখা নিরাপদ নহে ভাবিয়া ক্ষান্ত হইলাম। তখন যজ্ঞেশ্বরকে সেই যন্ত্রের ভিতর দিয়া দেখিতে বলিলাম। দেখিয়াই সে আগ্রহে বলিয়া উঠিল "এযে দিদি ঠাকরুণ।" আমি বলিলাম "চুপ্, গোল করিও না, এ শত্রুপুরী।" আমি স্থিরভাবে যজ্ঞেশ্বরের বিস্মিত কলেবর অবলোকন করিতেছিলাম। এতক্ষণ পরে সে যেন শারীরিক বল অপেক্ষা জ্ঞানবলের প্রাধান্য বুঝিতে পারিল, দেখা শেষ হইলে সে গভীর ভক্তিভরে আমার পায়ের ধূলা লইয়া বলিল "দাদাঠাকুর, প্রথমে তোমার কাজ করিবার শক্তির উপর আমার কোনও বিশ্বাস হয় নাই কিন্তু এখন বুঝিয়াছি তুমি সব পার, এখন তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব।" তাহার উপর এইরূপ বিজয় লাভ করিয়া আমি মনোমধ্যে একটা আনন্দজনক আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম। আমি তখন বলিলাম আজ আর কিছু করিবার নাই, সন্ধ্যা হইয়াছে এখন বাটী যাওয়া যাক্ কাল রাত্রি নাগাদ উদ্ধারের চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা তখন পুনরায় গৃহাভিমুখে রওনা হইলাম। আমি খানিক দূর চলিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলাম, তখন যজ্ঞেশ্বর আমার কোনও নিষেধ না মানিয়া আমাকে একবারে স্কন্ধে করিয়া লইয়া বাটীতে গিয়া পৌঁছছিল।

(৭)

পর দিন প্রাতে বন্ধুবর শরৎচন্দ্র আসিয়া পৌঁছিলেন। পাড়ার

লোকে ভাবিয়াছিল শরৎচন্দ্রের চেহারাটা একটা মস্ত পালোয়ানের মত হইবে। শরৎচন্দ্র নিশ্চয়ই লাঠি হাতে লইয়া দাঁড়াইলে একাই এক শত লোকের মোহাড়া লইতে পারিবে। বিপৎকালে আমি নিশ্চয়ই এরূপ একজন বীর বন্ধুকে আহ্বান করিয়াছি। কিন্তু তাহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া সকলে নিতান্ত বেকুব হইয়া গেল। সকলেরই কাছে ব্যাপারটা কিছু কৌতূহলজনক বোধ হইল। কেবল যজ্ঞেশ্বর এ ব্যাপারে কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হইল না, সে সকলকে বলিল, "গায়ের জোরে কি হয়, বাবুদের বুদ্ধি কত ?"

শরৎ আহার ও কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া সুস্থির হইল। আমরা উভয়ে বিশ্রাম ও পরামর্শ জন্য একটি গৃহে গিয়া তাকিয়া ঠেশ দিয়া শুইয়া পড়িলাম। চিরহাস্যময় শরৎ রহস্যভাবে কথা আরম্ভ করিল। "বাস্তবিক তোমার এরূপ একটা adventure হঠাৎ জুটাতে আমি বড়ই আনন্দিত হইয়াছি, আমরা সব বসে বসে যে এত সব scientific plan করতাম তার application করবার যে একটা সুযোগ জুটিয়াছে ইহাতে বড়ই আনন্দ হয় না কি ?"

আমি তাহার আনন্দে বাধা দিয়া সমস্ত ঘটনাটী খুলিয়া বলিলাম। সব শুনিয়া সে একটু গম্ভীরভাবে বলিল "তুমি যে এই পদ্মাপারে এমন এক বুদ্ধিমতী বৈজ্ঞানিকী Heroine এর দেখা পাইবে আমি তাহা আশা করি নাই। যাহাহউক এখন বৈজ্ঞানিকীকে উদ্ধার করিবার উপায় কি করিয়াছ ? আমাকে যাহা আনিতে সঙ্কেত করিয়াছিলে তাহা আনিয়াছি।" খানিকক্ষণ ধরিয়া দুই বন্ধুতে পরামর্শ করিয়া ঠিক হইল যে নিকটে সবডিভিসন টাউনে হরিমোহনের ভগ্নীপতি ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, তাহার কাছে কোনও সাহায্য পাওয়া যায় কিনা তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আমি যজ্ঞেশ্বরকে কতিপয় উপযুক্ত লোক, অর্থাৎ যাহারা পাকীর বেহারাগিরী এবং লাঠিবাজী

উভয় কার্য্যেই পোক্ত এমন কয়জন লোক লইয়া একখানা পাল্কী সঙ্গে রতনপুরের নিকট একটা নির্দ্দিষ্ট জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিবে এরূপ বলিয়া দিলাম। পাল্কীর ভিতরে লাঠি ও আমাদের রাসায়ণিক দ্রব্যাদি সংরক্ষিত হইল। কথা রহিল যে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা তাহাদের সহিত সেই জঙ্গলে সাক্ষাৎ করিব। আমরা তখন জনৈক ভদ্র লোকের সহিত নিকটবর্ত্তী—তে ডিপুটী বাবুর নিকট গমন করিলাম।

ডিপুটী বাবু বেশ ভদ্রলোক। আমাদের পরিচয় পাইয়া, যথোচিত আদর অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার নিকট সমস্ত ঘটনাটী বলাতে তিনি আমাদিগের সহিত সহানুভূতি করিলেন, এবং তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত রহিলেন। ডিপুটী বাবুর কথা অনুসারে ইন্‌স্‌পেক্টার বাবুকেও পরামর্শ মধ্যে গ্রহণ করা হইল। তাঁহাকে ডেপুটী বাবু লোক পাঠাইয়া ডাকাতে তিনি আসিলেন এবং সমস্ত শুনিয়া যাহা বলিলেন তাহা আমাদিগের বিশেষ ভরসাপ্রদ হইল না। তিনি বলিলেন "আপনারা অনেকে ভাবেন পুলিস একবারে অসীম ক্ষমতাশালী, কিন্তু তাহা নহে, সাধারণ লোকের উপর পুলিসের যথেষ্ট ক্ষমতা থাকিলেও ধনবানের উপর সেরূপ ক্ষমতা নাই। এতবড় একজন পরাক্রান্ত জমিদারের বাটী থানা-তল্লাসী করা আমাদের সাহসে কুলায় না। যদি থানা-তল্লাসী করিয়া তাহাদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করিতে না পারি, তবে আমাদিগকে নানা বিপদে পড়িতে হইবে। দেশের যাবতীয় সম্বাদপত্র আমাদিগের বিপক্ষে ভীষণ চীৎকার করিবে। জমিদারের ধনে ধনবান দেশের বড় বড় উকীল মোক্তারগণ আমাদিগের ধ্বংসসাধনে ব্যস্ত হইবেন। কাজেই আমরা ধনবানদিগের বিপক্ষে বিশেষ কিছু করিতে পারি না। এই বর্ত্তমান ঘটনাতেই কত গোলমাল দেখুন না। শ্রীপতি বাবু দূর হইতে মেয়েটীকে দেখিয়াছেন, তাঁহার ভ্রমও হইতে পারে। আবার ভ্রম না হইলেও তিনি সেই প্রকাণ্ড প্রাসাদের মধ্যে

সেই গৃহটী খুঁজিয়া লইতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। আবার পুলিসের লোকে সবলে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলে, গোলমাল হইবে। সেই গোলমালে সতর্ক হইয়া কন্যাটীকে তাহারা সরাইয়া ফেলিতেও পারে। এই সব ভাবিয়া দেখিলে ব্যাপারটী বিশেষ গুরুতর বলিয়া বোধ হইবে।” ইনস্পেক্টার বাবুর কথা শুনিয়া আমরা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলাম। শরৎ তখন বলিল “আমরা যদি এরূপ কোন বন্দোবস্ত করি যে আপনারা গেটে কোন রকম বাধা পাইবেন না এবং আপনারা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেও যদি কেহ জানিতে না পারে, আর যদি আমরা সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করি তবে আপনারা সাহায্য করিতে রাজি আছেন কি না?” ইন্‌স্পেক্টার বাবু ডেপুটী বাবুর মুখের দিকে চাহি-লেন। চাহনির অর্থ ইহাদের কথায় বিশ্বাস করা যাইতে পারে কি না? শরৎ আবার বলিল আপনারা যদি পুরী অবারিত দ্বার দেখিতে না পান ফিরিয়া আসিবেন। আরও কিছুক্ষণ বাক্ বিতণ্ডার পর তাঁহারা সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। ইন্‌স্পেক্টার বাবু জনকয়েক কনষ্টেবল সঙ্গে লইয়া, ইউনিফরম লুকাইয়া, থানায় কোথায় যাইতেছি তাহা না বলিয়া আমাদিগের সঙ্গে যাইবেন। ডেপুটী বাবুও এই সঙ্গে যাইবেন।

(৮০)

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা রতনপুরের নিকটে যজ্ঞেশ্বর ও তাহাঃ দলের সহিত মিলিলাম। শরৎ ও আমি তখন দল হইতে বাহিঃ হইয়া রতনপুরে প্রবেশ করিলাম। অন্যান্য সকলে সেই জঙ্গলে প্রস্তুত হইয়া রহিল। আধ ঘন্টা আন্দাজ সময়ের পর আমরা বাহির হইয় সকলকে পুরী প্রবেশ করিতে বলিলাম। গ্রামে প্রবেশ করিয়া দেখি সর্ব্বত্র মহাগোল উঠিয়াছে। গ্রামের সমুদায় লোকই রাজবাটী অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। সকলেরই মুখে রব “কালীর রোষ হইয়াছে।

সেই ভিড়ের ভিতর কেহ আমাদের লক্ষ্য করিল না। ভিড়ের ভিতর মিশাইয়া আমরাও রাজ-বাটীতে প্রবেশ করিলাম। সেখানে মহাভিড়। সমস্ত লোক কালীবাড়ী গিয়া জমায়েৎ হইতেছে। হঠাৎ এই সময়ে একটা বিষম শব্দ হইয়া উঠিল, যেন বোম ফাটিল। পশ্চাতের লোক সকল ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল। গোলমাল আরও শতগুণে বাড়িতে লাগিল। পুনঃপুনঃ যেন কালীবাটীতে অজস্র পটকা ফুটিতে লাগিল। আমরা কালীবাড়ী ছাড়াইয়া অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইলাম। যাহা আশা করিয়াছিলাম ঠিক তাহাই হইয়াছে; অন্তঃপুরের দিকে জনমানব নাই। প্রহরিগণ, দাসদাসীগণ সকলেই কালীবাড়ির দিকে ছুটিয়াছে। অন্তঃপুরকামিনীগণও কালীবাড়ীর ব্যাপার কি জ.... জন্য নিকটস্থ একটা বাটীর ছাদে উঠিয়াছে। অবাধে আমরা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সেই ত্রিতল অট্টালিকা অভিমুখে ধাবমান হইলাম। সিঁড়ির ঘর খোলা, দ্রুতবেগে আমরা উপরে উঠিলাম। উপরে উঠিয়া আমার একবার গোল লাগিল—কোন্ ঘরে কমলা আছে। একটা ঘরে চাবি দেওয়া দেখিলাম আর সব ঘরই খোলা, সন্দেহে ভয়ে যজ্ঞেশ্বরকে সেই ঘরটা দেখাইলাম। যজ্ঞেশ্বর দরজায় করাঘাত করিয়া হাঁকিল, "দিদি ঠাকরুণ।" এই ভীষণ গোলযোগে কে নিশ্চিন্ত আছে, কমলাও নিশ্চিন্ত ছিল না। যজ্ঞেশ্বরের কণ্ঠস্বরে আনন্দে বলিয়া উঠিল —"যজ্ঞেশ্বর, যজ্ঞেশ্বর। তোমরা এসেছ, শীঘ্র আমায় এখান থেকে নিয়ে চল।" যজ্ঞেশ্বর "দিদি ঠাকরুণ সর, আমি দরজা ভাঙ্গিব" বলিয়া দরজায় পদাঘাত করিতে লাগিল। সেই ভীম পদাঘাতে কতিপয় মুহূর্ত্ত মধ্যে দ্বার ভাঙ্গিয়া গেল। আমরা গৃহে প্রবেশ করিলাম। এই প্রথম কমলা আমার বাহুমধ্যে আসিয়া আনন্দে আবেগে মূর্চ্ছা

তাঁহারা আসামী ধরিবার জন্য রহিলেন। আমরা মূর্চ্ছিতা কমলাকে লইয়া চলিয়া গেলাম।

(৯)

বিবাহের কয়েক দিন পরে ডেপুটী বাবুর এক পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন :—

"প্রিয় মহাশয়,

আপনি ও আপনার সহধর্ম্মিণী আমার সস্নেহ সম্ভাষণ জানিবেন। আপনাদিগকে বিদায় দিয়া আমরা আসামী ধরিতে সেখানে রহিলাম। কিন্তু হতভাগ্য পার্থিব শাস্তির হাত এড়াইয়াছে। পুলিষ আসিয়াছে ও তাহার কৃতকর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে ধরা পড়িয়াছে বলিয়া এবং আর একটী কারণে, যাহা আমি নীচে লিখিতেছি, তাহা দ্বারা তাহার মস্তিষ্ক এতদূর বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল যে, সে আমাদের হস্তে পড়িবার পূর্ব্বেই পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করে।

আপনাদিগকে বিদায় দিয়া নিকটে কোন লোকজন না দেখিয়া আমরাও সেই মহাকোলাহলপূর্ণ কালীবাটী অভিমুখে গমন করিলাম। গিয়া যাহা দেখিলাম তাহা জীবনে কখনও ভুলিব না। আপনারা কি ভূত, প্রেত বা দৈবশক্তি মানেন ? সে দিনের ব্যাপারে বাস্তবিকই আমার মনে এক গুরুতর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অনেক কষ্টে কালী-বাটীর ভিতর উপস্থিত হইয়া দেখি বাটীর প্রাঙ্গনে কতকগুলা লোক তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে; হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী লাঠিয়াল ও দ্বারবান এবং ভদ্রলোক ও পূজারী বামুন সকলেই সে নৃত্যে যোগ দিয়াছেন। নৃত্য কিন্তু তাহাদের স্বেচ্ছাকৃত নহে, সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত ; তাহারা যেথানেই পা দেয় অমনি তাহাদের পায়ের নীচে কি একটা বিষম শব্দে ফুটিয়া যায়, বেচারী তখন লাফাইয়া সেথান হইতে অন্যত্র পড়ে,— সেথানেও ঠিক সেই রকম অবস্থা ঘটে। তাহাদের ভয়ে ও দারুণ

হতাশায় এবং বিকট মুখভঙ্গি দেখিয়া, সেই দুঃখের সময়েও হাস্য সংবরণ করা যায় না। শুধু তাহাই নহে, কালীবাটীর দেওয়ালের দিকে চাহিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে অন্তরাত্মা শুষ্ক হইল। দেওয়ালে অগ্নিময়ী কালীর ভীষণ মূর্ত্তি। অগ্নিময় চক্ষু, অগ্নিময় জিহ্বা, অগ্নিময় খড়্গ, হস্ত, বাহু, পদ, নৃমুণ্ডমালা সমস্তই অগ্নিময়। যেন দেবীর রোষাগ্নি অগ্নির আকারে ছড়াইয়া পড়িতেছে। আর সেই অগ্নিময়ী মূর্ত্তির নিম্ন-দেশে অগ্নিময় অক্ষরে লিখিত—

"এই পুরী মধ্যে সতী বন্দিনী। সত্বর তাহার উদ্ধার না হইলে, কালী-রোষানলে সমুদায় ধ্বংস হইবে।"

তখন সমস্ত ব্যাপার আমি বুঝিতে পারিলাম। বুঝিলাম আপনার বাক্‌দত্তা সতী সহধর্ম্মিণীর জন্যই কালী আজ এই লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা তখন সেই লোকদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম ভয় নাই, আমরা সেই সতীর উদ্ধার সাধন করিয়াছি। আমরা সরকারের লোক, সতী তাহার অভিভাবকের নিকট গিয়াছে। দেবীর রোষ নিশ্চয়ই শীঘ্র নির্ব্বাপিত হইবে। বাস্তবিক বলিলে আশ্চর্য্য হইবেন যে অল্পক্ষণ মধ্যে, ফোটা ও শব্দ বন্ধ হইয়া গেল। ঐ ব্যাপারে কাহারও কিছু বিশেষ অনিষ্ট হয় নাই। সেই অগ্নিময়ী মূর্ত্তি ও অক্ষর সকল ক্রমে নিষ্প্রভ হইতে লাগিল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। আপনারা এখন নব্য যুবক, এ সকল বিশ্বাস করিবেন কি না বলিতে পারি না। আপনারা ইহার কিরূপ কারণ বাহির করিবেন ও এই ঘটনাটী কিরূপ ভাবে লইবেন, জানাইলে সুখী হইবে। ইতি—

নিঃ শ্রী—"

ডিপুটী বাবুর পত্রখানি পড়িয়া শরৎ ও আমি বিশেষ আমোদ উপভোগ করিলাম। আমি বলিলাম "ভদ্রলোকের ভ্রান্তি দূর করা উচিত নহে, উপস্থিত ঘটনায় তাঁহার ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বাড়িয়াছে,

অতএব এই বিষয়ে আর কোনও গোলমাল করা উচিত নহে।” শরৎ বলিল “একটা প্রতারণা দ্বারা লোককে ঈশ্বরে ভক্তিমান করিতে হইবে, এ কেমন কথা? বিশেষতঃ আজকার এই কার্য্যটী যদি লোকে দৈবশক্তি-কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস করে, তবে আর দিনকতক বাদে হয়ত একজন বদমাইস্ লোক এই রকম একটা ঘটনা ঘটাইয়া নিজের নীচ-স্বার্থ সিদ্ধি করিবে। অতএব ডেপুটী বাবুর ভ্রম ঘুচাইয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য।” অগত্যা ডিপুটী বাবুকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লেখা গেল।

“প্রণাম পুরঃসর নিবেদনমিদং—

মহাশয়,

আপনার পত্র প্রাপ্তে যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। আপনার ঋণ আমরা এ জীবনে ভুলিতে পারিব না।

আপনার নিকটে কোনরূপ প্রতারণা করা অন্যায় এই বোধে সমস্ত ঘটনাটী আপনাকে লিখিতেছি। আমরা প্রেততত্ত্বে পণ্ডিত নই। এবং ভূতপ্রেত বিশ্বাস করিবার উপযোগী প্রমাণ এ পর্য্যন্ত পাই নাই। কাজেই ভূতপ্রেত সম্বন্ধে কোনও কথা বলার আমাদের অধিকার নাই। তবে সে দিনের ঘটনাটী যে ভৌতিক বা দৈবশক্তির কোনও পরিচায়ক নহে, তাহা আমরা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি। এই আশ্চর্য্য ব্যাপারটী রসায়ণবেত্তাগণের নিকট অতি সামান্য ঘটনা বলিয়া গণ্য হইবে। আপনাকেও ইহার কারণ বলিলে আপনি দেখিবেন ইহা অতি সোজা। ব্যাপারটী আমাদের বিশেষতঃ আমার বন্ধু শরৎচন্দ্রের দ্বারা সমাহিত হইয়াছিল। আমরা যখন আপনাদিগের নিকট হইতে রতনপুরের জঙ্গলে বিদায় হইয়া রতনপুরে গিয়াছিলাম, কাজটী সেই সময়ে সম্পন্ন হয়। আমরা উভয় বন্ধুতে কালীবাড়ী গিয়া দেখিলাম সেখানে লোকজন কেহ নাই, খুব অন্ধকার। দুইটী রাসায়ণিক পদার্থ আমরা সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম। একটী ফস্‌ফরাস,—এই ফসফরাস দ্বারা আমরা

দেওয়ালে এক কালীমূর্ত্তি ও অক্ষরগুলি লিখিয়াছিলাম। অন্ধকারে ফস্‌ফরাস লিখিত অক্ষরগুলি ও মূর্ত্তি অগ্নিময় দেখাইতে ছিল। আমি যে রাসায়নিক পদার্থটী ছিল তাহার নাম নাইট্রজেন আইওডাইড্। আমাদের সঙ্গে আমোনিয়া ও গুঁড়ান আইয়োডিন্ ছিল। তদ্দ্বারা এই পদার্থ তৈয়ার করান হয়। এই দ্রব্য অত্যন্ত দাহ্য। ইহা শুষ্ক হইলে যদি ইহাতে একটী সামান্য বালুকণাও পতিত হয় তাহা হইলে ইহা বিষম শব্দে ফাটিয়া যায়। এই দ্রব্যটী এরূপ ভাবে ভিজান হইয়াছিল যেন তাহা লোক আসিবার কিছুক্ষণ আন্দাজ সময়ের পর ফাটে।

লোকে প্রথমে আসিয়া সেই অগ্নিময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত ও ভীত হয়। তার পরে তারা দেখিল, লোক নাই জন নাই হঠাৎ একটা বিষম শব্দে কি ফাটিয়া উঠিল। ইহাতে তাহাদের ভয় ও বিস্ময়ের মাত্রা আরও বাড়িয়া উঠিল। এদিকে ওদিকে পলাইতে গিয়া আবার নূতন বিপদ ঘটিল। প্রাঙ্গনের চারি ধারে ছোট ছোট কাগজে করিয়া একটু একটু করিয়া নাইট্রোজেন আইয়োডাইড রাখা হইয়াছিল। এই সকল দ্রব্যে জল অধিক করিয়া মিশান হইয়াছিল, যেন তাহারা বড়টীর আগে না ফাটে। এস্থলে বলা উচিত সাংঘাতিক ফল হয় এরূপ মাত্রায় কোন স্থলেই উক্ত দাহ্য পদার্থ রক্ষিত হয় নাই। লোকে যখন পলাইতে গিয়া উঠানের নাইট্রোজেন আইয়োডাইডের উপর সজোরে পদার্পণ করে তখন তাহারাও ফাটিতে থাকে। ইহাই তাহাদিগের তাণ্ডব নৃত্যের কারণ।”

শ্রীসুকুমার ঘোষাল।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধণ।

পৌণ্ড্রদেশের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধণ অতি প্রাচীন নগর ভাগবতের নবম স্কন্ধে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে,

পৌণ্ড্রদেশের নামকরণ ও স্থাপন।

"বলির ক্ষেত্রে দীর্ঘতমাঃ হইতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে পাঁচ পুত্র জন্মে, তাঁহারা স্ব স্ব নামে ঐ পাঁচ জনপদ পূর্ব্বদেশে স্থাপিত করিয়াছিলেন।"

---

* ক্ষত্রিয়রাজ বলির পুত্র সন্তান ছিল না। তিনি একদিন গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়া দেখিলেন, এক অন্ধ ঋষি নদীর স্রোতে ভাসিয়া আসিতেছেন। ধার্ম্মিক রাজা অবিলম্বে তাঁহাকে জল হইতে তুলিয়া আপন আবাসে আনয়ন করিলেন। সেই অন্ধ ঋষির নাম দীর্ঘতমাঃ। রাজা তাঁহাকে তাঁহার ক্ষেত্রে পুত্রোৎপাদন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ঋষি সম্মত হইলে, রাজা রাণী সুদেষ্ণাকে তাঁহার নিকট যাইতে বলিলেন। কিন্তু ঋষিকে অন্ধ ও বৃদ্ধ দেখিয়া, রাজমহিষী নিজে না গিয়া, এক দাসীকে ঋষির নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ঋষি সেই শূদ্রযোনিতে ১১টী পুত্রোৎপাদন করিলেন। বলিরাজ পরে রাণীর আচরণ জানিতে পারিয়া, ঋষিকে প্রসন্ন করিয়া, সুদেষ্ণাকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। ঋষি দীর্ঘতমাঃ সুদেষ্ণা দেবীর অঙ্গ স্পর্শ করিয়া কহিলেন, 'তোমার আদিত্য তুল্য তেজস্বী পাঁচ পুত্র জন্মিবে। সেই পুত্রগণের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম হইবে। এই ভূমণ্ডলে তাহাদের স্ব স্ব নামে এক এক দেশ বিখ্যাত হইবে।' (মহাভারত, আদিপর্ব্ব)।

"অঙ্গো বঙ্গ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মাশ্চতে সুতাঃ।
তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনাম কথিতা ভুবি॥"

(মহাভারত, আদিপর্ব্ব—১০৪।৫০)

সুরগুরু বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উতথ্য স্বীয় প্রিয়তমা পত্নী মমতার গর্ভে অন্ধ দীর্ঘতমাঃ ঋষিকে অপত্যত্বে লাভ করেন। কালে দীর্ঘতমাঃ গোধর্ম্মপরায়ণ ও পরিবার প্রতিপোষণে অসমর্থ হইয়া ভর্ত্তা নামের অযোগ্য হওয়ায় তাঁহার পত্নী প্রদ্বেষী পুত্রগণের সাহায্যে তাঁহাকে বন্ধনপূর্ব্বক উড়ুপে নিক্ষেপ করিয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দেন। এবং দীর্ঘতমাঃ যদৃচ্ছাক্রমে বহুদেশ অতিক্রম করিয়া গঙ্গাপ্রবাহে ভাসিয়া যাইতে থাকেন। অবশেষে বলিরাজা তাঁহাকে তদবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়া, তাঁহার ব্রহ্ম তেজ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদে আপন পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে পঞ্চপুত্র লাভ করেন।

(আদিপর্ব্ব, ১০৪ অধ্যায়।)

এই পাঁচ পুত্র বালেয়ক্ষেত্রিয় বলিয়া উল্লিখিত হন।*

পৌণ্ড্রের প্রাচীনতা।

এই পৌণ্ড্ররাজ্য বৈদিক যুগে অর্থাৎ অদ্য হইতে ৩৫০০ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হয়।† পূর্ব্বোক্ত দীর্ঘতমাঃ ঋষি একজন বৈদিক ঋষি; ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৪০—১৬৪ সূক্ত ইহাঁর রচিত। ঋগ্বেদের দীর্ঘতমাঃ আপনার পিতার নাম উতথ্য এবং মাতার নাম মমতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (ঋগ্বেদ, ১ম মণ্ডল, ১৫৮ সূক্ত, ৪।৬ ঋক্।) সুতরাং ঋগ্বেদের উতথ্যই যে মহাভারতের উতথ্য এবং ঋগ্বেদীয় উতথ্য পুত্র দীর্ঘতমাই যে মহাভারতীয় উতথ্যপুত্র দীর্ঘতমাঃ, তদ্বিষয় সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

* তিতিক্ষোরুষদ্রথঃ পুত্রোঽভূৎ ততো হেম হেমাৎ সুতপাঃ তস্মাদ্বলিঃ।
যস্য ক্ষেত্রে দীর্ঘতমসা অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-সুহ্ম-পুণ্ড্রাখ্যং বালেয়ং ক্ষত্রমজন্যত।
তন্নাম—সন্ততি—সংজ্ঞাশ্চ পঞ্চ বিষয়া বভূবুঃ॥

(বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থ অংশ, ১৮শ অঃ)।

আবার ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে "বিশ্বামিত্রের শত পুত্র ছিল, তন্মধ্যে পঞ্চাশ জন মধুচ্ছন্দার অপেক্ষা বয়সে বড় এবং পঞ্চাশ জন তাঁহা অপেক্ষা বয়সে ছোট।

জ্যেষ্ঠগণ শুনঃশেপের অভিষেকে সন্তুষ্ট হইল না। বিশ্বামিত্র তাহাদিগকে এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন, 'তোদের বংশধরগণ অন্ত্যজ হইবে।' ইহাঁরাই সেই পুণ্ড্র ইত্যাদি।

মনুসংহিতার মতে, পৌণ্ড্রাদি সকলে পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিলেন, সংস্কার অভাবে বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

† শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র শেঠ, বি, এল্, মহাশয়, 'সাহিত্য' পত্রের ১৩০৬-৯ম সংখ্যায় 'পৌণ্ড্রক বাসুদেব' শীর্ষক প্রবন্ধের চতুর্থ পরিচ্ছেদে বলিপুত্র পুণ্ড্রের রাজ্যকাল যে ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন, আমরা সেই মতের অনুসরণ করিলাম এবং সেই অংশটুকু উদ্ধৃত করিলাম।

"হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ এবং ভাগবতে মগধের বার্হদ্রথ বংশীয় রাজগণের উল্লেখ আছে। বার্হদ্রথ বংশীয়গণের মগধ-শাসন ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। বার্হদ্রথ বংশীয়গণ ১২৮০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ হইতে ৬০৭ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত

নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহে পৌণ্ড্রের উল্লেখ দেখা যায়। যথাঃ—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, মনুসংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, শ্রীমদ্ভাগবত, দেবী-ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ, (ক) পৌণ্ড্রখণ্ড, (খ) রেবাখণ্ড, (গ) প্রভাস খণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, বামন পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, মৎস্য পুরাণ, সৌর পুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ, বৃহৎসংহিতা, কাশ্মীর রাজতরঙ্গিণী, অশোক-অবদান, রাজবলি কথা, মহাবংশ, জৈন কল্পসূত্র, কথাসরিৎসাগর, তারানাথের গ্রন্থ, সিওকী, দশকুমার চরিত, যোগিণী তন্ত্র, ও দান-সাগর। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক পুস্তকে পৌণ্ড্রের উল্লেখ আছে।

মগধে শাসনদণ্ড চালনা করেন। (Dutt's Ancient India)। এই বংশের কৃষ্ণদ্বেষী জরাসন্ধ সমধিক প্রসিদ্ধ। ইঁহার পুত্র মহাদেবের রাজত্ব কালে কুরু-পাণ্ডব-যুদ্ধ সংঘটিত হয়। জরাসন্ধ ১২৮০-১২৫৯ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করেন বলিয়া শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার প্রাচীন ভারত নামক ইংরাজী ইতিহাস গ্রন্থে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অঙ্গবংশীয় কর্ণ জরাসন্ধের সমকালবর্ত্তী বলিয়া মহাভারত ও হরিবংশ পাঠে অবগত হওয়া যায়। কর্ণ অঙ্গ হইতে ষোড়শ পুরুষ অধস্তন। প্রতি পুরুষে ২০ বৎসর গণনা করিলে, অঙ্গ ও কর্ণের মধ্যবর্ত্তী ১৫ জন রাজা ৩০০ বৎসর অঙ্গদেশ শাসন করিয়াছিলেন। পুণ্ড্র অঙ্গের সহোদর ভ্রাতা ও সমকালবর্ত্তী। এই হিসাবে পুণ্ড্র জরাসন্ধের ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে, বলি ১২৮০ + ৩০০ = ১৫৮০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে, বর্ত্তমান ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। অতএব, বলি ও তৎপুত্র পুণ্ড্র যে বৈদিকযুগের রাজা ও রাজকুমার ইহা স্থির ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। দীর্ঘতমা ঋষির মহাভারতীয় উপাখ্যানেও বৈদিকযুগের সমাজ-চিত্রের রেখাপাত পরিদৃষ্ট হয়। এবং ইহা হইতে বলি ও পুণ্ড্রের বৈদিক যুগে আবির্ভাবের বিষয় বিশ্বাস করিবার বলবত্তর কারণ পাওয়া যাইতেছে।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের কয়েকটী সূক্তের রচয়িতা এক দীর্ঘতমাঃ ঋষি। ঋগ্বেদীয় দীর্ঘতমাঃ আপনার পিতার নাম উতথ্য এবং মাতার নাম মমতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (ঋগ্বেদ, ১ম মণ্ডল, ১৫৮ সূক্ত, ৪।৬ ঋক্) সুতরাং ঋগ্বেদের উতথ্যই যে মহাভারতের উতথ্য, এবং ঋগ্বেদীয় উতথ্যপুত্র দীর্ঘতমাই যে মহাভারতীয় উতথ্যপুত্র দীর্ঘতমা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। স্বর্গীয় সাহিত্য-সেবক উমেশ চন্দ্র বটব্যাল মহাশয় স্বতন্ত্র পন্থা ও গণনা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ঋগ্বেদীয়

পুরাণাদিতে পুণ্ড্র, পৌণ্ড্রবর্দ্ধণ, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন—এই কয়েক নামেরই উল্লেখ দেখা যায়। পুণ্ড্র কর্ত্তৃক স্থাপিত বলিয়াই বোধ হয় পুণ্ড্রকে পৌণ্ড্র বলে। পুণ্ড্র ও পৌণ্ড্র দেশ উল্লিখিত স্থানে দেশবাচক ও পুণ্ড্রবর্দ্ধণ ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধণ নগরবাচক। কি বৈদিক যুগে, কি পৌরাণিক যুগে, কি ঐতিহাসিক যুগে ইহা একটী মহাতীর্থ* ও বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। করতোয়া

পৌণ্ড্র-মাহাত্ম্য।

দীর্ঘতমাকে ১৬৯০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দের ঋষি বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। (সাহিত্য, ৮ম বর্ষ, ৭৯ পৃঃ।) ইতিপূর্ব্বে হরিবংশ অবলম্বন করিয়া পুণ্ড্রের আবির্ভাব কাল ১৫৮০ পূঃ খৃঃ অনুমান করিয়াছি। দীর্ঘতমা ইহার ৩০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া অনুমান করিলে, বটব্যাল মহাশয়ের সময়ের সহিত আমার নির্ণীত সময়ের ৮০ বৎসরের পার্থক্য ঘটে। বটব্যাল মহাশয় প্রতি পুরুষে ৩০ বৎসর ধরিয়া গণনা করিয়াছেন ; আমি ২০ বৎসর ধরিয়াছি। আমি প্রতি পুরুষে ৩০ বৎসর ধরিলে ঐ পার্থক্য আরও কমিয়া যায়। কিন্তু অতি প্রাচীন কালের গণনায় এই সামান্য ৮০ বৎসরের পার্থক্য আদৌ ধর্ত্তব্য নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বলিপুত্র পুণ্ড্র বৈদিকযুগে, অর্থাৎ ১৫৮৫ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। এবং স্থূলতঃ খৃষ্টের ১৬০০ বৎসর পূর্ব্বে, অথবা অদ্য হইতে ৩৫০০ বৎসর পূর্ব্বে, পুণ্ড্র রাজ্য স্থাপিত হয়।

* পৌণ্ড্র কোটী শিলাদ্বীপে মহাপুণ্যো সুবিশ্রুতি।
করতোয়া সরিন্নীরং শরীরাদ্যস্ত পাবনং।
ভক্তিমুক্তি ফলার্থায় যে না কারী দ্বিজার্পণং॥
অদ্ভুতা কারিতা সৃষ্টিঃ কনকস্য দিনত্রয়ং।
স্কন্দ গোবিন্দয়োর্ম্মধ্যে ভূমিঃ সংস্কৃত বেদিকা॥
বেদী মধ্যোত্তরে পার্শ্বে দেবী কামাঙ্গুরী স্থিতা।
তদ্দক্ষিণেঽর্পিতা দেবী কোটীশ্বরীতি বিশ্রুতা।
নৈঋতে সিদ্ধকোট্যস্তু বসন্তি ভৃগুণার্পিতা।
বারুণে বিজয়চণ্ডী উত্তরে ভূতিকেশরঃ॥
তৎকুণ্ডে মুক্তিধৌ স্নাত্বা নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
ভূতিকেশর দেবস্য দক্ষিণে সূর্য্যমণ্ডপং॥
বেদী মধ্যেঽর্পিতোযূপঃ সংশ্লেষাদ্ বর্দ্ধতে নৃণাং।
গোবিন্দ মণ্ডপাৎ পূর্ব্বংকুণ্ডং বিষ্ণুবিনির্ম্মিতং॥
স্কন্দ মণ্ডপ বায়ব্যে সন্তা রামস্তবাদ ভূতা।
সপাদ লক্ষং বিপ্রাণাং যত্রাস্তেঽদভুত কর্ম্মণাং॥
প্রভাবা তপসো দেবী মুনীন্দ্রস্য মহাত্মনঃ।
তৎসন্তা বায়ুকোণেচ গর্ত্তমীশ্বর নির্ম্মিতং॥

মাহাত্ম্যে ইহা গুপ্ত বারাণসী বলিয়া লিখিত হইয়াছে। পরশুরাম (ভার্গব) ভগবান শঙ্করের নিকট পৌণ্ড্রক্ষেত্র-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া ঋষিগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এই নগরের আয়তন চতুর্দ্দিকে সম পরিমাণে পঞ্চক্রোশ।†

আদ্যংভুবো ভবন লক্ষ সপাদ বিপ্রৈঃস্কন্দাদি বিষ্ণু
বলভদ্র শিবাদি দেবৈর অধ্যাসিতং করজলম্বু বিধুত পাদং
শ্রী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরং শিরসানমামি॥
করজা পশ্চিমে ভাগে সদা বহতি জাহ্নবী।
পূর্ব্বভাগেতু করজাপাদোনা জাহ্নবী জলা॥
করতোয়া পশ্চিমে তীরে লোহিনী যত্র মৃত্তিকা।
মুক্তিক্ষেত্রং সমাখ্যাতং মহাপাতক নাশনং॥
করতোয়া নদী প্রাপ্য ত্রিরাত্রো পোষিতো নরঃ।
অশ্বমেধ মবাপ্নোতি শক্রলোকঞ্চ গচ্ছতি।
অত্রৈব স্নান মাসাদ্য হরিসাযুজ্য মাপ্নুয়াৎ॥

স্কন্দপুরাণান্তর্গত উত্তরপৌণ্ড্রখণ্ডে সূতশৌণকসংবাদে "পরশুরামবিরচিত করতোয়া-মাহাত্ম্যের যে একখানি অনুবাদ বগুড়া মালতীনগর নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় করিয়াছেন, তন্মধ্য হইতে উক্ত শ্লোকগুলি গৃহীত হইল। অত্র প্রবন্ধে করতোয়া বা পৌণ্ড্র মাহাত্ম্য জ্ঞাপক যে কোন শ্লোক বা অনুবাদ দেওয়া গেল ও যাইবে তাহা ঐ পণ্ডিত মহাশয়ের কৃত অনুবাদ করতোয়া-মাহাত্ম্য হইতে গৃহীত বুঝিতে হইবে।

অনেকে পৌণ্ড্র খণ্ডকে আধুনিক গ্রন্থ বলিতে চান। কিন্তু এই পৌণ্ড্রখণ্ড হইতে বাচস্পতি মিশ্র, শূলপাণি, স্মার্ত্তপ্রধান রঘুনন্দন প্রভৃতি মহামহা পণ্ডিতগণ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। রাজা বল্লাল সেনও তাঁহার দানসাগরে পৌণ্ড্রখণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন। পৌণ্ড্র খণ্ড যে অপ্রামাণিক একথা কেহই বলেন নাই।
কথা এই, পুরাণে যদিও কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত দেখা যায়, তাহা কেবল কাহারও মাহাত্ম্য বাড়াইবার জন্য; স্থান সম্বন্ধে গোলযোগ দেখা যায় না।

† পঞ্চ ক্রোশ মিদং ক্ষেত্র সমন্তাৎ পরিকীর্ত্তিতং,
তদন্তর্গত মেতত্তু ক্রোশ মাত্রং মহেশ্বরী।
অতিগুহ্য তমং ক্ষেত্র ধত্রাস্তে ভার্গব মুনিঃ॥
(করতোয়া-মাহাত্ম্য।)

পৌণ্ড্রবংশীয় নরপতিগণের মধ্যে এক বাসুদেব ভিন্ন আর কেহই খ্যাতিলাভ করিতে পারেন নাই। মহাভারত, হরিবংশ, শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে একমাত্র পৌণ্ড্রক বাসুদেবের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পৌণ্ড্রক বাসুদেব ও সুদেব।

ইনি জরাসন্ধের সমসাময়িক, সুতরাং শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মতে ১২৮০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে তিনি বিদ্যমান ছিলেন।

পুণ্ড্রদেশ পুণ্ড্র হইতে বাসুদেব পর্য্যন্ত ঐ বংশীয়দিগের দ্বারাই শাসিত হইতেছিল।

এই বাসুদেব অত্যন্ত প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন ও বিখ্যাত হন। পৌণ্ড্রক পৌণ্ড্ররাজ্য লাভ করিয়া পৌণ্ড্রক বাসুদেব নামে বিখ্যাত হন।*

বিদর্ভ-সমরে পৌণ্ড্রক বাসুদেবের পুত্র সুদেব এক অক্ষৌহিনী সৈন্যসহ বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং দ্বারকাবরোধকালে

---

* বাসুদেব মহাবল বলিয়া আদিপর্ব্বের ৮৭। ৮৮ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছেন। মগধাধিপতি জরাসন্ধের বন্ধু ছিলেন। হরিবংশ মতে ইহাঁর পিতার নাম বসুদেব। বসুদেবের দুই পত্নী ছিল, সুতনু ও নারাচী (মৎস্য পুরাণমতে রথরাজী)। সুতনুর গর্ভে পৌণ্ড্রক ও নারাচীর গর্ভে কপিল জন্ম পরিগ্রহ করেন। কপিল যোগধর্ম্ম অবলম্বন করেন। মহাভারতে লিখিত আছে রাজসূয়যজ্ঞকালে ভীম ইহাঁকে পরাজয় করিয়াছিলেন। হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, একদিন পৌণ্ড্রকের সভায় নারদ আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্ত্তন করেন। তিনি শঙ্খ-চক্রধারী অপর বাসুদেবের নাম শ্রবণ করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন 'আমি ভিন্ন আর কে বাসুদেব আছে? আমি জীবিত থাকিতে কা'র আস্পর্দ্ধা আমার নাম গ্রহণ করে। আমি তাহাকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিব।' পৌণ্ড্রক, একলব্য প্রভৃতি মহাবীরকে সঙ্গে লইয়া দ্বারকা আক্রমণ করেন। তাঁহাদের আক্রমণে দ্বারকাবাসী নগরদ্বার রুদ্ধ করিয়া ভয়-বিহ্বল চিত্তে অবস্থান করিয়াছিল। এই সংগ্রামে অনেক যাদব বীর ও বঙ্গীয় বীর প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল। অবশেষে কৃষ্ণের কৌশলে পৌণ্ড্রক বাসুদেব নিহত হন। (হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত ও ব্রহ্মপুরাণে ৯৩ অধ্যায়ে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

[বিশ্বকোষ, পৌণ্ড্রক বাসুদেব প্রস্তাব।]

সুদেব পৌণ্ড্রকের সহিত যান নাই। সম্ভবতঃ পৌণ্ড্রকের দ্বারকা যুদ্ধে পতনের পর সুদেব পৌণ্ড্রদেশের রাজসিংহাসনে আসীন হন।*

সুদেবের পর হইতে আদিশূরের সময় পর্য্যন্ত বোধ হয় পুণ্ড্রবংশীয় রাজগণ দ্বারাই পৌণ্ড্রদেশ শাসিত হইতেছিল। কিন্তু তাঁহাদের বিষয় কিছু জানা যায় না।

হিয়েন্থসিয়াঙ্গের কথিত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হিয়েন্থ সিয়াঙ্গ এ প্রদেশে আসিয়া পৌণ্ড্র দেশের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি যখন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজধানীতে আগমন করেন, সে সময় এই নগরের আয়তন ২৷৷০ ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। এবং পৌণ্ড্ররাজ্য ৮০০ মাইল বিস্তারিত দেখিয়াছিলেন। সে সময় এখানে তড়াগ-বটিকাদি সমাচ্ছাদিত ও বহুসংখ্যক লোকের ঘনবসতি ছিল। আর এখানে হীনযান ও মহাযান মতাবলম্বী বৌদ্ধগণের প্রায় ২০টী সঙ্ঘারাম, শত শত হিন্দু দেবালয়, বহুতর দার্শনিকের সমাবেশ এবং বহুসংখ্যক দিগম্বর নির্গ্রন্থ (জৈন) দিগের বাস দেখিয়াছিলেন। কথাসরিৎসাগর পাঠে কতকটা বুঝা যায়, পৌণ্ড্র নগরী গঙ্গার কিছুদূরে অবস্থিত ছিল। চীনপরিব্রাজক হিয়েন্থসিয়াঙ্গ এই নগরে আসিয়া অনেক নৌকার্য্যালয় দেখিয়াছিলেন।

হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন এই তিন সম্প্রদায়ের নিকটই পুণ্ড্রবর্দ্ধন এক সময়ে পবিত্র পুণ্যস্থান বলিয়া গণ্য ছিল। স্কন্দপুরাণীয় প্রভাস খণ্ডে লিখিত আছে এখানে মন্দার নামক শিবমূর্ত্তি বিদ্যমান। দেবী ভাগবতের মধ্যে সতীর খণ্ডিত দেহাংশ হইতে যে ১০৮ পীঠ উৎপন্ন

* সাহিত্য, ১০ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৫০২ পৃষ্ঠা।

হয়, তন্মধ্যে পুণ্ড্রবর্দ্ধন একটী। এখানে পাটলা নামে দেবীমূর্ত্তি অবস্থান করেন। (দেঃ ভাঃ ৭।৩০) আদিকে স্কন্দপুরাণীয় রেবা-খণ্ডে (২৯ অঃ) পুণ্ড্রবর্দ্ধণ যজ্ঞকারী চক্রবর্ত্তী রাজগণের প্রাচীন নিবাস বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দে যে সময় চীনপরি-ব্রাজক হিয়েন্থসিয়াঙ্গ এখানে আগমন করেন, তখন পূর্ব্ব ভারতের অনেক বিখ্যাত বৌদ্ধাচার্য্য এখানে অবস্থান করিতেন। পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের প্রায় আড়াই ক্রোশ পশ্চিমে গগণস্পর্শী চূড়া-বিলম্বিত বা শিভা সঙ্ঘারামের নিকট তিনি অশোক রাজ নির্ম্মিত স্তূপ ও সুবৃহৎ বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি সমন্বিত একটী বৌদ্ধ বিহার দর্শন করিয়াছিলেন। এই চীন পরিব্রাজক লিখিয়াছেন, যেখানে অশোক রাজস্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তথায় পূর্ব্বকালে তথাগত (বুদ্ধ) তিন মাস কাল ধর্ম্মোপ-দেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

চাতুর্ম্মাস্যকালে এখানে চারিদিকে উজ্জ্বল আলোক দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। পূর্ব্বে লিখিয়াছি, চীনপরিব্রাজক এখানে সর্ব্বাপেক্ষা বহু সংখ্যক নিগ্রন্থ (জৈন) দর্শন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক জৈনদিগের কল্পসূত্র নামক ধর্ম্মগ্রন্থে 'পুণ্ড্রবর্দ্ধনীয়' নামে একটী জৈন শাখার উল্লেখ পাওয়া যায়। খৃষ্ট জন্মের প্রায় দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে এই শাখার উৎপত্তি।

এক সময়ে ভারতের অপর প্রান্তে পুণ্ড্রবর্দ্ধনবাসী ব্রাহ্মণের সমাদর বিস্তৃত হইয়াছিল। রাষ্ট্রকূলরাজ নিত্যবর্ষ ৮৫৫ শকে কেশবদীক্ষিত নামে এক পুণ্ড্রবর্দ্ধনবাসী কৌশিক গোত্রীয় ব্রাহ্মণকে স্বরাজ্যে (মান্ধ-খেটে) আনাইয়া যে ভূমি দান করেন, তাহা হইতেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

(বিশ্বকোষ, ১১শ ভাগ, পুণ্ড্রবর্দ্ধন প্রস্তাব।)

রাভল অথবা র্যাওয়াল্ সিংহ নামক পৌণ্ড্রজাতীয় জনৈক প্রবল

পরাক্রান্ত হিন্দু-বীরকুলাগ্রগণ্য ব্যক্তির নামে রাওলপিণ্ডি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। *

কাশ্মীররাজ জয়াদিত্য বা জয়াপীড় আসিয়াও এখানে প্রচুর বিভূতি দেখিয়াছিলেন। জয়াপীড় ৬৬৭ শক (৭৪৫ খৃঃ অঃ) হইতে ৬৯৮ শক (৭৭৬ খৃঃ অঃ) পর্য্যন্ত কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। ইহার মধ্যে কোন সময় তিনি পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে আসিয়াছিলেন। তিনি গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যে প্রবেশ করেন; তিনি গঙ্গাতীরে সৈন্যগণকে বিদায় দিয়া ছদ্মবেশে গুপ্তভাবে নগরে প্রবেশ করিয়া পুরবাসিগণের ঐশ্বর্য্য ও রাজধানীর সমৃদ্ধি দর্শনে অতিশয় প্রীত হইলেন। জয়াপীড় এখানে কার্ত্তিকের মন্দিরে কমলা নাম্নী দেব নর্ত্তকীর নৃত্য দেখিয়া মুগ্ধ হন। কমলা জয়াপীড়ের অসামান্য রূপমাধুরী দর্শনে তাঁহাকে কোন রাজবংশীয় ভাবিয়া নিজগৃহে লইয়া আসেন। সেই সময়ে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে সিংহের উৎপাত হয়। জয়াপীড় স্বীয় ভুজবল-প্রভাবে সেই সিংহকে বিনাশ করেন। সিংহকে মারিতে গিয়া ঘটনাক্রমে তাঁহার নামাঙ্কিত কেয়ূর পড়িয়া যায়। কোন ব্যক্তি তাহা পাইয়া রাজা জয়ন্তের নিকট উপস্থিত করে। তাহাতে সকলে জানিতে পারিল যে কাশ্মীরপতি জয়াপীড় পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আসিয়াছেন। সকলেই নাম শুনিয়া কাঁপিতে লাগিল। রাজা জয়ন্ত কহিলেন, "শুনিয়াছি কাশ্মীর-রাজ কল্লট নাম গ্রহণ করিয়া ছদ্মবেশে দেশভ্রমণ করিতেছেন। অতএব আশঙ্কার কোন কারণ নাই। তাঁহাকে অনুসন্ধান কর।" তিনি চর-দ্বারা অবগত হইলেন যে, জয়াপীড় কমলার গৃহে অবস্থান করিতেছেন। অতঃপর রাজা অমাত্য ও রাজপরিবারবর্গকে সঙ্গে লইয়া জয়াপীড়কে

জয়াপীড়ের পৌণ্ড্রবর্দ্ধন দর্শন।

---

* নব্যভারত, বিংশ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, ১১৪ পৃঃ।

অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন এবং বহুযত্নে তাঁহাকে রাজভবনে লইয়া গিয়া তাঁহার একমাত্র কন্যা কল্যাণ দেবীকে সম্প্রদান করিলেন। এই সময় গৌড়দেশ কেবল জয়ন্তের অধিকারভুক্ত ছিল না। জয়াপীড় পাঁচজন গৌড়রাজকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া শ্বশুর জয়ন্তকে রাজ-চক্রবর্ত্তী করিলেন।

কাশ্মীররাজ জয়াদিত্য যখন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে আইসেন, তখন জয়ন্ত নামক একজন রাজা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের রাজা ছিলেন। অনেকে জয়ন্তকেই আদিশূর বলিয়া জানেন। ৺রাজেন্দ্র লালের মতে আদিশূরের অপর নাম বীরসেন, ইনি সেনরাজগণের আদিপুরুষ। আবার কাহারও মতে কনোজাধিপতি বৎসরাজ গৌড়ের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নরপতিকে উচ্ছেদ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার সেনাপতি জনৈক হিন্দুকে গৌড়ের সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। ইনিই আদিশূর।

আদিশূরের জাতি লইয়া অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। আদিশূর পৌণ্ড্রক বংশীয় নয় তো?

কল্হনের রাজতরঙ্গিনী পাঠে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দে গৌড় নামক ভূভাগের রাজধানীর নাম ছিল পৌণ্ড্রবর্দ্ধন।

এ দেশের প্রাচীন কুলাচার্য্যদিগের মতে রাজা আদিশূর বৌদ্ধগণকে পরাস্ত করিয়া সর্ব্বপ্রথম রাজচক্রবর্ত্তী হন।

জয়ন্তই আদিশূর।

রাজতরঙ্গিনীর মতে (খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ৬৬৭ শক হইতে ৬৯৮ শক মধ্যে) ঐ সময়ে জয়ন্ত গৌড়ের রাজা এবং তিনি সর্ব্বপ্রথম সমস্ত গৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। যদি ব্রাহ্মণ-বংশাবলী ও রাজতরঙ্গিনীর বিবরণ প্রকৃত হয়, তাহা হইলে আদিশূর ও জয়ন্তরাজকে অভিন্ন ব্যক্তি বলা যাইতে পারে। বোধ হয় জয়ন্তরাজ সর্ব্বপ্রথম সমস্ত গৌড়দেশের অধীশ্বর হইয়া 'আদিশূর' উপাধি গ্রহণ করেন।

এখনও পূর্ব্ববঙ্গের বহু লোকের বিশ্বাস আদিশূর বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপাল নামক স্থানেই রাজত্ব করিতেন এবং এইখানেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ প্রথমে আগমন করেন। কিন্তু এই প্রবাদের মূলে কোন ঐতিহাসিক সত্য লুক্কায়িত নাই। গৌড়াধিপ আদিশূর কোন কালে বিক্রমপুরে পদার্পণ করিয়াছেন কি না, তাহারই বিশ্বাসজনক প্রমাণাভাব। আদিশূর যে সময়ে গৌড়ের অধীশ্বর তৎকালে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে রাজধানী ছিল। আদিশূরের রাজধানীতে যদি পঞ্চ ব্রাহ্মণ পদার্পণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরেই তাঁহাদের শুভাগমন হইয়াছিল বলিতে হইবে।

আদিশূরের রাজধানী ও পঞ্চ ব্রাহ্মণ আগমন।

(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১০৬ পৃষ্ঠা।)

আদিশূর বা জয়ন্তের পর তৎপুত্র ভূশূর পৌণ্ড্রবর্দ্ধণের রাজা হইয়াছিলেন।* ৭৯০ খৃষ্টাব্দের পরে মগধের রাজা ধর্ম্মপালদেব পৌণ্ড্রবর্দ্ধণ অধিকার করিলে, ভূশূর রাঢ়দেশে নূতন পুণ্ড্র নগর স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। এই হইতেই পৌণ্ড্রবর্দ্ধণের স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত হয়।

ভূশূর।

ভূশূরের পর পৌণ্ড্রবর্দ্ধণ ধর্ম্মপালের অধিকার ভুক্ত হয়। ধর্ম্মপাল নিজে বৌদ্ধ হইলেও তিনি ব্রাহ্মণগণের যথেষ্ট সমাদর করিতেন। বারেন্দ্র কুলপঞ্জীতে লিখিত আছে যে, তিনি ভট্টনারায়ণের পুত্র আদি গাঁই ও ঝাঁকে গঙ্গাতীরে ধামসার নামক গ্রাম দান করেন। ধর্ম্মপালের আশ্র

পাল বংশের অধিকার।

---

* "ভূশূর নামক পুত্র আদি নৃপতির,
মুণি পঞ্চকের যজ্ঞে জন্ম যাঁর স্থির।"
—রামজয় কৃত বৈদ্যকুল পঞ্জিকা।

(খ) "ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্ত সুতেন চ"—ব্রাহ্মণডাঙ্গা নিবাসী বংশী বিদ্যারত্ন ঘটকের সংগৃহীত কুল পঞ্জিকা।

শাসন হইতেও জানা যায় যে, মহাসামন্তাধিপতি নারায়ণ বর্ম্মার অনুরোধে পৌণ্ড্রবর্দ্ধণ ভুক্তির অন্তর্গত চারিখানি গ্রাম নারায়ণ-পূজক লাট ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন।

এই প্রদেশ বহুকাল পালরাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল। ১১৬১ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দ পাল হইতেই পাল-গৌরব-রবি অস্তমিত হয়। এবং পুণ্ড্র নাম তিরোহিত হইয়া এ প্রদেশের বরেন্দ্র নাম-করণ হয়।

সেন বংশের অধিকার।

১১৬১ খৃষ্টাব্দে রাজা বল্লাল সেন গোবিন্দ পালকে পরাজয় করিয়া মিথিলা হইতে সমস্ত উত্তর গৌড় বা বরেন্দ্র ভূমি আপনার অধিকার ভূক্ত করিয়াছিলেন। রাজা বল্লাল সেন কর্ত্তৃক এ প্রদেশ বরেন্দ্র প্রদেশ বলিয়া অভিহিত হয়। এবং পৌণ্ড্রবর্দ্ধণে কিছুকাল রাজত্ব করার পর গৌড় নগরে রাজধানী পরিবর্ত্তিত করেন। বরেন্দ্রভূমি অধিকারের পর বল্লাল সেন বরেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কৌলীন্য মর্য্যাদা সংস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সেন রাজাদের সময় হইতেই পৌণ্ড্রবর্দ্ধণের অবনতির সূত্রপাত হয়।

হায়! সেই গৌরবস্পর্শী, বিদ্বদজন-পরিপূর্ণ, তড়াগবটিকাদি-সমাচ্ছাদিত, বহুলোকাকীর্ণ পৌণ্ড্রবর্দ্ধণ নগরী এক্ষণে কোথায়?

ওয়েষ্ট মেকট, স্মিথ্ প্রভৃতির মতে গোবন্দগঞ্জের নিকটবর্ত্তী বর্দ্ধণ-কুটীই প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধণ। কেহ বলেন রঙ্গপুরের মধ্যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধণ অবস্থিত ছিল। আবার মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র ও বিশ্বকোষকার প্রভৃতির মতে মালদহের অন্তর্গত পাঁড়ুয়া বা পাণ্ডুয়া নামক স্থানই পৌণ্ড্রবর্দ্ধণ নগর।

ইঁহাদের কাহারও মত অভ্রান্ত নহে। কারণ নিঃসন্দেহ এবং যুক্তিমূলক প্রমাণ কেহই দিতে পারেন নাই। কেবল অনুমানই ইঁহাদের প্রধান ভিত্তি। যে যে প্রমাণবলে আমরা প্রাচীন

পৌণ্ড্রবর্দ্ধণের বর্ত্তমান অবস্থান প্রতিপন্ন করিব,* তাহা পরে লিখিত হইতেছে।

করতোয়া নদী।

পৌণ্ড্রখণ্ডান্তর্গত করতোয়া মাহাত্ম্যের নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে জানা যায় যে, পৌণ্ডবর্দ্ধণ করতোয়া তীরবর্ত্তী।

"করতোয়ে সদানীরে সরিৎ শ্রেষ্ঠে সুবিশ্রুতে।
পৌণ্ড্রাণ্ প্লাবয়সে নিত্যং পাপং হর করোদ্ভবে॥"

অনেকেই জানেন, গোবিন্দগঞ্জের নিকট দিয়া মহাস্থান, বগুড়া ও সেরপুর স্পর্শ করিয়া ক্ষীণপ্রাণা করতোয়া এক্ষণে হলহলি বা হিঁয়ালী নদীতে মিশিয়াছে। কথিত অংশে করতোয়া সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই; তবে ঊর্দ্ধ ও শেষ গতি লইয়া মতভেদ আছে বটে, সে বিষয় প্রবন্ধান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধণ ও করতোয়া উভয়ের গৌরবে উভয়ে গৌরবান্বিত। কালের কুটীল গতিতে এক্ষণে একের অবনতিতে অন্যে যেন গা ঢাকা দিয়াছে। পৌণ্ড্রবর্দ্ধণের দুর্দ্দশা দেখিয়া দুঃখিতহৃদয়ে করতোয়া ক্ষুদ্রাকার ধারণপূর্ব্বক আত্মগোপনের চেষ্টায় আছে, অথবা পৌণ্ড্র-বর্দ্ধণই করতোয়ার দুর্দ্দশা দেখিয়া মর্ম্মহতচিত্তে ঘোর বনে নির্ব্বাসিত হইয়াছে।

করতোয়া নদী এক্ষণে ক্ষুদ্রাকার হইলেও বহু প্রাচীন মাহাত্ম্যসম্পন্না ও স্বনামখ্যাতা।* বেদঅন্তর্গত শতপথ-ব্রাহ্মণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, অতি প্রাচীন কালে (বৈদিকযুগে) যাগযজ্ঞশীল কৃষিজীবী আর্য্যগণই সদানীরা উত্তীর্ণ হন নাই। অমরকোষ ও হেমচন্দ্রাভিধানেও কর-তোয়ার নাম সদানীরা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পৌরাণিক কালে এই নদী মহাস্রোতস্বতীরূপে প্রবাহিত হইত।*

এই করতোয়াতীরবর্ত্তী বগুড়া হইতে, তিন ক্রোশ উত্তরে স্থিত 'মহাস্থান' নামক স্থানকেই আমরা প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধণ বলিতে চাই। পূর্ব্বোক্ত করতোয়া মাহাত্ম্যের নিম্নলিখিত শ্লোক হইতেই তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

মহাস্থানই পৌণ্ড্রবর্দ্ধণ।

হর গৌরীকে বলিতেছেন ঃ—

"পঞ্চ ক্রোশ মিদং ক্ষেত্র সমন্তাৎ পরিকীর্ত্তিতং
তদন্তর্গত মেতত্ত্ব ক্রোশ মাত্রং মহেশ্বরী
অতিগুহ্য তমং ক্ষেত্র যত্রাস্তে ভার্গব মুনি ;
পশোজ্ঞানং কথয়তি গুহস্তদ গৃহে তাম্র চূড়ো,
দৈবী হৈমী শটিত স্থরভির্যষ্টিবৃদ্ধি শিলাস্থিঃ।
ধেযুচ্ছত্রং ন ফলতি ফাণি দ্বিশ্বরো জীবলোকঃ
কুণ্ডোদ্বীপঃ কনক পতনং স্নানতঃ কাম্যকুণ্ডে,
ভোগো যজ্ঞো ভ্রমণ নটনং তত্রবাক্য হিবেদঃ।
ইত্থং রামো রচয়তি পদং লক্ষণান্যূবিংশ স্তস্মাৎ
সকল জগতাং শ্রীমহাস্থান মেতৎ ॥

এই প্রকার পরশুরাম ঊনবিংশ লক্ষণ রচনা করিয়াছেন, সেইজন্য পৌণ্ড্রবর্দ্ধণ, মহাস্থান নামে খ্যাত হইয়াছে।

এই গেল পুরাণের মত।

চৈনিক পরিব্রাজক হিয়েন্থ্‌সিয়াঙ্গের মতে এই নগর রাজমহলের নিকটস্থ গঙ্গা নদী হইতে ৬০০ লী বা ১০০ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। কানিংহাম বলেন* 'এই বিবরণ রাজমহল হইতে মহাস্থানের দূরত্বের

* Cunningham's Archæological of India, Vol. XV.

সহিত ঠিক মিলিয়া যায়। কারণ মহাস্থান রাজমহল হইতে ১০০ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত।' আর হিয়েন্থসিয়াঙ্গ বলিতেছেন 'পো শি পো' পৌণ্ড্র-বর্দ্ধণের ৪ মাইল পশ্চিমে; আবার মহাস্থান হইতে ভাসুবিহার ৬ মাইল পশ্চিমে।' সুতরাং উভয় বিবরণের সহিত বিবরণানুযায়ী ও স্থানানুযায়ী বেশ মিলিয়া যায়।

ভাসুবিহার পৌণ্ড্রবর্দ্ধণের অন্তর্গত একটী বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম। নাগর নদীর তীরে বিহার গ্রামে এখনও ইহার ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়। চীন-পরিব্রাজক হিয়েন্থসিয়াঙ্গ এখানে সাত শত মহাযান সম্প্রদায়ী বৌদ্ধযতির শাস্ত্রাধ্যয়ন বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

পুরাণবর্ণিত পৌণ্ড্রবর্দ্ধণের অবস্থিতির সহিত চীন-পরিব্রাজক হিয়েন্থসিয়াঙ্গের পৌণ্ড্রবর্দ্ধণের অবস্থিতি মিলিয়া যাইতেছে। আর কানিংহাম সাহেব তাঁহার Archæological Survey নামক গ্রন্থে পৌণ্ড্রখণ্ডের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই, অথচ পৌণ্ড্রখণ্ডোক্ত বচনের সহিত উক্ত প্রত্নতত্ত্ববিদের অনুমান মিলিয়া গিয়াছে। তিনি কেবল হিয়েন্থসিয়াঙ্গের বর্ণনার সহিত স্থান মিলাইতে গিয়া মহা-স্থানকেই পৌণ্ড্রবর্দ্ধণ বলিয়া ধারণা করিয়াছেন। এবারের ধারণা কিন্তু ঠিক্ হইয়াছে।

যদি কোন সমভূমি মাঠে পৌণ্ড্রবর্দ্ধণ প্রমাণ করা যাইত, তাহা হইলে অনেকের অনেক অনুমান করিবার থাকিত। কিন্তু মহাস্থানের সেই পাহাড়সদৃশ বিশাল গড়, অসংখ্য অট্টালিকার ভগ্নস্তূপ, বিহার গ্রামের ধ্বংসাবশেষ, এবং নগরবেষ্টনাবং সুউচ্চ ৮ মাইল দীর্ঘ জঙ্গল,—এই সকল দেখিয়া স্বতঃই মনে এই প্রশ্ন উদিত হয়, হায়! ইহা কত কালের কোন বিশাল রমণীয় নগরীর ধ্বংসাবশেষ, না জানি ইহাতে কতই সৌন্দর্য্যের আগার ছিল!

এই মহাস্থানে স্থিত করতোয়াতীরবর্ত্তী শিলাদ্বীপে সুপ্রসিদ্ধ পৌষনারায়ণী স্নান হইয়া থাকে। সে সময় মহাস্থানে ভারতবর্ষীয় লক্ষ লক্ষ হিন্দুর সমাগম হইয়া থাকে। পৌষনারায়ণী-যোগের বিষয় হিন্দু মাত্রেই অবগত আছেন।

"চাপার্কে মূল সংযুক্তে যদি সোমযুতাকূহূঃ
নারায়ণীতি বিখ্যাতা ত্রিকোটী কুল মুদ্ধরেৎ

পৌণ্ড্রদেশের বিস্তৃতি।

পৌণ্ড্রদেশ যে কতদূর বিস্তৃত ছিল, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। বোধ হয় কখন কোন রাজা অন্য রাজ্যের সীমা যতদূর পারিয়াছেন নিজরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন; আবার হয়ত কোন রাজা অপারগ হেতু নিজ রাজ্যের কতকাংশ অন্য রাজাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন। সুতরাং কোন সময়ে পৌণ্ড্রের সীমা বর্দ্ধিত কোন সময় বা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে।

হিয়েন্থসিয়াঙ্গের সময় পৌণ্ড্রের সীমা ৮০০ মাইল ছিল।

এ সম্বন্ধে মহাত্মা বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার বিবিধ প্রবন্ধের দ্বিতীয় ভাগের 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' শীর্ষক প্রবন্ধের টিপ্পনিতে উইলসনের বিষ্ণুপুরাণের ও ভবিষ্যপুরাণের যে যে মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

Pundras. the Western Provinces of Bengal, or as sometimes used in a more comprehensive sense it includes the following districts : Rajshahi, Dinagepur, and Rangpore ; Nadia, Beerbhum, Burdwan, part of Midnapur and the Jangle Mehals ; Ramghur, Pancheti, Palemow, and part of Chunar. See an account of Pundra

translated from what is said to be part of the Bramanda section of the Bhavishyat Puran in the quarterly Oriental Magazine, Decem. 1824, Wilson's Vishnupurana.

ভবিষ্যপুরাণের মতে পৌণ্ড্রদেশ সাত ভাগে বিভক্ত:—গৌড়দেশ, বরেন্দ্রভূমি, নীবৃত্ত, বরাহভূমি, বর্দ্ধমান, নারীখণ্ড ও বিন্ধ্যপার্শ্ব।

পৌণ্ড্রতীর্থ-আবিষ্কার কর্ত্তা ষষ্ঠাবতার পরশুরামের (ভার্গবের) সহিত মুসলমান-সমসাময়িক মহাস্থানের রাজা পরশুরামকে লইয়া ইতিহাসে O'donnell প্রভৃতি অনেকেই গোলে পড়িয়াছেন।

মহাস্থানের রাজা পরশুরাম।

রাজা পরশুরাম ১৩শ শতাব্দীর শেষভাগে মহাস্থানে রাজত্ব করিতেন, প্রচলিত কিম্বদন্তি হইতে ইহা জানা যায়। কিন্তু লঘুভারতকার লিখিতেছেন যে, হুসেন সার রাজত্বকালে শাহ সুলতান মহাস্থানে আসিয়া পরশুরামকে নিহত করেন। হুসেন সার রাজত্বকাল ১৪৯৪-১৫২৩ বা ২৫। দুই মতে প্রায় শত বৎসর প্রভেদ দেখা যাইতেছে। যাহা হউক ১৪শ শতাব্দীর মধ্যেই যে রাজা পরশুরাম মহাস্থানে রাজত্ব করিতেন, তাহা অবশ্যই কল্পনা করা যাইতে পারে।

লঘুভারতকার বলেন, এই রাজা পরশুরাম, রাজা শ্যামল বর্ম্মার বংশোদ্ভব ক্ষত্রিয়। শ্যামল বর্ম্মার বংশ বঙ্গে ও গৌড়ে বিস্তৃত হইয়াছিল। বগুড়া অঞ্চলে যে সকল শ্যামল বর্ম্মার বংশীয় ছিলেন, খিলিজির সময়ে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। তথাপি বরেন্দ্রের মধ্যে ক্ষত্রিয়গণ ছিলেন। মানসিংহ যখন কামরূপ জয়ে যান, তখন এই প্রদেশ হইতে ঐ সকল ক্ষত্রিয়গণকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন।

Dr. Buchanan Hamilton বলেন, এই জেলার প্রচলিত বিবরণ

হইতে জানা যায়, ইহা অতি পুরাকালে পরশুরামের রাজ্য ছিল। ইনি মহাস্থানে গড়ে বাস করিতেন। ইঁহার অধীনে ২২ জন রাজা ছিল।*

Archæological Survey of India, Vol. XV. ও Hunter's Statistical Account of Bogra District গ্রন্থে পরশুরামকে মহাস্থানের রাজা বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

১২৬৮ সালে লিখিত কালীকমল সার্ব্বভৌম প্রণীত '*ঐতিহাস বগুড়া বৃত্তান্ত*' *নামক একখানি পুরাতন গ্রন্থে* পরশুরাম ও মহাস্থান সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল।

সাহ সুলতান মুসলমানাধিকার।

"জনশ্রুতিতে প্রকাশ যে সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মহাস্থানের রাজা পরশুরমে নামক এক ব্যক্তি হিন্দুজাতি বাস করিয়াছিলেন। ঐ রাজার রাজ্য কালে ঐ স্থানের চতুর্দ্দিকে ইষ্টক নির্ম্মিত দুর্গে পরিবেষ্টিত ছিল। কোন শত্রু হঠাৎ রাজপুরী লুণ্ঠন করিতে পারিত না। দুর্গের মধ্যে ও বাহিরে কেবল অট্টালিকাময় নির্ম্মিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে অনেক দেবালয় ও বিদ্যালয়। দুর্গের মধ্যে অস্ত্রাগার ধনাগার প্রভৃতি বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। দুর্গের বাহিরে চতুর্দ্দিকে ৫ ক্রোশ পরিমিত স্থান রাজনগর ছিল। রাজনগরের চতুষ্পার্শ্বে চাঁদ সদাগর প্রভৃতি মহাধনী লোকের বাটী ছিল। তাঁহারা নিয়ত মহাস্থানে বাণিজ্য করিতেন। রাজনগরের পার্শ্বস্পার্শীয় কতিপয় স্থানের নাম গোকুল, বৃন্দাবন পাড়া, মথুরা, গয়া, কাশী যোগীর ভবন ছিল। গোকুল নামক স্থানে প্রকৃত গোকুলে ভগবানের যে সকল লীলা হইয়াছিল, তদ্রূপ ক্রিয়াকলাপ হইত। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা প্রভৃতি হইত। মথুরাপুরীতে কংসবিনাশাদি হইত। গয়াতে পিতৃকার্য্য হইত। কাশীতে কেবল অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বরের যেরূপ সেবা আছে,

তদ্রূপ হইত।* এতদ্ভিন্ন রাজ্যের মধ্যে স্থানে স্থানে অতি বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন দ্বারা প্রজাদিগের জলকষ্ট নিবারণ হইয়াছিল। রাজা পরশুরামের রাজ্যের সীমার স্থৈর্য্য ছিল না। এই রাজার এক মাত্র কন্যা ছিলেন; তাঁহার নাম অনেকে শীলাদেবী বলিত। ইনি বড় তপস্বিনী ও পিতৃভক্ত ছিলেন। শুনা গিয়াছে শীলাদেবীর শীলতায় জগৎবাধ্য ছিল। রাজার তাল বেতাল নামক বীরদ্বয় বশীভূত আর জীয়ন্তকুণ্ড নামে এক কুণ্ড থাকায় কোন বিপদ হইত না। তাহাতে রাজা সর্ব্বদাই নিঃস্কণ্টক হইয়া রাজ্য করিতেন। চিরকাল লোকের ভাগ্য সমান থাকে না। এ নিমিত্ত রাজা পরশুরাম যে প্রকারে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন, তাহার সংক্ষেপ বৃত্তান্ত নিম্নে দেওয়া গেল।

মহাস্থানবাসী কোন ব্রাহ্মণের * * * কালক্রমে সন্তান হয় না, তাহাতে ব্রাহ্মণব্রাহ্মণীর মনস্তাপের পরিসীমা ছিল না। ব্রাহ্মণ সন্তানের নিমিত্ত শান্তি স্বস্ত্যয়ন ও ঔষধাদি যে পর্য্যন্ত করিতে হয় তাহা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ পত্নী সিদ্ধপুরুষ তপস্বী ব্রাহ্মণদিগের প্রতি যৎপরোনাস্তি ভক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতেও কোনরূপে গর্ভসঞ্চার হয় নাই। ব্রাহ্মণ একদিন স্কন্দ নামক দেবতার মণ্ডপে গিয়া পুত্রকামনায় ধন্না দিয়া থাকিলেন, তাহাতে রাত্রিকালে প্রত্যাদেশ হইল যে, "তুমি যবনধর্ম্ম গ্রহণ করিলে সর্ব্বগুণাক্রান্ত এক পুত্র লাভ করিতে পারিবে।" ব্রাহ্মণ মহাস্থানে সে রাত্রে যে ভাবে প্রত্যাদিষ্ট

* শুনা যায় ষষ্ঠাবতার পশুরাম মহাস্থানের চতুস্পার্শ্বে ভারতবর্ষীয় সমস্ত প্রধান তীর্থ সমূহের একত্র সমীবেশ করিবার মানসে, ঐ সমস্ত তীর্থের নামে গ্রাম প্রতিষ্ঠিত ও তৎ তৎ স্থানানুযায়ী দেবদবীপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কাশীস্থাপন করিতে হইলে কোটী শিবলিঙ্গ প্রয়োজন; পরশুরাম কোটী লিঙ্গই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক কাশী ভিন্ন দ্বিতীয় কাশী হওয়া মহামায়ার অভিপ্রেত নহে, কাজেই একটী লিঙ্গ অপহৃত হইল। সে জন্য বোধ হয় মহাস্থান গুপ্ত বারাণসী বলিয়া করতোয়া মাহাত্ম্যে উল্লিখিত হইয়াছে।

হইলেন, মক্কানগরে পেগম্বর মহম্মদও ঐরূপ প্রত্যাদিষ্ট হইলেন যে, তুমি মহাস্থানস্থ তাবত হিন্দুকে যবনধর্ম্ম গ্রহণ করাও। তৎপর প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিদ্বয় স্ব স্ব কার্য্যসাধনের পথান্বেষণ করিতে লাগিলেন।

এক দিবস ব্রাহ্মণ প্রত্যাদেশের বিষয় অতি সাবধানে ব্রাহ্মণীর নিকট ব্যক্ত করিলে পর, বিপ্রপত্নী প্রতিকথায় বিশ্বস্তা আর আহ্লাদিতা হইয়া কহিলেন যে, ঠাকুর! আঁটকুড়া হইয়া থাকা অপেক্ষা দেবতার আদেশানুসারে যবনধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, যদি সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত পুত্র সন্তান হয়, তবে তাহাও কর্ত্তব্য। আমার বিবেচনায় অদ্যই যবনধর্ম্ম গ্রহণ করা ভাল। যত কালবিলম্ব হইবে ততই ব্যাঘাত জন্মিবে। ব্রাহ্মণ পতিপ্রাণার ধর্ম্মবিপর্য্যয় করার কথায়, তাদৃশ মনঃসংযোগ করিলেন না। তাহাতে ব্রাহ্মণপত্নী দুঃখিতা হইয়া থাকিলেন। অনন্তর একদিন দ্বিজপত্নী নিজ পরিচারিকার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁ গো বাছা! বল দেখি ঐ সহরের মধ্যে যবনজাতি আছে কি না? তাহাতে ঐ পরিচারিকা উত্তর করিল, ঠাকুরাণী, যবনজাতি কি প্রকার তাহা আমি জানি না। তৎপর ব্রাহ্মণের যবনধর্ম্ম গ্রহণের বিষয় ক্রমে ক্রমে রাজার কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে রাজা ব্রাহ্মণকে কারারুদ্ধ করিলেন। ব্রাহ্মণ কারাবাসী হইয়া সজলনয়নে মহাদেবের চিন্তা করিতে লাগিলেন। * * *

এদিকে মহম্মদ মহাস্থানবাসী হিন্দুদিগকে যবনধর্ম্ম গ্রহণ করাইবার নিমিত্ত মহাবল পরাক্রান্ত, অতি সাহসী, কার্য্যক্ষম তুরস্ক দেশের রাজপুত্র সাহ সুলতানকে* প্রেরণ করিলেন। যুবরাজ সাহ সুলতান পেগম্বর মহম্মদের আদেশানুসারে এক মৎস্যাকৃতি জলযানারোহণে

* এই সাহ সুলতানকে কেহ 'সা-সুলতান হজরৎ আউলিয়া', 'কেহ সাহ সুলতান ফাকির' ইত্যাদি নামে অভিহিত করেন।
লোকমুখে শুনা যায় সাহ সুলতান নাকি বঙ্কের রাজকুমার।

ক্রমে ক্রমে মহাস্থানের নিকট উপস্থিত হইয়া রাজা পরশুরামের বলাদি জ্ঞাত হইলেন। যে দিবস সাহ সুলতান মহাস্থানে উপস্থিত হইয়া ছিলেন, প্রথমে শীলাদেবী দেখেন সাহ সুলতান ফকির বেশ ধারণ করিয়া একাকী নৌকা হইতে উঠিয়া মহাস্থানে উপস্থিত হইয়া, রাজার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ফকির কি চান জিজ্ঞাসা কর, তৎপরে ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিলে ফকির বলিলেন, 'এই স্থানে অদ্য থাকিব, তন্নিমিত্ত একটু স্থান চাই।' রাজা ফকিরের প্রার্থনা জ্ঞাত হইয়া, দ্বারবানদিগকে আজ্ঞা করিলেন যে, এক দিনের নিমিত্ত ফকিরকে একটু স্থান দেওয়া হউক; কেহ যেন উহাকে উৎপাত না করে। তৎপর ফকিরবেশধারী সাহ সুলতান কৌশল-পূর্ব্বক অগ্রে তাল বেতাল নামক বীরদ্বয়কে যবনধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়া নিজ চর্ম্মাসন মহাস্থানময় ব্যাপ্ত করিলে, রাজা সৈন্য ও নগররক্ষকদিগকে আজ্ঞা করিলেন যে, দুর্বৃত্ত নরাধম সাহ সুলতানকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দাও। এই আজ্ঞা পাইবামাত্র রাজভৃত্যেরা মার মার শব্দ করিয়া সাহ সুলতানের উপর পড়িল; সাহ সুলতান অত্যন্ত সাহসী ও বীর পুরুষ ছিলেন বলিয়া একাকী এক গাছী শূলাস্ত্র দ্বারা তাবত সৈন্যসামন্তকে হতাহত ও পলায়িত করিলেন। রাজা এই বিস্ময়কর ব্যাপারের সংবাদ শুনিয়া স্বয়ং রণস্থলবর্ত্তী হইয়া মহা সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুকাল ঘোরতর সংগ্রাম হইলে পর সাহ সুলতান রাজার বক্ষঃস্থলে এমন এক গদাঘাত করিলেন যে, তাহাতে পরশুরাম মৃতাসুপ্রায় হইয়া কালীহ্রদে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তৎপর রাজার কন্যা শীলাদেবী রাজার নিধনসংবাদ শ্রবণ করিয়া করতোয়ায় কলেবর পরিত্যাগ করিবার জন্য একাকিনী প্রচ্ছন্নভাবে অন্তঃপুর হইতে নির্গতা হইয়া করতোয়ায় গমন করিতে ছিলেন, এমন সময় সাহ সুলতান ঐ সংবাদ শুনিয়া উঁহার গতিরোধ

করিবার জন্য অগ্রসর হইলে, শীলাদেবী ক্রেঅস্ত্র দ্বারা দুর্বৃত্ত যবন দলের শিরোচ্ছেদন করিয়া করতোয়াসলিলে দেহার্পণ করতঃ তনুত্যাগ করিলেন। তৎপরে সাহ সুলতানের সমভিব্যাহারী লোকেরা মহাস্থানস্থিত লোকদিগকে ছলে বলে-কলে-কৌশলে অনবরত যবন-ধর্ম্ম গ্রহণ করাইতে আরম্ভ করিলে পর মহাস্থানস্থিত অনেক ব্যক্তি স্থান ত্যাগ করিলে নগর ক্রমে ক্রমে যবন ও অরণ্যময় হইল। যবনময় হইলে পর যবনেরা মহাস্থানস্থিত হিন্দুদিগের দেব-দেবীর ও অন্যান্য বিষয়ের চিহ্ন রাখিল না। ইহার ৮। ৯ শত বৎসর পরে যখন মানসিংহ বঙ্গরাজ্যে আসিয়াছিলেন, তৎকালে তিনি মহাস্থানে বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া পৌণ্ড্রক্ষেত্রান্তর্গত শীলাদ্বীপের অনেক চিহ্ন প্রকাশ করেন। তাহাতে ঐ স্থানকে সকল লোকে পৌণ্ড্রক্ষেত্র বলিয়া স্বীকার করে ও মহাতীর্থ বলিয়া মানে। এইক্ষণ শাস্ত্রীয় নিদর্শন কিছুমাত্র পাওয়া যায় না।

মহাস্থানের বর্ত্তমান অবস্থা।

সম্প্রতি মহাস্থানে যে যে বিষয় বিদ্যমান আছে, তাহা বর্ণনা করা যাইতেছে। যথা:—এই স্থানের পূর্ব্বদিকে করতোয়া নদী, উত্তরে রায়নগর, পশ্চিমে বামণপাড়া প্রভৃতি কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম। দক্ষিণে বাঘোপাড়া প্রভৃতি কতিপয় গ্রাম। ইহার মধ্যবর্ত্তী স্থানে অত্যল্প লোকের বসতি। আর স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন আছে। এতদ্ভিন্ন প্রায় ভারত ভূমিতে তুঁত হয় ও ধান্য হয়। এই ধান্য আর তুঁতের ভূমিতে অতি পুরাতনকালে কোন হিন্দু রাজার অতি প্রাচীন প্রকাণ্ড দুর্গের চিহ্ন আছে। ঐ দুর্গের আকার প্রকারে বোধ হয়, কোন কালে কোন সম্রাট আসিয়া মহাস্থানে বাস করিয়াছিলেন। এদেশের অনেক লোক বলে যে, এই গড় রাজা পরশুরাম কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ঘাট আছে তাহাকে শীলাদেবীর ঘাট বলে। গড়ের

দেখা যায়। গত বৈশাখ মাসে বামণপাড়া গ্রামের নিকটস্থ ধান্য ক্ষেত্রের মধ্যে দ্বাদশ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট একটী ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ৫।৬ হাত মৃত্তিকা খনন করায় প্রকাশ পাইয়াছে। যৎকালে ঐ গৃহ প্রকাশ পায়, তৎকালে উহার মধ্যে যে যে দ্রব্য ছিল, তন্মধ্যে একটী ধাতু নির্ম্মিত ঘটী ও একটী স্বর্ণমুদ্রা প্রকাশ পাইয়াছে। ঐ স্বর্ণমুদ্রার আকার অর্দ্ধ-মুদ্রা হইতে কিঞ্চিৎ বড়, উহার মূল্য ১২।১৩ টাকার অধিক নহে। ঐ মুদ্রায় অক্ষরাদির কোন চিহ্ন নাই। কেবল দুই পৃষ্ঠাতেই পুত্তলিকার আকার আছে। তাহার একটী স্ত্রী আকার ও একটী পুরুষাকার। স্ত্রী মূর্ত্তিটি পদ্মাসনে উপবিষ্টা আর পুরুষ মূর্ত্তিটী দাঁড়ান। ইহার পূর্ব্বে আর এক ব্যক্তি ঐ গড়ের মধ্যে ধান্যক্ষেত্রের মৃত্তিকাখননকালীন কতকগুলি রজতমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিল, ঐ টাকা পুরাতন ঘরের টাকার ন্যায়। তাহাতেও কোন অক্ষর খোদিত ছিল না; কেবল একটী ত্রিশূল-হস্ত বৃষবাহণ শিবের মূর্ত্তি আছে। এতদ্ভিন্ন গড়ের আর আর স্থানের লোক সকল কত সামগ্রী পাইয়াছে, তাহা প্রকাশ হইতে পারে নাই। গড়ের পূর্ব্বদিকে করতোয়া নদীর তীরে একটা উচ্চ ভূমির উপরিভাগে সাহ সুলতানের সমাধিস্থান ও যবনদিগের ভজনালয় প্রভৃতি কতিপয় চিহ্ন আছে। ঐ স্থানে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বারণীর সময় মেলা হয়। এই মেলায় অনেক দুর হইতে লোকজন ও দোকানীপশারী আগত হয়। তেমনি বিক্রয়ও হয়। এই মেলায় গরু ও ঘোড়া অধিক বিক্রয় হয়। মেলা ৮ দিনের অধিক থাকে না। এতদ্ভিন্ন জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরার দিবস মেলা হয়। ঐ মেলা অতি সামান্য, এক দিবসমাত্র স্থায়ী। কখন কখন নারায়ণীযোগোপলক্ষে যে মেলা হয়, সে মেলা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে। (সেতিহাস বগুড়া বৃত্তান্ত)

বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে দেখিলে বুঝা যায় যে, গড়টী একটী চতুর্ভুজাকার ছিল। এবং চতুষ্পার্শ্বে বৃহৎ পরিসর ও সু-উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এই গড়ের চতুর্দ্দিকে খাল খনিত হইয়াছিল স্পষ্ট বুঝা যায়। এক্ষণে গড়ের কোন কোন অংশের উচ্চতা ২৫।৩০ হাত পর্য্যন্ত এবং পরিসর তদনুযায়ী দেখা যায়। দূর হইতে দেখিলে পাহাড় বলিয়া ভ্রম হয়। ৪।৫ ক্রোশের ভিতর প্রায় ভূমিই উচ্চ নীচ, কেবল ধ্বংসস্তূপে পরিপূর্ণ।

স্কন্ধ* গোবিন্দ-মন্দিরের মধ্যবর্ত্তী ভূমি অতি পবিত্র বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে ঐ দুই মন্দিরের স্থান দুইটী অশ্বথ বৃক্ষ দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে হত ভগদত্তের বৃহৎ স্বর্ণকবজ সহিত একখানি হস্ত একটী চিল-কর্ত্তৃক আনিত হইয়া মহাস্থানস্থিত করতোয়াকূলে পতিত হইয়াছিল

এই মহাস্থানের দক্ষিণে একটী জাঙ্গাল দেখা যায়, উহা ভীমের জাঙ্গাল বলিয়া খ্যাত। উচ্চ ২০ ফুট, দীর্ঘ ৮০মাইল।

মহাস্থান এখন মুসলমানদিগেরও একটী পবিত্র স্থান বলিয়া খ্যাত।

সাহসুলতানের মস্‌জিদের জন্য ৬১০ একর পরিমাণ পীরপাল আছে। ইহা দিল্লির সম্রাট কর্ত্তৃক সনন্দযোগে মঞ্জুর করা। সনন্দ খানা হারাইয়া গিয়াছে। কিন্তু ১০৭৬ হিজিরা ১৬৬৬ অব্দে ঢাকার শাসন-কর্ত্তা দ্বারা পুনরায় সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৮৩৬ অব্দে গভর্ণমেণ্ট এই সত্ত্ব তুলিয়া লইবার জন্য মকদ্দমা রুজু করিয়াছিলেন, কিন্তু অধিক কালের মঞ্জুরীকৃত বলিয়া ১৮৪৪ অব্দে ঐ মোকদ্দমা ছাড়িয়া দিয়াছেন। এপ্রেল মাসের মাঝামাঝি মহাস্থানে যে মেলা হয়, তাহাতে ঐ মস্‌জিদের

---

* এই মন্দিরে কল্যাণী দেবীর নৃত্য দেখিয়া কাশ্মীররাজ জয়াদিত্য মোহিত হইয়াছিলেন।

এখানকার মৃত্তিকার স্তূপের ভিতর হইতে ইলিয়দ সাহী বংশের মহম্মদ সার নামাঙ্কিত একটী টাকা পাওয়া গিয়াছে। রাজা কাংশ বা গণেশের সহিত যুদ্ধ করিয়া গৌড়সিংহাসন হারাইয়া পরে যখন ইলিয়দ সাহীবংশ ঐ সিংহাসন পুনঃ প্রাপ্ত হন, মহম্মদ সা সেই বংশের প্রথম রাজা। হিজিরা ৮৫২ বা ১৪৪৮ অব্দ হিঃ ৮৫৮ বা ১৪৫৪ অব্দ এবং হিঃ ৮৬২ বাং ১৪৫৮ অব্দের তিনটী মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ১৮৭৪ অব্দে মহাস্থানে এক পাত্র পুরাতন টাকা পাওয়া গিয়াছিল, ইহার একটীতে মিলসার নাম ছিল। আর একটী মুদ্রাতে "শ্রীমহেন্দ্র সিংহ পরাক্রম" অপর পার্শ্বে কুমার গুপ্ত অঙ্কিত ছিল।

ওডোনেম সাহেব বলেন :—

"The whole place is of great interest, and deserves a detailed arch æological survey.

* বিহার তরফের বর্ত্তমান মোতওল্লী বগুড়ার নবাব আবদুস্ সোব্হান চৌধুরী।

উদয়াদিত্য।*

প্রভাসি অতীত উদয়-অচল
উদয়াদিত্য উদিল রে!
নবীন বঙ্গ করিয়া উজল
নব বিভাকর ভাতিল রে।
করহ ফুল্ল কুসুম চয়ন,
চরণে ঢালিব অর্ঘ্য রে;
শতেক যুগের দুরিত দমন
করিয়া লভিব স্বর্গ রে!

আজি এ বঙ্গ ভুবনময়
গাহরে উদয়াদিত্য জয়।
ঢালরে চরণে কুসুম চয়
ভক্তি নম্র অন্তরে।

বঙ্গের সুখ গৌরব ছবি
হেরি পুলকিত চিত্ত!
আজিরে উদয় অচলের রবি
উদিল উদয়াদিত্য!
ঝলিতেছে করে খর তরবার
প্রখর রৌদ্রদীপ্ত
নয়নে জ্বলিছে উজ্জ্বলতর
সংহার রবি দৃপ্ত।

---

* বিগত ৪ঠা আশ্বিন বঙ্গের বালকগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত "উদয়াদিত্য পুষ্পাঞ্জলি" উৎসব উপলক্ষ্যে রচিত ও গীত।

অমিত-বীর্য্য-মহিমাময়
জয় হে উদয়াদিত্য জয়।
পরশি চরণ, দেহ অভয়
শৌর্য্য দীপ্ত অন্তরে।

শ্রাবণ গগনে জীমূত মন্দ্র
যেমন গভীর বাজে;
মথিয়া ভুবন, শৈল রন্ধ্রে,
ঝটিকা যেমন বাজে,
তেমনি গভীর, তেমনি ভীষণ,
উঠুক বাজিয়া গীতি
উঠুক কাঁপিয়া কানন গহন
উঠুক কাঁপিয়া ক্ষিতি!

আজিহে গগন ভুবনময়
গাহরে উদয়াদিত্য জয়।
ভক্তি বীর্য্য শৌর্য্য চয়
পূর্ণ করিয়ে অন্তরে!

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

অ্যাবট্‌স্‌ফোর্ড।

প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র, জানালার কাছে গিয়া, পর্দা তুলিয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলাম। জানালার নিম্নে রাজ-পথ,—দুই একটি গোপবালা দুগ্ধপাত্র হস্তে লইয়া ক্ষিপ্রগতিতে অদৃশ্য হইল। পথের পর একটি বিস্তীর্ণ ময়দান।* তাহার প্রান্তে তরুশ্রেণী, তাহার পর গৃহপুঞ্জ। কিয়দ্দূরে "ক্যাস্‌ল্‌ হিল্‌" উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান,—তাহার চূড়ায় এডিনব্রা-দুর্গ। যদিও তখন বেলা ৮টা, কোথাও সূর্য্যদেবের কোনও চিহ্ন নাই। আকাশে অল্প মেঘ,—বাতাসে কিঞ্চিৎ কুয়াসা। অস্ফুটস্বরে বলিলাম—"যাক্‌,—বাঁচা গেল।"

গৃহবাসী পাঠকগণ আমার এ মন্তব্যের অর্থ বোধ হয় বুঝিতে পারিবেন না—সুতরাং কিঞ্চিৎ টীকা আবশ্যক। আমি যে হঠাৎ উঠিয়া জানালা খুলিলাম,—দৃশ্য দেখিবার অভিপ্রায়ে খুলি নাই।—শুধু দেখিবার জন্য,—আকাশ কেমন আছে। আজ আমরা পঞ্চবন্ধু মিলিয়া, প্রাতরাশের পর, অ্যাবট্‌স্‌ফোর্ড যাত্রা করিব—সুতরাং প্রথমেই আকাশের সংবাদ লইতে হইল। এ দেশে, কোথাও যাইতে আসিতে হইলে,—বিশেষতঃ যদি প্রমোদভ্রমণ হয়,—তাহা হইলে প্রধান চিন্তা, সেদিন আকাশ কেমন থাকিবে। যদি রৌদ্র উঠে, তাহা হইলে ত কথাই নাই—সৌভাগ্যের চরমসীমা। রৌদ্র যদি নাও উঠে,—বৃষ্টিটা বন্ধ থাকিলেই যথেষ্ট। আকাশের অঙ্গে বৃষ্টি হইবার আশু সম্ভাবনা না দেখিয়া,—আশ্বস্ত হইয়া বলিলাম "বাঁচা গেল।" রবি বাবুর মতে, পূর্ব্বে পঞ্চশর যখন গোটা ছিলেন,—তখন,

---

* স্কটের উপন্যাস-পাঠকেরা, "Fortunes of Nigel" গ্রন্থে এই Meadowsএর বর্ণনা পাঠ করিয়াছেন।

বর্ষা ঋতুটা আমাদের দেশে বর্ষের একদেশে সম্পূর্ণভাবে বিরাজ করে; কিন্তু এ দেশে জানি না কোন্ মহাদেব, মদনকে না পাইয়া, তদীয় প্রিয়সহচর বর্ষাকে চূর্ণ করিয়া বর্ষময় ছড়াইয়া দিয়াছেন।

বেলা দশটার সময় আমরা পঞ্চবন্ধু,—Waverley ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। আমরা গাড়ীর যে কামরায় প্রবেশ করিলাম,—তাহাতে একজন "নেটিভ" বাসয়া ছিল। পঞ্চজন কৃষ্ণমূর্ত্তির যুগপৎ আবির্ভাব দর্শনে, সে ব্যক্তি চট্ করিয়া সরিয়া পড়িল। আমরা হাস্যকৌতুকে ও পাইপের ধূমে কক্ষখানি ভরিয়া ফেলিলাম। ক্রমে গাড়ী ছাড়িল কাস্‌ল্ হিলের পাদদেশ দিয়া, প্রিন্সেস্ গার্ডেন দক্ষিণে রাখিয়া আমরা এডিনব্রার সীমা পার হইলাম। নগরটি ক্ষুদ্র,—কলিকাতা অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র—নগরসীমা অতিক্রম করিতে বিলম্ব হইল না।

নগরের পর,—মাঠ, নদী ও পর্ব্বত। মাঝে মাঝে পর্ব্বতচূড়ায় একটি পুরাতন দুর্গ দেখা যায়। কয়েকটি ষ্টেশন অতিক্রম করিলাম যাহার নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রক্তের অক্ষরে লেখা আছে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্কট্‌ল্যাণ্ডে এত রক্তপাত হইয়া গিয়াছে যে, কিছুদূর ভ্রমণ করিতে হইলে এরূপ স্থান অতিক্রম করা অনিবার্য্য।

এক ঘণ্টা পরে আমাদের গাড়ী মেল্‌রোজ ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। অ্যাবট্‌স্‌ফোর্ড যাইতে হইলে মেলরোজে নামিতে হয়। মেলরোজ একটি পুরাতন স্থান। নগরও নয়,—গ্রামও নয়,—এই দুইয়ের মাঝামাঝি। মেলরোজে দ্রষ্টব্য জিনিষ ইহার পুরাতন অ্যাবি। আমরা স্থির করিলাম, অ্যাবট্‌স্‌ফোর্ড দেখিয়া আসিয়া, মেলরোজ অ্যাবি দেখিব।

ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া দেখা গেল, অ্যাবট্‌স্‌ফোর্ড-যাত্রীদের

লইয়া যাইবার এবং ফিরাইয়া আনিবার জন্ত একখানি সারা (Chara-banc) দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কেহ কেহ বলিলেন সারাবঁতে ওঠা যাউক, আমি বলিলাম না, পদব্রজে যাইতে হইবে। প্রথমত সারাবঁ লইলে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিরিতে হইবে, স্বেচ্ছামত দেখিয়া শুনিয়া বেড়াইতে পাওয়া যাইবে না। দ্বিতীয়তঃ পদব্রজে যাওয়ার যে নিজস্ব একটা বিশেষ আমোদ আছে তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। তুইমত—সুতরাং ভোট্ লইবার আবশ্যকতা উপস্থিত হইল। ফলে, পদব্রজে যাওয়াই স্থির হইল। পথ জিজ্ঞাসা করিয়া আমরা অগ্রসর হইলাম।

মেলরোজ গ্রাম বা নগর ছাড়াইয়া আমরা মাঠে আসিয়া পড়িলাম আমাদের হস্তে Pearson's Guide,—তাহার নির্দ্দেশ অনুসারে যাইতে লাগিলাম। একস্থানে পৌঁছিলে তাহার পর লেখা আছে টেলিগ্রাফের তার যে দিকে গিয়াছে, সেই দিকে যাইতে হইবে ডার্ণিক গ্রাম বামে রাখিয়া টেলিগ্রাফের তার ধরিয়া আমরা চলিলাম দুইধারে শস্যক্ষেত্র, পথটি নীচু, দুই ধারে বেড়া, তাহার গায়ে থিস্‌ল্ ও অন্যান্য বনফুল ফুটিয়াছে। ক্রমে দূরে Eildon Hillsএর চূড়াত্রয় দেখা যাইতে লাগিল। অ্যাবট্‌স্‌ফোর্ড গৃহের ছবিতে পশ্চাৎভাগে সচরাচর যে পর্ব্বতমালা দেখা যায়, তাহাই Eildon Hills। স্কট্ নানা স্থানে এই ত্রিচূড় পর্ব্বতের বর্ণনা করিয়াছেন। 'এই পর্ব্বতে আরোহণ করা স্কটের একটি প্রিয়কার্য্য ছিল। একবার তিনি বলিয়াছিলেন,—"এই পর্ব্বতের চূড়ায় দাঁড়াইয়া আমি ৪৩টি স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারি যাহা যুদ্ধে ও কাব্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছে।"

পথে কিয়দ্দূর যাইতে যাইতেই, একস্থানে একটি কাষ্ঠফলকে লেখা দেখিলাম—To Abbotsford House। পথ হইতে গৃহের অগ্রভাগটি দেখা গেল মাত্র। বাকী অংশ বাগানের গাছে পালায় আবৃত

সরু পথটি ধরিয়া সঙ্কেত অনুসারে আমরা যাইতে লাগিলাম। অনুমানে বোধ হইল, গৃহের পশ্চাৎভাগ হইতে আমরা প্রবেশ করিতেছি। শেষে দেখিলাম তাহাই বটে। গৃহের সম্মুখভাগ টুইড্‌ নদীর উপর, তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবার অবসর ঘটে নাই। ষ্টেশন হইতে আসিবাব রাস্তা, গৃহের পশ্চাৎভাগ দিয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য, যখন এ গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তখন ষ্টেশনও ছিলনা এবং সম্ভবতঃ ষ্টেশন হইতে এ পথও ছিলনা।

যাইতে যাইতে আরও দুই একটি স্থানে কাষ্ঠফলক দেখিলাম। তদনুসারে ক্রমে একটী ক্ষুদ্র কক্ষে উপস্থিত হইলাম। যে ভৃত্য দর্শকগণকে বাড়ীটি দেখায়, সে তখন একদল দর্শককে লইয়া ভিতরে গিয়াছিল। আমাদের একটু অপেক্ষা করিতে হইল। এই কক্ষে স্কট সম্বন্ধীয় অনেক বিক্রেয় পদার্থ রহিয়াছে। ছবি, পোষ্টকার্ড, ছবির বহি, ফোটোগ্রাফ্,—নানাপ্রকার টার্টানে ক্ষুদ্রাকারে বাঁধা স্কটের কাব্যাদি ;—একজন স্ত্রীলোক এসব বিক্রয় করিতেছে।

যাঁহারা স্কটের জীবনী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এই গৃহের জন্ম-বৃত্তান্ত অবগত আছেন, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তাঁহারা জানেন, এই গৃহের প্রতি স্কটের অনুরাগ কিরূপ প্রবল ছিল। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে শেষবার যখন প্রবাস হইতে ফিরিয়া স্কট গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন বারম্বার বলিতে থাকেন—"আমি অনেক দেখিয়াছি কিন্তু আমার গৃহের মত কিছুই দেখি নাই।"*

আমরা যাহা দেখিলাম, তাহার বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে একটি কথা বলিয়া রাখি। এ গৃহের অধিকারিণী এখন অনরেবল্‌ মিশেশ্‌ ম্যাক্স ওয়েল্‌ স্কট্‌। ইনি স্কটের প্রদৌহিত্রী। সোফায়া ছাড়া, স্কটের অপর

---

* "I have seen much" he kept saying, "but nothing like my ain house."—*Lockhart's Life*, Vol. X., p. 269.

সকল পুত্রকন্যা নিঃসন্তান অবস্থা মরিয়া যান? স্কটের জীবনীলেখক লক্‌হার্ট, সোফায়ার পাণিগ্রহণ করেন। সার্লট নামে ইহাঁদের এক কন্যা জন্মে। অনরেবল্ মিশেশ্ ম্যাক্সওয়েলস্কট্ এই সার্লটের কন্যা ইনি বিধবা, স্বীয় পুত্রকন্যা লইয়া এখন অ্যাবট্‌সফোর্ড গৃহে বা করিতেছেন। সুতরাং গৃহটির সর্ব্বত্র দর্শকগণের অধিগম্য নহে। যে কক্ষগুলি অধিগম্য, তাহারই বর্ণনা নিম্নে করিতেছি।

কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর,—দ্বারবান পূর্ব্বাগত দর্শকগণকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। আমরা তখন, প্রত্যেকে এক সিলিং করি প্রাবেশিক দিয়া, তাহার সহিত ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

প্রথমেই, বামদিকে একটী অনতিপ্রশস্ত সিঁড়ি দেখা গেল। প্রত্যে ধাপের মধ্যস্থানগুলি খইয়া রহিয়াছে। উঠিতে উঠিতে আমার ম হইতে লাগিল,—ঠিক যে প্রস্তর গুলির উপর চরণ রাখিয়া সাহি সম্রাট্ স্কট্ সহস্রবার উঠিয়াছেন নামিয়াছেন,—সেই বহু সম্মানিত প্র গুলিরই উপর আজ ক্ষণেকের জন্য এ কোন্ দীনহীন সাহিত্যসেবী পদস্পর্শ হইতেছে!

প্রথমে আমরা যে কক্ষে নীত হইলাম, সেটি স্কটের লিপিমন্দি (study) ছিল। এডিনব্রা পরিত্যাগের পর স্কটের অধিকাংশ রচ এই কক্ষে সম্পন্ন হইয়াছে। কালো চামড়ায় মোড়া একটী মো সোটা আর্ম্ম চেয়ার, একটী দেরাজযুক্ত ডেস্কের সম্মুখে রাখা রহিয়াছে এই চেয়ারে বসিয়া, এই ডেস্কে স্কট্ লিখিতেন। বামে বৃহৎ জান তাহা গৃহসংলগ্ন বাগানের উপর খুলিয়াছে। লিখিতে লিখিতে হইলে এই বাগানের সবুজে বোধ করি স্কট্ চক্ষুকে নিমগ্ন করিতে কক্ষটি ক্ষুদ্র, তিন দিকের দেওয়ালে, মেঝে হইতে ceiling পু পুস্তকের আলমারি। উপরের আলমারিগুলি পৌঁছিবার দেওয়ালের মাঝখান দিয়া একটী সঙ্কীর্ণ বারান্দার মত চলিয়া গিয়া

সিঁড়ি দিয়া এই বারান্দায় ওঠা যায়। এই বারান্দার শেষে একটী ক্ষুদ্র দুয়ার আছে। সেই পথে স্কটের শয়নকক্ষে পৌঁছান যায়। কল্পনায় যেন দেখিলাম, এই কক্ষে বসিয়া অনেক রাত্রি অবধি স্কট্ লিখিতেছিলেন। লেখা শেষ হইলে, টেবিলের বাতি নিবাইবার পূর্ব্বে, একটী মোমবাতি জ্বালিয়া লইলেন। তখন টেবিলের বাতিটি নিবাইয়া, মোমবাতির আধারটি হাতে করিয়া, সিঁড়ি দিয়া সেই বারান্দায় উঠিলেন। সমস্ত বারান্দাটি অতিক্রম করিয়া, সেই দুয়ারটি খুলিয়া শয়নকক্ষে উঠিয়া গেলেন।

লক্‌হার্ট যখন প্রথম এডিনব্রায় স্কটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তখন স্কট্‌কে এই ডেস্কটির সম্মুখে উপবিষ্ট দেখিয়াছিলেন। স্কট্-জীবনীতে তিনি তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। এই ঘটনার চতুর্দ্দশ বৎসর পরে,—স্কটের উইল্ সন্ধান করিবার জন্য লক্‌হার্ট এই ডেস্কটি খুলিয়াছেন,—সে ঘটনারও বর্ণনা তিনি জীবনীতে করিয়াছেন। সে বর্ণনাটির মধ্যে স্কটের হৃদয়ের এমন একটি স্নেহসিক্ততার পরিচয় পাওয়া যায়! তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রকাশ করিলাম :—

"সমাধির পরদিন সন্ধ্যায় তাঁহার ডেস্ক খুলিয়া আমরা দেখিলাম সম্মুখেই একটী স্থানে কয়েকটি ছোট ছোট জিনিষ সারিবদ্ধ করা রহিয়াছে, এমন ভাবে সেগুলি সজ্জিত যে প্রতিদিন প্রভাতে ডেস্কটি খুলিবামাত্র জিনিষগুলি চক্ষু আকর্ষণ করে। জিনিষগুলির তালিকা এই :—কয়েকটি সেকালের কৌটা যাহা স্কটজননী বেশবিন্যাসের টেবিলে ব্যবহার করিতেন; একটী রূপার বাঁতিদান (ব্যারিষ্টার হইয়া যে প্রথম পাঁচ গিনি ফি পাইয়াছিলেন তাহা হইতেই স্কট্ মাতাকে এই ক্ষুদ্র উপহারটি কিনিয়া দেন); কতকগুলি কাগজের মোড়ক (স্কটের যে সকল ভাইভগিনীগুলি শৈশবেই মার কোল শূন্য করিয়া যায়,—তাহাদের চুল এই মোড়কগুলিতে রক্ষিত আছে; উপরে মাতার

হস্তাক্ষরে তাহাদের নাম লেখা) ; একটী নস্যের ডিবা (ইহা স্কটের পিতা ব্যবহার করিতেন) ইত্যাদি।

এই কক্ষের পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র কক্ষ, তাহার মধ্য দিয়া লাইব্রেরিতে প্রবেশ করিলাম। ইহা একটী প্রশস্ত কক্ষ। এখানে বিংশ সহস্র পুস্তক রক্ষিত আছে। এই কক্ষের কিয়দংশ আসবাব চতুর্থ জর্জের প্রদত্ত উপহার। পুস্তক ও এই উপহারগুলি ছাড়া আরও অনেক ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য পদার্থ এককক্ষে সঞ্চিত আছে। বৃহৎ জানালার কাছে একটী সো-কেশ আছে। তাহাতে অনেক দ্রব্য সঞ্চিত, কতকগুলির নাম করিতেছি :—নেপোলিয়নের ব্লটিংবুক্* (ইহার মলাটে মধ্যস্থলে লতাপাতার মধ্যে রেশমে N. অক্ষরটী অঙ্কিত আছে) ; নেপোলিয়নের কলমদানী* ; মেরি কুইন্ অব্ স্কট্‌সের শীল, তাঁহার পরিচ্ছদের ছিন্নাংশ, হস্তিদন্ত-খচিত একটী ক্রশ্ যাহা তিনি শিরশ্ছেদের সময় পরিধান করিয়াছিলেন) ; 'বনি প্রিন্স চার্লি'র কেশ ; নেলসন্ ও ওয়েলিংটনের কেশ ; কবি বার্ণসের পানপাত্র ; স্কটের বাল্যকালে ব্যবহারের ছুরী-কাঁটা ; রব রয়ের পার্স ; হেলেন ম্যাক্‌গ্রেগরের ব্রোচ্ প্রভৃতি। দেওয়ালের একস্থানে একটী বৃহৎ চিত্র লম্বিত আছে—তাহাতে সৈনিক বেশে স্কটের পুত্র এবং তাঁহার অশ্বের মূর্ত্তি অঙ্কিত।

ইহার পর 'ড্রয়িংরুম'। স্কটের ব্যবহারকালে এ কক্ষটি যেরূপ ভাবে সজ্জিত ছিল, এখনও অবিকল সেইরূপ রাখা আছে। দেওয়ালের চিত্রাঙ্কিত কাগজ পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। লক্‌হার্টের জীবন-চরিতের পাঠকগণ এই কক্ষের বর্ণনা বিশেষরূপেই অবগত আছেন। তখন রেল ছিল না,—রাজধানী হইতে বহুদূরে এই বিজনেও, স্কটের যশালোকে আকৃষ্ট হইয়া এত অতিথি-পতঙ্গের আবির্ভাব হইত যে, সময়ে

---

* Waterloo যুদ্ধের পর ইংরাজসৈন্য কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত।

সময় এই সুবৃহৎ বাসভবনেও লেডিস্কট্ কোথায় স্থান সংকুলান করিবেন ভাবিয়া ব্যাকুল হইতেন। সে সকল দিনে এই ড্রয়িংরুম কত না প্রমোদের রঙ্গভূমি হইয়াছিল।—এই কক্ষে কয়েকখানি মূল্যবান ও উৎকৃষ্ট ছবি আছে। *বিখ্যাত মূর্ত্তিচিত্রকর রেবর্ণ-অঙ্কিত স্কটের ছবি, স্যাক্সন্-অঙ্কিত লেডি স্কটের ছবি, ওয়াট্‌সন্-অঙ্কিত স্কটজননীর* ছবি প্রভৃতি।

ইহার পার্শ্বে অস্ত্রাগার (Armoury)। এখানে নানা সময়ের নানা দেশের অস্ত্রাদি সজ্জিত আছে,—বঙ্গভাষায় তাহার বর্ণনা করা অসম্ভব। শুধু কয়েকটী ঐতিহাসিক অস্ত্রের নাম করিব। ওয়াটার্লু যুদ্ধের পর, নেপোলিয়নের অঙ্গ হইতে যে এক যোড়া পিস্তল গৃহীত হইয়াছিল, তাহা রহিয়াছে। তাহা ভিন্ন, 'বনি প্রিন্স চার্লি'র মৃগয়া-ছুরিকা, প্রথম জেমসের মৃগয়া-পাণাধার; প্রথম চার্লস্ কর্ত্তৃক মণ্টরোজ্‌কে প্রদত্ত তরবারি; লখ্‌লেভেন দুর্গের চাবি (পাঠকগণ Abbot উপন্যাস স্মরণ করুন); স্কট্ স্বয়ং যখন Edinburgh Light Dragoon দলভুক্ত ছিলেন, সে সময়ের তাঁহার ব্যবহারের বন্দুক, তরবারি প্রভৃতি; রবরয়ের তরবারি ও অন্যান্য অস্ত্রাদি আছে। ইহা ছাড়া, ওয়াটার্লুক্ষেত্রে প্রাপ্ত একটী সৈন্যের Memo book এবং কলোডেন যুদ্ধের পর রণ-ক্ষেত্রে পতিত একজন মৃত হাইল্যাণ্ডার সৈন্যের পকেটে প্রাপ্ত এক টুকরা oat cake রক্ষিত আছে।*

* কলোডেন যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রিন্স চার্লস্ (বা ইংরাজদের মতে Young Pretender)এর সৈন্যগণ কিরূপ ক্ষুধাকাতর হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে এই oat cake টুকুর করুণ ইতিহাস কল্পনা করা যায়। "Chambe 's History of Rebellion in Scotland" গ্রন্থে বর্ণিত আছে, প্রিন্স চার্লস্ যখন কলোডেন্ হাউসে পৌঁছিলেন, তখন তিনি স্বয়ং এক টুক্‌রা রুটি এবং একটু মদ্য ছাড়া আর কিছু পাইলেন না। সৈন্যগণের ক্ষুধাকাতরতা অবগত হইয়া হুকুম দেন, "পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম লুট করিয়া খাদ্য সংগ্রহ কর।" তাঁহার আদেশ অনুসারে খাদ্য সংগ্রহ করা হইল, কিন্তু পাক শেষ হইবার পূর্ব্বেই যুদ্ধারম্ভ হয়;—সৈন্যগণ আহার করিবার অবকাশ পায় নাই।

শেষ-প্রবেশ-দালান (Entrance Hall)। এই দালানে, অন্যান্য নানা দ্রব্যের মধ্যে, একটি গ্লাসকেসে, স্কট্ মৃত্যুর পূর্ব্বে যে সকল বস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা রক্ষিত আছে। খাকী রঙের ট্রাউজারস্, ডোরা কাটা ওয়েষ্ট কোট, গভীর সবুজ রঙের একটী কোট, তাহার বোতামগুলি পিত্তলনির্ম্মিত, একটী ধূসরবর্ণ বীবরলোমাবৃত হ্যাট্ (ইহার আকারটি প্রায় বর্ত্তমানকালের টপ্ হ্যাটের মত) এবং এক যোড়া জুতা। জুতা যোড়াটি দেখিতে প্রায় একালেরই মত; বেশ ঝক্ ঝক্ করিতেছে; অনুমান করিলাম মাঝে মাঝে বুরুষ করা হইয়া থাকে। পার্শ্বেই একটি কক্ষে, কাচের আল্মারির ভিতর স্কটের কতকগুলি ছড়ি এবং ধূমপানের নানা আকারের পাইপ দেখিলাম।

এই গৃহের কোনও স্থানে একটি ভোজন-কক্ষ (dining room) আছে—যেখানে স্কট্ জীবনের শেষ সময়টুকু অতিবাহিত করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, অ্যাবট্‌স্‌ফোর্ডের বর্ত্তমান অধিকারিণী, সে কক্ষটী সাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখেন না। লক্‌হার্টের গ্রন্থে স্কটের শেষ সময়ের বর্ণনাটি এতই করুণোদ্দীপক যে, সেই কক্ষটি দেখিবার বড়ই আকাঙ্ক্ষা ছিল কিন্তু তাহা পূর্ণ হইল না। আমাদের পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা সে বর্ণনা পড়েন নাই, তাঁহাদের জন্য একটী অনুবাদ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

লক্‌হার্ট লিখিতেছেন—"১৭ই সেপ্টেম্বর প্রভাতে আমি যখন বেশ পরিধান করিতেছিলাম, নিকল্‌সন্ আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল তাহার প্রভুর সজ্ঞান অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে এবং তিনি আমাকে এখনি দেখিতে চাহেন। আমি গিয়া দেখিলাম তিনি সম্পূর্ণ আত্মস্থ—যদিও একান্ত দুর্ব্বল। তাঁহার চক্ষুযুগল পরিষ্কার ও শান্ত, ডিলিরিয়মের অগ্নি সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত। আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন—লক্‌হার্ট, হয়ত এক মিনিটের অধিক কথা কহিতে পারিব

না। বৎস, সদাচারপরায়ণ ধার্ম্মিক হও, সৎকর্ম্মশীল হও। আমার অবস্থায় যখন উপস্থিত হইবে, তখন আর অন্য কিছুই তোমাকে সান্ত্বনা দিতে পারিবে না। তিনি থামিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—সোফায়া ও অ্যানকে ডাকিয়া পাঠাইব কি? তিনি বলিলেন—'না। তাহাদিগকে উঠাইও না। তাহারা সারা রাত জাগিয়াছে। ঈশ্বর তোমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন।' বলিয়া তিনি আবার প্রশান্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ইহার পর আর তিনি সম্বিতের চিহ্ন প্রকাশ করেন নাই—শুধু বোধ হয় এক মুহূর্ত্ত ছাড়া—যখন তাঁহার পুত্রেরা আসিয়া পৌঁছিয়াছিল।

২১শে সেপ্টেম্বর বেলা দেড়টার সময় তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। সে দিনটি অত্যন্ত পরিষ্কার ছিল। বেশ গরম ছিল—এমন কি সমস্ত জানালা খুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সে দিন চতুর্দ্দিক এত নিস্তব্ধ যে টুইড-তীরে নুড়ীগুলির উপর ঢেউয়ের আঘাত-শব্দটুকু পর্য্যন্ত শুনা যাইতেছিল। শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে আমরা সকলে বিছানার চতুর্দ্দিকে নতজানু হইয়া বসিলাম। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র তাঁহার মুদ্রিত নেত্রযুগল চুম্বন করিল।"

অ্যাবট্‌স্‌ফোর্ডদর্শন শেষ করিয়া আমরা বাহিরে আসিলাম। তখন হঠাৎ আমার মনে হইল, একটা বিষয়ের সংবাদ লইতে ভুলিয়াছি; সুতরাং আমি আবার অ্যাবট্‌স্‌ফোর্ডে ফিরিয়া গেলাম—সঙ্গিগণকে বলিলাম তাঁহারা অগ্রসর হউন, আমি শীঘ্রই আবার তাঁহাদের ধরিব। কিন্তু ঘটনাবশতঃ ফিরিতে আমার বিলম্ব হইয়া গেল; আবার যখন বাহিরে আসিলাম, ততক্ষণ বন্ধুরা অনেক দূর চলিয়া গিয়াছেন। আমি একাকী সুতরাং মেলরোজের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। একস্থানে আসিয়া পথ দুইদিকে বিভক্ত হইল, আসিবার সময় ভাল করিয়া পথ চিনিয়া আসি নাই, কিঞ্চিৎ দ্বিধায় পড়িয়া গেলাম। পথ এমন

নির্জ্জন যে কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া লইব সে উপায়ও নাই। তখন উপরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম টেলিগ্রাফের তার, দুইটি পথের একটি দিয়া চলিয়া গিয়াছে। মনে মনে বলিলাম ঠিক হইয়াছে গাইড বহিতে এই তার ধরিয়াই যাইতে বলিয়াছে কিনা। সুতরাং সে পথই অবলম্বন করিলাম। বলা বাহুল্য ভুল করিলাম। কয়েক খানি গ্রামে গ্রামে পর্য্যটন করিয়া যখন মেলরোজে উপনীত হইতে সক্ষম হইলাম, তখন বেলা আড়াইটা, বন্ধুগণের কোথাও উদ্দেশ নাই। ক্ষুধায় অস্থির। বন্ধু-অন্বেষণ বন্ধ রাখিয়া, কিঞ্চিৎ আহারের অন্বেষণে ব্যাপৃত হইলাম। যে হোটেলে প্রবেশ করিলাম, সেখানকার ওয়েট্রেস্ বলিল কিয়ৎ পূর্ব্বে অপর কয়েকটি ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোক এখানে আসিয়া আমাকে অন্বেষণ করিয়া গিয়াছেন। অনুমান করিলাম, ষ্টেশনে গেলেই তাঁহাদের সাক্ষাৎ পাইব। ভোজনান্তে ষ্টেশনে গিয়া তাঁহাদের দেখা পাইলাম। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন "এত দেরী যে?" আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম "একটা সর্টকট্ নিয়ে আসা গেল।" পরে বলিলাম, অনেক গ্রাম ট্রাম দেখিয়া আসিতে বিলম্ব হইয়া গেল। হারাইয়া যাওয়ার কথাটা আর কেমন করিয়া স্বীকার করি!

তখন বেলা ৩টা বাজিয়া গিয়াছে। বন্ধুরা ইতিমধ্যে মেল্‌রোজ্ অ্যাবি দেখিয়া লইয়াছেন। তিনটা কয় মিনিটে এডিন্‌ব্রায় ফিরিয়া আসিবার একটি ট্রেণ আছে, বন্ধুরা তাহাতেই ফিরিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। ইহার পরের ষ্টেশনে—এডিনব্রার উল্টাদিকে, নামিলে ড্রাইব্রায় যাওয়া যায়। ড্রাইব্রা অ্যাবিতে স্কটের সমাধি আছে। সেদিন সন্ধ্যাকালে এডিন্‌ব্রার একটা নাট্যশালায় হাইল্যাণ্ড-নৃত্য হইবার কথা ছিল, আমরা পরামর্শ করিয়াছিলাম সময় মত ফিরিয়া সেটা দেখিতে যাইব। এখন অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইল—ড্রাইব্রা দেখিতে গেলে সেটা দেখা হয় না—সেটা দেখিতে গেলে ড্রাইব্রা বাদ

দিতে হয়। বন্ধুরা নৃত্য দর্শন করিতে বিশেষ উৎসুক ছিলেন, তাঁহারা এডিনব্রায় ফিরিলেন। আমি একাকী ট্রেণের অপেক্ষায় ষ্টেশনে বসিয়া রহিলাম।

ট্রেণে কয়েক মিনিট মাত্র; যখন St. Boswell'sএ নামিলাম, তখন চারিটা বাজিল। ষ্টেশন হইতে ড্রাইব্রা অ্যাবি এক ক্রোশ পথ। পথ জিজ্ঞাসা করিয়া ক্ষিপ্রপদে অগ্রসর হইলাম। টুইডের উপর একটা সেতু আছে তাহা পার হইয়া ড্রাইব্রায় যাইতে হইবে ইহা আমার গাইড্ বুকে লেখা ছিল। ক্রমে টুইডের তীরে আসিয়া পৌঁছিলাম। নদীটী অতি ক্ষুদ্র। প্রস্থে ভবানীপুর ও আলিপুরের মধ্যবর্ত্তী আদি গঙ্গার অপেক্ষা অধিক বেশী হইবে না। গভীরতা নাই বলিলেই হয়। একটি ছাগলও অনায়াসে অনেক স্থানে হাঁটিয়া পার হইয়া যাইতে পারে। সেতুর নিকট আসিয়া দেখিলাম নোটিস্ টাঙ্গানো রহিয়াছে "সেতুটি বড় ক্ষীণ একত্র দশ জনের অধিক ইহার উপর আরোহণ করিবে না।" যখন "সেতুর" মাঝামাঝি উপস্থিত হইলাম, তখন উক্ত যন্ত্রটি এরূপ দুলিতে লাগিল যে, ভাবিলাম অদৃষ্টে কি শেষে টুইড্ প্রাপ্তি আছে না কি?

যাহা হউক, নির্ব্বিঘ্নে ত পার হওয়া গেল। সেখান হইতে দশ মিনিটের মধ্যেই অ্যাবিতে পৌঁছিলাম। ইহা একটি বহু পুরাতন মন্দির;—অষ্টম হেন্‌রির সময় হইতেই ভগ্নাবশেষ স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। চতুর্দ্দিকের স্থান বেশ প্রশস্ত;—জঙ্গলের মত। ভিতরে প্রবেশ করিয়া, স্কটের সমাধি অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। একটী জীর্ণ "আইল" আছে (St. Mary's Aisle), তাহা দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগের রেলিংগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র—তাহাতে কতিপয় অজ্ঞাত ব্যক্তির সমাধি আছে। অন্য ভাগের রেলিংগুলি উচ্চ,—তাহার ভিতরে স্কট ও তাঁহার পত্নী,—তাঁহাদের জ্যেষ্ঠপুত্র, এবং জামাতা লক্‌হার্টের সমাধি

রহিয়াছে। আমি রেলিংয়ের নিকট দাঁড়াইয়া মস্তক অনাবৃত করিলাম। এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। পরে কাগজ পেন্সিল বাহির করিয়া, সমাধির উপরের লেখাগুলি নকল করিয়া লইলাম। স্কটের স্ত্রীর সমাধিটীই আমার নিকট হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরে ছিল। অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল;—দূরের সে লেখাগুলি ভাল দেখা যাইতেছিল না। আরও দুই একটী যাত্রী—তাহারা রেলিংয়ে আরোহণ করিয়া পড়িতে লাগিল;—কিন্তু আমার হিন্দুসংস্কার আমাকে সে পবিত্র স্থানে পদস্পর্শ করিতে নিষেধ করিল। আমি কষ্টে, চক্ষু সঙ্কুচিত করিয়া, বিলম্বে তাহা পাঠ করিলাম। সে সমাধিগুলির অবস্থান এবং লিখিতাংশ নিম্নে প্রদান করিতেছি:—

DAME MARGARET CARPENTER WIFE OF SIR WALTER SCOTT OF ABBOTS FORD, BARONET DIED AT ABBOTSFORD MAY 15, A.D. 1826. SIR WALTER SCOTT, BARONET DIED SEPTEMBER 21, A.D. 1832.	HERE AT THE FEET OF WALTER SCOTT LIE THE MORTAL REMAINS OF JOHN GIBSON LOCKHART HIS SON-IN-LAW BIOGRAPHER AND FRIEND BORN 14 JUNE 1794 DIED 25 NOV. 1854.

LIEUTENANT COLONEL SIR WALTER
SCOTT OF ABBOTSFORD, SECOND
BARONET.

DIED AT SEA 8 FEBRUARY 1887
AGED 45 YEARS. HIS WIDOW
PLACED THIS STONE OVER
HIS GRAVE.

লেখা শেষ হইলে, ভারতবর্ষে স্কটভক্ত বন্ধুগণকে উপহার পাঠাইবার জন্য, এই সমাধি হইতে কিছু স্মরণচিহ্নের অনুসন্ধান করিলাম। রেলিংয়ের নিম্নে সবুজ ঘাস জন্মিয়াছিল। সেই ঘাস কতকগুলি উৎপাটন করিয়া লইলাম। সেগুলি যত্ন করিয়া একটী খামে ভরিয়া রাখিলাম।*

সন্ধ্যা হইয়া আসিল; আকাশের আলোক ক্রমে ক্ষীণ ক্ষীণতর হইল। সবুজ গাছপালা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিতে লাগিল। সমাধিমঞ্চ আমি বারত্রয় প্রদক্ষিণ করিয়া, মৃদুপদে ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিলাম।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

নির্ঝর।

ভেদিয়া পাষাণ-কায় তুলি মৃদুতান
ইন্দ্রধনু ধরি হৃদে ঝরিছে নির্ঝর।
মরি কি সুন্দর দৃশ্য! এ'হতে মহান্
আছে কিছু মানি, যদি হৃদয়ের'পর
(ভগবৎ-প্রেম বিনা কঠিন—পাষাণ!)
আচম্বিতে ভক্তিধারা হয় বহমান।

শ্রীললিত মোহন মিত্র

* দুঃখের বিষয় আমার অভিপ্রায় সফল হয় নাই। ঘাসভরা খামটি এডিনব্রায় আমার লিখিবার টেবিলের উপর রাখিয়াছিলাম। আমার অনুপস্থিতিতে একদিন আমাদের দাসীটি টেবিল ঝাড়িতে আসিয়া—আবর্জ্জনা মনে করিয়া ঘাসগুলি আগুনে ফেলিয়া দিয়াছিল। লেখক।

বেদে পৃথিবীর গতি।

পৃথিবীর গতিসম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের অভিজ্ঞতা।

পৃথিবীর গতি যে অতি প্রাচীন ভারতে বৈদিক আচার্য্যগণের পরিজ্ঞাত ছিল, তাহাই আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে দেখাইব।

বেদে দেখিতে পাই নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে পৃথিবী বুঝাইয়া থাকে। যথা—

১ গো, ২গ্মা, ৩ জ্মা, ৪ ক্ষ্মা, ৫ ক্ষা, ৬ ক্ষমা, ৭ ক্ষোণি, ৮ ক্ষিতি, ৯ অবনি, ১০ ম্বিপ, ১১ গাতু, ১২, নিঋ তি।*

এই শব্দ সমূহের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, পৃথিবীর গতি আছে বলিয়াই সেই সকল শব্দ পৃথিবীর বাচক হইয়াছে।

১। গো শব্দ পৃথিবীকে বুঝায় কেন? ইহার উত্তরে আচার্য্য যাস্ক বলিয়াছেন :—

---

* ১। ঋ. স. ১০. ৩১. ১০, ১০. ৩১. ৬,
২। „ ১০. ৪৯. ২, ১০. ১২. ৬,
৩। „ ৬. ৫২. ১৫, ৭. ৩৯. ৩, ৮. ১. ১৮
৪। „ ১০. ৬১. ৭, ৭. ৪৬. ২,
৫। „ ৯. ৯৬. ৭,
৬। „ ২. ১৪. ১১,
৭। „ ১০. ২২. ৯, ৮. ৬. ১০,
৮। „ ৫. ৩৭. ৪, ৬. ২. ১১,
৯। „ ১. ১৮১. ৩, ১. ১৪০. ৫,
১০। „ ১০. ৭৯. ৩, ৩. ৫. ৫,
১১। „ ৫. ৩৫. ১০, ১. ১৩৬. ২,

ইহা ভিন্ন বেদে আরও কয়েকটী পৃথিবীর নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা বর্ত্তমান [illegible] এখানে লিখিত হইল না।

"গৌরিতি পৃথিব্যা নামধেয়ং ভবতি, যদ্ দূরংগতা ভবতি, যচ্চাস্যাং ভূতানি গচ্ছন্তি গাতের্বৌকারো নামকরণঃ।"*

"গো" এই শব্দ পৃথিবীর নাম, (১) যেহেতু ইহা দূরপথে† গমন করে, (২) যেহেতু ইহাতে জীবগণ বিচরণ করে। "গম্" ধাতু বা "গতি" (গা) ধাতুর উত্তর "ও" প্রত্যয় করিলে "গো" পদ সিদ্ধ হয়।‡

যাস্ককৃত গো শব্দের প্রথম নির্বচনে (যেহেতু ইহা দূরপথে গমন করে) স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পৃথিবীর গতি আছে বলিয়া বৈদিক আচার্য্যগণের জ্ঞান ছিল।§

* নিরুক্ত পূ. ষ. ২ অ. ২ পা. ১ ম.।

† "যস্মাদ্ ইয়ং দূরম্ অধ্বানং প্রতি গতা ভবতীতি।" টীকাকার দুর্গাচার্য্য।

‡ অতএব পাণিনিও স্বসূত্রে লিখিয়াছেন—"গমে র্ডোস্" (৫০২.৬২.)

§ ভগবান যাস্ক "নিঘণ্টুর" ভাষ্যকার। নিঘণ্টু ও তাঁহার কৃত ভাষ্য "নিরুক্ত" নামে প্রচলিত। নিঘণ্টুতে কোন বস্তুর কি কি নাম, কোন্ ধাতুর কি অর্থ ইত্যাদি প্রতিপাদক কতকগুলি শব্দমাত্র উল্লিখিত আছে। আচার্য্য যাস্ক সেই শব্দপাঠের কঠিন কঠিন কতকগুলি শব্দের ধাতু প্রত্যয়াদি বিভাগ করিয়া সপ্রমাণ অর্থ নির্বচন করিয়াছেন। স্কন্দস্বামী, দুর্গাচার্য্য প্রভৃতি যাস্কীয় ভাষ্যের ব্যাখ্যাকর্ত্তা। দেবরাজ প্রভৃতি কয়েক জন নিঘণ্টুতে উল্লিখিত সমস্ত শব্দেরই সংক্ষেপে নির্বচন করিয়াছেন। ইহাঁরা সকলেই যাস্ক হইতে বহু পরবর্ত্তী। ব্যাখ্যা করিতে বসিয়া ইহাঁরা যাস্কমতকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই, বিশদ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। বোধ হয়, তাঁহাদের তাদৃশ চেষ্টায় যাস্কমত অনেক স্থানে বিকৃত হইয়া গিয়াছে। এই গোশব্দের নির্বচনেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। যাস্ক বলেন "দূরে গমন করে বলিয়া পৃথিবী গো।" স্কন্দস্বামী তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না, তিনি বলেন পৃথিবীর বস্তুতঃ গতি নাই, কিন্তু যেমন আত্মা, আকাশ প্রভৃতির দূরদেশও উপলব্ধি হয়, পৃথিবীরও সেইরূপ হয় বলিয়া, ভাষ্যকার, তাহার গতি আছে বলিয়াছেন। ("দূরং গতা ভবতি—আত্মাকাশাদিবদ্ দূরেঽপ্যুপলব্ধের্গতি ক্রিয়া ব্যবহারঃ।")

দেবরাজ স্কন্দস্বামীর মতে মত দিয়া কথাটা আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, বাহুল্যভয়ে তাহা দেখান হইল না। তবে এ সম্বন্ধে তিনি যে আর একটী কথা বলিয়াছেন, তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। তিনি পৃথিবীর গতি বিচার করিয়া (সম্ভবতঃ তাহাতে নিজেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই) পশ্চাৎ বলিয়াছেন—গা ধাতুর উত্তর ও প্রত্যয় করিয়া, "গো" পদ হউক, কিন্তু সেই গা ধাতুর অর্থ "গতি" নহে—"স্তুতি"। অতএব পৃথিবীকে স্তব করা যায় বলিয়া, অথবা পৃথিবীতে থাকিয়া

২। গ্মা এই পদটী গম ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।* "গমতি" বা "গম্" ধাতুর অর্থ গতি। "...জসতি গমতি ..গতি কর্ম্মাণঃ।" নি. ২অ. ১৪খ.। অতএব গো পদের যে ব্যুৎপত্তি, গ্মা পদেরও তাহাই—যে দূরে গমন করে, অথবা যাহাতে জীবগণ বিচরণ করে, তাহার নাম গ্মা—পৃথিবী। আচার্য্য মাধব+ এস্থানে বলিয়াছেন—"গ্মা গচ্ছতেঃ, গচ্ছন্তী হীয়ম্"—"গ্মা গম্ ধাতু হইতে হইয়াছে, কেননা এই পৃথিবী গমনশীলা।

লোকে স্তব করে বলিয়া, তাহার নাম "গো।" গোতের্বা স্তুত্যর্থস্য, গীয়তে স্তূয়তে-ইসারিতি, গায়ন্তি বাস্যাং স্থিতা ইতি গোঃ।)

এই ব্যখ্যা কতদুর ঠিক, পাঠকবর্গ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন. বেদে "গাতি" বা "গা" ধাতুর অর্থ গতি। নিঘণ্টুতে তাহা স্পষ্টভাবে লিখিত আছে। যথা—"...চততি, অততি, গাতি...দ্বাবিংশশতং গতিকর্ম্মাণঃ।" নিঘণ্টু ২অ. ১৪খ.। উদাহরণ যথা—"...পৃতেব স্বধিতিঃ শ্রুতির্গাৎ" ঋ. স. ৫.২-৪.৪.। "গা" বা "গাতি" ধাতুর অর্থ যে স্তুতি, বেদে তাহা পাওয়া যায় না। "গায়তি" বা "গৈ" ধাতুর অর্থ অর্চ্চনা হয়, তাহা পাওয়া যায় (যথা "গায়ন্তিত্বা গায়ত্রিণঃ" ঋ. স. ১.১ ১৯.১.) ও নিঘণ্টুতেও আছে (৩অ. ১৪খ.)। গোপদের নির্বচনে যাস্ক "গাতি" বলিয়াছেন, "গায়তি" বলেন নাই। আরও, আচার্য্য যাস্ক যদি অদাদি গণীয় স্তুত্যর্থক "গা" ধাতুর উল্লেখ করিয়া থাকিতেন, তবে তাঁহার "অদ্যাপি পশুনামেহ ভবতি এতস্মাদেব"—(এই ধাতু দ্বারা এই অর্থে নিষ্পন্ন গো পদ পশুরও বাচক হয়)—এই বাক্য কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? পশুবাচক গোশব্দ যে অত্যর্থক ধাতু হইতে হইয়াছে, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহ অস্বীকার করেন নাই।

বৈদিক শব্দ নির্বচন যথাসম্ভব বৈদিক ধাত্বর্থ দিয়াই করা উচিত। দেবরাজ বহুস্থানে তাহা অনুসরণ করেন নাই। আমাদের আলোচ্য অপর কয়েকটী শব্দের নির্বচনেও দেব-রাজ এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য পূর্ব্বোক্ত নিয়মও তাঁহা কর্ত্তৃক অননুসৃত হয় নাই। কৌতূহলী পাঠক স্বয়ং তাহা দেখিয়া লইবেন।

স্কন্দ স্বামী ও দেবরাজের ব্যাখ্যায় বুঝা যায় যে যাস্কের সময়ে পৃথিবীর গতিত্বে স্বীকৃত হইলেও তাঁহাদের সময়ে তাহাতে বিষম আপত্তি ঘটিয়াছিল। য়ুরোপেও ঠিক এইরূপই বাদ প্রতিবাদ বহুদিন যাবত (কলম্বসের সময় পর্য্যন্ত) চলিয়াছিল।

* অনাবশ্যক বোধে সূত্র উল্লেখ করিয়া সাধন প্রণালী দেখান হইল না, ও পরেও হইবে না।

+ এই মাধব সায়ণ মাধব হইতে প্রাচীন, "বিবরণ গ্রন্থকার বেদ ভাষ্যকর্ত্তা মাধব ভট্ট ও শ্রীবেঙ্কটাচার্য্যপুত্র নিরুক্তভাষ্যটীকাকার মাধব, এই দুয়ের অন্যতর।"

৩। জ্মা পদ জম্ বা জমতি ধাতু হইয়াছে। বেদে জমতি ধাতুর অর্থ গতি।* ব্যুৎপত্তি পূর্ব্ববৎ। গত্যর্থক ধাতু হইলেই অর্থনির্বচন-প্রণালী গোপদের ন্যায় বুঝিতে হইবে।†

৪. ৫. ৬. ৮.। ক্ষ্মা, ক্ষা, ক্ষমা ও ক্ষিতি এই পদ চারিটী গত্যর্থক ক্ষি ধাতুদ্বারা সিদ্ধ করিতে পারা যায়।‡

৯। "অবনি" অবতি বা অব্ ধাতু হইতে হইয়াছে। অব্ ধাতু নিঘণ্টুতে গত্যর্থ ধাতু মধ্যে পঠিত।§

১০। "রিপ," গত্যর্থক রেপৃ ধাতু হইতে উৎপন্ন।

১১। "গাতু"—গম্ ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন।

১২। "নিঋর্তি" পদের দুইটী অর্থ, পৃথিবীও কষ্টপ্রাপ্তি। আচার্য্য যাস্ক বলিয়াছেন—

"নিঋর্তিঃ নিরমণাৎ, ঋচ্ছতেঃ কষ্টপ্রাপ্তিরিতরা।"

ভূতবর্গকে আরাম প্রদান করে বলিয়া পৃথিবী নিঋর্তি, (নি—রম্+ক্তিন্)। কষ্টপ্রাপ্তিবাচক নিঋর্তি নির্ পূর্ব্বক ঋ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।

আচার্য্য যাস্কেরই নির্বচন হইতে পাওয়া গেল—নিঋতি নি—ঋধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে। নিঘণ্টুতে ঋ ধাতু গত্যর্থ মধ্যে পঠিত। অতএব পৃথিবীর অন্যান্য নামগুলির ন্যায়, "নিঋর্তি" পদেরও "নি—

* নিঘণ্টু ৩ অ. ১৪খ, নিরুক্ত ৩ অ. ১ পা. ৬ খ.।

† দেবরাজ এখানে জমু অদান, জনী প্রাদুর্ভাবে ইত্যাদি আরও কয়েকটী ধাতু দ্বারা জমা পদ সিদ্ধ করিয়া, ধাত্বানুসারে অর্থ করিয়াছেন।

‡ দেবরাজ হিংসার্থক ক্ষি, ক্ষয়ার্থক ক্ষি ও সহনার্থক ক্ষম প্রভৃতি ধাতু দ্বারা এই পদগুলির সাধন করিলেও গত্যর্থক ক্ষি ধাতু পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

§ দেবরাজ অব্ ধাতু হইতে "অবনি" হইয়াছে বলেন, তবে তিনি ধাতুপাঠ প্রভৃতির অনুসারে অব্ধাতুর গতি, তৃপ্তি প্রভৃতি ১৮টী অর্থ কল্পনা করিয়া যথাযোগ্য অর্থ করিয়াছেন।

ঋ+ক্তিন্," (কর্ত্তৃ বা অধিকরণ বাচ্য) এরূপ নির্বচন করিলে বোধ হয় কোন অসঙ্গতি হইতে পারে না।*

এই সমস্ত আলোচনা করিয়া আমার ধারণা হয়, পৃথিবীর গতি সুবহুপূর্ব্বে ভারতীয় আর্য্যগণের বিশেষরূপে বিদিত ছিল, অন্যথা এক গতিক্রিয়া লইয়া তাঁহারা পৃথিবীর এতগুলি নাম করিতেন না।

আচার্য্য যাস্কের কথায় বোধ হয়, তাঁহার সময়েও† পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে লোকের কোন বিপ্রতিপত্তি ছিল না। তাঁহার পরে, সন্দেহের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। এই জন্যই তাঁহার পরবর্ত্তী স্কন্দস্বামী তাঁহার (যাস্কের) "যদ্দূরংগতা ভবতি" এই কথার উপর আস্থা স্থাপন না করিয়া নানারূপ কষ্টকল্পিত অর্থ করিয়াছেন।‡ তাহা পাদটীকাতে দেখান হইয়াছে। যাস্কের বহু পরবর্ত্তী হইলেও আচার্য্য মাধব (পূর্ব্বোক্ত) স্পষ্টই বলিয়াছেন যে পৃথিবী চলিতেছে—"গ্মা গচ্ছতেঃ গচ্ছন্তী হীয়ম্।" ইহাও

* স্কন্দস্বামী পৃথিবীর গতিবাদিগণের অত্যন্ত বিপক্ষে ছিলেন, বোধ হয়। এই জন্যই তিনি যাস্কের "নির্ঋতি নিরমণাৎ" এই কথার ব্যাখা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন "নিরমণাৎ নিশ্চলত্বেন অবস্থানাৎ ইত্যর্থঃ।" নিরমণ শব্দের নিশ্চলরূপে অবস্থান এই অর্থ টী কি কষ্টকল্পিত নহে? দেবরাজ স্কন্দস্বামীর মতে মত দিয়া বলিতেছেন—"নির্নিশ্চলত্বমাহ ন অনবস্থানম্" (নি উপসর্গ পৃথিবীর নিশ্চলত্ব বলিতেছে, চঞ্চলত্ব নহে।) দেবরাজ এখানে বৈয়াকরণ পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলেন—নির্-ঋ+ক্তিন্ =নির্ঋতি ইহার অর্থ—"নিশ্চলবদ্ অবতিষ্ঠতে" (নিশ্চলের ন্যায় থাকে।) তবেই বুঝা যায় না কি—পৃথিবী নিশ্চলের ন্যায় থাকে, কিন্তু বস্তুতঃ নিশ্চল নহে?

† যাস্ক পাণিনির বহু প্রাচীন। সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ ৪ শতাব্দী বা তাহারও পূর্ব্বে হইবে।

‡ যাস্ক ভাষ্যের অন্যতম টীকাকার দুর্গাচার্য্য এই বাক্যের কথা প্রকৃত অর্থ করিয়াছেন। স্কন্দস্বামী প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ যাস্কের দ্বিতীয় নির্বচনের (যচ্চাসাং ভূতানি গচ্ছন্তি) উপরেই জোর রাখিয়া অন্যান্য নাম নির্বচনের অর্থ করিয়াছেন। সায়ণাচার্য্যও এই পথের পথিক। তিনি "...অধস্মো অধবা দিব..." (ঋ স. ৮. ১.১৮.) ইত্যাদি ঋকের ব্যাখ্যায় পৃথিবী বাচী জমা শব্দের ব্যুৎপত্তি লিখিয়াছেন—"জমন্তি গচ্ছন্ত্যস্যাম্ ইতি জমা।" তিনি "জমতি গচ্ছতীতি জমা" বলিতে সাহস করেন নাই।

পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। "গচ্ছতি-ইতি জগৎ" এই বাক্যও বহু প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়।

বহু সংস্কৃত কোষেই দেখিতে পাই, পৃথিবীর নামাবলীর মধ্যে "অচলা" ও "স্থিরা" অন্যতম। পৃথিবী চলে না—স্থির থাকে বলিয়াই ঐ নাম দুইটী হইয়াছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু বৈদিক অভিধানে (নিঘণ্টুতে) ঐ দুই শব্দের কোন গন্ধও নাই। ঐ দুই শব্দযুক্ত কোন বৈদিক বচনও এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। থাকিলে অন্ততঃ নিঘণ্টুতে বা যাস্কীয় নিরুক্তে থাকিবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। ইহা দ্বারাও বোধ হয় বেদের বহুকাল পরে পৃথিবীর স্থিরত্ববাদিগণ গো প্রভৃতি পৃথিবীর গতিমত্ব প্রতিপাদক নামগুলির পরিবর্ত্তে সম্পূর্ণ বিপরীত ঐ নাম দুইটী কল্পিত করিয়া থাকিবেন।

"গো জ্মা" প্রভৃতি পৃথিবী বাচী যে শব্দগুলি উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা সমস্তই ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের মতে ঋগ্বেদই পৃথিবীর সর্ব্ব প্রাচীন গ্রন্থ। ব্রাহ্মণপণ্ডিতসম্প্রদায়-মতে ত বেদ মাত্রই অনাদি। এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, অতি পুরাকালে ভারতীয় বৈদিক আচার্য্যগণের পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ছিল কি না ?*

শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।

---

* এই প্রবন্ধটী ইংরাজ পণ্ডিতের গবেষণা-নিরপেক্ষ মৌলিক প্রবন্ধ বলিয়া অধিক আদরণীয়। ভাঃ সং।

কুবলয়া।

(বৌদ্ধ গাথা)

বেণুবন কুঞ্জশিরে নীরব সন্ধ্যায়
সুবর্ণ রঞ্জিয়া উঠে কিরণ ছটায়;
পক্ষিগণ শূন্যমাঝে করি কলরব
কুলায় পশিয়া হ'ল নিশ্চল—নীরব;
পবন বহে না আর—পাতা নাহি নড়ে,
বিশ্ব আজি মৌন যেন মহাধ্যান ভরে।

গগন আগ্রহে নিল তারকার টিপ
ঘরে ঘরে পুরাঙ্গনা জ্বালিল প্রদীপ;
পুরীর অদূরে শোভে গৌতমের মঠ
তারি পাশে ওই বুঝি শ্যাম নদী তট;—
শান্ত নদী ক্ষুব্ধ করি আইল তরণী,
পুলকে চঞ্চল হ'ল বিমুগ্ধা ধরণী।

নামি তীরে ধীরে ধীরে সুন্দরী কামিনী
চলিল পথাঙ্ক ধরি' অলস গামিনী;
আনন্দ গুরুর তরে পত্রপুট ভরি
বারি ল'য়ে যেতেছিল; সহসা সম্বরি'
জিজ্ঞাসিল "ওগো ভদ্রে, হেন অন্ধকারে
একাকিনী বনপথে খুঁজিছ কাহারে?"

'কে তুমি?' "আনন্দ নাম—ভিক্ষু আমি দেবি,
এ নিকুঞ্জে মোরা সবে গুরুপদ সেবি।"

'গুরু কে ?'—"সংসার মাঝে সর্ব্বত্যাগী যিনি
কর্ম্ম যাঁর নিত্যব্রত মহাজ্ঞানী তিনি
ভগবান বুদ্ধদেব, নির্ব্বাণ আশায়
বিরাজিত ; এস যদি হেরিবে তাঁহারে।"

কহিল 'আসিব আমি প্রহরেক রাতে
একাকী আশ্রমে ; যেন তাঁহার সাক্ষাতে
দিওনা এ পরিচয়, হে আশ্রমবাসি।'—
নর্ত্তকী ফিরিয়া গেল ; চলিল সন্ন্যাসী—
মনে নাহি দিল স্থান ক্ষণেকের তরে
কি হেতু আসিবে নারী নিশীথ প্রহরে।

তখন পঞ্চমী শশী ভেদিয়া তিমির
উঠিয়াছে পূর্ব্বদিকে ; সাজায়ে শরীর
কুসুমের আভরণে মোহিনীর রূপে
কুবলয়া বনদেশে আসি চুপে চুপে
দাঁড়াইল যথা দীপ্ত মুখর নির্ঝরে
ঝরিছে নির্ম্মল ধারা সদা ঝরঝরে।

অন্তরে অনন্ত তৃষা, গলে ফুলমালা
বিশ্বজয়ী রূপ ল'য়ে একবার বালা
সগর্ব্বে চাহিল শুধু নিজ দেহ'পরে ;
জলদ ভাসিয়া গেল ক্ষণেকের তরে
সুনীল অম্বর তলে, শ্যামল ধরায়
মোহিনী ভাবিল 'আজি মোরে কে হারায়!'

ধীরে ধীরে প্রবেশিল নীরব আশ্রম—
মহামৌন তপোবন অতি মনোরম;
একপদ—দুইপদ—আর নাহি চলে,—
ধরা যেন নাহি আর আছে পদতলে;
যে গর্ব্ব পূরিয়া ছিল ক্ষুদ্র বক্ষ তার
নিমেষে আনিল বহি সহস্র ধিক্কার!

এ মহা সৌন্দর্য্য মাঝে শুধু তার মন
কি ঘোর কালিমা মাখা দেখে প্রতিক্ষণ;
ধরাসাথে গগণের চিত্ত বিনিময়
দেখি তার মনে যেন কি হ'ল উদয়;—
ওই শশী, ওই তারা, এই ধরা মাঝে
কুরূপ তাহার চেয়ে কে আজি বিরাজে!

অদূরে তাপস মূর্ত্তি হইল উদয়
বারেক নেহারি তাঁরে মানিল বিস্ময়,
অন্তরের শূন্য যাহা পূর্ণ হল সব
গুঞ্জরি উঠিল মনে যা ছিল নীরব
আপনি নমিল শির চরণে তাঁহার—
মোহিনীর রূপ এল ফিরিয়া আবার।

শ্রীবীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

নারায়ণী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বৃদ্ধ বীরচন্দ্রের সহচরগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন রতন। রতন বাঙ্গালীব্রাহ্মণ, উপাধি রায়। নৈহাটীর সন্নিহিত কোন একটী গ্রামে তাঁহার জন্মস্থান। ছোটনাগপুরই রতন রায়ের কর্ম্মভূমি বলিয়া, সে গ্রামের বিশেষ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বোধ করিলাম না।

অদৃষ্টসূত্রে আকৃষ্ট হইয়া বীরচন্দ্রের সহিত তিনি সৌহার্দ্দ্যবন্ধনে আবদ্ধ হন। শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করিতে যাইয়া রাজার সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ—সেই প্রথম সাক্ষাতেই উভয়ের সখ্য। ইহার পর রতন আর দেশে ফিরিলেন না। রাজার অনুরোধে অনন্তপুরই তাঁহার ভাবীবাসস্থান নির্ণীত হইল। রতনের সংসারে কেহ ছিল না।

রতন যখন প্রথমে অনন্তপুরে আসেন, তখন তিনি নবজাতশ্মশ্রু যুবা। এখন তাঁহার ষষ্টি বর্ষ বয়ঃক্রম। এই সময়ের মধ্যে তিনি রামচন্দ্রকে মানুষ করিয়াছিলেন। নিজে মনোমত কন্যার সন্ধান করিয়া তাহার সহিত রামচন্দ্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। এখন আবার মাতৃপিতৃহীনা নারায়ণীর ভার তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

কেমন করিয়া দরিদ্র বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ একজন কোটীপতির সখিত্ব লাভ করিল, এ রহস্য বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই। এ রহস্য চিরকালই রহস্য থাকিবে। জগতে এরূপ উদাহরণ দুর্ল্লভ নয়।

বীরচন্দ্রের অন্তঃপুরেও রতনের প্রবেশাধিকার ছিল। রাণী মধুমতী রতনকে পিতৃজ্ঞানে ভক্তি করিতেন। ধর্ম্মকার্য্যে পরামর্শ প্রয়োজনে রাজার ন্যায় তিনিও ব্রাহ্মণের উপদেশ গ্রহণ করিতেন। আসল কথা

সোদরোপম বীরচন্দ্র ও তাঁহার স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া রতন অনন্তপুরে এক অভিনব সংসার পাতিয়াছিলেন।

মাতৃবিয়োগের পর হইতে নারায়ণী অধিকাংশ সময় রতনের কাছেই থাকিত। বিশেষতঃ এই এক বৎসর পুত্রশোকাতুরা রাণী মধুমতী নারায়ণীকে বড় একটা কাছে রাখিতেন না। রাখিতে সাহসও করিতেন না। পরের ধন করিয়া রাখিলে নারায়ণী বাঁচিয়া থাকিবে, এই আশায় রাণী তাঁহাকে ব্রাহ্মণের হাতে একরূপ সমর্পণই করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণেরও আপনার বলিবার কেহ ছিল না। সুতরাং ঈর্ষাপরতন্ত্র বিধাতা নিশ্চিন্ত ব্রাহ্মণকে বৃদ্ধ বয়সে একটী আপনার ধন দিয়া তাঁহার জীবনের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। রতনের তপজপ হোম যাগ এখন এই কুসুমকিঞ্জল্কসমা বালিকা।

যে সময় পুলিশ সাহেব অনন্তপুরে আসিয়া রাজাকে কার্য্য হইতে অপসৃত করিতেছিলেন, তখন রতন নারায়ণীকে সঙ্গে লইয়া, বীরচন্দ্রের অট্টালিকাসংলগ্ন উদ্যানে এক মুকুলিত সহকারতলে দাঁড়াইয়া একটী মৃগশিশুর সহিত খেলা করিতেছিলেন।

তৎপূর্ব্বে নারায়ণী পিতামহীর উপর অভিমান করিয়াছিল।

শৈশবে পিতামহীর উপরে নারায়ণীর অভিমান অধিকাংশ সময়ে রতনের পৃষ্ঠেই সংরক্ষিত হইত। দুই চারিগাছি পক্ককেশও সেই অভিমানের ফলে স্থানচ্যুত হইত। পিতৃবিয়োগের পর হইতেই বালিকার অভিমানের সেই কার্য্যকরী শক্তি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। নারায়ণীর অভিমানচিহ্ন এখন কেবলমাত্র লোচনজলে পর্য্যবসিত। অভিমান হইলে বালিকা শুধু ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিত—কথা কহিত না।

সেটা রতনের বড়ই অসহ্য হইত। তাই আজ বৃদ্ধ নারয়ণীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্ত নিজের ব্যায়ামকৌশল দেখাইতে উদ্যানে আসিয়াছেন।

কিছু পূর্ব্বে তিনি নারায়ণীর সম্মুখে বড় বড় পাথর লোফালুফি করিয়াছেন, বড় বড় বৃক্ষের শাখা ভগ্ন করিয়াছেন, কৃষ্ণসারের সহিত মল্লযুদ্ধ করিয়াছেন। তথাপি বালিকার অভিমান দূর হয় নাই।

অবশেষে মৃগশিশুটী আসিয়া ব্রাহ্মণের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

এক হস্তে ঘট অন্য হস্তে আম্রমুকুল ধরিয়া নারায়ণী দূর হইতে হরিণশাবকের খেলা দেখিতেছিল। সে নারায়ণীকে কিছু অতিরিক্ত আদর দেখাইত। তাহাকে দেখিলেই দূর হইতে ছুটিয়া আসিত। অজাতশৃঙ্গমস্তকে তাহার গণ্ড-পৃষ্ঠ-বক্ষ কণ্ডূয়ন করিত, কর্ণ-মুখ-নাসিকা লেহন করিত। এই সকল কারণে মৃগশিশুর সঙ্গটা তাহার বড় ভাল লাগিত না। তাই নারায়ণী দূরে দাঁড়াইয়া তাহার খেলা দেখিতেছিল। বালিকার অভিমানভারাবনত বদনকমলে অর্দ্ধবিশুষ্ক-লোচনজল, অরুণ-কিরণস্পর্শী প্রভাতবাতাভিহত শিশিরবিন্দুর ন্যায় শোভা পাইতেছিল।

বৃদ্ধ কিন্তু বালিকাকে ভুলাইতে যাইয়া নিজেই আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছেন। হরিণের সহিত খেলা করিতে করিতে তিনি আপনার পক্ককেশ, ও তদ্বৎ শুভ্র আবক্ষলম্বিত শ্মশ্রু বার্দ্ধক্যের যে সকল দেহোপ-করণ সব ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি এক একবার আম্রশাখা আকৃষ্ট করিয়া মৃগশিশুর মুখের কাছে ধরিতেছিলেন। ব্যগ্রতাসহকারে সে যেমন মুকুলগুচ্ছকে রসনাপাশে জড়াইবার উপক্রম করিতেছিল, অমনি শাখা পরিত্যাগ করিতেছিলেন। মুকুলগুচ্ছও সেই সঙ্গে উৎক্ষিপ্ত হইয়া চারিধারে কণা বর্ষণ করিতেছিল। এইরূপে বৃতন একমনে বাল্যোচিত ক্রীড়ায় নিমগ্ন ছিলেন। নারায়ণী যে নিকটে দাঁড়াইয়া আছে তাহা মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

হরিণশিশু দেখিতে দেখিতে নারায়ণী একবার এদিক ওদিক মুখ ফিরাইতেছিল। তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার যোগ্য অনেক সামগ্রীই সেই উদ্যানের ভিতরে সংরক্ষিত ছিল।

এদিক ওদিক সেদিক মুখ ফিরাইতে, তরুলতা পুষ্পবন নিরীক্ষণ করিতে করিতে বালিকা দেখিল দূরে কুঞ্জদ্বাররক্ষী কামিনীতরুতোরণ-তলে দাঁড়াইয়া একটী বালক তাহাদের খেলা দেখিতেছে। বিস্ময়-বিস্ফারিতলোচনে নারায়ণী তাহার পানে চাহিল। বালকও অমনি তরু-অন্তরালে লুকাইল। তখন চাহিয়া চাহিয়া বালিকা একপদ একপদ করিয়া সেইদিকে অগ্রসর হইল।

বালক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। অগ্রসর হইয়া নারায়ণীর কাছে আসিবে কি পিছাইয়া পলাইয়া যাইবে স্থির করিতে পারিতেছিল না। কর্ত্তব্য স্থির করিতে না করিতে নারায়ণী সম্মুখে উপস্থিত হইল।

নারায়ণী বলিল "মুকু"—

বালক আনন্দদেবের পুত্র মুকুন্দ। পিতার সহিত সে আজ অনন্ত-পুরে ফিরিয়া আসিয়াছে। কিরূপ অবস্থায় ফিরিয়াছে তাহা সে অনেকটা বুঝিতেও পারিয়াছে। তাহার বয়স এখন সপ্তদশ বৎসর সুতরাং পিতার সহিত রাজার বর্ত্তমান সম্বন্ধ বুঝিবার কতকটা শক্তি তাহার জন্মিয়াছে। তাই নারায়ণীর কথায় কি উত্তর দিবে স্থির করিতে না পারিয়া মুকুন্দ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নারায়ণীর সহিত মুকুন্দ অতি শৈশবে ক্রীড়া করিত। তার পর যখন সে শুনিল নারায়ণীর সহিত তাহার বিবাহ হইবে, তখন সে লজ্জায় নারায়ণীর কাছে বড় একটা আসিতে চাহিত না। কেননা পুরস্ত্রীগণ প্রায়ই বালকবালিকাকে, বিবাহকথা লইয়া রহস্য করিত। নারায়ণী বড় বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক মুকুন্দ অনেকটা বুঝিতে পারিত।

সেই নারায়ণী বহুদিন পরে তাহার সম্মুখে। তাহার উপর বালিকা বয়ঃসন্ধি। এই এক বৎসরে নারায়ণীর দেহলাবণ্যে একটা বিপ্লব ঘটিয়াছে। সর্ব্বোপরি মুকুন্দের যৌবনোন্মেষ। মানসিক বৃত্তিগুলি প্রস্ফুটনোন্মুখী। চক্ষু অন্ধকারে রূপের আভাস দেখে। কর্ণ কে

দূরদেশের সুকণ্ঠের সূক্ষ্ম স্বরসুধা পান করে। নাসিকা পারিজাতের আঘ্রাণ পায়। অঙ্গে জলভারাবনত নব কাদম্বিনীর স্পর্শসুখ অনুভূত হয়।

কাজেই নারায়ণীকে দেখিয়া কে যেন হৃদয়ের ভিতর হইতে মুকুন্দের নাক-মুখ-চোখ চাপিয়া ধরিল। মুকুন্দ নারায়ণীর কথায় উত্তর দিতে পারিল না।

তখন বালিকা দক্ষিণকরের আম্রমুকুল ঘটমুখে স্থাপিত করিল। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া মুকুন্দের হাত ধরিয়া টানিল।

কাজেই মুকুন্দকে কথা কহিতে হইল। কম্পিতকর নারায়ণীর হস্ত হইতে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট করিয়া অর্দ্ধপরিস্ফুট কণ্ঠে মুকুন্দ কহিল—"আমি যাইব না।"

"চল দোলায় দুলিব।"

"না"

"হরিণ লইয়া খেলিব।"

"না"

"তবে চল দাদার কাছে যাই।"

বালিকা ঘট ফেলিয়া দিল। এবং দুই হস্তে মুকুন্দের একহস্ত সবলে ধরিয়া আকর্ষণ করিল। মুকুন্দ বলিল "আমায় ছাড়িয়া দাও।" নারায়ণী বলিল—"ছাড়িব না। কখনই ছাড়িব না।"

বৃদ্ধের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তখন আম্রশাখা পরিত্যাগ করিয়া তিনি পশ্চাতে ফিরিলেন। দেখিলেন নারায়ণী নাই। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন নারায়ণীকে দেখিতে পাইলেন না। ডাকিলেন —"নারায়ণী," নারায়ণী পশ্চাতে না ফিরিয়াই উত্তর করিল— "কি ?"

বৃদ্ধ দেখিলেন নারায়ণী আনন্দদেবের পুত্রের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া

এদিক ওদিক সেদিক মুখ ফিরাইতে, তরুলতা পুষ্পবন নিরীক্ষণ করিতে করিতে বালিকা দেখিল দূরে কুঞ্জদ্বাররক্ষী কামিনীতরুতোরণ-তলে দাঁড়াইয়া একটী বালক তাহাদের খেলা দেখিতেছে। বিস্ময়-বিস্ফারিতলোচনে নারায়ণী তাহার পানে চাহিল। বালকও অমনি তরু-অন্তরালে লুকাইল। তখন চাহিয়া চাহিয়া বালিকা একপদ একপদ করিয়া সেইদিকে অগ্রসর হইল।

বালক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। অগ্রসর হইয়া নারায়ণীর কাছে আসিবে কি পিছাইয়া পলাইয়া যাইবে স্থির করিতে পারিতেছিল না। কর্ত্তব্য স্থির করিতে না করিতে নারায়ণী সম্মুখে উপস্থিত হইল।

নারায়ণী বলিল "মুকু"—

বালক আনন্দদেবের পুত্র মুকুন্দ। পিতার সহিত সে আজ অনন্তপুরে ফিরিয়া আসিয়াছে। কিরূপ অবস্থায় ফিরিয়াছে তাহা সে অনেকটা বুঝিতেও পারিয়াছে। তাহার বয়স এখন সপ্তদশ বৎসর। সুতরাং পিতার সহিত রাজার বর্ত্তমান সম্বন্ধ বুঝিবার কতকটা শক্তিও তাহার জন্মিয়াছে। তাই নারায়ণীর কথায় কি উত্তর দিবে স্থির করিতে না পারিয়া মুকুন্দ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নারায়ণীর সহিত মুকুন্দ অতি শৈশবে ক্রীড়া করিত। তার পর যখন সে শুনিল নারায়ণীর সহিত তাহার বিবাহ হইবে, তখন সে লজ্জায় নারায়ণীর কাছে বড় একটা আসিতে চাহিত না। কেননা পুরস্ত্রীগণ প্রায়ই বালকবালিকাকে, বিবাহকথা লইয়া রহস্য করিত। নারায়ণী বড় বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক মুকুন্দ অনেকটা বুঝিতে পারিত।

সেই নারায়ণী বহুদিন পরে তাহার সম্মুখে। তাহার উপর বালিকার বয়ঃসন্ধি। এই এক বৎসরে নারায়ণীর দেহলাবণ্যে একটা বিপ্লব ঘটিয়াছে। সর্ব্বোপরি মুকুন্দের যৌবনোন্মেষ। মানসিক বৃত্তিগুলি প্রস্ফুটনোন্মুখী। চক্ষু অন্ধকারে রূপের আভাস দেখে। কর্ণ কোন

দূরদেশের সুকণ্ঠের সুক্ষ্ম স্বরসুধা পান করে। নাসিকা পারিজাতের আঘ্রাণ পায়। অঙ্গে জলভারাবনত নব কাদম্বিনীর স্পর্শসুখ অনুভূত হয়।

কাজেই নারায়ণীকে দেখিয়া কে যেন হৃদয়ের ভিতর হইতে মুকুন্দের নাক-মুখ-চোখ চাপিয়া ধরিল। মুকুন্দ নারায়ণীর কথায় উত্তর দিতে পারিল না।

তখন বালিকা দক্ষিণকরের আম্রমুকুল ঘটমুখে স্থাপিত করিল। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া মুকুন্দের হাত ধরিয়া টানিল।

কাজেই মুকুন্দকে কথা কহিতে হইল। কম্পিতকর নারায়ণীর হস্ত হইতে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট করিয়া অর্দ্ধপরিস্ফুট কণ্ঠে মুকুন্দ কহিল— „আমি যাইব না।"

"চল দোলায় দুলিব।"

"না"

"হরিণ লইয়া খেলিব।"

"না"

"তবে চল দাদার কাছে যাই।"

বালিকা ঘট ফেলিয়া দিল। এবং দুই হস্তে মুকুন্দের একহস্ত সবলে ধরিয়া আকর্ষণ করিল। মুকুন্দ বলিল "আমায় ছাড়িয়া দাও।" নারায়ণী বলিল—"ছাড়িব না। কখনই ছাড়িব না।"

বৃদ্ধের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তখন আম্রশাখা পরিত্যাগ করিয়া তিনি পশ্চাতে ফিরিলেন। দেখিলেন নারায়ণী নাই। চারি-দিকে চাহিয়া দেখিলেন নারায়ণীকে দেখিতে পাইলেন না। ডাকিলেন —"নারায়ণী," নারায়ণী পশ্চাতে না ফিরিয়াই উত্তর করিল— "কি?"

বৃদ্ধ দেখিলেন নারায়ণী আনন্দদেবের পুত্রের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া

আছে। মুকুন্দকে দেখিয়াই বৃদ্ধের লোচন ক্রোধরাগরঞ্জিত হইল। তখন গম্ভীরস্বরে তিনি আবার ডাকিলেন—"নারায়ণী।"

সেই গম্ভীর-স্বর-ঝঙ্কারে সমস্ত উদ্যান প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। বালক স্তম্ভিত হইল। তাহার করের দৃঢ় বন্ধন—নারায়ণীর কোমল-করাঙ্গুলি-বলয় খুলিয়া গেল। বৃদ্ধ আবার বলিলেন—"চলিয়া আয়"—মুকুন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তোমাকে এখানে কে আসিতে বলিল?"

ভয়ে মুকুন্দের মুখ শুকাইয়া গেল।

এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে বীরচন্দ্র প্রবেশ করিলেন। মুকুন্দকে তদবস্থ দেখিয়া রতনকে বলিলেন "ও বালককে তিরস্কার করিও না। এখন হইতে এ বাগান—এ বাগান কেন—এই অট্টালিকা, রাজ্য সমস্ত ওই বালকের পিতার—আমার নয়।"

রতন বলিলেন—"কি রকম?"

বীরচন্দ্র রতনকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বলিতে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। ইত্যবসরে মুকুন্দ একপদ একপদ পিছাইয়া যেই একটু অন্তরালে পড়িল, অমনি ছুটিয়া পলাইল।

নারায়ণীও পিতামহীর কাছে চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আনন্দদেব বীরচন্দ্রের আত্মীয়-পুত্র। কিন্তু দুর সম্পর্কীয় এবং দরিদ্র। অনন্তপুর হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে মথুরাপুরে তিনি বাস করিতেন। পৌত্রীর সহিত তাঁহার পুত্রের বিবাহ দিবার অভিপ্রায়ে রাজা বীরচন্দ্র তাঁহাকে অনন্তপুরে আনাইয়া আশ্রয় প্রদান করেন। অনন্তপুরে আসিয়া আনন্দদেব অল্পদিবসের মধ্যেই প্রতিপত্তি লাভ করেন। প্রথমে তিনি রাজদপ্তরে একটী সামান্য কাজ পান।

ক্রমে বুদ্ধিকৌশলে রাজাকে তুষ্ট করিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর পদ লাভ করেন। ইংরাজের অধীন হইয়া বীরচন্দ্র যে সময় রাজকার্য্য হইতে অবসর লইয়া পুত্রের হস্তে রাজ্যভার প্রদান করেন, তখন রামচন্দ্রের সহায়তার জন্য তিনি আনন্দদেবকেই নিযুক্ত করেন।

রামচন্দ্র বিলাসী, রাজকার্য্য কিছুই দেখিতেন না। সুতরাং কার্য্যতঃ আনন্দদেবই অনন্তপুরের মধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। তাঁহার কথা ও কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে অনন্তপুরে কেহ রহিল না।

এরূপ সুবিধায় কয়জন লোক প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারে? অল্পদিনের মধ্যেই বীরচন্দ্রের ধনরাশিতে আনন্দদেবের ঘর পূর্ণ হইয়া গেল। অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তিনি রামচন্দ্রের বিলাসিতার প্রশ্রয় দিতে লাগিলেন। এবং সাহেবদিগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিয়া ও নানাবিধ উপায়ে তাহাদিগকে তুষ্ট করিয়া ভবিষ্যতের পথ অনেকটা নিষ্কণ্টক করিয়া রাখিলেন। পদচ্যুত করিবার সময়ে বীরচন্দ্র বুঝিতে পারিলেন না তাহা অপেক্ষা তাঁহার দেওয়ানের শক্তি কত অধিক। ফলে বীরচন্দ্রকেই অবশেষে স্বাধিকারচ্যুত হইতে হইল।

আনন্দদেবকে কেহই চিনিতে পারে নাই। চিনিয়াছিল কেবল একজন। সে ঐ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ রতন। রতন যে অমানুষিক অন্তর্দৃষ্টিবলে আনন্দদেবকে চিনিয়াছিলেন, আমরা এমন কথা বলিতে পারি না। তিনি চিনিয়াছিলেন কেবল তাহার দেহের একটীমাত্র চিহ্ন দেখিয়া আনন্দদেবের সম্মুখে দুইটী দাঁতের উপর আর দুইটী দাঁত ছিল।

বীরচন্দ্র ব্রাহ্মণের কাছে আনন্দদেবসম্বন্ধে কখনও কোন প্রসঙ্গ তুলিলেই রতন বলিতেন—"ট্যারার হাজার দোষ, কুঁজোর নেই অন্ত। ইহারও অধিক যার দন্তের উপর দন্ত।" রাজা সরল হৃদয় ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া হাসিতেন। এরূপ বিজ্ঞতায় কেনা হাসিবে? কিন্তু রতন সে হাসি গ্রাহ্য করিতেন না। আনন্দদেবের চরিত্রের উপর তাঁহার

সন্দেহ কেহ কোন মতে দূর করিতে পারিত না। যে করিতে যাইত ব্রাহ্মণ তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতেন না। তিনি বলিতেন, বহুদিন হইতে, বহু উদাহরণ হইতে, বহু বিজ্ঞতার ফলে কবিতাটী রচিত হইয়াছে। ইহাতে অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই। যে করে আমি তার বিজ্ঞতার প্রশংসা করি না।

আনন্দদেবকে রাজকার্য্যে নিয়োগ করিবার সময়ে রতন প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। রাজ্যের ভার দিবার সময়েও প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। বলিতেন—"আত্মীয়—তাহাকে জমী দাও, বাড়ী দাও, আদর যত্ন কর। রাজ্যের অন্ধিসন্ধি জানাইবার প্রয়োজন কি ?"

বীরচন্দ্র তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করেন নাই। তিনি বুঝিলেন, অদৃষ্টদোষে আনন্দ রতনের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছে। সুতরাং রতনের বিজ্ঞতা রতনের কাছেই থাকিত। তাহার ফল আনন্দদেবের স্বার্থকে কখনও স্পর্শ করে নাই। সে বিজ্ঞতা-পরিচালিত হইয়া রাজা কখনও কার্য্য করেন নাই। নিজে আনন্দদেবের আচরণে ও কার্য্যকুশলতায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার পদোন্নতি করিয়া তিনি নিজেই আগ্রহ করিয়া তাহাকে দেওয়ানী দিয়াছিলেন।

এখন বীরচন্দ্র নিজের মূর্খতা ও মূর্খ ব্রাহ্মণের সর্ব্বজ্ঞতা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন। আনন্দদেবের হস্ত হইতে রাজ্যভার কেমন করিয়া পুনর্গ্রহণ করা যায়, তাই পরামর্শ করিবার জন্য তিনি রতনের কাছে আসিলেন। তাঁহার ভয় হইল বুঝি নারায়ণী বিষয়ভোগে বঞ্চিত হইবে।

রতন বুঝিলেন রাজ্য রাঘববোয়ালে গ্রাস করিয়াছে। রাজাকে রাজ্য ফিরাইয়া দিতে এখন আনন্দদেবেরও সাধ্যাতীত। বলিলেন. শক্তি আর ফিরিবে না। প্রতীকারের চেষ্টা করিতে গেলে বিপরীত ফল হইবে। যে একটু আধটু অধিকার তাঁহার আছে

হাও থাকিবে না। বীরচন্দ্রও তাহা বুঝিলেন। বুঝিয়া চারিদিক
দেখিলেন।

রতন সংসারানভিজ্ঞের যোগ্য উপদেশ দিলেন। সংসারের সকলই
নিত্য বুঝাইয়া তিনি তাঁহাকে বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে ও
র্ম্মকর্ম্মে মনোযোগ দিতে আদেশ করিলেন। বলিলেন—"আর কেন?
স গিয়াছে, পুত্র গিয়াছে; তখন, মণি বিসর্জ্জন দিয়া কাচে এত
লাভ কেন?" অবশ্য একথায় রাজা তুষ্ট হইলেন না। একথায় কেই
কবে তুষ্ট হইয়াছে? নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণের কথায় তাঁহার মনে শান্তি
আসিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইল। আনন্দদেব অল্পদিনের ভিতরে
রাজ্য মধ্যে নিজের শক্তি দৃঢ়তর করিয়া লইলেন। রাজার যা একটু
আধটুও স্বাধীনতা অবশিষ্ট ছিল, অল্পে অল্পে তাহাও কাড়িয়া লইলেন।
এখন বীরচন্দ্র নিজের গৃহে একরূপ বন্দী; ক্রমে রতনের কাছে আসাও
তাঁহার বন্ধ হইয়া গেল। স্বগৃহে আবদ্ধ বীরচন্দ্র দেখিতে লাগিলেন,
তাঁহার অট্টালিকাসম্মুখস্থ বিশালপ্রান্তর কিংকবলার, ফ্রেগুলি বুচার
প্রভৃতি মহাপ্রভুগণের ক্রীড়াভূমি হইয়াছে। যে ঘরে বসিয়া তিনি
রতনের সহিত শাস্ত্রালাপে নিযুক্ত থাকিতেন, সেই ঘর এখন সাহেব
দিগের পৈশাচিক ভোজের জন্য ব্যবহৃত।

বীরচন্দ্র দশদিক অন্ধকার দেখিলেন। যে আদর নারায়ণীর প্রাপ্য,
সেই আদর মুকুন্দ ভোগ করিতেছে। নারায়ণীকে পুত্রবধূ করা এখন
আনন্দদেবের অনুগ্রহ। তা করিলে বুঝি বীরচন্দ্র আপনাকে ভাগ্যবান
বিবেচনা করিতেন।

কিন্তু আনন্দদেব তাহা করিলেন না। তিনি বীরচন্দ্রের অপর এক

আত্মীয়ের কন্যার সহিত মুকুন্দের বিবাহ দিলেন। মহাসমারোহে অনন্তপুরেই বিবাহ নিষ্পন্ন হইল।

বীরচন্দ্র ক্ষিপ্তবৎ অস্থির হইলেন। এই অসময়ে রাণী মধুমতী সর্ব্বদা রাজার নিকটে থাকিতেন, প্রাণপণে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতেন। অবস্থাবিপর্য্যয়ে নারায়ণীও অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। নারায়ণী আর পিতামহীর উপর অভিমান করিত না। রতনকেও আর তাহার অত্যাচার সহিতে হইত না। নারায়ণী বিশেষ কিছু বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক তবে এটা বুঝিয়াছিল বাড়ীতে একটা গোলমাল বাধিয়াছে।

রতনের কাছে থাকিলে সে তাহার পূজাদির আয়োজন করিয়া দিত। পিতামহের কাছে আসিয়া কিন্তু সে কোন কিছু করিবার সুবিধা পাইত না। পিতামহের মুখ দেখিয়া তাহার প্রাণটা কেমন কেমন করিত। চক্ষু আপনা আপনি কেমন জলে ভরিয়া যাইত। পিতামাতার অভাব নূতন ভাবে আসিয়া যেন তাহাকে পীড়ন করিত।

মনের ভাব গোপন করিবার চেষ্টাও এই বয়সে নারায়ণীর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। পিতামহের নিকটে বসিয়া যখন মনোভাব উদ্বেলিত হইবার উপক্রম করিত, তখন গৃহের সামগ্রী—এটা ওখানে, ওটা সেখানে স্থানান্তরিত করিতে নিযুক্ত হইত।

মুকুন্দের সহিত নারায়ণীর আর বড় দেখা শুনা হইত না। যদি ঘটনাক্রমে কখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইত, নারায়ণী আর তাহার সহিত প্রগল্‌ভ হইয়া কথা কহিত না। এমন কি কথা যাহাতে না কহিতে হয় সেইরূপ উপায়ই অবলম্বন করিত। দূর হইতে দেখিলে দূর হইতেই সরিয়া যাইত। নিকটে পড়িলে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইত। মুকুন্দও উপযাচক হইয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে

হসী হইত না। মুকুন্দের বিবাহের পর হইতে উভয়ের মধ্যে আর
খা সাক্ষাৎ হয় নাই।

বিবাহের পর নববধূকে লইয়া যখন মুকুন্দ ঘরে আসে, তখন
রায়ণীর একবার উভয়কে দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। নববধূটীর
ইত ছেলেবেলা হইতে তাহার বড়ই ভাব ছিল। বালিকার পিত্রালয়
নন্তপুরের নিকটেই। তাহার পিতা মধ্যবিত্ত তালুকদার—দুই তিনখানি
াম তাহার অধিকারভুক্ত ছিল। গ্রাম কয়খানি বীরচন্দ্রেরই প্রদত্ত।
ালিকা মাঝে মাঝে বীরচন্দ্রের বাটীতে আসিত। এবং আসিলে
হুদিন ধরিয়া অবস্থিত হইত। এই সূত্রে নারায়ণীর সহিত তাহার
ড়ই সদ্ভাব হইয়াছিল। বালিকার নাম ছিল জানকী। জানকী
হুদিন অনন্তপুরে আসে নাই। তাহার পিতা পরমানন্দ সিংহ
ামচন্দ্রের সর্ব্বনাশসাধনে আনন্দদেবের সহায় ছিল, বীরচন্দ্র অনুসন্ধানে
ানিতে পারিয়াছিলেন। এ বিশ্বাসঘাতকতা কার্য্যেও সে কতকটা
লিপ্ত ছিল।

বহুদিন দেখে নাই বলিয়া নারায়ণীর জানকীকে দেখিবার ইচ্ছা
হইয়াছিল। কিন্তু পিতামহীর জন্য দেখিতে পায় নাই। ইদানীং
নারায়ণী বাটী হইতে বড় বাহির হইত না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আনন্দদেবের ইচ্ছা ছিল, রতন কোন মতে না অনন্তপুরে থাকিতে
পায়। এইজন্য প্রথমেই সে রাজাকে এই সঙ্গীটী হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার
চেষ্টায় ছিল। অন্য সঙ্গীতে তাহার বড় আপত্তি ছিল না। কিন্তু
তাহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। পুলীস সাহেব বৃদ্ধকে পূর্ব্বে
অনেকবার দেখিয়াছেন। তাহা হইতে যে ভয়ের কোনও কারণ
থাকিতে পারে এটা তিনি স্বপ্নেও বিশ্বাস করিতে পারেন নাই।

আত্মীয়ের কন্যার সহিত মুকুন্দের বিবাহ দিলেন। মহাসমারোহে অনন্তপুরেই বিবাহ নিষ্পন্ন হইল।

বীরচন্দ্র ক্ষিপ্তবৎ অস্থির হইলেন। এই অসময়ে রাণী মধুমতী সর্ব্বদা রাজার নিকটে থাকিতেন, প্রাণপণে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতেন। অবস্থাবিপর্য্যয়ে নারায়ণীও অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। নারায়ণী আর পিতামহীর উপর অভিমান করিত না। রতনকেও আর তাহার অত্যাচার সহিতে হইত না। নারায়ণী বিশেষ কিছু বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক তবে এটা বুঝিয়াছিল বাড়ীতে একটা গোলমাল বাধিয়াছে।

রতনের কাছে থাকিলে সে তাহার পূজাদির আয়োজন করিয়া দিত। পিতামহের কাছে আসিয়া কিন্তু সে কোন কিছু করিবার সুবিধা পাইত না। পিতামহের মুখ দেখিয়া তাহার প্রাণটা কেমন কেমন করিত। চক্ষু আপনা আপনি কেমন জলে ভরিয়া যাইত। পিতামাতার অভাব নূতন ভাবে আসিয়া যেন তাহাকে পীড়ন করিত।

মনের ভাব গোপন করিবার চেষ্টাও এই বয়সে নারায়ণীর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। পিতামহের নিকটে বসিয়া যখন মনোভাব উদ্বেলিত হইবার উপক্রম করিত, তখন গৃহের সামগ্রী—এটা ওখানে, ওটা সেখানে স্থানান্তরিত করিতে নিযুক্ত হইত।

মুকুন্দের সহিত নারায়ণীর আর বড় দেখা শুনা হইত না। যদি ঘটনাক্রমে কখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইত, নারায়ণী আর তাহার সহিত প্রগল্‌ভ হইয়া কথা কহিত না। এমন কি কথা যাহাতে না কহিতে হয় সেইরূপ উপায়ই অবলম্বন করিত। দূর হইতে দেখিলে দূর হইতেই সরিয়া যাইত। নিকটে পাড়লে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইত। মুকুন্দও উপযাচক হইয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে

সাহসী হইত না। মুকুন্দের বিবাহের পর হইতে উভয়ের মধ্যে আর দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই।

বিবাহের পর নববধূকে লইয়া যখন মুকুন্দ ঘরে আসে, তখন নারায়ণীর একবার উভয়কে দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। নববধূটীর সহিত ছেলেবেলা হইতে তাহার বড়ই ভাব ছিল। বালিকার পিত্রালয় অনন্তপুরের নিকটেই। তাহার পিতা মধ্যবিত্ত তালুকদার—দুই তিনখানি গ্রাম তাহার অধিকারভুক্ত ছিল। গ্রাম কয়খানি বীরচন্দ্রেরই প্রদত্ত। বালিকা মাঝে মাঝে বীরচন্দ্রের বাটীতে আসিত। এবং আসিলে বহুদিন ধরিয়া অবস্থিত হইত। এই সূত্রে নারায়ণীর সহিত তাহার বড়ই সদ্ভাব হইয়াছিল। বালিকার নাম ছিল জানকী। জানকী বহুদিন অনন্তপুরে আসে নাই। তাহার পিতা পরমানন্দ সিংহ রামচন্দ্রের সর্ব্বনাশসাধনে আনন্দদেবের সহায় ছিল, বীরচন্দ্র অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছিলেন। এ বিশ্বাসঘাতকতা কার্য্যেও সে কতকটা লিপ্ত ছিল।

বহুদিন দেখে নাই বলিয়া নারায়ণীর জানকীকে দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু পিতামহীর জন্য দেখিতে পায় নাই। ইদানীং নারায়ণী বাটী হইতে বড় বাহির হইত না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আনন্দদেবের ইচ্ছা ছিল, রতন কোন মতে না অনন্তপুরে থাকিতে পায়। এইজন্য প্রথমেই সে রাজাকে এই সঙ্গীটী হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টায় ছিল। অন্য সঙ্গীতে তাহার বড় আপত্তি ছিল না। কিন্তু তাহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। পুলীস সাহেব বৃদ্ধকে পূর্ব্বে অনেকবার দেখিয়াছেন। তাহা হইতে যে ভয়ের কোনও কারণ থাকিতে পারে এটা তিনি স্বপ্নেও বিশ্বাস করিতে পারেন নাই।

কাজেই আনন্দদেবের প্রস্তাব তাঁহার কাছে উপহাস্য হইয়াছিল। যাই হ'ক, কার্য্যতঃ আনন্দদেব রাজাকে রতন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল। কিন্তু রতনকে নির্ব্বাসিত করিতে তাহার সাহসে কুলায় নাই।

ইহা ভিন্ন রাজাকে দেখিতে রতনের নিজের যদি কোন সময় ইচ্ছা হইত, তাহা হইলে কোনও লোক তাঁহাকে বাধা দিতে সাহসী হইত না।

রতনকে এত ভয় কেন? স্বরাজ্যে সহস্র অনুচরমধ্যে অগণ্য রক্ষি-সহায় রাজপ্রতিনিধির এক সামান্য ব্রাহ্মণকে এত ভয় কেন?

ভয়ের অনেক কারণ ছিল। প্রথম কারণ, রতন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। নিরীহ, মিষ্টভাষী, সদালাপী সদানন্দ পুরুষ। অনন্তপুরের আবালবৃদ্ধ-বনিতা তাঁহাকে ভক্তি করিত। পরোপকারের জন্য তাহার জীবন উৎসর্গীকৃত। দ্বিতীয় কারণ, ব্রাহ্মণের বল গল্পের বিষয় ছিল। অনন্তপুরের অধিকাংশ সিপাহীই তাঁহার কাছে ব্যায়াম শিক্ষা করিয়াছিল।* যাহারা নবাগত তাহারাও তাঁহার কার্য্যকলাপ অবগত হইয়া তাঁহাকে ভক্তি করিত। সুতরাং তাঁহার অঙ্গে হাত তুলিতে কে অগ্রসর হইবে? তৃতীয়—সরলহৃদয় ব্রাহ্মণ সদিচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিতে পর্ব্বতের বাধাও গ্রাহ্য করিতেন না। হৃদয়ে ঐশ্বরিক বল, বিষয়ে সম্পূর্ণ অনাসক্তি, কাঁদিবার কাঁদাইবার লোকাভাব, মৃত্যুভয়রাহিত্য, এই প্রকার নানাবিধ অস্ত্রে সজ্জিত ব্রাহ্মণ অনন্তপুরের মধ্যে নিশ্চিন্ত মনে বাস করিতেন।

ব্রাহ্মণ একেবারে যে ক্রোধশূন্য ছিলেন, এ কথা বলিতে পারি না। কখন কখন কোনও বিশেষ কারণে ব্রাহ্মণের ধৈর্য্যচ্যুতির কথা শুনা গিয়াছে। আনন্দদেব একবার নিজেই দেখিয়াছিল একজন বিপন্নকে রক্ষা করিতে ব্রাহ্মণ শতাধিক লোককে বিপন্ন করিয়াছিলেন। নখ হইতে মুখের কথাটি পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের তীক্ষ্ণ অস্ত্রের কার্য্য করিয়াছিল। আনন্দদেব ইহাও দেখিয়াছে যে, ব্রাহ্মণ একবার ক্রুদ্ধ হইলে, সে

ক্রোধ সহজে উপশমিত হইত না। ব্রাহ্মণের চপেটাঘাতে একটী প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র প্রাণ দিয়াছে—অনন্তপুরের আবালবৃদ্ধবনিতা ইহাও বিশ্বাস করিত। সুতরাং এরূপ ব্রাহ্মণের অনিষ্ট করিতে ভীরু দেওয়ান সাহসী হইত না। রতন কিন্তু বুঝিলেন, অনন্তপুরে থাকা আর অধিক দিন চলিবে না। অনন্তপুরের অবস্থা এখন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বাবস্থা যে আর ফিরিবে এমন সম্ভাবনাও তিনি দেখিতে পাইলেন না।

রাজবাটীর পশ্চাতে একটী ছোট বাগানের মধ্যে একটী পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া রতন তাহার মধ্যে অবস্থান করিতেন। রাজা তাঁহাকে একখানি পাকাবাড়ী করিয়া দিবার জন্য পঁচিশ বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু রতন তাহা করিতে দেন নাই। পর্ণশালা হইলেও পরিচ্ছন্নতায় ও মনোহারিত্বে রতনের বাসস্থান রাজপ্রাসাদ হইতে যে কোনও অংশে হীন ছিল, তা বলিতে পারি না। দেখিলে স্থানটীকে একটী সিদ্ধাশ্রম বলিয়া ভ্রম হইত।

রতন একা। কিন্তু তাঁহার গৃহ সর্ব্বদাই বহুজনে পূর্ণ থাকিত। গ্রামের বালক-যুবা-বৃদ্ধ সকলেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের আশ্রমে যাতায়াত করিত। শাস্ত্রালাপে, সঙ্গীতে, হাস্যকোলাহলে রতনের বাসগৃহ সর্ব্বদা এক অপূর্ব্ব সজীবতার পরিচয় প্রদান করিত।

বালকেরা আসিয়া রতনের বাড়ীর উঠানে কুস্তি শিখিত। যুবক কুস্তিগীর রতনের শিষ্যসম্প্রদায় শিক্ষকের কার্য্য করিত। রতন নিকটে একখানি চৌকীতে বসিয়া তামাকু টানিতে টানিতে তাহাদের খেলা দেখিতেন। এবং প্রয়োজন হইলে দুই একটা ব্যায়ামকৌশল বলিয়া দিতেন। বিশেষ প্রয়োজন হইলে কখন কখন নিজেও মাটী মাখিতেন।

রতনের আশ্রমের পার্শ্ব দিয়া সুবর্ণরেখা প্রবাহিতা। রাজা তাঁহার গৃহপার্শ্ববর্ত্তী সুবর্ণরেখাতলদেশ খনন করাইয়া গভীর করিয়া দিয়াছিলেন। ব্যায়ামান্তে সকলে সেইখানে স্নান করিত। তাহাদের

স্নানকার্য্য একটা সমারোহ ব্যাপার। তাহাদের অঙ্গতাড়িত তরঙ্গোচ্ছ্বাসে নদীজলে গভীর আবর্ত্ত উপস্থিত হইত।

শিলাময় তটভূমি বিদীর্ণপ্রায় হইত। রতনও তাহাদিগের সঙ্গে স্নান করিতেন। বহুক্ষণ ধরিয়া রতনের গাত্রমার্জনকার্য্য চলিত। বালকসম্প্রদায় দশ পোনরজন এক সঙ্গে রতনের পৃষ্ঠে স্কন্ধে বাহুতে মুষ্ট্যাঘাতকার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। তাহাদের মুষ্টি বজ্রসম কঠিন হইবে এইজন্য রতন স্বেচ্ছায় তাহাদিগকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। কেহ এরূপ কার্য্যে ঔদাস্য দেখাইলে ওস্তাদের কাছে তিরস্কৃত হইত। বালকেরাও বুঝিত কিছু কালের জন্য তাহাদের পাহাড়ের সঙ্গে লড়াই করিতে হইবে। প্রথম প্রথম প্রহারান্তে বালকদিগকে বড়ই কষ্ট পাইতে হইত। চূণহলুদের শ্রাদ্ধক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়া যখন তাহাদের হাতের ব্যথা মরিত, তখন আবার পূর্ব্বানুরূপ প্রহারকার্য্যে নিযুক্ত হইত।

রতনের অঙ্গে প্রহার করিয়া যখন আর তাহাদের চূণহরিদ্রার প্রয়োজন হইত না—হস্তে কোনওরূপ যন্ত্রণা অনুভব করিত না, তখন তাহারা স্থির বুঝিত যে তাহাদের মুষ্টিপ্রহার পর্ব্বতগাত্রও চূর্ণ করিতে সমর্থ। ব্যাঘ্রাদি জন্তুর সম্মুখে পড়িলে মুষ্টিই তাহাদের আত্মরক্ষণোপযোগী মহাস্ত্র।

স্নানান্তে রতনের গৃহে জলযোগ রাশি রাশি ছোলা ও গুড়। জলযোগের পর সকলে আনন্দ করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিত। রতন এই সময় আহ্নিকাদি কার্য্য সমাপন করিয়া, রন্ধনের উদ্যোগ করিতেন। রাজবাটী হইতে প্রত্যহ বিশ জন লোকের যোগ্য সিধা আসিত। রতন একাই পাঁচ ছয় জনের যোগ্য আহার করিতে পারিতেন। রাজপ্রদত্ত একজন ভৃত্য ও একজন দাসী ছিল। সাকরেতদিগের মধ্যে কেহ কেহ গুরুর প্রসাদ পাইবার জন্য থাকিয়া যাইত।

সময় বিশেষে প্রয়োজন হইলে আরও আহারীয় তিনি আনাইয়া লইতেন।

বিকালে রতনের সহচরগণের সিদ্ধি ঘুঁটিতে এবং সেই সঙ্গে সীতারামের জয়সঙ্গীতে, সুবর্ণরেখাতটভূমি প্রতিধ্বনিত করিত। এই সময়ে গ্রামস্থ বৃদ্ধগণেরই সমাগম অধিক ছিল। তাহারা আসিয়া রতনের সহিত শাস্ত্রালাপে রত থাকিত। কেহ কেহ খোস গল্প করিত।

আর কেহ বড় একটা আসেনা। আসিতে সাহস করে না। কিজানি কোন দিন আনন্দদেব দেখিবে, দেখিলে নাজানি কি বিপদ ঘটিবে। ভয়ে আর কেহ বড় রতনের কাছে আসিতে চাহিত না! সকলেই জানিত রতন আনন্দদেবকে দুচক্ষে দেখিতে পারিত না। সুতরাং রতনের কিছু করিতে পারুক আর নাই পারুক, যে রতনের সঙ্গে মিশিবে আনন্দদেব যে তাহার সর্ব্বনাশ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেহ আসিতে চাহিলে রতন নিজেই তাহাকে আসিতে দিতেন না।

তাঁহার কুস্তির আখড়ায় বড় বড় তৃণগুল্ম জন্মিয়া বন হইয়াছিল, সিদ্ধির বাটীতে ছাতা ধরিয়াছিল, বাহির হইতে তাঁহার ঘর দেখিলে লোক আছে এরূপ বোধ হইত না। সুবর্ণরেখা সঙ্গীহারা—সুতরাং উচ্ছ্বাসশূন্যা—কুল কুল করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার উদ্যানের পার্শ্বদিয়া চলিয়া যাইত। তাঁহাকে দেখিবার পর্য্যন্ত লোক ছিলনা। আর সেরূপ ভারে ভারে তাঁহার গৃহে দধিদুগ্ধ-ঘৃত-আটা-তণ্ডুল নানাবিধ মিষ্টান্ন আসা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। আনন্দদেব অবশ্য তাঁহার জন্য সিধা পাঠাইত। কিন্তু প্রায়ই তাহাতে রতনের পর্য্যাপ্ত হইত না। কখন কখন সিধা সময়ে উপস্থিত হইত না। ইতিমধ্যে দুই চারি দিন রতনের উপবাসে কাটিয়া গিয়াছে।

রাণী মধুমতী পূর্ব্বে ততটা রতনসম্বন্ধে তত্ত্বাবধান করিবার অবসর পান নাই। আনন্দের বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁহারও মনের অবস্থা কতকটা বিকৃত হইয়াছিল। অবশেষে একদিন নারায়ণীর মুখে ব্রাহ্মণের অবস্থার বিষয় অবগত হইয়া ইদানীং প্রতিদিন সংবাদ লইতে আরম্ভ করিয়াছেন। সরকার হইতে আসিবার অপেক্ষা না করিয়া, তিনি ঘর হইতে প্রতিদিন ব্রাহ্মণের আহার্য্য প্রেরণ করিতেন। নারায়ণী নিজে বসিয়া ব্রাহ্মণের আহারের পর্য্যবেক্ষণ করিত।

রতন ভাবিলেন, এরূপ করিয়াই বা আর কতদিন চলিবে। রাণী আপনাকে বঞ্চিত করিয়া যে তাহার অন্ন যোগাইতেছেন না, তাহাই বা কে বলিবে? নারায়ণীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কিছু বলিত না। রাণীর কাছে তথ্য জানিবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। আনন্দময় রতন অল্পে অল্পে বিষাদকালিমায় আচ্ছন্ন হইতে লাগিলেন। তাঁহার পূর্ব্বশ্রী অল্পে অল্পে লোপ পাইতে লাগিল। অনন্তপুরের বায়ু এখন তাঁহার পক্ষে উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।

বহুদিন পরে রতনের অনন্তপুর-ত্যাগে ইচ্ছা হইল। দ্বাদশ বৎসর তিনি এস্থান হইতে বাহির হন নাই। দুই একদিনের জন্য বাহিরে যাওয়া অবশ্য ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। এই সেদিন নারায়ণীর পাত্রানুসন্ধানে অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও তিনি আপনাকে গৃহ হইতে বহির্গত বিবেচনা করেন নাই। বহুকাল পরে তাঁহার প্রিয় পর্ণকুটীরটী ছাড়িবার অভিপ্রায় জাগিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু কেমন করিয়া যাইবেন? নন্দিনী বলিতে, সঙ্গিনী বলিতে, ক্রীড়ণক বলিতে একমাত্র যে নারায়ণী তাহাকে কেমন করিয়া পরিত্যাগ করিবেন। পরিত্যাগের চিন্তায় ব্রাহ্মণ শিহরিয়া উঠিতেন। নারায়ণীকে পাত্রস্থা করিতে পারিলে, অবশ্য অনেকটা নিশ্চিন্ত হইবার কথা ছিল। কিন্তু নারায়ণীর যে বিবাহ হয় এমনটা তাঁহার আর

বিশ্বাস হইল না। কে আর নারায়ণীর বিবাহের উদ্যোগ করিবে? রাজার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় বুঝিয়াছেন, পাগলের সহিত তাঁর আর বিশেষ প্রভেদ নাই। নারায়ণীর ভবিষ্যৎ বুঝিয়া তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। কিন্তু অনন্তপুরে থাকা তাঁহার আর অধিকদিন চলিবে না। নিজে ইচ্ছা করুন আর নাই করুন, তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই ত্যাগ করিতে হইবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কিছুদিন ইতস্ততঃ করিয়া রতন অবশেষে রাণী মধুমতীর কাছে কথাটা পাড়িলেন। বলিলেন আজ বাদে কাল মরিব, তখন তীর্থে মরিতে পারিলেই ভাল হয়। মধুমতী শুনিয়া বজ্রাহতের ন্যায় নিস্পন্দ হইলেন। কিজন্য ব্রাহ্মণ বলিলেন, তিনি সমস্তই বুঝিয়াছিলেন। কিছুক্ষণের জন্য তিনি কথা কহিতে পারিলেন না। নীরব, স্তম্ভিত—চক্ষু দিয়া কেবল জলধারা পড়িতে লাগিল। রতনও অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না। রাণী যখন প্রকৃতিস্থা হইলেন, তখনও কোন কথা কহিতে পারিলেন না। কি বলিবেন? হিতাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণের বর্ত্তমান অবস্থা তিনি ত বিলক্ষণই বুঝিতে পারিতেছেন। কোন প্রাণে তাঁহাকে আর থাকিতে অনুরোধ করিবেন? তাঁহাদের যা ঘটে ঘটুক, ব্রাহ্মণ তাঁহাদের স্বার্থপরতার জন্য কষ্ট পান কেন? কিন্তু এমন ব্রাহ্মণ যদি না রহিল, তবে অনন্তপুরে রহিল কি?

রাণী রতনকে অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। বলিলেন—"আপনি বসুন। আমি একবার রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।"

রাণী প্রস্থান করিলে রতনের হৃদয়ে ঝড় বহিতে লাগিল। সংসার-বিরাগী ব্রাহ্মণ জীবনে কখন এরূপ আত্মহারা হন নাই। তাঁহার মনোরাজ্যে মুহূর্ত্তমধ্যে একটা বিপ্লব ঘটিয়া গেল। তিনি ভাবিলেন—

"করিলাম কি? রাণীর কাছে মনের অবস্থা প্রকাশ করিয়া কি বুদ্ধিমানের কার্য্য করিলাম? নিজের শক্তির উপরেই কি আমার বিশ্বাস আছে? আমি কি নারায়ণীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব?"

রাণী বীরচন্দ্রের কাছে সকল কথা বলিলেন। রাজা বলিলেন—দেবহৃদয় ব্রাহ্মণকে আর আবদ্ধ করিও না"।

রাণী ফিরিয়া আসিলেন। আসিবার সময় নারায়ণীকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। নারায়ণী নিদ্রিত ছিল। ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে বসাইয়া, আর একবার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অল্পক্ষণ পরে একটী রৌপ্যপাত্রপূর্ণ স্বর্ণমুদ্রা ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে রক্ষিত হইল। রাণী স্বর্ণমুদ্রা ব্রাহ্মণকে নিবেদন করিয়া ভূমিষ্ঠা হইয়া প্রণাম করিলেন। নারায়ণীকেও প্রণাম করিতে বলিলেন।

দাদাকে প্রণাম করা তাহার জীবনে কখন অভ্যাস ছিল না। বরং তাঁহার পৃষ্ঠদেশে আরোহণাদি কার্য্যেই সে অধিক আনন্দ বোধ করিত। সে কেমন অপ্রস্তুত হইয়া গেল। দাদার প্রতি এরূপ অভ্যর্থনা সে আর কখন দেখে নাই। নানারূপ গোলমালের মধ্যে পড়িয়া সে অবশেষে পিতামহীর অনুরোধে একটা প্রণাম করিল। অল্পক্ষণ পরেই রাজাও আসিলেন। ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলেন।

রতন বলিলেন—"একি!—এত স্বর্ণমুদ্রা কেন? এ আমি কি করিব?

রাজা বলিলেন—"মনে দ্বিধা করিবেন না। আমরা আপনার সন্তান। গ্রহণ না করিলে মর্ম্মব্যথা পাইব। তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতে হইবে। বিদেশে পথে অর্থের নানা প্রয়োজন। পুত্রকন্যার প্রতি দয়া করিয়া গ্রহণ করুন।" বলিতে বলিতে বীরচন্দ্র কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর ঝঞ্ঝাভিহতের ন্যায় কম্পিত হইয়া উঠিল।

রতন এতক্ষণ কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধরিয়াছিলেন। এখন বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন—"মহারাজ! তোমরা যা ভাবিয়াছ,

ামি তা নই ; আমি আপনাকে এতদিন চিনিতে পারি নাই। এ বৃদ্ধ ারী হইতেও অধম। চিত্তসংযমে তাহার কিছুমাত্র শক্তি নাই। আমি ারায়ণীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। তবে তীর্থে যাইবার মনন রিয়াছি। দিন কতক ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিব।”

নারায়ণী এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল। ব্যাপারটা কি সে ভাল বুঝিতে পারিতেছিল না। এখন বুঝিল দাদা তাহাকে ছাড়িয়া যাইতেছে। বালিকাও আবেগপূর্ণহৃদয়ে বলিয়া উঠিল—“দাদা আমাকে কাহার কাছে রাখিয়া যাইবে?”

নারায়ণীর প্রশ্নে এবং রাজা ও রাণীর কথার ভাবে রতন বুঝিলেন, পাষণ্ড আনন্দ নারায়ণীর জন্য একটা পরিচারিকা পর্য্যন্ত নিযুক্ত করে নাই।

ব্রাহ্মণের শোকাবেগ মুহূর্ত্ত মধ্যে ক্রোধে পরিণত হইল। বলিলেন, বৃদ্ধ হইয়াছি। কয়দিনই বা বাঁচিব? সুতরাং অপঘাত মৃত্যু হয়, তাও স্বীকার। অনন্তপুর ছাড়িবার পূর্ব্বে এর একটা ব্যবস্থা করিয়া যাইব।”

রাজা ও রাণী উভয়েই সাগ্রহে তাঁহাকে উত্তেজিত হইতে নিষেধ করিলেন। ব্রহ্মণ সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না—রাণীর প্রদত্ত উপহার গ্রহণ করিয়া মুহূর্ত্তে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। পশ্চাতে আর নিরীক্ষণ করিলেন না।

[ক্রমশঃ]

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

আল্‌হাম্‌রা।*

স্পেনের সুপ্রসিদ্ধ আল্‌হামরা প্রাসাদের নাম পুরাতত্ত্বপ্রিয় পাঠকমাত্রেরই নিকট সুপরিচিত। ইহার ধ্বংসস্তূপ গ্রানাডানগরে অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে বলিয়া, ইস্‌লামের প্রাচীন কীর্ত্তিস্মৃতি ইউরোপ হইতে মুছিয়া যায় নাই। অদ্য এই অনন্ত সৌন্দর্য্যের আধার আল্‌হামরা প্রাসাদের কথঞ্চিৎ আভ্যন্তরিক বিবরণ পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

প্রাসাদটী যে স্থানে অবস্থিত, তত্রত্য ভূমির বর্ণ লোহিতাভ বলিয়া, ইহা আল্‌হাম্‌রা বা লোহিতপ্রাসাদ নামে অভিহিত হইয়াছে। তদানীন্তন প্রসিদ্ধ আরবীয় এবং মূরীয়† স্থপতি ও শিল্পীগণ কর্ত্তৃক ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আরব্ধ হইয়া চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সমাপ্ত হইয়াছিল। লোকে বলিত, "ইহারা 'কিমিয়া'‡ জানে, নহিলে এতাদৃশ আশ্চর্য্য প্রকাণ্ড প্রাসাদনির্ম্মাণ মানবশক্তির বহির্ভূত!" কথিত আছে, ইহার অভ্যন্তরে চত্তারিংশৎ সহস্র লোক অনায়াসে বাস করিতে পারিত! যে ইস্‌লামের পতাকাতলে এই অতুলনীয় রাজপ্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার শাসনাধীনে স্পেন কতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছিল, এবং আধুনিক সভ্যতা ও উন্নতির জন্য

---

* এই প্রবন্ধে বর্ণিত বিষয়গুলি প্রধানতঃ নিম্নলিখিত গ্রন্থদ্বয় হইতে সংগৃহীত হইয়াছে :—

(1) Ameer Ali's A Short History of the Saracens.

(2) Stanley Lane-Pooles The Moors in Spain.

† আফ্রিকার মরক্কোবাসী মুসলমানগণ মূর নামে বিখ্যাত। ইঁহারই স্পেন অধিকার করিয়াছিলেন।

াশ্চাত্য প্রদেশ সমূহ তাহার নিকট কি পরিমাণে ঋণী রহিয়াছেন, ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার বিস্তারিত আলোচনা সম্ভবে না। কিন্তু দ্বিষয়ে দুই একটী কথার উল্লেখ এস্থলে বাহুল্য হইবে না।

ইস্‌লাম-প্রচারক মহাপুরুষ মহম্মদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ারবীয় মরুভূমি হইতে যে মহাদিগ্বিজয়-স্রোত উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বেগে প্রধাবিত হইয়াছিল, তাহারই একটী ভীষণ তরঙ্গাভিঘাতে স্পেন, ষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রাক্কালে, মূরীয় রাজগণের শাসনাধীনে আসিয়া ড়িল। *বিজয়মদমত্ত মুসলমানেরা ইহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না;* তাঁহারা িরিনিস্ অতিক্রম করিয়া ফরাসীরাজ্য জয় করিবার জন্য প্রয়াস ইলেন। কিন্তু প্রথম উদ্যমেই বিফলমনোরথ হইয়া, যেন তাঁহাদের গ্বিজয়ের নেশা ছুটিয়া গেল। তাঁহারা নববিজিত স্পেনরাজ্যে াস্তভাবে প্রত্যাগমন করিয়া দিগ্বিজয়ী তরবারি কোষবদ্ধ করিলেন; বংবাহুবলের পরিবর্ত্তে বিদ্যাবলে ইউরোপ জয় করিবার জন্য তাঁহা-দের অমিত শক্তি নিয়োজিত করিলেন। মসী ও লেখনী, শোণিত বং তরবারির স্থান অধিকার করিল; এবং পরবর্ত্তী কিঞ্চিন্ন্যূন ০০ বৎসর ধরিয়া তদানীন্তন অর্দ্ধসভ্য বর্ব্বর ইউরোপের সমক্ষে, াসেমগণ সভ্যতা ও উন্নতির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ক্রমাগত উপস্থিত করিতে াগিলেন। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে স্পেন হইতে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ণিত, জ্যোতিষ, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, ইতিহাস, দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহের য গভীর জ্ঞানগর্ভ উৎস উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইয়াছিল, াহারই স্রোতোসলিলের উর্ব্বরশক্তিপ্রভাবে আজ ইউরোপের বিদ্যাভূমি ত উৎকর্ষিত। কর্দ্দভা, গ্রানাডা, সেভিলি, টলেডো, জীন, এবং ালাগার বিখ্যাত মূরীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে ইতালী, জর্ম্মণি, ফ্রান্স, ংলণ্ড প্রভৃতি দূরদেশ হইতে জ্ঞানপিপাসু বিদ্যার্থিগণ দলে দলে সমবেত হইতেন। এতাদৃশ গভীর গবেষণাপূর্ণ উচ্চশ্রাস্ত্রের আলোচনা,

আল্‌হাম্‌রা।*

স্পেনের সুপ্রসিদ্ধ আল্‌হামরা প্রাসাদের নাম পুরাতত্ত্বপ্রিয় পাঠকমাত্রেরই নিকট সুপরিচিত। ইহার ধ্বংসস্তূপ গ্রানাডানগরে অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে বলিয়া, ইস্‌লামের প্রাচীন কীর্ত্তিস্মৃতি ইউরোপ হইতে মুছিয়া যায় নাই। অদ্য এই অনন্ত সৌন্দর্য্যের আধার আল্‌হামরা প্রাসাদের কথঞ্চিৎ আভ্যন্তরিক বিবরণ পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

প্রাসাদটী যে স্থানে অবস্থিত, তত্রত্য ভূমির বর্ণ লোহিতাভ বলিয়া, ইহা আল্‌হাম্‌রা বা লোহিতপ্রাসাদ নামে অভিহিত হইয়াছে। তদানীন্তন প্রসিদ্ধ আরবায় এবং মূরীয়† স্থপতি ও শিল্পীগণ কর্ত্তৃক ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আরব্ধ হইয়া চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সমাপ্ত হইয়াছিল। লোকে বলিত, "ইহারা 'কিমিয়া'‡ জানে, নহিলে এতাদৃশ আশ্চর্য্য প্রকাণ্ড প্রাসাদনির্ম্মাণ মানবশক্তির বহির্ভূত!" কথিত আছে, ইহার অভ্যন্তরে চত্বারিংশৎ সহস্র লোক অনায়াসে বাস করিতে পারিত! যে ইস্‌লামের পতাকাতলে এই অতুলনীয় রাজপ্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার শাসনাধীনে স্পেন কতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছিল, এবং আধুনিক সভ্যতা ও উন্নতির জন্য

---

* এই প্রবন্ধে বর্ণিত বিষয়গুলি প্রধানতঃ নিম্নলিখিত গ্রন্থদ্বয় হইতে সংগৃহীত হইয়াছে:—

(1) Ameer Ali's A Short History of the Saracens.

(2) Stanley Lane-Pooles The Moors in Spain.

† আফ্রিকার মরক্কোবাসী মুসলমানগণ মূর নামে বিখ্যাত। ইঁহারই স্পেন অধিকার করিয়াছিলেন।

‡ "কিমিয়া" সাধারণতঃ "ঐন্দ্রজালিক রসায়ণ" অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই আরবী শব্দ হইতে ইংরাজি "Chemistry"র উৎপত্তি।

পাশ্চাত্য প্রদেশ সমূহ তাহার নিকট কি পরিমাণে ঋণী রহিয়াছেন, এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার বিস্তারিত আলেচনা সম্ভবে না। কিন্তু তদ্বিষয়ে দুই একটী কথার উল্লেখ এস্থলে বাহুল্য হইবে না।

ইস্‌লাম-প্রচারক মহাপুরুষ মহম্মদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই আরবীয় মরুভূমি হইতে যে মহাদিগ্বিজয়-স্রোত উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বেগে প্রধাবিত হইয়াছিল, তাহারই একটী ভীষণ তরঙ্গাভিঘাতে স্পেন, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রাক্কালে, মূরীয় রাজগণের শাসনাধীনে আসিয়া পড়িল। বিজয়মদমত্ত মুসলমানেরা ইহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না; তাঁহারা পীরিনিস্ অতিক্রম করিয়া ফরাসীরাজ্য জয় করিবার জন্য প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু প্রথম উদ্যমেই বিফলমনোরথ হইয়া, যেন তাঁহাদের দিগ্বিজয়ের নেশা ছুটিয়া গেল। তাঁহারা নববিজিত স্পেনরাজ্যে শান্তভাবে প্রত্যাগমন করিয়া দিগ্বিজয়ী তরবারি কোষবদ্ধ করিলেন; এবংবাহুবলের পরিবর্ত্তে বিদ্যাবলে ইউরোপ জয় করিবার জন্য তাঁহাদিগের অমিত শক্তি নিয়োজিত করিলেন। মসী ও লেখনী, শোণিত এবং তরবারির স্থান অধিকার করিল; এবং পরবর্ত্তী কিঞ্চিন্ন্যূন ৮০০ বৎসর ধরিয়া তদানীন্তন অর্দ্ধসভ্য বর্ব্বর ইউরোপের সমক্ষে, মোসেমগণ সভ্যতা ও উন্নতির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ক্রমাগত উপস্থিত করিতে লাগিলেন। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে স্পেন হইতে সাহিত্য, বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিষ, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, ইতিহাস, দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহের যে গভীর জ্ঞানগর্ভ উৎস উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহারই স্রোতোসলিলের উর্ব্বরশক্তিপ্রভাবে আজ ইউরোপের বিদ্যাভূমি এত উৎকর্ষিত। কর্দ্দভা, গ্রানাডা, সেভিলি, টলেডো, জীন, এবং মালাগার বিখ্যাত মূরীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে ইতালী, জর্ম্মণি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দূরদেশ হইতে জ্ঞানপিপাসু বিদ্যার্থিগণ দলে দলে সমবেত হইতেন। এতাদৃশ গভীর গবেষণাপূর্ণ উচ্চশ্রাস্ত্রের আলোচনা,

তৎকালে স্পেন ভিন্ন ইউরোপের অন্য কোন প্রদেশে দৃষ্ট হইত না। একমাত্র গ্রাণাডা নগরেই সপ্ততি সংখ্যক বৃহৎ বৃহৎ সাধারণ পাঠাগার সপ্তদশটী উচ্চবিদ্যালয়, এবং দ্বিশতাধিক প্রবেশিকা বিদ্যালয় ছিল। পণ্ডিত-প্রসূ ফর্দ্দভা নগরে যে সকল সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কিঞ্চিন্ন্যূন তিন শত নাম, অষ্টাদশ শতাব্দীর জনৈক বিখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিত* সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁদিগেরই প্রবল প্রতিভা-প্রসূত পঞ্চলক্ষাধিক মূল্যবান গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি, ফর্দ্দভায় বিশাল পুস্তকালয়ের কলেবর, এবং সমগ্র ইউরোপখণ্ডের জ্ঞানযোগী ছাত্র-মণ্ডলীর মস্তিষ্ক পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন অসংখ্য বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বজ্জনের বিরচিত গ্রন্থরাশিতে, গ্রাণাডা, মালাগা, প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকালয়গুলি পরিপূর্ণ ছিল। এই সকল বিদ্যালয় ও পুস্তকালয় হইতে নির্ম্মল জ্যোতিঃ জ্ঞানসূর্য্য উত্থিত হইয়া ইউরোপীয় সভ্যতা এবং উন্নতির প্রভাতাকাশে সমুদিত হইয়াছিল; এবং ইহারই অপূর্ব্ব অক্ষয় শুভ্রালোক সমগ্র পাশ্চাত্য প্রদেশের কুসংস্কার এবং অজ্ঞানতায় ঘোরান্ধকার বিদূরিত করিয়া জ্ঞান ও সভ্যতার গৌরবান্বিত পথ উদ্ভাসিত করিয়াছিল।

কোন প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত† স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, ইউরোপের অধুনাতন একান্ত প্রয়োজনীয় নিত্য ব্যবহার্য্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির অধিকাংশ মূরীয় স্পেনের বিজ্ঞানক্ষেত্রেই প্রথম অঙ্কুরিত হইয়াছিল। তড়িদ্গর্ভ-তারসহযোগে সংবাদ প্রেরিত হইতে পারে, এবং ভারযুক্ত দোলকের দ্বারা সময়নিরূপণ করা যায়, এ সকল স্পেনীয় মোস্লেমগণই প্রথম লক্ষ্য করিয়াছিলেন। শুনা যায়,

---

* কাসিরি।

† সম্ভবতঃ কাসিরি।

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কথা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মূরীয় বৈজ্ঞানিক-*গণের নিকট নাকি অবিদিত ছিল না। ভৈষজ্য এবং অস্ত্র-চিকিৎসা* শাস্ত্রেও মোস্লেমগণ অশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। কর্দ্দভানগরে মুসলমান-স্ত্রীচিকিৎসকেরও অভাব ছিল না।

স্ত্রীশিক্ষায় স্পেনীয় মুসলমানগণ আধুনিক সভ্যতা-শিখরচারী ইউরোপ অথবা আমেরিকাবাসিগণ অপেক্ষা কোন ক্রমেই ন্যূন ছিলেন না। তাঁহারা সম্ভ্রান্ত মহিলাগণকে গভীর জ্ঞানানুশীলনে উৎসাহিত করিতেন। আরব্যসাহিত্য-উদ্যানে নাজহান, জয়নাব, হানদা, হাফসা, কানাইয়া, সাফিয়া, মেরিয়া প্রভৃতি বিদূষী মূর-রমণীবৃন্দের নাম অনন্তকাল প্রস্ফুটিত ও সৌরভে পরিপূর্ণ রহিবে। ইঁহাদিগের কেহ প্রথিতযশা কবি, কেহ সাহিত্যেতিহাসে সুপণ্ডিতা, কেহ অদ্বিতীয়া বক্তা, কেহ বা গণিত-বিজ্ঞানে পারদর্শিনী ছিলেন। তৎকালে সুলতানগণের অন্তঃপুর হইতে সময়ে সময়ে রাজনীতিকুশলা দুই একটী প্রতিভাশালিনী রমণীর প্রভাবও পরিলক্ষিত হইত।

কিন্তু গভীর দুঃখের বিষয় এই যে, মোস্লেমগণ দীর্ঘ ৮০০ বৎসরকাল স্পেনে বসিয়া যে কঠোর জ্ঞানানুশীলন করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা শুধু স্পেন ভিন্ন অন্যান্য পাশ্চাত্য প্রদেশের সকলগুলিই, নবালোকিত জ্ঞান ও সভ্যতার মহাপথে অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজিত ও উৎসাহিত হইয়াছিল, কিন্তু যে স্পেনরাজ্যের বক্ষঃস্থল হইতে এক সময়ে নির্ম্মল-সলিলা বিদ্যাস্রোত-সমূহ উত্থিত হইয়া, ইউরোপের আধুনিক বিশাল জ্ঞানসাগরের সৃষ্টি সূচিত করিয়াছিল, কুসংস্কারাসক্ত এবং জ্ঞান-হীনতার গৌরবানুভবকারী সেই স্পানিয়ার্ডগণ, তাহার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া, মূরজাতির সহিত তাহাদিগের সমুন্নত বিদ্যাগৌরব চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইল। স্পানিয়ার্ড-গণ তাহাদের জ্ঞানগুরু মোস্লেমজাতিকে বিতাড়িত করিয়া কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহা বিখ্যাত ঐতিহাসিক Stanley Lane-Poole তাঁহার Moors in Spain নামক গ্রন্থে, অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

মোস্লেমশাসনাধীনে স্পেন যে শুধু দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য লইয়াই ব্যস্ত ছিল, এমত নহে; কলাবিদ্যায়ও স্পেন অতি আশ্চর্য্য উৎকর্ষ

লাভ করিয়াছিল। এই প্রবন্ধে বর্ণিত আল্হাম্রা প্রাসাদ মূরগণের স্থপতি ও শিল্পচাতুর্য্যের অতি বিস্ময়কর দৃষ্টান্তস্থল। এতদ্ভিন্ন মোস্লেমগণের সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি বিশেষ প্রশংসনীয় ছিল। স্পেন স্বভাবতঃই অত্যন্ত উর্ব্বর সুতরাং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি ; তাহার উপর মূরজাতির অধ্যবসায় এবং কলাকুশলতা মিলিত হইয়া, সমগ্র রাজ্যটী একটী পরম রমণীয় বিচিত্র কাননে পরিণত করিয়া তুলিয়াছিল। গোয়াডিয়ানা এবং গোয়াডলকুইভার নদীদ্বয়ের উভয়কূলে যে সকল অতুলনীয় নগর নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেগুলি অধুনা নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াও প্রাচীন মূরকীর্ত্তির সমুজ্জ্বল স্মৃতিমহিমা অদ্যাপি কীর্ত্তন করিতেছে। তদানীন্তন রাজ্যসমূহের মধ্যে গ্রাণাডাই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক উৎকর্ষিত হইয়াছিল। ইহা দৈর্ঘ্যে কিঞ্চিদধিক একশত ক্রোশ এবং প্রস্থে তাহার একতৃতীয়াংশ মাত্র ; কিন্তু এই ক্ষুদ্র রাজ্যটী একটী বৃহৎ পরাক্রান্ত সমৃদ্ধিশালী সাম্রাজ্যে পরিগণিত ছিল। গ্রাণাডায় ত্রিশটী বৃহৎ নগর, ৮০টী দুর্গ, এবং কয়েক সহস্র ক্ষুদ্র নগর ছিল। কথিত আছে, একমাত্র গোয়াডল্কুইভার নদীর উভয়তীর, শেষোক্ত প্রকার দ্বাদশ সহস্র ক্ষুদ্র নগরে পরিশোভিত ছিল।

তুষারাবৃত "মিরানেভেজ" (চন্দ্রগিরি) গিরিশ্রেণীর পাদমূলে, বিশাল "ভেগা" প্রান্তরের উপকূলে গ্রাণাডারাজ্যের রাজধানী গ্রাণাডা মহানগরী অবস্থিত। ইহারই এক প্রান্তে মূরকীর্ত্তিমুকুটের উজ্জ্বলতম রত্ন আল্হাম্রা প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার অভ্রভেদী চূড়া হইতে, বহুস্রোতস্বিনীসলিলধৌত দ্রাক্ষানারঙ্গকাননপূর্ণ, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিরশ্যামল কুসুমকুঞ্জ-সমন্বিত সেই বিস্তীর্ণ "ভেগার" মনোহর শোভা নয়নগোচর হয়। সুশীতল মৃদুসমীরণ, চিরহিমাবৃত "চন্দ্রগিরি"-শিখর হইতে অবতীর্ণ হইয়া, "ভেগা" খণ্ডের প্রফুল্ল কুসুমরাজির সৌরভ-ভার বহন করিতে করিতে লোহিত প্রাসাদের সুপ্রশস্ত গবাক্ষ-পথে প্রবিষ্ট হইয়া, নিদাঘপ্রখর উষ্ণ মধ্যাহ্নও মাধবীসন্ধ্যার ন্যায় সুখশীতল করিয়া তুলে।

আল্হাম্‌রা প্রাসাদ একটী অসমতল উচ্চভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার চতুষ্পার্শ্বে অত্যুচ্চ দুর্ভেদ্য প্রাচীর, এবং স্থানে স্থানে দৃঢ় দুর্গদ্বারা সুসংরক্ষিত। উত্তরে দারো নদী, ইহার পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত

হইতেছে। আল্‌হাম্‌রার অনেক

সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। লোহিত এবং বাসন্তী

প্রকাণ্ড দুর্গ ভেদ করিয়া, এই দ্বার আল্‌হামরা অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। মূরখলিফাগণ এই "ন্যায়দ্বারে" বিচারাসনে উপবিষ্ট হইতেন। এই পথে প্রাসাদে প্রবেশ করিলে, সম্মুখে একটী চতুষ্কোণ প্রাঙ্গন নয়নগোচর হয়। তাহার পর সুন্দর মার্টলপুঞ্জে সুশোভিত মার্টল-প্রাসাদ। এই রমণীয় প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া একটী সঙ্কীর্ণপথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, প্রায় শতহস্ত দীর্ঘ এবং তদর্দ্ধপরিমিত প্রস্থ একটী সুদৃশ্য প্রাঙ্গন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার মধ্যস্থলে সুবর্ণমৎস্য-পরিপূর্ণ একটী জলাশয় আছে; এবং যখন বালসূর্য্যরশ্মিজাল সেই সকল ক্রীড়ারত মৎস্যগাত্র হইতে প্রতিলক্ষিত হইতে থাকে, তখন এক অতি অনির্ব্বচনীয় দৃশ্য প্রকটিত হয়। নানাকারুকার্য্যখচিত এবং বিচিত্র চিত্রে শোভিত স্তম্ভসমূহে প্রাঙ্গনটী বেষ্টিত; ইহার উত্তরে চতুষ্কোণ কোমারিস দুর্গ ঊর্দ্ধমুখে গগনমণ্ডল চুম্বন করিতে উদ্যত হইয়াছে।

আলহামরার এই অংশ প্রগাঢ় শান্তিময়; এত নিস্তব্ধ যে, বহির্জগতের অস্তিত্বমাত্রও এস্থানে অনুমিত হয় না। ক্ষুদ্র একটী জলস্রোত নিঃশব্দে অতি মৃদুগতি জলাশয়ে প্রবেশ করে, এবং তদ্রূপ নিঃশব্দে ভিন্নপথে পুনরায় চলিয়া যায়। সমীরণের মৃদুতম একটী হিল্লোল আসিয়া এ স্থানের লতাপত্রাদি এক বিন্দু কম্পিত করিতে সাহসী হয় না;—কীটপতঙ্গের উল্লাসরবের ক্ষীণতম একটী কম্পনও এ নীরবতা ভেদ করিতে পারে না; এস্থান এমনি নিস্তব্ধ! চারিদিক্ যেন এক অচিন্ত্যনীয় গম্ভীর-স্তব্ধরাজ্য;—কিন্তু তাই বলিয়া এ নিস্তব্ধতার মধ্যে ধ্বংস ও মৃত্যুর নিদারুণ বিভীষিকার ছায়া অনুভূত হয় না। শতাব্দীর পর শতাব্দী জগতের শত শত কীর্ত্তিরাশি বহন করিয়া কালগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এ প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষও সেই প্রাচীনকালের মাহাত্ম্য-মুকুট শিরে পরিয়া অদ্যাপি দণ্ডায়মান রহিয়াছে;—সর্ব্বগ্রাসী কালের সহিত শত শত বর্ষ যুদ্ধ করিতে করিতে বিক্ষতদেহ এবং নষ্ট-সৌন্দর্য্য হইয়াও সে যেন তাহার প্রাণের অস্তিত্বটুকু জ্ঞাপন করিবার জন্য সদাসর্ব্বদা ব্যগ্র হইয়া রহিয়াছে।

রাজসভাগৃহে প্রবেশ করিলে মনে হয়, যেন অদূরে বহুকীর্ত্তিপ্রথিত

তৎকালে স্পেন ভিন্ন ইউরোপের অন্য কোন প্রদেশে দৃষ্ট হইত না। একমাত্র গ্রাণাডা নগরেই সপ্ততি সংখ্যক বৃহৎ বৃহৎ সাধারণ পাঠাগার সপ্তদশটী উচ্চবিদ্যালয়, এবং দ্বিশতাধিক প্রবেশিকা বিদ্যালয় ছিল। পণ্ডিত-প্রসূ ফর্দ্দভা নগরে যে সকল সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কিঞ্চিন্ন্যূন তিন শত নাম, অষ্টাদশ শতাব্দীর জনৈক বিখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিত* সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁদিগেরই প্রবল প্রতিভা-প্রসূত পঞ্চলক্ষাধিক মূল্যবান গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি, ফর্দ্দভায় বিশাল পুস্তকালয়ের কলেবর, এবং সমগ্র ইউরোপখণ্ডের জ্ঞানযোগী ছাত্র-মণ্ডলীর মস্তিষ্ক পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন অসংখ্য বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বজ্জনের বিরচিত গ্রন্থরাশিতে, গ্রাণাডা, মালাগা, প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকালয়গুলি পরিপূর্ণ ছিল। এই সকল বিদ্যালয় ও পুস্তকালয় হইতে নির্ম্মল জ্যোতিঃ জ্ঞানসূর্য্য উত্থিত হইয়া ইউরোপীয় সভ্যতা এবং উন্নতির প্রভাতাকাশে সমুদিত হইয়াছিল; এবং ইহারই অপূর্ব্ব অক্ষয় শুভ্রালোক সমগ্র পাশ্চাত্য প্রদেশের কুসংস্কার এবং অজ্ঞানতায় ঘোরান্ধকার বিদূরিত করিয়া জ্ঞান ও সভ্যতার গৌরবান্বিত পথ উদ্ভাসিত করিয়াছিল।

কোন প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, ইউরোপের অধুনাতন একান্ত প্রয়োজনীয় নিত্য ব্যবহার্য্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির অধিকাংশ মূরীয় স্পেনের বিজ্ঞানক্ষেত্রেই প্রথম অঙ্কুরিত হইয়াছিল। তড়িদ্গর্ভ-তারসহযোগে সংবাদ প্রেরিত হইতে পারে, এবং ভারযুক্ত দোলকের দ্বারা সময়নিরূপণ করা যায়, এ সকল স্পেনীয় মোস্লেমগণই প্রথম লক্ষ্য করিয়াছিলেন। শুনা যায়,

* সম্ভবতঃ কাসিরি।

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কথা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মূরীয় বৈজ্ঞানিক-গণের নিকট নাকি অবিদিত ছিল না। ভৈষজ্য এবং অস্ত্র-চিকিৎসা শাস্ত্রেও মোস্লেমগণ অশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। কর্দ্দভানগরে মুসলমান-স্ত্রীচিকিৎসকেরও অভাব ছিল না।

স্ত্রীশিক্ষায় স্পেনীয় মুসলমানগণ আধুনিক সভ্যতা-শিখরচারী ইউরোপ অথবা আমেরিকাবাসিগণ অপেক্ষা কোন ক্রমেই ন্যূন ছিলেন না। তাঁহারা সম্ভ্রান্ত মহিলাগণকে গভীর জ্ঞানানুশীলনে উৎসাহিত করিতেন। আরব্যসাহিত্য-উদ্যানে নাজহান, জয়নাব, হানদা, হাফসা, কানাইয়া, সাফিয়া, মেরিয়া প্রভৃতি বিদূষী মূর-রমণীবৃন্দের নাম অনন্তকাল প্রস্ফুটিত ও সৌরভে পরিপূর্ণ রহিবে। ইঁহাদিগের কেহ প্রথিতযশা কবি, কেহ সাহিত্যেতিহাসে সুপণ্ডিতা, কেহ অদ্বিতীয়া বক্তা, কেহ বা গণিত-বিজ্ঞানে পারদর্শিনা ছিলেন। তৎকালে সুলতানগণের অন্তঃপুর হইতে সময়ে সময়ে রাজনীতিকুশলা দুই একটী প্রতিভাশালিনী রমণীর প্রভাবও পরিলক্ষিত হইত।

কিন্তু গভীর দুঃখের বিষয় এই যে, মোস্লেমগণ দীর্ঘ ৮০০ বৎসরকাল স্পেনে বসিয়া যে কঠোর জ্ঞানানুশীলন করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা শুধু স্পেন ভিন্ন অন্যান্য পাশ্চাত্য প্রদেশের সকলগুলিই, নবালোকিত জ্ঞান ও সভ্যতার মহাপথে অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজিত ও উৎসাহিত হইয়াছিল, কিন্তু যে স্পেনরাজ্যের বক্ষঃস্থল হইতে এক সময়ে নির্ম্মল-সলিলা বিদ্যাস্রোত-সমূহ উত্থিত হইয়া, ইউরোপের আধুনিক বিশাল জ্ঞানসাগরের সৃষ্টি সূচিত করিয়াছিল, কুসংস্কারাসক্ত এবং জ্ঞান-হীনতার গৌরবানুভবকারী সেই স্পানিয়ার্ডগণ, তাহার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া, মূরজাতির সহিত তাহাদিগের সমুন্নত বিদ্যাগৌরব চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইল। স্পানিয়ার্ড-গণ তাহাদের জ্ঞানগুরু মোস্লেমজাতিকে বিতাড়িত করিয়া কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহা বিখ্যাত ঐতিহাসিক Stanley Lane-Poole তাঁহার Moors in Spain নামক গ্রন্থে, অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

মোস্লেমশাসনাধীনে স্পেন যে শুধু দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য লইয়াই ব্যস্ত ছিল, এমত নহে; কলাবিদ্যায়ও স্পেন অতি আশ্চর্য্য উৎকর্ষ

লাভ করিয়াছিল। এই প্রবন্ধে বর্ণিতব্য আল্‌হাম্‌রা প্রাসাদ মূরগণের স্থপতি ও শিল্পচাতুর্য্যের অতি বিস্ময়কর দৃষ্টান্তস্থল। এতদ্ভিন্ন মোস্লেমগণের সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি বিশেষ প্রশংসনীয় ছিল। স্পেন স্বভাবতঃই অত্যন্ত উর্ব্বর সুতরাং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি ; তাহার উপর মূরজাতির অধ্যবসায় এবং কলাকুশলতা মিলিত হইয়া, সমগ্র রাজ্যটী একটী পরম রমণীয় বিচিত্র কাননে পরিণত করিয়া তুলিয়াছিল। গোয়াডিয়ানা এবং গোয়াডলকুইভার নদীদ্বয়ের উভয়কূলে যে সকল অতুলনীয় নগর নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেগুলি অধুনা নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াও প্রাচীন মূরকীর্ত্তির সমুজ্জ্বল স্মৃতিমহিমা অদ্যাপি কীর্ত্তন করিতেছে। তদানীন্তন রাজ্যসমূহের মধ্যে গ্রাণাডাই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক উৎকর্ষিত হইয়াছিল। ইহা দৈর্ঘ্যে কিঞ্চিদধিক একশত ক্রোশ এবং প্রস্থে তাহার একতৃতীয়াংশ মাত্র ; কিন্তু এই ক্ষুদ্র রাজ্যটী একটী বৃহৎ পরাক্রান্ত সমৃদ্ধিশালী সাম্রাজ্যে পরিগণিত ছিল। গ্রাণাডায় ত্রিশটী বৃহৎ নগর, ৮০টী দুর্গ, এবং কয়েক সহস্র ক্ষুদ্র নগর ছিল। কথিত আছে, একমাত্র গোয়াডল্‌কুইভার নদীর উভয়তীর, শেষোক্ত প্রকার দ্বাদশ সহস্র ক্ষুদ্র নগরে পরিশোভিত ছিল।

তুষারাবৃত "মিয়ানেভেজ" (চন্দ্রগিরি) গিরিশ্রেণীর পাদমূলে, বিশাল "ভেগা" প্রান্তরের উপকূলে গ্রাণাডারাজ্যের রাজধানী গ্রাণাডা মহানগরী অবস্থিত। ইহারই এক প্রান্তে মূরকীর্ত্তিমুকুটের উজ্জ্বলতম রত্ন আল্‌হাম্‌রা প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার অভ্রভেদী চূড়া হইতে, বহুস্রোতস্বিনীসলিলধৌত দ্রাক্ষানারঙ্গকাননপূর্ণ, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিরশ্যামল কুসুমকুঞ্জ-সমন্বিত সেই বিস্তীর্ণ "ভেগার" মনোহর শোভা নয়নগোচর হয়। সুশীতল মৃদুসমীরণ, চিরহিমাবৃত "চন্দ্রগিরি"-শিখর হইতে অবতীর্ণ হইয়া, "ভেগা" খণ্ডের প্রফুল্ল কুসুমরাজির সৌরভ-ভার বহন করিতে করিতে লোহিত প্রাসাদের সুপ্রশস্ত গবাক্ষ-পথে প্রবিষ্ট হইয়া, নিদাঘপ্রখর উষ্ণ মধ্যাহ্নও মাধবীসন্ধ্যার ন্যায় সুখশীতল করিয়া তুলে।

আল্‌হাম্‌রা প্রাসাদ একটী অসমতল উচ্চভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার চতুষ্পার্শ্বে অত্যুচ্চ দুর্ভেদ্য প্রাচীর, এবং স্থানে স্থানে দৃঢ় দুর্গদ্বারা

হইতেছে। আল্‌হাম্‌রার অনেকগুলি প্রবেশদ্বার; তন্মধ্যে "ন্যায়দ্বার" সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। লোহিত এবং বাসন্তী বর্ণে সুরঞ্জিত একটী প্রকাণ্ড দুর্গ ভেদ করিয়া, এই দ্বার আল্‌হামরা অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। মূরখলিফাগণ এই "ন্যায়দ্বারে" বিচারাসনে উপবিষ্ট হইতেন। এই পথে প্রাসাদে প্রবেশ করিলে, সম্মুখে একটী চতুষ্কোণ প্রাঙ্গন নয়নগোচর হয়। তাহার পর সুন্দর মার্টলপুঞ্জে সুশোভিত মার্টল-প্রাসাদ। এই রমণীয় প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া একটী সঙ্কীর্ণপথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, প্রায় শতহস্ত দীর্ঘ এবং তদর্দ্ধপরিমিত প্রস্থ একটী সুদৃশ্য প্রাঙ্গন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার মধ্যস্থলে সুবর্ণমৎস্য-পরিপূর্ণ একটী জলাশয় আছে; এবং যখন বালসূর্য্যরশ্মিজাল সেই সকল ক্রীড়ারত মৎস্যগাত্র হইতে প্রতিলক্ষিত হইতে থাকে, তখন এক অতি অনির্ব্বচনীয় দৃশ্য প্রকটিত হয়। নানাকারুকার্য্যখচিত এবং বিচিত্র চিত্রে শোভিত স্তম্ভসমূহে প্রাঙ্গনটী বেষ্টিত; ইহার উত্তরে চতুষ্কোণ কোমারিস দুর্গ ঊর্দ্ধমুখে গগনমণ্ডল চুম্বন করিতে উদ্যত হইয়াছে।

আলহামরার এই অংশ প্রগাঢ় শান্তিময়; এত নিস্তব্ধ যে, বহির্জগতের অস্তিত্বমাত্রও এস্থানে অনুমিত হয় না। ক্ষুদ্র একটী জলস্রোত নিঃশব্দে অতি মৃদুগতি জলাশয়ে প্রবেশ করে, এবং তদ্রূপ নিঃশব্দে ভিন্নপথে পুনরায় চলিয়া যায়। সমীরণের মৃদুতম একটী হিল্লোল আসিয়া এ স্থানের লতাপত্রাদি এক বিন্দু কম্পিত করিতে সাহসী হয় না;—কীটপতঙ্গের উল্লাসরবের ক্ষীণতম একটী কম্পনও এ নীরবতা ভেদ করিতে পারে না; এস্থান এমনি নিস্তব্ধ! চারিদিক্ যেন এক অচিন্ত্যনীয় গম্ভীর স্তব্ধরাজ্য;—কিন্তু তাই বলিয়া এ নিস্তব্ধ-তার মধ্যে ধ্বংস ও মৃত্যুর নিদারুণ বিভীষিকার ছায়া অনুভূত হয় না। শতাব্দীর পর শতাব্দী জগতের শত শত কীর্ত্তিরাশি বহন করিয়া কালগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এ প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষও সেই প্রাচীনকালের মাহাত্ম্য-মুকুট শিরে পরিয়া অদ্যাপি দণ্ডায়মান রহিয়াছে;—সর্ব্বগ্রাসী কালের সহিত শত শত বর্ষ যুদ্ধ করিতে করিতে বিক্ষতদেহ এবং নষ্টসৌন্দর্য্য হইয়াও সে যেন তাহার প্রাণের অস্তিত্ব-টুকু জ্ঞাপন করিবার জন্য সদাসর্ব্বদা ব্যগ্র হইয়া রহিয়াছে।

রাজসভাগৃহে প্রবেশ করিলে মনে হয়, যেন অদূরে বহুকীর্ত্তিপ্রথিত

মূরসম্রাট্ রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া নীরবে আপনার প্রাচীন মহিমা বিস্তার করিতেছেন, এবং তাঁহার সভাসদ্‌গণ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া তেমনি নীরবে তাঁহার পুরাতন কীর্ত্তিকলাপ সকরুণ ছন্দে গাহিয়া যাইতেছেন! সে কি অপূর্ব্ব গভীর কল্পনাগর্ভ স্মৃতিবিদারক নিস্তব্ধতা! মুহূর্ত্তের জন্য সে চিত্র মানসচক্ষে অঙ্কিত করিলে, নিমেষ মধ্যে শত শত বর্ষ পুরাতন মোস্লেমসৌভাগ্য-সূর্য্যের মধ্যাহ্নকিরণপ্রতাপে কল্পনা-প্রস্রবণ অবশচিত্ত ঝল্‌সিয়া যায়!

উপরোক্ত বিশাল প্রকোষ্ঠের প্রাচীরগাত্রে কারুকার্য্যখচিত নানাবর্ণের বহুমূল্য প্রস্তরসমূহ গ্রথিত রহিয়াছে; তদুপরি গগনস্পর্শী অর্দ্ধমণ্ডলাকৃতি ছত্রতল, সুচিত্রিত গ্রহতারাদি লইয়া, যেন অনন্ত আকাশমণ্ডলের অনুকরণেচ্ছায় বিপুল দেহ বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। সুদৃশ্য সুপ্রশস্ত গবাক্ষশ্রেণী কক্ষটী আলোকিত করিতেছে; এই সকল গবাক্ষের মধ্যে প্রবাদনির্দ্দিষ্ট একটীর নিকটবর্ত্তী হইয়া সম্মুখস্থ দারো নদীর স্থূল রজতরেখার উপর মুগ্ধদৃষ্টি ক্ষণকাল আবদ্ধ রাখিলে, স্মৃতি মন্থন করিয়া শত শত অতীত ঘটনার স্পষ্টচ্ছায়া চক্ষুর সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া যায়। মনে হয়, পাঁচশত বর্ষ পূর্ব্বে সম্রাজ্ঞী আয়েষা তাঁহার শিশু-পুত্র কুমার আবু আবদুল্লাকে এই গবাক্ষপথে কৌশলে নিম্নে অবতারণ করাইয়া,—বুঝি সে দেব-বাঞ্ছিত রাজ্য-সম্পদ্ ভবিষ্যতে তাঁহারই দুই হাত দিয়া নষ্ট করাইবার জন্য—একদিন গুপ্তহন্তার হস্ত হইতে তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন।* আবার যখন মনে পড়ে, এই আবদুল্লাকে লক্ষ্য করিয়া সহৃদয় সম্রাট পঞ্চম চার্লস্ একদিন গভীর সহানুভূতির সহিত কহিয়াছিলেন,—"যাহার হস্ত হইতে এ অসীম সম্পদ্ চিরদিনের জন্য স্খলিত হইয়া গিয়াছে, হায়, সে কত না দুর্ভাগ্য।" —তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে বলিতে ইচ্ছা করে—"হায়, সেই গুপ্তহন্তার হস্তে কেন এ হতভাগ্য শিশুকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল না!" আবার যখন মূরসুলতানগণের সম্পদ্‌গৌরবের কথা চিত্ত হইতে ক্রমে অপসৃত হইয়া, পরবর্ত্তী ইসাই রাজত্বকালের দুই

* আবু আবদুল্লা (বুআবদিল্) গ্রাণাডার শেষ মূরসম্রাট্। বাল্যকালে ইহাঁকে নিহত করিবার জন্য প্রাসাদে একটী ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। মাতা সম্রাজ্ঞী আয়েষা বর্ণিত উপায়ে ইহাঁর প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন।

একটী চিত্র উদিত হইতে থাকে, তখন সহসা মনে পড়িয়া যায়, স্বনামধন্য মহাত্মা কলম্বস্ তাঁহার কল্পিত নূতন পৃথিবী আবিষ্কারার্থ একদিন সম্রাজ্ঞী ইসাবেলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিফলমনোরথ হইয়া, কোন বিদেশীয় সহৃদয় নরপতির নিকট আবেদন করিবার কথা কল্পনা করিতে করিতে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, সেও এই ঐতিহাসিক গবাক্ষেরই সম্মুখ দিয়া !

অপ্রশস্ত চূর্ণিত সোপানপথে উল্লিখিত প্রকোষ্ঠের উচ্চ শিখরদেশে আরোহণকালে মনে হয়, ভেগাপ্রান্তরে কোন যুদ্ধ হইবার সময়ে সৈন্যগণের গতিবিধিদর্শনমানসে কত সুন্দরী রাজকন্যা, এবং কত বীরশ্রেষ্ঠ রাজপুত্র এই সোপান অতিক্রম করিয়া প্রসাদ-শীর্ষে আরোহণ করিতেন, আর সুন্দরীগণের সুকোমল চরণস্পর্শে এ সোপানাবলী কত মৃদুমধুর শব্দ করিত, এবং বীরপুরুষগণের পদভরে গৌরবান্বিত হইত ! শীর্ষদেশ হইতে ভেগার বিশালবক্ষে দৃষ্টি স্থাপিত করিলে, তাহার কোন্ কোন্ অংশে পুরাকালে, ইসাই এবং মোস্লেইগণ আল্‌হাম্‌রার অধিকার লইয়া বারবার সমরে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা প্রবাদবাক্যদ্বারা নির্দ্ধারিত করিবার জন্য চিত্ত ব্যগ্র হইয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে সেই বহুপুরাতন জনশ্রুতিগুলি স্মরণ করাইয়া দেয় যে, সম্রাজ্ঞী ইসাবেলা একবার কলম্বসের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া, পুনরায় তাঁহাকে ডাকিয়া আনাইবার জন্য যে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, সে ত ঐ স্থানে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া, দেশত্যাগোন্মুখ ভগ্নহৃদয় কলম্বস্‌কে ফিরাইয়া আনিয়াছিল ! প্রচলিত প্রবাদ মাত্রেই এ সকল ঐতিহাসিক স্থান চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে ; কিন্তু তাহাতে কি আসে-যায় ? এই কিম্বদন্তীগুলি আল্‌হাম্‌রার এক একটী প্রধান অঙ্গ স্বরূপ, কেননা ইহারা আল্‌হাম্‌রার অনন্ত সৌন্দর্য্য, একটী কল্পনা-মুখর গাম্ভীর্য্যে, এবং একটী বিচিত্র রহস্যময় ইন্দ্রজালে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে।

অতীত স্মৃতির এই নিভৃত প্রিয় আবাসভূমি পশ্চাতে রাখিয়া আল্‌হাম্‌রার আরও অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, মুরসুলতানাগণের অন্তঃপুর প্রাপ্ত হওয়া যায়। তত্রত্য গবাক্ষপথে ভেগাপ্রান্তরের নয়নাভিরাম শ্যামল-শোভা, দুরত্বনিবন্ধন অত্যন্ত মনোহর বলিয়া অনুভূত হয়। এ অন্তঃপুরের কক্ষগুলির তলদেশ তুষারধবল মর্ম্মরে

মণ্ডিত। ইহার প্রত্যেকটীর দ্বারসন্নিধানে কক্ষতলে কতকগুলি করিয়া সঙ্কীর্ণ ছিদ্র আছে। শুনা যায়, ইহার নিম্নদেশে নানাজাতীয় গন্ধদ্রব্য প্রজ্জ্বলিত হইত, এবং তদুত্থিত সুরভি ধূম্ররাজি ঐ সকল রন্ধ্রপথে সুলতানাগণের কক্ষসমূহে প্রবিষ্ট হইয়া, সমস্ত অন্তঃপুর এক স্বর্গীয় পরিমলে আমোদিত করিয়া তুলিত। এই প্রবাদ হইতে প্রাচীন মুরজাতির বিলাসিতার কথঞ্চিৎ আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রত্যেক কক্ষে, এক একখানি বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড হইতে খোদিত এক একটী স্নানাগার; এগুলি বিচিত্র বর্ণে ও কারুকার্য্যে সুচিত্রিত, এবং গোলাপ ও নক্ষত্রাকৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে আলোকিত। অন্তঃপুরের মধ্যে একটী কুসুমিতলতাগুল্মশোভিত প্রস্তরময় ক্ষুদ্র প্রাঙ্গন দৃষ্ট হয়। ইহারও একপার্শ্বে কতকগুলি স্নানাগার রহিয়াছে। এ স্নানাগারগুলিতে যে চিত্রনৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা অতীব বিস্ময়জনক। সুলতানাদিগের স্নানকালে এবং স্বর্ণশয্যায় বিশ্রামকালে তাঁহাদিগের চিত্ত-বিনোদনার্থ যখন গীতবাদ্য হইত, তখন এই প্রাঙ্গনমধ্যস্থিত একটী উৎস হইতে তাহার সহিত তালে তালে শ্রুতিমধুর সলিলকল্লোল উত্থিত হইত।

আল্‌হাম্‌রার সিংহ-প্রাসাদই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও প্রসিদ্ধ। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ সৌন্দর্য্য যেন তিল তিল করিয়া এই প্রাসাদে মাখাইয়া রাখিয়াছে। পূর্ব্ব-বর্ণিত মার্টলপ্রাসাদ অপেক্ষা ইহার আয়তন কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্রতর। ১২৮টী মর্ম্মরস্তম্ভে সিংহপ্রাসাদ সুশোভিত। ইহার প্রাঙ্গনে একটী বৃহৎ শূন্যজলপাত্রের উপর দ্বাদশটী সিংহের প্রস্তরমূর্ত্তি সজ্জিত রহিয়াছে বলিয়া, ইহার নাম সিংহ-প্রাসাদ। এক সময়ে এই দ্বাদশটী সিংহমুখনিঃসৃত সুবাসিত সলিলে শূন্যপাত্রটী সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকিত। অন্যগুলির ন্যায় এ প্রাসাদ তেমন উচ্চ না হইলেও, ইহার বিচিত্র নির্ম্মাণপ্রণালী, অমলধবল স্তম্ভশ্রেণীর গঠনপারিপাট্য, এবং সুনিপুণ শিল্পী-চিত্রিত স্বর্ণ ও অন্যান্য বিবিধ বর্ণের চিত্ররাজির ধ্বংসাবশেষেরও অদ্ভুত পরিস্ফুটত্ব, প্রথম দর্শনে ইহাকে কল্পনাসর্ব্বস্ব কবির স্বপ্নদৃষ্ট কোন পরীরাজ্যের সুন্দরী রাজকন্যাদিগের বিলাসপ্রাসাদের ছায়ামাত্র বলিয়া সহসা ভ্রম জন্মাইয়া দেয়।

উপরোক্ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সিংহপ্রাসাদ উত্তীর্ণ হইলে, একটী অসংখ্য

মণিরত্নভূষিত বিচিত্রগঠন দ্বারপথে বৃহৎ প্রকোষ্ঠান্তরে প্রবেশ করিতে হয়। প্রবাদ আছে, এই স্থানে আল্‌হাম্‌রা প্রাসাদের শেষ প্রদীপ সুল-তান আবু আব্দুল্লার আদেশানুসারে, বনিসেরাজবংশীয় প্রধান ব্যক্তিগণের শিরচ্ছেদন করা হইয়াছিল।* এই জনশ্রুতির সত্যতা প্রমাণার্থ অসন্দিগ্ধচিত্ত দর্শকবৃন্দকে রক্তচিহ্নিত কয়েকটী স্থান অদ্যাপি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। কিন্তু এ বিশাল কক্ষটী এত অনন্ত প্রশান্ত সৌন্দর্য্যের আধার যে, কথনও এপ্রকার ভয়াবহ ঘটনা এ স্থানে সংঘটিত হইয়াছিল, এ কথা হৃদয়ে স্থান দিতে বিন্দুমাত্রও প্রবৃত্তি হয় না। অথবা হতভাগ্য আবু আবদুল্লার স্মৃতির সহিত চিরকাল এ ঘোর কলঙ্ক জড়িত থাকিবে, এ কথায় আমাদের প্রাণে এক গভীর বেদনাক্লিষ্ট করুণ সন্দেহের উদয় না হইয়া যায় না।

আল্‌হাম্‌রার প্রত্যেক ক্ষুদ্রাংশ তন্ন তন্ন করিয়া বর্ণনা করিতে গেলে, প্রবন্ধের কলেবর অযথা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং ইহার অন্তর্গত কানন-প্রাসাদ "জেনেরালিফের" ভগ্নাবশেষের একটী সংক্ষিপ্ত চিত্র পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াই প্রবন্ধ সমাপন করিব। আলহাম্‌রা হইতে একটী সরলপথ বহির্গত হইয়া, "লসমলিনস" নাম্নী ক্ষুদ্র একটী স্রোতস্বিনীর উপর দিয়া জেনেরালিফে প্রবেশ করিয়াছে। এই কাননটী গবাক্ষবিহীন অত্যুচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল, কিন্তু ধ্বংসপ্রিয় কালের প্রভাবে তাহা ক্রমে খসিয়া পড়িতেছে। প্রাচীরগাত্রস্থ আরবীয় শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শনগুলি বিলীন হইয়া যাইতেছে; মূরীয় ভাস্করবিদ্যার লুপ্তপ্রায় শেষচিহ্নগুলি এক্ষণে কচিৎ দৃষ্ট হয়; সুবাসিত সলিলগর্ভ উৎসগুলি চিরনিস্তব্ধতায় নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে; আর সে প্রাসাদবাটিকার সৌন্দর্য্যরাশি ত অধুনা বিস্মৃত-প্রায় জনশ্রুতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু জেনেরালিফের অভ্যন্তরস্থ নয়ন-রঞ্জন চিরশ্যামল লতাপত্রের প্রাচুর্য্য, পরিমলবাহী মৃদুসমীরণের ক্রীড়া, এবং নিস্পন্দবক্ষ নির্ম্মল জলাশয়সমূহে অনন্ত নীলাকাশের নীল প্রতিবিম্বের

---

* আবু আবদুল্লার রাজত্বকালে জেগ্রিস্‌ ও বনিসয়োজ বংশদ্বয়ের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়। পরে বনিসেরাজীগণ কুচক্রে নিহত হন। ইহারা আবু আবদুল্লার মাতা সম্রাজ্ঞী আয়েষার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। আবু আবদুল্লা স্বয়ং যে উক্ত হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে।

অন্তরালে, প্রকৃতি তাহার সহজ সৌন্দর্য্যটুকু অদ্যাপি জীবিত রাখিয়াছে। একটী ক্ষুদ্র অথচ বেগবান জলস্রোত, শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত দীর্ঘ খাতের উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে; কোথায়ও বা সুকোমল লতামণ্ডিত বৃক্ষগুলি অবনতদেহ এই সুশুভ্র স্রোতোবক্ষের উপর শীতল ছায়া নিক্ষেপ করিতেছে; কোথায়ও বা নীলাকাশের নীলছায়া ধীরতরঙ্গিত স্রোতোবক্ষে প্রতিফলিত হইয়া মৃদু মৃদু কম্পিত হইতেছে; কোথায়ও বা ক্ষীণ শুভ্র স্রোতটী ঘুরিয়া ঘুরিয়া লতাকুঞ্জে প্রবেশ করিতে গিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। ইহার দ্রুতপ্রবাহিণী কুটিলগামিনী কলনাদিনী স্রোতস্বিনী ও প্রশান্তবক্ষ ক্ষুদ্রক্ষুদ্র জলাশয়, ইহার অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহের মধ্যাহ্নরবিকরোদ্ভাসিত ক্ষীণ রজত-রেখা ও সায়াহ্নকালের রক্তকিরণোজ্জ্বল ক্ষীণ কনকরেখা, ইহার উন্মুক্ত সূর্য্যালোকিত শ্যামল ভূখণ্ড ও প্রস্ফুটিত কুসুমবহুল লতাকুঞ্জের শীতল ছায়া, ইহার পূর্ণিমা রজনীর শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত ম্লানসৌন্দর্য্য এবং গভীর অন্ধকার রজনীর বিষাদগম্ভীর মর্ম্মকাতরতা,—প্রকৃতি যেন এ সমস্তই আপনার সুচারু হস্তে অতি আশ্চর্য্য নিপুণতার সহিত সাজাইয়া রাখিতে নিরন্তর ব্যগ্র। যখন মৃদুমন্দ প্রবাহিত সুশীতল সমীরণ এই সকল লতাপত্রের মধ্য দিয়া সর্ সর্ রবে প্রবাহিত হইয়া কল্পনাপ্রবণ দর্শকগণের শরীর রোমাঞ্চিত করিয়া দেয়, তখন মনে হয়, যেন প্রকৃতি সুগভীর দীর্ঘশ্বাসে জেনেরালিফের করুণ গীতি মুখরা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, ইহার অন্তর্নিহিত লুপ্তপ্রায় কীর্ত্তিস্মৃতিরাশি, কালের চিরবিস্মৃতিগর্ভ খরস্রোতের ক্রূরগ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুলপ্রাণে অনুনয় করিতেছে!

শ্রীইমদাদলহক্।

উদ্ভ্রান্ত প্রেমিক।

কি চাহ প্রেমিক পান্থ, একা এ প্রান্তরে?
নাহি হেথা বারিবিন্দু—স্নিগ্ধ সরোবর,
নাহি হেথা ছায়াতরু; প্রদীপ্ত অম্বরে
কেবল জ্বলিছে তেজে সহস্র ভাস্কর!
উত্তপ্ত বালুকারাশি; ভ্রান্ত মরীচিকা—
অনন্ত কুহক জাল! নিষ্ঠুর পবন
নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে আনে মৃত্যুর কণিকা,
জানিও এখানে হয় জীবন্ত দহন!
ফিরে যাও, ফিরে যাও, ত্যজ অভিমান,
পারিবেনা উত্তরিতে এ ভীম প্রান্তর;
আন গিয়ে সাধনার স্বর্গীয় বাতাস,
বহাও এ প্রেম মেঘে সাধনার ঝড়;—
এ মরু প্রান্তর তবে হইবে শীতল
সুন্দর ফলিবে শস্য—স্নিগ্ধ সুশ্যামল!

শ্রীশরৎ কুমার সেন গুপ্ত

"সেনাপতি কালী।"

বঙ্গ সাহিত্য-ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক গবেষণার মধুর হিল্লোল বহিয়াছে; বসন্ত-মলয় যেরূপ নানা ফুল্লফুলের সদ্য সুবাস সংগ্রহ করিয়া ব্যথিত হৃদয়কেও প্রফুল্ল করিয়া তুলে, আমাদের সংবাদ-পত্রসমূহও সেইরূপ সময়ে সময়ে নব নব তথ্য, নব নব গৌরবগাথা পাঠকমণ্ডলীকে উপহার দিয়া, তাহাদের শ্লথ হৃদয়তন্ত্রীকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতেছে। আমরাও বিবিধ রহস্যময় সরস সাহিত্যের সেবা করিয়া, বিরস নিদ্রালস চিত্তকে উৎফুল্ল করিবার অবসর পাইতেছি। আমাদের মানস-রাজ্যের প্রাচীর-দ্বারে বাঙ্গালী-গৌরবের যে ক্ষীণালোক-ভাতি রক্তিম-রাগে ক্রমে ক্রমে দিগ্বলয় অতিক্রম করিবার উপক্রম করিতেছে, তাহা যে একদিন দিগন্ত—প্রসারী রশ্মিজালে পরিণত হইয়া, আমাদিগকে সমুদ্ভাসিত, সঞ্জীবিত ও সমুন্নত করিবে—সে আশা আমরা কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারি না।

এক্ষণে বাঙ্গালীর পূর্ব্বগৌরবের কোনও নূতন সংবাদ প্রচারিত হইলে, তদ্বিষয়ক সত্যানুসন্ধিৎসা সাহিত্য সেবিগণের মনে জাগরিত হয়; বাঙ্গালীর উর্ব্বর-মস্তিষ্ক ও তীক্ষ্ণ প্রতিভা সময়ে সময়ে তাহার সাহায্য করে; হয়তঃ অল্পদিনেই প্রকৃত রহস্য উদ্ভিন্ন হয়, এবং অনেক প্রাসঙ্গিক তথ্যও লোকলোচনের পথবর্ত্তী হয়। সেই আশায় আমি একটী ক্ষুদ্র সংবাদ লইয়া পাঠকবর্গের সমীপে উপস্থিত হইতেছি। ইহার কোন অংশ যদি অসত্য বা কল্পনা-প্রসূত বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহাতে আমার তুষ্ট ব্যতীত ক্ষুণ্ণ হইবার কারণ থাকিবে না। কারণ সত্যালোক প্রদীপ্ত হইলে, অপরের সঙ্গে সঙ্গে আমারও ভ্রান্তি বিদূরিত হইবে। সত্যই আমাদের উপাস্য দেবতা।

বঙ্গেশ্বর মহারাজ প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কবিবর ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

যশোর নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম,
মহারাজ বঙ্গজ-কায়স্থ।
নাহি মানে পাতসায়, কেহ নাহি আটে তায়,
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ।
বরপুত্র ভবানীর, প্রিয়তম পৃথিবীর,
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী,
ষোড়শ হলকা হাতি অযুত তুরঙ্গী সাতি
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী।

এই কবিতার শেষ পংক্তিতে "সেনাপতি কালী" আছে; ইহার অর্থ সাধারণতঃ প্রায় সকলেই করেন যে যুদ্ধকালে অসুরমর্দ্দিনী ভগবতী কালী স্বয়ং মহারাজের সেনাপতির কার্য্য করিতেন। অথবা কালিকাদেবীর সশরীরে আবির্ভাবের কথা স্বীকার না করিলেও মহারাজ যে দেবীর কৃপায় জয়লাভ করিতেন—উদ্ধৃত কবিতার ভাবার্থে তাহাও হইতে পারে। কিন্তু কালিকাদেবীর প্রত্যক্ষ কৃপাই যদি জয়লাভের একমাত্র হেতু হয় তবে বায়ান্ন হাজার সৈন্য এবং অযুত হয়-হস্তির আবশ্যকতা কি, এবং মহারাজের বীরত্বেরই বা কি ব্যাখ্যা হইল, তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল না। কয়েক পংক্তি পূর্ব্বে কবি মহারাজকে ভবানীর বরপুত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং এই বর্ণনাই যথেষ্ট বলিয়া বোধ হয়। পুনরায় কালীকে সেনাপতি বলিয়া কীর্ত্তন করার প্রয়োজনীয়তা সম্যক উপলব্ধি করা যায় না। সে যাহা হউক, উপরোক্ত ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া ধরিয়া লইলেও, কাহারও কাহারও মনে এতদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হওয়া বিচিত্র নহে। বিশেষতঃ কবির উদ্দেশ্য সর্ব্বত্রই দুর্জ্ঞেয়। বাক্য বিশেষের এক প্রকার ব্যাখ্যা প্রচলিত থাকিলেও তাহার অন্যবিধ ব্যাখ্যা অসম্ভব নহে। আবার স্থান বিশেষে একটী সম্ভবপর নূতন

ব্যাখ্যা করিয়া যদি একটী নূতন ঐতিহাসিক সত্য প্রকাশিত করা যায়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি ?

যশোহর জেলার কোন কোন স্থানে উপরোক্ত বাক্যের একটী পৃথক্ ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। তদনুসারে "কালী" বলিতে দেবতাকে না বুঝাইয়া কালিদাস রায় নামক এক ব্যক্তিকে বুঝায়। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের যে অসংখ্য ঢালী সৈন্য ছিল, কালিদাস রায় তাহাদেরই সর্দ্দার বা অধিনায়ক ছিলেন। জনশ্রুতির উপর আস্থা স্থাপন করিলে, আমরা জানিতে পারি, যে কালিদাস প্রতাপাদিত্যের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন; তাঁহারই সাহায্যে মহারাজ প্রতাপ গঞ্জেলিস প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত পর্টুগীজ দস্যুদিগকে দমন করিয়াছিলেন; উপরোক্ত কবিতায় "সেনাপতি কালী" বলিতে সেনাপতি কালিদাস রায় চৌধুরীকেই বুঝায়। কেহ কেহ বলেন মদনমল্ল নামক এক ব্যক্তি প্রতাপের ঢালী সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন; কারণ একখানি ঘটক-কারিকায় আছে :—"সামন্ত মদনশ্চৈব ঢালীনাং পতি মল্লজঃ।" কিন্তু যাঁহার ঢালী সৈন্যের সংখ্যা বায়ান্ন হাজার বলিয়া প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের অধিনায়ক একজন ব্যতীত থাকিতে নাই, এরূপ ধারণা করাও বিফল। এক্ষণে কেহ বলিতে পারেন, যে কালিদাস মদনমল্লের নিম্ন পদস্থ ছিলেন; এবং তাহা যে নিতান্ত অসম্ভব এরূপও বলা যায় না। তবে কালিদাস জীবদ্দশায় "রাজা কালিদাস রায়" বলিয়া পরিচিত ছিলেন, এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সনন্দেও তিনি "রাজা" বলিয়া উল্লিখিত আছেন। এরূপ স্থলে তিনি যে একজন উচ্চপদস্থ এবং খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। এবং একজন মল্লজাতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা তাঁহার পদও উচ্চসংস্থিত ছিল, এ কল্পনাও নিতান্ত অসঙ্গত না হইতে পারে। যাহা হউক, বীরবর মদনমল্ল কে ও তাঁহার নিবাস কোথায় ছিল, তাহা অদ্যাবধি স্থিরীকৃত হয় নাই; কিন্তু কালিদাস সম্বন্ধে [illegible] জীবনকাহিনীর কথা সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে।

তাহা হইতে প্রতীত হইবে যে কালিদাস রায় একজন প্রভূত ক্ষমতাশালী পরাক্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন।

কালিদাস রায় দত্তবংশসম্ভূত দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ। ইঁহাদের পূর্ব্ব নিবাস বালীতে ছিল। তথা হইতে সম্ভবতঃ বিশ্বেশ্বর দত্ত বা তাঁহার কোন বংশধর বিঘটিয়া নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। বিশ্বেশ্বরের অধস্তন অষ্টম বংশধর শ্রীরাম রায় চৌধুরী চেঙ্গটিয়া পরগণার জমিদার ছিলেন। তাঁহারই সময় হইতে এতদ্বংশীয়দিগের "রায় চৌধুরী" উপাধি হয়। কালিদাস রায়ের পিতা কেশবরাম রায় উক্ত শ্রীরাম রায়ের ভ্রাতা কানাইদাস রায়ের পৌত্র। শ্রীরাম রায়ের বংশধরগণ এখনও যশোহরের অন্তর্গত সেখহাটি নামক স্থানে বাস করিতেছেন। কালিদাস রায়ের বংশলতিকা প্রদত্ত হইল :—

ব্যাখ্যা করিয়া যদি একটী নূতন ঐতিহাসিক সত্য প্রকাশিত করা যায়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি ?

যশোহর জেলার কোন কোন স্থানে উপরোক্ত বাক্যের একটী পৃথক্ ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। তদনুসারে "কালী" বলিতে দেবতাকে না বুঝাইয়া কালিদাস রায় নামক এক ব্যক্তিকে বুঝায়। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের যে অসংখ্য ঢালী সৈন্য ছিল, কালিদাস রায় তাহাদেরই সর্দ্দার বা অধিনায়ক ছিলেন। জনশ্রুতির উপর আস্থা স্থাপন করিলে, আমরা জানিতে পারি, যে কালিদাস প্রতাপাদিত্যের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন; তাঁহারই সাহায্যে মহারাজ প্রতাপ গঞ্জেলিস প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত পর্টুগীজ দস্যুদিগকে দমন করিয়াছিলেন; উপরোক্ত কবিতায় "সেনাপতি কালী" বলিতে সেনাপতি কালিদাস রায় চৌধুরীকেই বুঝায়। কেহ কেহ বলেন মদনমল্ল নামক এক ব্যক্তি প্রতাপের ঢালী সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন; কারণ একখানি ঘটক-কারিকায় আছে :—"সামন্ত মদনশ্চৈব ঢালীনাং পতি মল্লজঃ।" কিন্তু যাঁহার ঢালী সৈন্যের সংখ্যা বায়ান্ন হাজার বলিয়া প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের অধিনায়ক একজন ব্যতীত থাকিতে নাই, এরূপ ধারণা করাও বিফল। এক্ষণে কেহ বলিতে পারেন, যে কালিদাস মদনমল্লের নিম্ন পদস্থ ছিলেন; এবং তাহা যে নিতান্ত অসম্ভব এরূপও বলা যায় না। তবে কালিদাস জীবদ্দশায় "রাজা কালিদাস রায়" বলিয়া পরিচিত ছিলেন, এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সনন্দেও তিনি "রাজা" বলিয়া উল্লিখিত আছেন। এরূপ স্থলে তিনি যে একজন উচ্চপদস্থ এবং খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। এবং একজন মল্লজাতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা তাঁহার পদও উচ্চসংস্থিত ছিল, এ কল্পনাও নিতান্ত অসঙ্গত না হইতে পারে। যাহা হউক, বীরবর মদনমল্ল কে ও তাঁহার নিবাস কোথায় ছিল, তাহা অদ্যাবধি স্থিরীকৃত হয় নাই; কিন্তু কালিদাস সম্বন্ধে কতকগুলি প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে।

তাহা হইতে প্রতীত হইবে যে কালিদাস রায় একজন প্রভূত ক্ষমতা-শালী পরাক্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন।

কালিদাস রায় দত্তবংশসম্ভূত দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ। ইঁহাদের পূর্ব্ব নিবাস বালীতে ছিল। তথা হইতে সম্ভবতঃ বিশ্বেশ্বর দত্ত বা তাঁহার কোন বংশধর বিঘটিয়া নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। বিশ্বেশ্বরের অধস্তন অষ্টম বংশধর শ্রীরাম রায় চৌধুরী চেঙ্গটিয়া পরগণার জমিদার ছিলেন। তাঁহারই সময় হইতে এতদ্বংশীয়দিগের "রায় চৌধুরী" উপাধি হয়। কালিদাস রায়ের পিতা কেশবরাম রায় উক্ত শ্রীরাম রায়ের ভ্রাতা কানাইদাস রায়ের পৌত্র। শ্রীরাম রায়ের বংশধরগণ এখনও যশোহরের অন্তর্গত সেখহাটি নামক স্থানে বাস করিতেছেন। কালিদাস রায়ের বংশলতিকা প্রদত্ত হইল :—
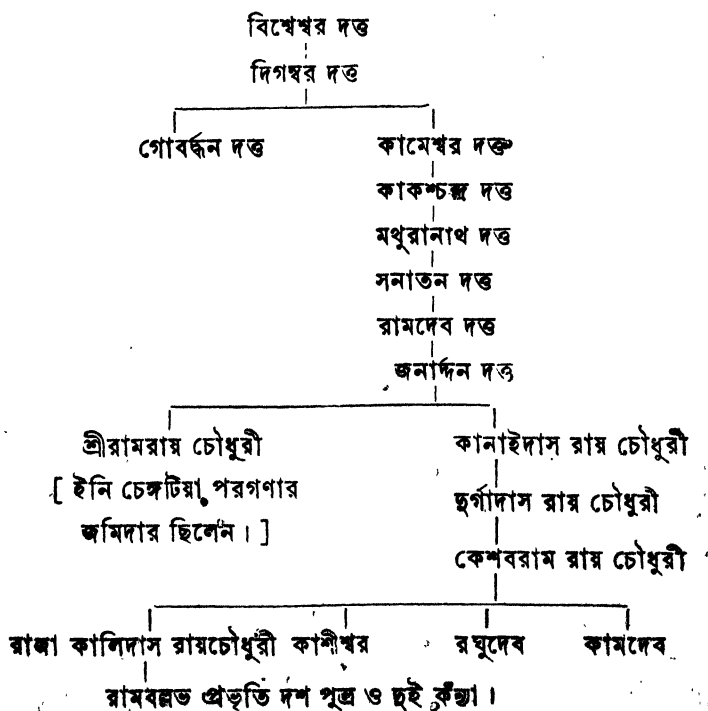
কেশবরাম খুঁটি সং লোক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কালিদাস রায় তাঁহরাই জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে বা তাহার কিছু পরে কালিদাসের জন্ম হয়। তিনি শিশুকালেই অত্যন্ত বলশালী ছিলেন; লেখনী অপেক্ষা বংশযষ্টি পরিচালনাই তাঁহার নিকট অধিকতর প্রিয় ছিল। যখন তিনি যৌবনসীমায় পদার্পণ করেন, তখন তাঁহার দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির পরিচয়ে প্রতিবেশিগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কালিদাসের অধীনে কতকগুলি লাঠিয়াল ছিল। প্রাচীন বঙ্গে লাঠিই আত্মরক্ষা বা পরনিপীড়নের প্রধান সম্বল ছিল। এখন লাঠি যেরূপ "ছড়িত্ব প্রাপ্ত হইয়া শৃগাল-কুকুর-ভীত বাবুবর্গের হস্তের শোভাবর্দ্ধন করে এবং কুকুর ডাকিলেই সে ননীর হাতগুলি হইতে খসিয়া পড়ে,"* পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। তখন ইহারই বলে গৃহস্থের মান মর্য্যাদা ও ধনধান্য রক্ষিত হইত; দেশ ও সমাজ উভয়েরই শাসনভার লাঠির উপর ন্যস্ত ছিল। ক্ষুদ্র লাঠিয়ালের সর্দ্দার কালিদাস লাঠির শাস্ত্রে পারদর্শী বলিয়া দেশবিখ্যাত ছিলেন; তখন সেই ম্যালেরিয়া—কলেরা-বর্জ্জিত প্রাচীন বঙ্গে লাঠি সবল ও শিক্ষিত হস্তে পড়িয়া অদ্ভুত ক্রিয়া-সম্পাদনে সক্ষম ছিল। মল্লদেহ কালিদাসের লাঠি ও তাঁহার সুশিক্ষিত লাঠিয়ালদলের বিচিত্র লীলা ক্রমে কালিদাসেরই সম্পদ ও সৌভাগ্যের পথ প্রশস্ত করিতেছিল। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সর্ব্বগ্রাসী প্রভাব যখন সমগ্র বঙ্গের বহু প্রদেশে তাঁহার বিজয়-বৈজয়ন্তী প্রতিষ্ঠিত করিতেছিল, তখন কালিদাসের ক্ষুদ্র পরগণা নিস্তার পায় নাই। তবে শ্রীরামরায়ের সুযোগ্য বংশধরের বলপ্রতাপ একেবারে নগণ্য ছিল না; এজন্য অগণ্য সৈন্যদলপতি প্রতাপের পক্ষেও সে ক্ষুদ্র প্রদেশ নিতান্ত অনায়াসলভ্য হয় নাই। কালিদাস যৌবনের প্রারম্ভ হইতে যে পৈতৃক সম্পত্তি স্বকবলস্থ রাখিবার জন্য

* ৺বঙ্কিমচন্দ্র, "দেবী চৌধুরাণী" ১৫৮ পৃঃ।

প্রবল আয়োজন করিতেছিলেন, যোগ্যতর ব্যক্তির ভাগ্য সম্বন্ধে তাহা সমস্তই বিফল হইল। কিন্তু মহানুভব প্রতাপ গুণের আদর করিতেন, গুণীর মর্য্যাদা বুঝিতেন, এবং বঙ্গের বীরত্ব প্রতিভা উৎসাহদানে সঞ্জীবিত করিতে সচেষ্ট হইতেন। এজন্য কালিদাসের উদ্দেশ্য পরাভূত হইলেও তিনি প্রতাপ কর্ত্তৃক নবাধিকৃত সম্পত্তির সঙ্গে সাদরে গৃহীত হইলেন। মণিকাঞ্চন সংযোগ হইল; প্রতাপ কালিদাসকে স্বীয় ঢালী সৈন্যের একজন প্রধান অধিনায়কপদে নিযুক্ত করিলেন। তিনি বঙ্গভূমিতে যে এক প্রবল হিন্দুরাজ্য সংস্থাপনের কল্পনা পরিপোষণ করিতেছিলেন, সেনাপতি কালী তৎপক্ষে একজন প্রধান সহায় হইলেন। স্বাধীনতা রক্ষা ও রাষ্ট্রবিজয়ের জন্য প্রতাপাদিত্য যে সমস্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেক যুদ্ধেই কলিদাস স্বীয় বলবীর্য্য প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হন নাই।

কালিদাস আজীবন সৈনিক পুরুষ ছিলেন। যেস্থানে তাঁহার রাজ-প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এখনও বিরাজিত, এবং যে অঞ্চলে তৎ-সম্বন্ধীয় জনশ্রুতি এখনও বহু মজলিসে সাদরে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে, সে প্রদেশে তাঁহার বীরত্বমূলক কোনও উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট ঘটনা প্রচলিত নাই—কারণ তাঁহার যোদ্ধৃজীবন সেস্থান হইতে বহুদূরে সমাহিত হইয়াছিল।

১৬০০ খৃষ্টাব্দের প্রাক্কালে বহুসংখ্যক পর্টুগীজ দস্যু চট্টগ্রাম ও আরাকানের নিকটবর্ত্তী দ্বীপসমূহে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠে। বাঙ্গালা দেশে তখন মোগল শাসনকাল বটে, কিন্তু প্রকৃত দেশের মালিক দ্বাদশ ভৌমিকেরাই ছিলেন এবং পর্টুগীজ দস্যুগণও দক্ষিণভাগে মোগলদিগের রাজ্যাধিকার-কল্পনা বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতেছিল*। ইহাদের সৈন্যবল ও কম ছিল না; ইহারা অত্যন্ত

* Marshman's History of Bengal.

সাহসী এবং নাবযুদ্ধাদিতে সুদক্ষ ছিল, একজন কেহই ইহাদিগকে দমন করিতে পারিত না। সিবাস্তিন গঞ্জেলিস নামক একজন এক সময়ে মোগলদিগকে একটি নৌযুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিত করিয়া সন্দ্বীপ অধিকার করিয়া লইয়াছিল এবং কয়েক সহস্র সৈন্যের দলপতি হইয়া দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিল। কিন্তু এ ঘটনা প্রতাপাদিত্যের পরাজয়ের বহু পরে ঘটিয়াছিল; প্রতাপাদিত্যের শাসন সময়ে পর্টুগীজগণ মস্তকোত্তলন করিতে সক্ষম হয় নাই; যখন তাহাদের প্রবল অত্যাচারে দক্ষিণদেশীয় অধিবাসীদিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তখন প্রতাপাদিত্যই নানাস্থানে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া দেশের লোককে তাহাদের অমানুষিক অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। এরূপ কথিত হয় যে সেনাপতি কালিদাসের বাহুবল এই বিষয়ে তাঁহাকে যথেষ্ট আনুকুল্য করিয়াছিল। ফিরিঙ্গি রুডা আসিয়া প্রতাপের অধীনে গোলন্দাজ হইয়াছিলেন; দুর্দ্ধর্ষ কারভ্যাল্‌হো প্রতাপের লোকদিগের দ্বারা নিহত হইয়াছিল; গঞ্জেলিসের সহিত প্রতাপ ও আরাকান রাজের সন্ধি সংস্থাপিত হইয়াছিল।

যখন হিন্দুকুলগ্লানি মানসিংহ হিন্দু স্বাধীনতা বিলোপের জন্য অগণ্য সৈন্য সহ বঙ্গভূমিতে অবতরণ করিয়াছিলেন, যখন ভবানন্দ মজুমদার, মহাভাপ রামরায় ও শ্রীমন্ত খাঁ প্রভৃতি কুলাঙ্গারগণ সাধিয়া শৃঙ্খলধারী "গোলামের জাতি" হইবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছিল, তখন প্রভুভক্ত ও স্বদেশভক্ত কালিদাস প্রভৃতি বীরগণ দেশের জন্য দেহের শোণিত ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। যখন বিশ্বাসঘাতকেরা লবণের মর্য্যাদা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া, অরাতিদলকে স্বজাতির উপর উপদ্রব করিবার জন্য আহ্বান করিতেছিল, তখন সূর্য্যকান্ত, কমল, শরণ, মদনমল্ল ও কালিদাস প্রভৃতি বঙ্গীয় বীরগণ কেহ যশোহরে,

কেহ বিক্রমপুরে স্বজাতির গৌরবরক্ষার জন্য উত্থিত কৃপাণকরে দণ্ডায়মান ছিলেন। শঙ্কর ও রঘুনন্দন প্রভৃতি বঙ্গের সুসন্তানগণের ওজস্বিনী বক্তৃতা তখন বঙ্গীয় বীরগণকে রণাঙ্গনে সমুৎসাহিত করিতে ছিল। কিন্তু বঙ্গদেশের ভাগ্যদোষে বাঙ্গালীর সব আশা ভরসা নির্ম্মূল হইল; বঙ্গ-গৌরব বারভুঞাগণ হতবীর্য্য হইলেন। মানসিংহ একে একে তাঁহাদিগকে উৎসন্ন করিলেন।

মানসিংহ মহাবীর প্রতাপকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ করিলেন; ভূষণার মুকুন্দরামের রাজ্য অধিকার করিলেন; শ্রীপুরের কেদার রায়কে ছলে বলে নিহত করিলেন; খিজিরপুরের ঈশা খাঁ পূর্ব্বেই বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। এইরূপে বারভুঞাদিগের মধ্যে যাহারা সর্ব্ব প্রধান,* তাঁহাদের গৌরব অস্তমিত হইলে, অন্যান্য সকলকে দমন করিতে অধিক সময়ের আবশ্যক হইল না।

যে সকল স্বজাতিদ্রোহিগণ দুর্জ্জয় অভিযানে বিজয়দৃপ্ত মানের প্রধান সহায় হইয়াছিল, পূর্ণাভীষ্ট মান নানা ভাবে তাহাদের সম্মান বৃদ্ধি করিতে ক্রটী করেন নাই। প্রতাপের প্রবল শত্রু কচুরায় (রাঘব) তাঁহার দুর্গাদির সমস্ত গুপ্ততত্ত্ব মানসিংহের নিকট বিজ্ঞাপিত করিয়াছিল, এজন্য "কচুরায় পাইল যশোরজিৎ নাম"† প্রতাপের বিরুদ্ধে সেই "নারকীয় ষড়যন্ত্রে যে সকল মহাপাপী লিপ্ত ছিল, তন্মধ্যে ভবানন্দ মজুমদার সর্ব্ব প্রধান।"‡ প্রিয়দর্শন ব্রাহ্মণ কুমার ভবানন্দ প্রথমতঃ প্রতাপেরই অধীনে কার্য্য করিতেন; পরে তিনিই খাদ্য ও রসদাদি

---

* "The most powerful of the twelve were the Lords of Sreepur and Chandican and above all Mansudali Masá—uddin (?) Perhaps this is Isa khan Massuddi -i- Ali of Khizrpur." Beveridges Bakarzunj p. 29.

† ভারতচন্দ্র, অন্নদামঙ্গল।

‡ সত্যচরণ শাস্ত্রী, প্রতাপাদিত্য চরিত ১৩৮ পৃঃ

যোগাইয়া মানসিংহের যশোহর বিজয়ের পথ পরিষ্কার করেন। রাজ মানসিংহ অবশেষে বাদসাহের স্বাক্ষর যুক্ত সনন্দে ভবানন্দকে বাগুয়া পরগনায় জমিদারি দিয়া পুরস্কৃত করেন।* চাঁচড়ার রাজবংশের পূর্ব্ব পুরুষ ভবেশ্বর রায় বঙ্গের মোগল সুবাদার আজিম খাঁর অধীনে সৈ দলভুক্ত হন; এবং তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা প্রতাপাদিত্যের অধীনস্থ মল পরগণার রাজস্ব সংগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন। প্রবাদ এই যে উক্ত কনি ভ্রাতা বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক প্রতাপের আভ্যন্তরিক সমস্ত সংবা মোগল শিবিরে প্রেরণ করিতেন। ভবেশ্বরের পুত্র মহাতাপ রামর গোপনে কচুরায়কে আশ্রয় দেন ও মানসিংহকে নানা ভাবে সাহা করেন। এজন্য তিনি মানসিংহের বিজয় লাভের পর ৪টি পরগণা লা করেন ও "যশোহরের রাজা" উপাধি গ্রহণ করেন।† এই মহাতা রামের বংশধর উত্তরকালে কালিদাসের রাজপ্রাসাদ চূর্ণ বিচূর্ণ করি জমিদারী অধিকার করিয়া লন।

এদিকে যখন ভৌমিকদিগের প্রতিপত্তি নিষ্প্রভ হইল, তৎ তাঁহাদের অধীনস্থ সেনাপতিগণ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন এ প্রাদেশিক রাজধানী সকল পরিত্যাগ করিয়া, সেই অরাজক রাজে এক এক প্রান্তে জীবিকা নির্ব্বাহার্থ এক বা ততোধিক পরগ অধিকার করিয়া বসিলেন। বাকলা বা চন্দ্রদ্বীপের রামচ মানসিংহের বশ্যতা স্বীকার করিয়া স্বরাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ভূষণার মুকুন্দরাম পরাজিত হইবার পরে তৎপুত্র সত্রজিৎ রাজে কতকাংশের অধিকারী ছিলেন; বিক্রমপুরের কেদার রায়ের রা তাঁহার মন্ত্রী ও সেনাপতিবর্গের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। এই সম কালিদাস আসিয়া ইসফপুর পরগণা অধিকার করিয়া বসেন।

* রাজীব লোচন মুখোপাধ্যায় কৃত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের চরিত্র, ১৬ পৃঃ
† প্রতাপাদিত্যের জীবন চরিত ১৪০ পৃঃ ও ১৬২ পৃঃ

বিক্রমপুরাধিপতি বিক্রমশালী কেদার রায়ের অধীনে কালি ঢ লী নামক একজন সেনাপতি ছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যা তিনিও মানসিংহের অধীনতা স্বীকার করেন নাই ; বরং শেষ প বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনিও বর্ত্তমান প্রবন্ধোক্ত কালি অভিন্ন ব্যক্তি কিনা সন্দেহস্থল। এরূপও হইতে পারে যে প্রতা পরাজয়ের পর তাঁহার সেনাপতি কালিদাস কেদার রায়ের আশ্রয় গ্র করিয়া, মোগলের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য সচেষ্ট ছিলে প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধের সময়ে হয়ত' কেদার রায় পূর্ব্বেই কা দাসের বীর্য্যবত্তার পরিচয় পাইয়াছিলেন। এজন্য কেদার রায়ের তাঁহ স্বীয় সৈন্যদলের একজন প্রধান অধিনায়ক পদে বরিত করা আশ্চ বিষয় নহে। কিন্তু "বারভুঞা" প্রবন্ধ লেখক শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দ রায় কালিদাস ঢালীকে "ব্রাহ্মণবংশীয়" বলিয়া বর্ণনা করিয়া এবং একথাও বলিয়াছেন যে, তাঁহার বংশীয়েরা উত্তর কালে মু বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন।* তাহা হইলে, কায়স্থবংশীয় ঢা সেনাপতি কালিদাস রায় ও ব্রাহ্মণবংশীয় সেনাপতি কালিদাস ঢ অভিন্ন ব্যক্তি নহেন, ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

সেনাপতি কালিদাস রায়চৌধুরী ইসফপুর পরগণা অধি করিয়া তদন্তর্গত বেভাগদি (বিভাগদিহি) গ্রামে স্বীয় আবাস নির্ণয় করেন। ইসফপুর পরগণা পূর্ব্বে প্রতাপাদিত্যেরই রা অন্তর্গত ছিল। সম্ভবতঃ প্রতাপের পরাজয়ের পরে মানসিংহের নি বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহারই অনুমতি ক্রমে তিনি উহা অধি করেন। যাহা হউক, কালিদাস উক্ত পরগণা অধিকার করি চাঁচড়ার মহাতাপ রামরায় তাঁহাকে পরাজিত ও দূরীকৃত করিবার বহুচেষ্টা করেন। কিন্তু কালিদাস দুর্ব্বলহস্তে শাসনদণ্ড পরিচ

* নব্যভারত, শ্রাবণ ১৩০৮, ১৭৭ পৃঃ।

যোগাইয়া মানসিংহের যশোহর বিজয়ের পথ পরিষ্কার করেন। রাজা মানসিংহ অবশেষে বাদসাহের স্বাক্ষর যুক্ত সনন্দে ভবানন্দকে বাগুয়ান পরগণায় জমিদারি দিয়া পুরস্কৃত করেন।* চাঁচড়ার রাজবংশের পূর্ব্ব-পুরুষ ভবেশ্বর রায় বঙ্গের মোগল সুবাদার আজিম খাঁর অধীনে সৈন্য দলভুক্ত হন; এবং তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা প্রতাপাদিত্যের অধীনস্থ মলই পরগণার রাজস্ব সংগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন। প্রবাদ এই যে উক্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক প্রতাপের আভ্যন্তরিক সমস্ত সংবাদ মোগল শিবিরে প্রেরণ করিতেন। ভবেশ্বরের পুত্র মহাতাপ রামরায় গোপনে কচুরায়কে আশ্রয় দেন ও মানসিংহকে নানা ভাবে সাহায্য করেন। এজন্য তিনি মানসিংহের বিজয় লাভের পর ৪টি পরগণা লাভ করেন ও "যশোহরের রাজা" উপাধি গ্রহণ করেন।† এই মহাতাপ রামের বংশধর উত্তরকালে কালিদাসের রাজপ্রাসাদ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া জমিদারী অধিকার করিয়া লন।

এদিকে যখন ভৌমিকদিগের প্রতিপত্তি নিষ্প্রভ হইল, তখন তাঁহাদের অধীনস্থ সেনাপতিগণ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন এবং প্রাদেশিক রাজধানী সকল পরিত্যাগ করিয়া, সেই অরাজক রাজ্যের এক এক প্রান্তে জীবিকা নির্ব্বাহার্থ এক বা ততোধিক পরগণা অধিকার করিয়া বসিলেন। বাকলা বা চন্দ্রদ্বীপের রামচন্দ্র মানসিংহের বশ্যতা স্বীকার করিয়া স্বরাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; ভূষণার মুকুন্দরাম পরাজিত হইবার পরে তৎপুত্র সত্রজিৎ রাজ্যের কতকাংশের অধিকারী ছিলেন; বিক্রমপুরের কেদার রায়ের রাজ্য তাঁহার মন্ত্রী ও সেনাপতিবর্গের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। এই সময়ে কালিদাস আসিয়া ইসফপুর পরগণা অধিকার করিয়া বসেন।

* রাজীব লোচন মুখোপাধ্যায় কৃত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের চরিত্র, ১৬ পৃঃ

† প্রতাপাদিত্যের জীবন চরিত ১৪০ পৃঃ ও ১৬২ পৃঃ

বিক্রমপুরাধিপতি বিক্রমশালী কেদার রায়ের অধীনে কালিদাস ঢালী নামক একজন সেনাপতি ছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। তিনিও মানসিংহের অধীনতা স্বীকার করেন নাই; বরং শেষ পর্য্যন্ত বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি ও বর্ত্তমান প্রবন্ধোক্ত কালিদাস অভিন্ন ব্যক্তি কিনা সন্দেহস্থল। এরূপও হইতে পারে যে প্রতাপের পরাজয়ের পর তাঁহার সেনাপতি কালিদাস কেদার রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, মোগলের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধের সময়ে হয়ত' কেদার রায় পূর্ব্বেই কালিদাসের বীর্য্যবত্তার পরিচয় পাইয়াছিলেন। এজন্য কেদার রায়ের তাঁহাকে স্বীয় সৈন্যদলের একজন প্রধান অধিনায়ক পদে বরিত করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু "বারভূঞা" প্রবন্ধ লেখক শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দ নাথ রায় কালিদাস ঢালীকে "ব্রাহ্মণবংশীয়" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং একথাও বলিয়াছেন যে, তাঁহার বংশীয়েরা উত্তর কালে মুখুটি বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন।* তাহা হইলে, কায়স্থবংশীয় ঢালী-সেনাপতি কালিদাস রায় ও ব্রাহ্মণবংশীয় সেনাপতি কালিদাস ঢালী অভিন্ন ব্যক্তি নহেন, ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

সেনাপতি কালিদাস রায়চৌধুরী ইসফপুর পরগণা অধিকার করিয়া তদন্তর্গত বেভাগদি (বিভাগদিহি) গ্রামে স্বীয় আবাস স্থান নির্ণয় করেন। ইসফপুর পরগণা পূর্ব্বে প্রতাপাদিত্যেরই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সম্ভবতঃ প্রতাপের পরাজয়ের পরে মানসিংহের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহারই অনুমতি ক্রমে তিনি উহা অধিকার করেন। যাহা হউক, কালিদাস উক্ত পরগণা অধিকার করিলে চাঁচড়ার মহাতাপ রামরায় তাঁহাকে পরাজিত ও দূরীকৃত করিবার জন্য বহুচেষ্টা করেন। কিন্তু কালিদাস দুর্দ্ধর্ষহস্তে শাসনদণ্ড পরিচালন

* নব্যভারত, শ্রাবণ ১৩০৮, ১৭৭ পৃঃ।

করিতেন না; তাঁহার অধীনে তখনও রীতিমত ঢালী ও লাঠিয়াল সৈন্য ছিল। তিনি তাহাদেরই সাহায্যে মহাতাপরামের লুব্ধমার্জ্জারবৎ আক্রমণ সমূহ নিরাকৃত করেন। অবশেষে কালিদাস বহুমূল্য উপহার দ্রব্য ঢাকায় সুবাদারের নিকট প্রেরণ করেন এবং তাঁহার সন্তুষ্টিসাধন করিয়া দিল্লীশ্বরের স্বাক্ষর-সম্বলিত ইসফপুর পরগণার জমিদারীর সনন্দ লাভ করেন। এই সময় হইতে তিনি "রাজা" উপাধি পাইয়াছিলেন, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। সনন্দ গ্রহণের পর কালিদাসের জীবদ্দশায় চাঁচড়ার রাজবংশীয়েরা ইসফপুর লাভের আর কোনও চেষ্টা করেন নাই। মহাতাপরামের পুত্র কন্দর্প রায় ১৬১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করেন। তাঁহার সময়েও ইসফপুর পরগণা কালিদাসের বংশধরগণের করায়ত্ত ছিল।

রাজা কালিদাসের আবাস স্থান বেভাগদি গ্রাম বর্ত্তমান যশোহর জেলার অন্তর্গত। ইহা বেঙ্গল সেণ্ট্রাল রেলওয়ের নওয়াপাড়া নামক ষ্টেশন হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। কালিদাস যখন এ প্রদেশে প্রথম অধিষ্ঠান করেন, তখন ইহা জনাকীর্ণ সুন্দর স্থান ছিল না; তখন বেভাগদির চতুঃপার্শ্বে দূর-বিস্তৃত বিল ছিল। সম্ভবতঃ শত্রুর আক্রমণ হইতে রাজধানী রক্ষা করা সহজ সাধ্য হইবে প্রত্যাশায় তিনি এই প্রান্তরময় প্রদেশে বাস করেন; এবং অনতিবিলম্বে নানা-রম্য-হর্ম্ম্যরাজি সমন্বিত রাজ-প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া অপূর্ব্বখ্যাতি বেভাগদি গ্রামের সৌন্দর্য্য ও গৌরব বৃদ্ধি করেন। তাঁহার অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্ষুদ্র জনপদ সন্ধ্যাকালীন কাক-কোকিল-কোলাহলময় অশ্বত্থতরুর মত জন-কল্লোল পরিপূরিত হইয়া উঠিল। বহুসংখ্যক পুষ্করিণী খনিত হইল, বৃক্ষবাটিকা নির্ম্মিত হইল, এবং চতুর্দ্দিকে নূতন নূতন রাজপথ নির্ম্মিত হইল। সাধারণ লোকের জলকষ্ট নিবারণের জন্য কালিদাস যে সুদীর্ঘ জলাশয় খনন করিয়াছিলেন, তাহা এখনও বেভাগদি গ্রামে

"মঠবাড়ার দিঘী" নামে খ্যাত থাকিয়া, তাঁহার গৌরব ঘোষণা করিতেছে। কালিদাসের জ্ঞাতিবর্গের আবাস স্থান সেখহাটি গ্রাম, বেভাগদি হইতে প্রায় ১০।১১ মাইল দূরবর্ত্তী হইবে। তিনি উক্ত সেখহাটি পর্য্যন্ত যে দীর্ঘ ও উন্নত রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দেন, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে এবং প্রতিদিন শত শত পথিক ঐ পথে গমনাগমন করিয়া থাকেন। যখন প্রথম রাস্তা প্রস্তুত হয়, তখন বিলের মধ্য দিয়া রাস্তা প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। সেই জল-প্লাবিত প্রান্তরের মধ্য দিয়া প্রশস্ত ও সমুন্নত রাজপথ নির্ম্মাণ করা কত কষ্টকর ও কত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার, তাহা ভাবিলেও বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

রাজা কালিদাস রায়ের রমাবল্লভ প্রভৃতি দশ পুত্র এবং দুই কন্যা ছিল। কালিদাস স্বয়ং দক্ষিণ রাঢ়ীয় মৌলিক কায়স্থ ছিলেন; কিন্তু তাঁহার কন্যাদ্বয় ও পৌত্রীগণকে বিভিন্ন সমাজের প্রবল মুখ্য কুলীনের সহিত বিবাহ দিয়া স্বীয় বংশমর্য্যাদা বৃদ্ধি করেন। এইরূপে তিনি "গোষ্ঠীপতি" আখ্যা পাইয়াছিলেন। কায়স্থ সমাজে অনেক স্থলে কুলীনদিগের অপেক্ষা গোষ্ঠীপতির সন্মান অধিক। বালী সমাজের ১৯ পর্য্যায়স্থ গোসাঁইদাস ঘোষ, দাঁতিয়া পরগণার জমিদার কুমিরা নিবাসী রুক্মিণীকান্ত মিত্র চৌধুরীর কন্যা বিবাহ করিয়া উক্ত কুমিরায় বাস করিতেছিলেন। কালিদাস স্বীয় জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত উক্ত গোসাঁইদাসের জ্যেষ্ঠ পৌত্র ২১ পর্য্যায়স্থ প্রকৃত মুখ্য রামদেব ঘোষের সহিত বিবাহ দিয়া তাঁহাকে স্বায় বাটীতে আনিয়া রাখেন, পরে মৌজা বাণীপুর তালুক বৃত্তি দিয়া নিকটবর্ত্তী বাঘুটিয়া গ্রামে রামদেবকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই রামদেবই বাঘুটিয়ার প্রসিদ্ধ ঘোষ বংশের আদিপুরুষ। তাঁহারই বংশধরগণ এক্ষণে প্রায় একশত ঘর হইয়াছেন এবং উক্ত সুপ্রশস্ত বাঘুটিয়া গ্রামের প্রায় ১০।১১টি পাড়ায় বাস করিতেছেন। দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থদিগের মধ্যে বাঘুটিয়ার ঘোষ

মহাশয়দিগের সম্মান ও প্রতিপত্তি অত্যন্ত অধিক। তাঁহাদিগের মধ্যে দেশমান্য মহাত্মাগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহারাই যশোহর ও খুল্না জেলার কায়স্থগণের সমাজপতি ছিলেন। রাজা কালিদাসই ইহাদের প্রতিষ্ঠাতা। উক্ত ঘোষবংশীয়গণ আজিও কালিদাসের প্রদত্ত বাণীপুর নামক খারিজা তালুকের উপস্বত্ব ভোগ করিতেছেন।

কালিদাস স্বীয় কনিষ্ঠ কন্যাকে মাহিনগর সমাজের ২৭ পর্য্যায়স্থ কোমল মুখ্য রামদেব বসু মহাশয়ের সহিত বিবাহ দেন এবং নিয়মিত বৃত্তিদান করিয়া বেভাগদি গ্রামেই তাঁহার বসতি নির্দ্দেশ করিয়া দেন। বর্ত্তমান সময়ে বেভাগদির বসুগণ উক্ত রামদেব বসুরই অধস্তন বংশধর। কালিদাসের পৌত্রীর সহিত বাগাণ্ডা সমাজের প্রবল মুখ্য জনৈক বসুর বিবাহ হয়; কালিদাস তাঁহাকে জঙ্গলবাধাল বৃত্তি দিয়াছিলেন।* বেভাগদি ও জঙ্গলবাধালের বসুগণ অনেকেই এখনও কালিদাস-প্রদত্ত বৃত্তিভোগ করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত নিকটবর্ত্তী [illegible]পাড়া ও অন্যান্য স্থানের কায়স্থগণের মধ্যে কেহ কেহ এখনও তৎপ্রদত্ত "মহাত্রাণ" জমির অধিকারী আছেন।

রাজা কালিদাস অত্যন্ত ব্রাহ্মণ-ভক্ত এবং স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন; নিকটবর্ত্তী বড়গাতি, শিঙ্গিয়া, সেখহাটি, দেয়াপাড়া, ডুমিলহাট ও শোনপুর প্রভৃতি ২৫ খানি গ্রামের অনেক ব্রাহ্মণপরিবার এখনও কালিদাস প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর জমি ভোগদখল করিতেছেন। বড়গাতি নিবাসী পূজ্যপাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণের পূর্ব্বপুরুষ কালিদাসের ইষ্ট-গুরু ছিলেন। উঁহাদিগের নিকট কালিদাসের সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান লেখক উক্ত ভট্টাচার্য্য বংশীয় জনৈক পরমারাধ্য ব্যক্তির নিকটই প্রথম "সেনাপতি কালী" সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলেন।

---

* শ্রীবিশ্বেশ্বর ঘোষ কৃত "কায়স্থ কুলদর্পণ" ১৪-১৫ পৃঃ।

কালিদাস অত্যন্ত দাতা ছিলেন, বলিয়া খ্যাত; পূর্ব্বোল্লিখিত বিবরণ হইতেও তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন তিনি অনেক সময়ে যাগ যজ্ঞ উপলক্ষে দীনদুঃখীদিগকে অজস্র দান করিতেন। তাঁহার মত বহুগুণান্বিত মহৎ ব্যক্তি অতীব দুর্ল্লভ। মানুষ থাকে না, কিন্তু কীর্ত্তি থাকে; কালিদাস নাই—কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তি চিহ্ন এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। বাঙ্গালী বীর-পূজা জানে না—ইহাই বাঙ্গালীর সর্ব্বপ্রধান কলঙ্ক। কিন্তু যে দেশে বীর ছিল এবং তাহার পূজাও ছিল—সে জাতি কখনও চিরদিন বীর-পূজা বিস্মৃত হইয়া থাকিবে না। যে জাতির অতীত আছে—তাহার ভবিষ্যৎও আসিবে,—এ আশা কিছুতেই পরিত্যাগ করা যায় না। যখন বাঙ্গালী ষোড়শোপচারে বীর-পূজা করিতে শিখিবে, তখন বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে এক কালিদাস কেন, এরূপ শত শত কালিদাসের কীর্ত্তি-কাহিনী পরিকীর্ত্তিত হইবে। বাঙ্গালীর পিতৃধন কম নহে।

কালিদাসের উপর চিরদিনই চাঁচড়ার রাজবংশীয়গণের আক্রোশ ছিল। কালিদাসের মৃত্যুর পর তাঁহারা স্বাভিলাষ পূরণ করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে কন্দর্প রায়ের মৃত্যুর পর যশোহরের সম্পত্তি তৎপুত্র মনোহর রায়ের হস্তে যায়। তিনি ১৭০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইঁহারই সময়ে চাঁচড়ার জমিদারীর উন্নতি পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয় এবং ইনিই উক্ত জমিদারীর সর্ব্বপ্রধান প্রতিষ্ঠাতা;* যশোহরের নিকটবর্ত্তী মনোহরপুর গ্রাম ইঁহারই নাম ঘোষণা করিতেছে।

মনোহর রায়ের হস্তে জমিদারী ন্যস্ত হইবার কয়েক বৎসর পরে সমস্ত ভারতবর্ষে এক ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত হয়। এতদিন সাহিস্নুজা

* Hunter's Statistical Accounts, Vol. II.

বাঙ্গালার সুবাদার ছিলেন; তাঁহার সুচ্ছায় শাসনতলে বাঙ্গালাদেশ পরম শান্তি সম্ভোগ করিতেছিল। কিন্তু ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে বাদসাহ সাহজাহান পীড়িত হইলে দিল্লীর সিংহাসন লইয়া তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে ভীষণ বিবাদ উপস্থিত হয়। সাহসুজা তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র। ঐ বিবাদের ফলে সাহসুজা পরিজনবর্গসহ নিধন প্রাপ্ত হন এবং বাদসাহের তৃতীয় পুত্র কূটনীতিবিশারদ আওরঙ্গজেব সিংহাসন লাভ করিয়া, প্রধান সেনাপতি মীরজুম্লাকে বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত করেন। জুম্লাও স্বল্পদিন মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে, সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালার নবাব হইয়া আসেন। সম্ভবতঃ উপরোক্ত বিপ্লব-সময়ে মনোহর রায় পূর্ব্বপুরুষের অপূর্ণ অভীষ্ট পূর্ণ করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি ইসফপুর পরগণার অধিকাংশ হস্তগত করেন এবং কালিদাসের রাজপ্রাসাদ ধুল্যবলুণ্ঠিত করিয়া চিরসম্পোষিত চিত্তাভিলাষ পূর্ণ করিয়া লন।

মনোহর রায়ের অভয়া নাম্নী এক কন্যা ছিল। তিনি বেভাগদির অনতিদূরে উক্ত কন্যার জন্য এক বাসস্থান নির্ণয় করেন; ঐ স্থান এখনও অভয়ানগর নামে পরিচিত। কালিদাসের ভগ্ন প্রাসাদের মালমসলা লইয়া উক্ত অভয়ানগরে মনোহরের প্রিয় দুহিতার জন্য পরিখা-পরিবেষ্টিত একটি সুন্দর আবাস বাটী এবং দ্বাদশটি শিবমন্দির নির্ম্মিত হয়। ঐ শিবমন্দির গুলি এখনও ভগ্নাবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। বেষ্টন-পরিখা এখনও বর্ষাগমে জলপ্লাবিত হইয়া গ্রীষ্মারম্ভে শুষ্ক হয়। যদিও উহা এক্ষণে জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি অক্লিষ্টদেহ পরিদর্শকের পক্ষে তাহার অবস্থান ও পরিমাণ নির্দ্দেশ করা নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার নহে। কালসহকারে অভয়াকুমারীর আবাস গৃহগুলিও জঙ্গলাকীর্ণ এবং বাসের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছিল; অধিক দিনের কথা নহে রাজঘাট নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার মিত্র চাঁচড়ার সরকারের

একজন নায়েব ছিলেন এবং সুযোগমত সরকার হইতে উক্ত অভয়া-নগরের পত্তনী ক্রয় করেন। তিনি উক্ত ভগ্নবাটী অভয়ানগর নিবাসী শ্রীযুক্ত তারকনাথ ভট্টাচার্য্যের নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেই জীর্ণ বাটীর জিনিসপত্র লইয়া স্বকীয় বাসোপযোগী একটি অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন। এবং কালিদাসের গর্ব্বোন্নত রাজপ্রাসাদের প্রসাদলাভে প্রসন্ন হইয়া আত্মশ্লাঘা বোধ করিতেছেন।

এদিকে যেখানে সেই রাজপ্রাসাদ ছিল, তথায় এক জীর্ণ নিকেতনে কালিদাসের বংশধর ৺সাতুলাল রায়ের বিধবা স্ত্রী দুইটি অপোগণ্ড শিশুসহ দীনভাবে বাস করিতেছেন। কালের কি বিচিত্র গতি! করাল কালের কুটিল স্রোতে পড়িয়া কত কত কালিদাসের বিচিত্র লীলা যে বিলুপ্ত হইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করে? কালের করে যে কলের পুতুল, সে মানুষের আবার গর্ব্ব কিসের?

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র।

কার্ত্তিকেয়ের বক্তৃতা।

পরীক্ষিত কহিলেন, "ভগবন্, প্রত্যহই আপনার নিকট হস্তলিখিত অতি জীর্ণ পুঁথি দেখিতে পাই, আজ আপনার হস্তে ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর লেখাযুক্ত কাগজখানি কি? জনমেজয় উত্তর দিলেন "এখানি স্বর্গস্থিত জনৈক মানব-সম্পাদিত "দেব-বার্ত্তা" নামক সংবাদ পত্র। শ্রীমান্ কার্ত্তিকেয় তাঁহার গত মর্ত্ত-ভ্রমণবৃত্তান্ত সম্বন্ধে দেবতাদিগকে একটি বক্তৃতা দেন। আমি তাহাই পাঠ করিতেছি।"

পরীক্ষিত বক্তৃতাটি প্রথম হইতে পাঠ করিবার নিমিত্ত জনমেজয়কে অনুরোধ করিলেন। জনমেজয় নিম্নলিখিত বিবরণটি পাঠ করিলেন।

(আমাদের সংবাদদাতার পত্র।)

গত কল্য "দেব-হলে" শ্রীমান্ কার্ত্তিকেয় তাঁহার মর্ত্তে ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ করেন। সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় সভাগৃহটি, দেব দেবী ও ও মানবগণ কর্ত্তৃক পূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন পঞ্চমুখ ব্রহ্মা সভাপতি; নারায়ণ ও তৎপত্নী লক্ষ্মী; স্বর্গীয় আবগারীর কর্ত্তা শিব ও তৎপত্নী দুর্গা; রাবণজেতা শ্রীরামচন্দ্র ও তৎপত্নী সীতা; সুরগুরু বৃহস্পতী, দৈত্যগুরু শুক্র, প্রভৃতি দেব ও দেবীগণ। এবং অদ্ভুৎদাতা কর্ণ, অটল প্রতিজ্ঞ দেবব্রত, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ও তৎভ্রাতাগণ, বঙ্গের শেষবীর মহামহিমান্বিত প্রতাপাদিত্য, রায় বাহাদুর বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দ রানাড়ে, প্রভৃতি মানবগণ।

সভাপতি মহাশয় ব্রহ্মা উঠিয়া কার্ত্তিকেয়কে তাঁহার বক্তৃতা পাঠ করিতে অনুরোধ করিলে, দেব সেনাপতি বলিলেন, "সভাপতি মহাশয়, দেবীগণ, দেবগণ ও মানবগণ, আজ আপনারা আমার বক্তৃতা শুনিতে আসিয়া আমার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিলেন, যে হেতু মদগ্রজ গণেশদাদা মর্ত্তবিষয়ে আমাপেক্ষা অধিক অভিজ্ঞ। মর্ত্তে "আরম্স্ একৃট্ নামক একটি আইন হওয়ায় তত্রত্য অধিবাসীরা আমার পূজা একেবারে বন্ধ করিয়াছেন। আর মর্ত্তে যাঁহাদেরই "লক্ষ্মী শ্রী" আছে তাঁহারাই তাঁহার পূজা না করিয়া কোন শুভ কর্ম্ম করেন না। অধুনা আমার পূজা বারাঙ্গনার গৃহেই অধিক হইয়া থাকে। আমি অত্র যাহা যাহা বলিব তৎসমস্তই আমার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বলিয়া জানিবেন।

আমি স্বর্গ হইতে একেবারে মর্ত্তে ঝাঁপ দিলাম। ময়ূরটি কিন্তু সঙ্গে লইলাম না, কারণ দেখিতে পাই মানবগণ তাহাকে বধ করিয়া তাহার পালকে বিবিধ সৌখীনের দ্রব্যাদি করে।”

এই সময় সভাগৃহে ইন্দ্রের আলো জ্বলিল। মনে হইল যেন সূর্য্য পুনরায় উঠিলেন। আপনাদের ইলেকট্রিক লাইট ইহার নিকট প্রদীপ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

শ্রীমান্ কার্ত্তিকেয় বলিয়া যাইতে লাগিলেন, “ঝাঁপদিয়া দেখিলাম সেখানে সন্ধ্যা উপস্থিত। আমি যে স্থলে পতিত হইয়াছিলাম, সে স্থলের নাম শুনিলাম “ইডেন গার্ডেন”। তথায় মিটি মিটি আলো জ্বলিতেছিল। কিন্তু তৎপরে অবগত হইলাম যে ঐ আলো অপেক্ষা ভূমণ্ডলে আর উজ্জলতর আলোক আবিষ্কৃত হয় নাই। যাহা হউক আমি উঠিলাম। উঠিয়া দেখি তথায় দ্বিবিধ লোক। একপ্রকার লোকের বালিসের খোলের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ আবৃত, তন্মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও কদাচিত হস্তের অঙ্গুলি, নয়নগোচর হয়। ইহারা সর্ব্বদা বৃহৎলাঙ্গুল সংযুক্ত পশুর ন্যায় দ্রুত চলিতে সক্ষম। আর একপ্রকার লোক দেখিলাম ইহাদের হস্ত, পদ, প্রভৃতি, আমাদেরই মত অনাবৃত। ইহারা সহজেই কিছু নম্র, এজন্য ইহাদের চালচলন উভয়ই নম্র। সর্ব্বাঙ্গাবৃত লোকদিগকে সাহেব কহে এবং অপর জাতিটি “বাবু” নামে অভিহিত।—”

একজন দেবতা উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়, ভূমণ্ডলে “সাহেব” বা কে? এবং “বাবু” বা কে? ইঁহাদের পরস্পর মধ্যে সম্বন্ধই বা কি?”

শ্রীমান্ কার্ত্তিকেয় উত্তর করিলেন, “সাহেব এবং বাবু উভয়েই দুইটি ভিন্ন জাতি। সাহেব হলেন রাজা, বাবু হলেন প্রজা। বাবু হলেন খাদ্য, সাহেব হলেন খাদক। সাহেবেরা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা,

ব্যতীত সমস্ত অঙ্গই ঢাকা দিয়া রাখেন পাছে "নেটিভদের" (অর্থাৎ "বাবুদের") হাওয়া গায়ে লাগে। বাবুরা আমাদিগেরই মত। কিন্তু কতিপয় বাবু ও সাহেব হইয়া যান, যখন তাঁহারা সাহেবদিগের দেশে একবার পদার্পন করেন। জগতে যত স্থান আছে তন্মধ্যে ভারতভূমি অবতারের ভূমি। পূর্ব্বে এ স্থানে মাত্র নয় জন অবতার ছিল, কিন্তু কালের ও ভারতের মৃত্তিকার কৃপায় অধুনা যে যে সাহেব এখানে পদার্পন করেন, তিনিই এক একটি অবতার হইয়া উঠেন, এবং একটি না একটি নেটিভের প্লীহা ফাটাইয়া তাহার স্বর্গের সোপান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে ইঁহাদের ও ইঁহাদের শঙ্কর বংশধর ফিরীঙ্গিদের সংখ্যা বড় ন্যূন নহে। সেই জন্য আমি এই সাহেবগণকে দশ অবতার শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে চাই, যথা—প্রথম অবতার, বড় লাট, ইঁহার অস্ত্র মিষ্ট বাক্য, ইহার বধ্য করদ রাজা। দ্বিতীয় অবতার, প্রাদেশিক-লাট, ইঁহার অস্ত্র সহানুভূতি, ইঁহার বধ্য প্রজাদের স্বত্ব। তৃতীয় অবতার হাইকোর্টের বড় জজ, ইহার অস্ত্র বে-আইন, ইহার বধ্য নেটিভ হিতৈষী জজ। চতুর্থ অবতার, মিউনিসিপালিটির বড় কর্ত্তা, ইহার অস্ত্র বাই-ল, ইঁহার বধ্য করদাতারা। পঞ্চম অবতার জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, ইঁহার অস্ত্র পুলিশ, ইঁহার বধ্য জমীদার, দোষী, নির্দ্দোষী প্রভৃতি জেলার সমস্ত লোক। (ইনি পূর্ণাবতার!) ষষ্ঠ অবতার বণিক্ সভার কর্ত্তা সাহেব, ইহার অস্ত্র বাণিজ্য, ইঁহার বধ্য বেচারা বড়লাটটি (প্রথম অবতার) পর্য্যন্ত। সপ্তম অবতার চা-কর, ইঁহার অস্ত্র প্রলোভন, ইঁহার বধ্য কুলী রমণী ও পুরুষ। অষ্টম অবতার গোরাসৈন্য, ইঁহার অস্ত্র সবুট পদাঘাত, ইহার বধ্য পাথাটানা কুলী। নবম অবতার বড় দোকানদার, ইঁহার অস্ত্র বিজ্ঞাপন, ইহার বধ্য ধনী বাবু। এবং দশম অবতার কাগজের সম্পাদক, ইঁহার অস্ত্র প্রবল আড়ম্বর, ইঁহার বধ্য নেটীভ কাগজ গুলা এবং খোদ গবরমেণ্ট।"

এই স্থলে কার্ত্তিকেয় প্রশ্নকারা দেবতার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "মহাশয়, এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, অত্যন্ত সময় নষ্ট হয়, আশা করি এরূপ আর করিবেন না।"

"এখন যে বিষয় বলিতেছিলাম। আমি'ত উঠিলাম। উঠিয়া বাগান পার হইয়া আসিয়া একটি রাস্তায় পড়িলাম। তথায় দেখিলাম সাহেব ও বিবিরা (সাহেবের স্ত্রীলোককে বিবি কহে) বেড়াইতেছেন। আমার পরণে আধুনিক বাবুর বেশ ছিল। আমি সেই পথে গেলাম অমনি লাল পাগড়িধারী একটি কালা পাহারাওয়ালা আমায় নিষেধ করিয়া বলিল, "উরাস্তা সাহাব কা ওয়াস্তে হ্যায়, তোমরা বাস্তে নেহি হ্যায়। হট্ যাও উঁহাসে।" এই রাস্তাটি রেড রোড নামে অভিহিত। আমি পাহারাওয়ালার বাক্য শুনিয়া ফিরিতে বাধ্য হইলাম। ফিরিয়া—"

এমন সময় আর একজন দেবতা উঠিয়া বলিলেন, "বক্তা মহাশয়, ক্ষমা করিবেন, বাবু কি প্রকার জাতি সম্যকরূপে বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহারা কেনই বা প্রজা আর সাহেবরা কেনই বা তাঁহাদের রাজা? তাঁহাদের মধ্যে প্রভেদ কি অনুগ্রহ করিয়া আমায় সবিস্তারে বলুন না, আর আপনাকে এই প্রকার বাধা প্রদান করিব না।"

বক্তা মহাশয় উত্তর দিলেন, "মহাশয়, বাবুরা কেন যে প্রজা ইহা তাঁহাদের দুর্ভাগ্যের দোষে। তাঁহাদেরও দুই হাত, দুই পা এবং সাহেবদেরও তাহাই, যা কেবল পরিচ্ছদ ও আহারের বিভিন্নতা। বাবুদের মধ্যে কতকগুলি এরূপ বলিয়া থাকেন যে সাহেবরা আমিষ ভোজী বলিয়া তাহারা অধিক বলশালী সুতরাং তাহারা বাবুদের রাজা। কিন্তু আমি জ্ঞাত আছি জাপান নামক একটি প্রবল পরাক্রান্ত দ্বীপের অধিবাসীরা সকলেই নিরামিষ ভোজী, কিন্তু তাঁহারা অতিশয় বলশালী। অধিকন্তু এই বাবুদেরই রাজা এই জাপান দ্বীপের সহিত

সখ্যতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া আপনাকে অতি মহান্ বলিয়া মনে করেন। আরও আপনি বোধ হয় অবগত আছেন যে এক কালে এই বাবুরাই স্বাধীন ছিল। কিন্তু এখন তাহারা পরপদানত। মহাশয়, অধীন ও পরপীড়িত হইলে লোকের অনেক দোষ ঘটিয়া থাকে, সুতরাং ইহাদেরও অনেকগুলি দোষ বর্ত্তমান। তাহারা পরশ্রী কাতর, এবং সকলেই "হাম বড়" হ'তে চায়। তাহারা তাম্রকুট পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিগারেট এবং সিগার নামক এক প্রকার বিদেশী অপদার্থ পদার্থ ব্যবহার করিয়া থাকে। সুতরাং দেশের অর্থ বিদেশে চলিয়া যায়। চা নামক আর একটি পানীয় প্রত্যুষে তাহারা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহার অর্থপুষ্ট, নধরদেহবিশিষ্ট চা-সাহেব শুধু যে কুলির প্রতি ভীষণ অত্যাচার করে তা নয়, ইহার লাভের এক কড়া কানাকড়িও দেশে থাকে না। আমার মতে বাবুরা সকলে মিলিয়া চা ও সিগার ও সিগারেট ব্যবহারাদি পরিত্যাগ করা বিধেয়। উক্ত প্রকার এবং অন্যান্য প্রকারে বাবুদের অর্থ বিদেশে যাইতেছে। এক্ষণে ইহাদের দেশের এমন দুরবস্থা যে, দেশের সকল লোকের ভাগ্যে দুইবেলা অন্ন জোটা ভার। ইহারা—"

এই স্থলে পরীক্ষিত অশ্রুপূর্ণলোচনে জনমেজয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্, যে দেশের কথা শুনিতেছি, ইহা আমাদেরই দেশ বলিয়া মনে হইতেছে। এদেশকে এক কালে সুফলা, সুজলা, নামে জানিত। এখন কি না সেই দেশে অন্নের অভাব! থাক, আপনি আর পড়িবেন না।"

শ্রীরাধাকান্ত বসু।

জৈনধর্ম্ম।

আমাদের দেশে জৈনধর্ম্মের আদি, উৎপত্তি, কাল, শিক্ষা, নেতা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কতকগুলি ভ্রান্ত মত প্রচলিত আছে। সেই জন্য হয়ত আমরা জৈনদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকি। সত্য ও তত্বানুসন্ধানই সভ্যজাতির চরম উদ্দেশ্য। এই প্রবন্ধে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া ভ্রমগুলি দূর করিবার চেষ্টা করিব।

জৈন, নিরামিষাশী ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্ম। "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" ইহার সারশিক্ষা ও ভিত্তি। জৈনের মতে "জীবহিংসা করিওনা, জীবকে কষ্ট দিওনা, ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।" সাধারণ লোকে এই ধর্ম্মের অতি সামান্য মাত্র জানে। কেহ কেহ বলেন বণিক, শ্রাভোগী ও নাস্তিকের ধর্ম্ম। কেহ বা মনে করেন হিন্দু বা বৌদ্ধধর্ম্মের শাখা মাত্র, শঙ্করাচার্য্যের সময় হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়কালে ইহার উৎপত্তি। কেহ কেহ বলেন ইহা হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের গবেষণার চরম ফল। অনেকে আবার মনে করেন মহাবীর অথবা পার্শ্বনান ইহার প্রথম প্রচারক। অনেকের ধারণা জৈনেরা অত্যন্ত অশুচি, এবং উলঙ্গ প্রতিমা-পূজক। মধ্যপ্রদেশে ও রাজপুতানার লোকে জৈনধর্ম্মকে অত্যন্ত ঘৃণা করে। ভদ্দেশবাসী হিন্দুরা বলেন যে, যদি মত্তহস্তী তোমাকে আক্রমণ করে, তথাপি প্রাণ রক্ষার জন্য জৈনমন্দিরে প্রবেশ করিবে না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ধারণাও ভ্রমপূর্ণ।

১। জৈনধর্ম্মের প্রাচীনত্ব।

শঙ্করাচার্য্যের সময় জৈনধর্ম্মের প্রচার প্রথম আরম্ভ হয়, একথা সত্য নহে। ঐতিহাসিক Lethbridge and Monstuart Elphinstone বলেন যে, ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইহার প্রথম প্রচার ও

দ্বাদশ শতাব্দী হইতে ইহার প্রভাব হ্রাস হইতে থাকে। এ কথাও সত্য নহে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্র একবাক্যে স্বীকার করে যে, শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং উজ্জয়িনী নগরীর নিকটস্থ কোন স্থানে এক জৈন পণ্ডিতকে তর্কে পরাস্ত করেন। মাধব ও আনন্দগিরি শঙ্কর দিগ্‌বিজয় এবং সদানন্দ শঙ্করবিজয়সার নামক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং স্বীকার করেন যে, জৈনধর্ম্ম অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত। তিনি বদ্রায়নের বেদান্ত সূত্রের ভাষ্যে বলেন যে, দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পদের ৩৩-৩৬ সূত্র জৈনধর্ম্মসম্বন্ধে লিখিত। শারীরিক মীমাংসার ভাষ্যকার রামানুজেরও এই মত। অতএব শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবকালে যে জৈনধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অধ্যাপক Wilson, Lassen, Barth, Weber প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন যে, ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের শাখা মাত্র। কিন্তু কখন, কি কারণে ইহা শাখারূপে পরিণত হয় তাহা বলেন না। পণ্ডিত প্রবর Barth তাঁহার "Religions of India" 1892. নামক পুস্তকে স্বীকার করিয়াছেন যে এ বিষয়ের তিনি কিছুই জ্ঞাত নহেন।

অধ্যাপক Weber, "History of Indian Literature" নামক গ্রন্থে স্বীকার করেন যে "জৈনধর্ম্মসম্বন্ধে আমাদের যে টুকু জ্ঞান তাহা ব্রাহ্মণশাস্ত্র হইতেই আয়ত্ত হইয়াছে।" যে সকল পণ্ডিত সরলভাবে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাদের মত পরীক্ষার কোন আবশ্যক নাই।

জৈনধর্ম্ম যে বৌদ্ধধর্ম্মের শাখা, কোন হিন্দুগ্রন্থ একথা বলে না। আচার্য্যগণ জৈন ও বৌদ্ধ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন। মাধব "সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে" জৈনদর্শনকে ষোড়শ দর্শনের অন্যতম বলিয়া নির্দ্দেশ [illegible] তিনি বলেন চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে জৈন ও বৌদ্ধ

দর্শন প্রচলিত ছিল। কাশ্মীরী পণ্ডিত সদানন্দ "অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি" নামক পুস্তকে জৈন ও বৌদ্ধ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সদানন্দ ও মাধব বৌদ্ধ ধর্ম্মকে বৈভশিক, সৌত্রাণ্তিক, যোগাচার এবং মাধ্যমিক এই চারি উপবিভাগে বিভাগ করিয়াছেন, জৈন সম্প্রদায়কে ইহার অন্তর্নিবিষ্ট করেন নাই। বরাহমিহির (Dr. Kernএর মতে তিনি খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে জন্ম গ্রহণ করেন) বৃহৎ সংহিতায় বলেন, নগ্ন অর্থাৎ জৈন জিনের, এবং শাক্য অর্থাৎ বৌদ্ধ বুদ্ধের উপাসক—"শাক্যান্ সর্ব্বহিতস্য শান্তমনসো নগ্নান্ জিনানাং বিদুঃ," ৬১ অধ্যায়, ১৯ শ্লোক। সিদ্ধান্তশিরোমণি-প্রণেতা জৈন ও বৌদ্ধ উভয় জ্যোতির্শাস্ত্রের ভ্রম দর্শন করিয়াছেন। হনুমান নাটকও জৈন এবং বৌদ্ধ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় বলে। ১ম অধ্যায় ৩য় শ্লোকে লিখিত হইয়াছে যে, রামচন্দ্রকে জৈনেরা অর্হৎ এবং বৌদ্ধেরা বুদ্ধ বলিয়া থাকে। বরাহমিহির বলেন জৈনদের অর্হৎ ও বুদ্ধের মূর্ত্তি বিভিন্ন প্রণালীতে নির্ম্মাণ করিতে হইবে:—

পদমাঙ্কিত করচরণঃ প্রসন্নমূর্ত্তিস্মুনী চ কেশশ্চ।
পদমাসনোপবিষ্টঃ পিতেব জগতো বেদবুদ্ধঃ॥
আজানুলম্ববাহুঃ শ্রীবৎসাঙ্কঃ প্রশান্তমূর্ত্তিশ্চ।
দিগ্বাসাস্তরুণোরূপবাংশ্চ কায়োঽর্হতাং দেবঃ॥
(বৃহৎ সংহিতা, ৫৮ অধ্যায়, ৪৪-৪৫ শ্লোক)।

ভাগবতে বুদ্ধকে বৌদ্ধধর্ম্মের, এবং দিগম্বর ঋষি ঋষভকে জৈন ধর্ম্মের প্রথম প্রচারক বলা হইয়াছে। জৈন ও বৌদ্ধ স্বতন্ত্র সম্প্রদায় বলিয়া শারীরিক মীমাংসা ও মহাভারতে উক্ত হইয়াছে। মীমাংসার ২য় অধ্যায়, ২য় পদের ১৮-৩২ সূত্রে বৌদ্ধ মতের খণ্ডন করা হইয়াছে। ব্যাস মহাভারতেও ঐ কথা বলেন। মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব্ব, অনুগীত, ৪৯ অধ্যায়, ২-১২ শ্লোকে জৈনদিগকে বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতে স্বতন্ত্র করা

হইয়াছে।' দ্বিতীয় শ্লোকের টীকায় নীলকণ্ঠ বলেন "স্যাদ্বাদিনঃ" অর্থে সপ্তভঙ্গীনয়জ্ঞ।—"সর্বং সংশয়িত মিতিস্যাদ্বাদিনঃ সপ্তভঙ্গীনয়জ্ঞাঃ" ইতি। মহাভারতের অনুবাদে মোক্ষমুলর স্যাদ্বাদিনঃ অর্থে জৈন বলিয়াছেন। Dr. Barthও ঐ কথা বলেন (Religions of India, p. 148)। অমরকোষেরও ঐ মত—"নৈয়ায়িকস্তক্ষ পাদ; স্যাদ্বাদিক আর্হকঃ (ব্রহ্মবর্গ, ২ কাণ্ড, '৬—৭)। ব্রাহ্মণেরা যখনই জৈনধর্ম্মের দোষোল্লেখ করিয়াছেন তাঁহাদের আক্রমণের বিষয় এই সপ্তভঙ্গীনয়। শঙ্করাচার্য্য এই সপ্তভঙ্গীনয় খণ্ডন করিয়া জৈন-বিজয়ী হইয়াছিলেন। বদ্রায়নও সপ্তভঙ্গীনয় সমালোচনা করিয়াছেন—"নৈকস্মিন্ন সম্ভবাৎ," বেদান্তসূত্র, ৩৩। স্বরাজ্যসিদ্ধি নামক পুস্তকেও ইহার সমালোচনা দেখা যায়। মহাভারত ও বেদান্তসূত্র যে অতি প্রাচীন গ্রন্থ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যখন উভয় পুস্তকে জৈন ও বৌদ্ধ বিভিন্ন সম্প্রদায় বলিয়া কথিত, তখন জৈন বৌদ্ধধর্ম্মের শাখা এ কথা বলা যাইতে পারে না।

আদিপর্ব্ব, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৬-২৭ শ্লোকে "নগ্নক্ষপণক" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। নীলকণ্ঠ ক্ষপণক অর্থাৎ পাখণ্ড (পাষণ্ড) ভিক্ষুক এই কথা বলেন। পাষণ্ড ভিক্ষুক দিগম্বর জৈন সন্ন্যাসী।

অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধির গ্রন্থকার ক্ষপণক অর্থে জৈন সন্ন্যাসী বলেন—"ক্ষপণকা জৈনমার্গ সিদ্ধান্ত প্রবর্ত্তকা ইতি কেচিৎ," পৃষ্ঠা ১৬৯। শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্ম্ম, ২৩৯ অধ্যায়, ৬ শ্লোকে জৈনদিগের সপ্তভঙ্গীনয়ের আভাষ পাওয়া যায়—

"এতদেবং চ নৈবঞ্চ নচোভে নানুভে তথা।
কর্ম্মস্থা বিষয়ং ব্রূয়ুঃ সত্ত্বস্থাঃ সমদর্শিনঃ॥"

শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্ম্ম, ২৬৪ অধ্যায়, ৩ শ্লোকে জাজালি তুলাধরকে [illegible] ভৎর্সনা করিতেছেন—"নাস্তিক্যমপি জল্পসি"।

নীলকণ্ঠ বলেন নাস্তিকের অর্থ বৈদিক বলিদান-বিরোধী ও নিন্দাকারী —নাস্তিক্যং হিংসাত্মক যেন যজ্ঞনিন্দা। সুতরাং মহাভারত রচনাকালে এক নাস্তিক সম্প্রদায় বর্ত্তমান ছিল। এ নাস্তিক কাহারা? সাংখ্য-মতাবলম্বী অথবা জৈনসম্প্রদায়। সাংখ্যদর্শন কি তখন প্রচলিত হইয়াছিল? কোন্ প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে সাংখ্য মতাবলম্বীকে নাস্তিক বলা হয়? এ নাস্তিক জৈনসম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেহ নহে। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, বৈরাগ্য প্রকরণ, ১৫ অধ্যায়, ৮ শ্লোকে রামচন্দ্র জিনের ন্যায় শান্ত প্রকৃতি হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন :—

নাহং রামো নমে বাঞ্ছা ভাবেষু ন চ মে মনঃ।
শান্ত আসিতুমিচ্ছামি স্বাত্মনীব জিনো যথা॥

রামায়ণ, বাল্যকাণ্ড, ১৪ সর্গ, ২২ শ্লোকে রাজা দশরথ শ্রমণদিগের অতিথি সৎকার করেন এই কথা লেখা আছে—"তাপসা ভুঞ্জতে চাপি শ্রমণা ভুঞ্জতে তথা।" ভূষণটীকায় শ্রমণ অর্থে দিগম্বর বলা হয়. শ্রমণাদিগম্বরাঃ শ্রমণাবাতবসনাঃ; ইতি নিঘণ্টুঃ। কাত্যায়নের উণাদিসূত্রে জিন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে—ইন্ সিঞ জিনীভুষ্যবিভ্যোনক্ সূত্র ২৮৯; পাদ ২। সিদ্ধান্তকৌমুদীতে এই সূত্রের ব্যাখায় "জিনোঽর্হন" বলা হইয়াছে। জৈনদিগের আদিগুরু অর্হন, জৈনেরা এই কথা বলেন।

অমরকোষে জিন ও বুদ্ধ সমার্থবোধক। কিন্তু মেদিনীকোষে জিন শব্দের অর্থ (১) অর্হন, জৈনধর্ম্মের আদি প্রচারক এবং (২) বুদ্ধ, বৌদ্ধ ধর্ম্মের স্থাপক। ভারতে যখন জৈন নামে এক সম্প্রদায় বিদ্যমান আছে, তখন জিন শব্দের দ্বিতীয় অর্থগ্রহণের কোন আবশ্যক দেখিতে পাওয়া যায় না। বৃত্তিকারেরাও জিন অর্থে অর্হন বলেন, যথা উণাদি-সূত্র, সিদ্ধান্তকৌমুদী। শকাত্যায়ন কোন সময় উণাদিসূত্র রচনা করেন? যস্কের নিরুক্তে শকত্যায়নের নামোল্লেখ আছে। পাণিনির

বহুকাল পূর্ব্বে নিরুক্ত লেখা হইয়াছে, সকলেই একথা স্বীকার করেন। পাণিনি মহাভাষ্যপ্রণেতা পাতঞ্জলির কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দী পাতঞ্জলির কাল নির্দ্দেশ করেন। সুতরাং এখন দেখা যাইতেছে যে, শকতায়নের উণাদিসূত্র অতি প্রাচীন গ্রন্থ।

অন্যান্য গ্রন্থেও জিন বা অর্হন্ জৈনধর্ম্মের প্রথম প্রচারক বলা হয়। বরাহমিহির বৃহৎসংহিতায় নগ্নদিগকে জিনের শিষ্য বলেন। রাজ-তরঙ্গিনীমতে অশোক জিনশাসন অবলম্বন করিয়াছিলেন—

যঃ শান্ত বৃজিনো রাজা প্রপন্নো জিন শাসনম্।
শুষ্কলেত্র বিতস্তাত্রৌ তস্তার স্তূপ মণ্ডলে॥

(প্রথমস্তরঙ্গঃ।)

হনুমান নাটক, গণেশ পুরাণ প্রভৃতি পুস্তকে অর্হন শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। জৈনদিগের অর্হৎ নাম এই অর্হন শব্দ হইতে উৎপন্ন।

এখন দেখা যাউক বৌদ্ধশাস্ত্র ঐ সম্বন্ধে কি বলে। বৌদ্ধগ্রন্থে মহাবীরকে ২৪টি জৈন তীর্থাঙ্কর ও বুদ্ধের সমকালীন বলা হয়। যে ছয়জন পণ্ডিত বুদ্ধের জীবিতকালে বৌদ্ধমতখণ্ডনের চেষ্টা করেন, মহাবীর তাঁহাদের মধ্যে একজন, এ কথা বৌদ্ধেরা বলে। কল্পসূত্র, আচারাঙ্গসূত্র, উত্তরাধ্যায়ন, সূত্রকৃতাঙ্গ প্রভৃতি শ্বেতাম্বর জৈনগ্রন্থে মহাবীরকে জাতৃপুত্র বলা হইয়াছে। জ্ঞাতৃক এক ক্ষত্রিয়বংশ, মহাবীর এই বংশসম্ভূত। সমস্ত জৈনগ্রন্থে এই জ্ঞাতৃক বংশের উল্লেখ আছে। কোন কোন গ্রন্থে মহাবীরকে বৈশলিক্ বা বৈশল্পিনিবাসী; বৈদেহ বা বিদেহরাজপুত্র এবং কাশ্যপ বা উক্ত গোত্রজাত বলা হয়। কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থে তাঁহাকে নত্তপুত্ত প্রাকৃত নত্ত=সংস্কৃত জ্ঞাতৃক, এবং প্রাকৃতপুত্ত=সংস্কৃত পুত্র নামে অভিহিত করা হইয়াছে। বৌদ্ধ গ্রন্থে জ্ঞাতৃকদিগকে নাদিক বা নাতিক নাম প্রদত্ত হইয়াছে; জৈন

নির্গ্রন্থ বা প্রাকৃত নিগন্থ শব্দেরও ব্যবহার দেখা যায়; এই প্রাকৃত নিগন্থদিগকে নিগন্থনত্তপুত্ত মহাবীরের শিষ্য বলা হয়। দিস্‌বৃত্ত নামক বৌদ্ধগ্রন্থে জৈনের কর্ম্মবাদ, শীতলবারি-ব্যবহার-নিষেধ প্রভৃতি আচারের উল্লেখ আছে। এই আবিষ্কার Buhler ও Jacobiর বহু পরিশ্রমের ফল, প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে তাঁহাদের নিকট আমরা অনেক বিষয়ে ঋণী (Sacred Books of the East, Vol. XLV. দেখ)। মহাভাগ্য, মহাপরিনিভাণসুত্ত, অমুপুত্তরনিকর, সমানফলসুত্ত, সুমঙ্গলবিলাসনি, ললিতবিস্তর প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থে জৈনধর্ম্মের বা জৈননামের ব্যবহার দেখা যায়। মোক্ষমুলর তাঁহার "Six Systems of Philosophy ও Natural Religion" এবং Olden Berg তাঁহার "The Buddha" নামক পুস্তকে মহাবীর বা নত্তপুত্তকে বৌদ্ধের সমকালীন ব্যক্তি বলেন। বহু পরিশ্রমে Jacobi প্রমাণ করিয়াছেন যে, নির্গ্রন্থ শব্দের অর্থ জৈন, (S.B.E., Vol. XIV)। Barth সাহেব ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে জৈনধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের শাখামাত্র একথা বলেন সত্য, কিন্তু ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে Jacobi সে ভ্রম দূর করিয়াছেন। খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে যখন জৈনধর্ম্মের নাম উল্লেখ হইয়াছে, ইহাকে কি প্রকারে বৌদ্ধধর্ম্মের শাখা বা রূপান্তর বলা যাইতে পারে ?

জৈনশাস্ত্র এ সম্বন্ধে কি বলে? দেবানন্দ আচার্য্য প্রণীত দর্শন-সার (সম্বৎ ৯৯০ উজ্জিয়নী নগরে লিখিত) পাঠে জানা যায় যে পার্শ্ব-নাথের সময়ে পিহিতশ্রাবের শিষ্য শাস্ত্রদর্শী সন্ন্যাসী বুদ্ধকৃতি সরযূতীরে পলাশ নগরে তপস্যা করিতেছিলেন। একদিন তিনি একটী ভাসমান মৃতমৎস্য সরযূসলিলে দর্শন করেন। আত্মাবিমুক্ত মৃতজীবভক্ষণে পাপ নাই বিবেচনা করিয়া তিনি আহার করেন, এবং তপস্যা পরিত্যাগ করিয়া রক্তবস্ত্র পরিধান করতঃ বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারে ব্রতী হন। শ্বেতাম্বর সাধু স্বামী আত্মারাম অজ্ঞানতিমিরভাস্করে, দিগম্বর পণ্ডিত শিবচন্দ্র

প্রশ্নোত্তরদীপিকার এবং তৎকালীন সমস্ত জৈন পণ্ডিত দর্শনসারের পূর্ব্বোল্লিখিত গাথা উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, বুদ্ধ প্রথমে এক জৈনসন্ন্যাসী ছিলেন। প্রবৃত্তিদমনে অসমর্থ হইয়া আমিষভোজনেও বিধি দান করেন। রক্তবস্ত্র পরিধান করতঃ নূতন ধর্ম্মপ্রচারে ব্রতী হন।

অতএব এখন দেখা যাইতেছে যে, জৈনধর্ম্ম যে বৌদ্ধধর্ম্মের শাখা, হিন্দুশাস্ত্র একথা বলে না। বদ্রায়ন বুদ্ধের সমকালীন ব্যক্তি, তিনিও একথা বলেন না। বৌদ্ধশাস্ত্রপাঠে জানা যায় যে, জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার এক সময়ে আরম্ভ হয়। কোন কোন গ্রন্থমতে জৈন, বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বে প্রচার হইয়াছিল। বুদ্ধ প্রথমে এক জৈনসন্ন্যাসী ছিলেন, তিনি পিহিত শ্রাবের শিষ্য, জৈনশাস্ত্র এই কথা বলে।

Hunter প্রভৃতি ইয়োরোপীয় ঐতিহাসিকগণ বলেন বুদ্ধ মহাবীরের শিষ্য, জৈনগ্রন্থ একথা অস্বীকার করে। Colebrooke, Stevenson, Major Delamaine, Dr. Hamilton প্রভৃতি পণ্ডিত গৌতমবুদ্ধ এবং জৈন-গৌতম ইন্দ্রভূতিকে একই ব্যক্তি মনে করেন। ইন্দ্রভূতি মহাবীরের প্রধান গণধর ছিলেন, গৌতমবুদ্ধ তাঁহার শিষ্য নহেন। বৌদ্ধ ও জৈন একবাক্যে স্বীকার করেন, বুদ্ধ ও মহাবীর সমকালীন ব্যক্তি। মহাবীর, বৌদ্ধমতখণ্ডনকারী পণ্ডিতদিগের অন্যতম। বুদ্ধ-কীর্ত্তি পার্শ্বনাথের সময় জন্মগ্রহণ করেন, একবার পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। স্বামী আত্মারাম, পার্শ্বনাথ হইতে কবলগাছার পত্রাবলী এইরূপে অঙ্কন করেন—

শ্রীপার্শ্বনাথ।

শুভদত্ত গণধর।

হরিদত্তজী।

আর্য্যসমুদ্র।

শ্রীস্বামীপ্রভাসূর্য্য।

„ কেশীস্বামী।

তিনি বলেন পিহিতশ্রাব প্রভাসূর্য্যের শিষ্য। উত্তরাধ্যয়নসূত্র ও অন্যান্য জৈনগ্রন্থমতে কেশীস্বামী পার্শ্বনাথের পক্ষাবলম্বী ও মহাবীরের সমকালীন ব্যক্তি; অতএব পিহিতশ্রাবের শিষ্য বুদ্ধকীর্ত্তি ও মহাবীর সমকালীন। ধর্ম্মপরীক্ষাপ্রণেতা (সম্বৎ ১০৭০ লিখিত) অমৃতগাত আচার্য্য বলেন পার্শ্বনাথের শিষ্য মোগ্গলায়ন মহাবীরের সহিত কলহ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। তিনি কালদোষে শুদ্ধোধনের পুত্র বুদ্ধকে পরমাত্মাজ্ঞানে স্ব-প্রচারিত ধর্ম্মকে বৌদ্ধ নামে অভিহিত করেন।

রুষ্টঃ শ্রীবীরনাথস্য তপস্বী মৌড়িলায়নঃ।
শিষ্যঃ শ্রীপার্শ্বনাথস্য বিদধে বুদ্ধ দর্শনম্॥ ৬৮।
শুদ্ধোদন সুতং বুদ্ধং পরমাত্মানমব্রবীৎ।
প্রাণিনঃ কুর্ব্বতে কিংন কোপ বৈরি পরাজিতাঃ॥ ৬৯।
(ধর্ম্মপরীক্ষা, অধ্যায় ১৮)।

এই শ্লোকে শিষ্যার্থে শিষ্যপরা শিষ্য।

মহাভাগ্গ পুস্তকপাঠে (pp. 141-150, S. B. E. Vol. XIII.) জানা যায় যে সঞ্জয় নামক পরিব্রাজকের মোগ্গলায়ন ও সরিপুত্ত নামে দুই ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন। ধর্ম্মপরীক্ষার মতে মোগ্গলায়ন পার্শ্বনাথের পরাশিষ্য, সুতরাং সঞ্জয় জৈন ছিলেন। মোগ্গলায়ন মহাবীরের বৈরী ছিলেন, পরে বুদ্ধকে গুরু বলিয়া স্বীকার করেন, অতএব মহাবীর ও বুদ্ধ সমকালীন। কিন্তু ধর্ম্মপরীক্ষা, মহাভাগ্গ এবং শ্রেণিকচরিত্র পুস্তকের মহাবীর অর্হতের পদ অধিকার করিবার পূর্ব্বে বুদ্ধ প্রচারকার্য্যে ব্রতী হন। ধর্ম্মপরীক্ষার উপরোদ্ধৃত শ্লোক দুইটী পাঠে বোধ হয় যে মোগ্গলায়নই বৌদ্ধধর্ম্মের স্থাপক। কিন্তু

ইহা সত্য নহে। শ্লোকদ্বয়ের অর্থ এই যে তিনি শিষ্য হইয়া বুদ্ধের প্রচারকার্য্যে অনেক সহায়তা করেন। বৌদ্ধশাস্ত্রেরও এই মত।

Colebrooke, Buhler ও Jacobi জৈন এবং হিন্দুধর্ম্মের সাদৃশ্য দর্শনে বলেন যে, পার্শ্বনাথ জৈনদিগের আদিগুরু এবং জৈনধর্ম্ম হিন্দু-ধর্ম্মের রূপান্তর মাত্র। জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের সাদৃশ্য দর্শনে Lassen, Weber, Barth এবং Wilson ইহাকে বৌদ্ধধর্ম্মের রূপান্তর মনে করেন। কিন্তু আবার ইহারাই বলেন যে বৌদ্ধশাস্ত্রে জৈনধর্ম্মকে নিগ্রন্থের ধর্ম্ম বলা হইয়াছে, এবং এই নিগ্রন্থধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের বহুপূর্ব্বে প্রচলিত ছিল।

২। জৈনধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের রূপান্তর নহে।

জৈনেরা বলেন যে হিন্দুধর্ম্ম যেমন দেশ, কাল ও প্রকৃতিগত, জৈন-ধর্ম্মও তদ্রূপ, এক অন্যের শাখা বা রূপান্তর নহে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস অজ্ঞাত না হইলেও অতি অল্পমাত্র জানা আছে। লোকের বিশ্বাস প্রাচীন ভরতে হিন্দুধর্ম্ম এবং অনার্য্যদিগের ভূত-প্রেত-উপাসনা ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল না। হিন্দুধর্ম্মে আমরা বৈদিক ধর্ম্ম বুঝিয়া থাকি। বৈদিক বলিদান ব্যতীত যে অন্য প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। এক সম্প্রদায় শিক্ষা দিতেন "অগ্নি-ষোমীয়ং পশুং হিংস্যাৎ" অর্থাৎ যে সকল জীবের দেবতা অগ্নি ও সোম তাহাদিগকে বধ করিবে। আর এক সম্প্রদায় শিক্ষা দিতেন "মা হন্যাদ্ সর্ব্বভূতানি" অর্থাৎ কোন জীব বধ করিবে না। Cowell এবং Gouph সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের ১০ ও ১১ পৃষ্ঠায় আর এক সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেন। তাঁহারা শিক্ষা দিতেন "স্বর্গ নাই, মোক্ষ নাই, পর-লোকে কোন আত্মা নাই। চারিজাতি কর্ম্মের কোন ফল নাই। অজ্ঞ ও কাপুরুষদিগের জীবিকানির্ব্বাহের সুবিধার জন্য অগ্নিহোত্র, তিন

বেদ এবং সন্ন্যাসধর্ম্মের সৃষ্টি। প্রকৃতি স্বয়ং অভাবমোচনের উপায় আমাদিগকে বলিয়া দেন, এ জীবিকানির্ব্বাহের পন্থা প্রকৃতিদত্ত। জ্যোতিষ্টোম প্রথানুসারে হতজীব যদি স্বর্গগামী হয়, উপাসক নিজে পিতাকে কেন বলি প্রদান করেন না? শ্রাদ্ধে যদি মৃতব্যক্তির তুষ্টি সম্পাদন হয়, যাত্রীরা তবে কেন পাথেয় লইয়া দূরদেশ যাত্রা করে? ভূতলে শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদন করিয়া যদি স্বর্গস্থ ব্যক্তিকে আহার প্রদান করা যায়, ছাদোপরি উপবিষ্ট ব্যক্তিকে নিম্নভূমিতে খাদ্য প্রদান কেন করা হয় না? যত দিন জীবন, তত দিন সুখভোগ কর। ঋণ করিয়া ঘৃতাহার কর। দেহ একবার ভস্মে পরিণত হইলে প্রত্যাগমন করিতে পারে না। আত্মা দেহবিযুক্ত হইয়া যদি পরলোক গমন করে, স্নেহ ও মায়াবশে তবে কেন পুনরায় জ্ঞাতি-কুটম্বের নিকট ফিরিয়া আসে না? অতএব আপনাদের লাভের জন্য ব্রাহ্মণেরা শ্রাদ্ধের প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন, ইহার অন্য কোন ফল নাই" ইত্যাদি। বলা বাহুল্য যে এই শিক্ষা চার্ব্বাক-সম্প্রদায়ের।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র যোগসূত্রের প্রস্তাবনায় বলেন যে, সামবেদে এক বলিদানবিরোধী যতির উল্লেখ আছে। তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য ভৃগুকে দান করা হয়। আত্রেয় ব্রাহ্মণের মতে বলিদানবিরোধী যতিকে শৃগালের সম্মুখে প্রক্ষিপ্ত করিতে হইবে। মগধ বা কিরুতে যজ্ঞ, দান প্রভৃতি বিরোধী এক সম্প্রদায় ছিল, (ঋগ্বেদ, ৩ অষ্টক, ৩ অধ্যায়, ২১ বর্গ, ১৪ ঋক দেখ)। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই যে বদ্রায়নের দর্শন বিশ্বাস করিতেন, একথা কেহ বলিতে পারেন না। তাঁহারা সকলে কখনই বেদান্তকথিত ব্রহ্মের উপাসক ছিলেন না। কপিলের ন্যায় অনেকে বিশ্বাস করিতেন "ঈশ্বরাসিদ্ধে।" ভার্গব নামে ঋষি বলেন "ইন্দ্র নাই, কেহ তাঁহাকে কখন দেখে নাই, যাঁহার অস্তিত্বে সন্দেহ, কেমন করিয়া তাঁহার উপাসনা করি? ইহা কেবল

লোকবাদ মাত্র," (ঋগ্বেদ, ৮ মণ্ডল, ১০ অধ্যায়, ৮৯ সূক্ত, ৩ ঋক দেখ)। ৪ ঋকে ইন্দ্র আপনার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছেন, এবং আপন বৈরীদিগকে নাশ করিবেন এইরূপ ভয় প্রদর্শন করিতেছেন। অন্যপক্ষে গৃতসমদ ঋষি বলেন "অনেকে ইন্দ্রের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করে; কিন্তু বাস্তবিক ইন্দ্র আছেন," (ঋগ্বেদ, ২ মণ্ডল, ২ অধ্যায়, ১২ সূক্ত, ৫ ঋক দেখ)। জৈনেরা পরলোকে বিশ্বাস করে, প্রাচীন ভারতে কেহ বিশ্বাস করিত, কেহ বা অবিশ্বাস করিত। Barth বলেন ব্রাহ্মণে কখন কখন পরলোক আছে কিনা এই প্রশ্নের উল্লেখ দেখা যায়। ঋগ্বেদ, ৬ অষ্টক, ৪ অধ্যায়, ৩২ বর্গ, ১০ ঋকে কেকনটের উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহাদের সম্বন্ধে বলা হয় যে এই সুদগ্রাহীরা জগতে সূর্য্যের আলোক দর্শন করে, কিন্তু মৃত্যুর পর ঘোর তমসাচ্ছন্ন লোকে গমন করে। ইহারা নাস্তিক, পরলোক দেখে নাই বলিয়া বিশ্বাস করে না।

প্রাচীন ভারতে বৈদিক বলি প্রদান ব্যতীত যে অন্য প্রকারে উপাসনা ও আরাধনা করা হইত, তাহার শত শত প্রমাণ হিন্দুগ্রন্থ হইতেই দেওয়া যায়। স্থানাভাব বশতঃ কেবল অল্প সংখ্যক শাস্ত্রীয় পদের উল্লেখ করা যাইতেছে। এ কথা সত্য যে অধিকাংশ লোকে বিশ্বাস করিত "স্বর্গকামো যজেত"—স্বর্গকামী বলি প্রদান করিবে। পাতঞ্জলীর যোগসূত্র হইতে কয়েকটী পদ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"অহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যা পরিগ্রহা যমাঃ।"

২য় পদ, ৩০ সূত্র। "এতে জাতি দেশকাল সময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্ব্বভৌম মহাব্রতম্। ৩১ সূত্র (রাজেন্দ্র লাল মিত্রের অনুবাদ পৃঃ ৯৩ দেখ)। "অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎ সন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ," ৩৫ সূত্র। "সত্য প্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়া ফলম্," ৩৬ সূত্র।" "তদ্বচনাৎ যস্য কস্যচিৎ ক্রিয়া ... [illegible] ... ফলং ভবতি" ইত্যাদি। যোগদর্শনের মতে

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ প্রভৃতি কর্ম্মফল স্বর্গকামীর পকারী।

সাংখ্যদর্শন—

"অবিশেষশ্চোভয়োঃ," ৬ সূত্র; অর্থাৎ দুয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই দুঃখ এবং যন্ত্রণা দূর করিবার দৃশ্যমান ও বৈদিক উপায়ের কোন ভেদ নাই)। কেন? কারণ বৈদিক বলিদান নিষ্ঠুর প্রথামাত্র। জ্ঞে পশু হনন করিলে কর্ম্মদোষ হয়, এজন্য পুরুষের কোন লাভ নাই। মাহিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি," "অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভ্তে," "দৃষ্ট বদানুশ্রবিকঃ বিশুদ্ধি ক্ষয়াতিশয় যুক্তঃ"; সাংখ্য কারিক, ২। গৌড়পদ সাংখ্য রিকার ভাষ্যে নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া কপিলের মতের মর্থন করেন—"তৈতেতদ্বহুশোভ্যস্তং জন্ম জন্মান্তরেষ্বপি।

"ত্রয়ী ধর্ম্ম মধর্মটয়ং ন সম্যক প্রতিভাতিমে" অর্থাৎ হে পিতঃ, মানে ও গতজীবনে আমি বৈদিক ধর্ম্ম আলোচনা করিয়াছি। মি এ ধর্ম্মের পক্ষপাতী নহি, কারণ ইহা অধর্ম্মে পূর্ণ। কপিল-ত্রের ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু, মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে নিম্নলিখিত াকটী উদ্ধৃত করিয়া, কপিলমতের সমর্থন করেন—

তস্মাদ্যাম্যহং তাত দৃষ্টেবং দুঃখ সন্নিধিম্।
ত্রয়ী ধর্ম্ম মধমাটয়ং কিং পাকফল সন্নিভম্॥"

অর্থাৎ হে মৃগ, বৈদিক ধর্ম্ম সর্ব্বপ্রকার অধর্ম্ম ও নিষ্ঠুরতায় র্ণ দেখিয়া আমি কেমন করিয়া ইহার অনুকরণ করি? দিক ধর্ম্ম পাকফলের ন্যায় বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে কিন্তু অন্তরে লাহলে পূর্ণ। মহাভারত ও চার্ব্বাক দর্শনের মত পূর্ব্বেই উল্লেখ া হইয়াছে। *অশ্বমেধ পর্ব্ব, অনুগীত, ৪৯ অধ্যায় ২—১২ শ্লোকের লকণ্ঠকৃত টীকা পাঠ কর।

জৈন গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্ত অনেক পাওয়া যায়। প্রাচীন কালে দিগম্বর ঋষি ঋষভ "অহিংসা পরমো ধর্ম্ম" শিক্ষাদান করেন। তাঁহার শিক্ষা দেব, মনুষ্য ও ইতর প্রাণীর অনেক উপকার সাধন করিয়াছে। তৎকালে ৩৬৩ জন পাষণ্ড ধর্ম্ম-প্রচারক ছিলেন, চার্ব্বাকের নেতা শুক্র বা বৃহস্পতি তাঁহাদের মধ্যে একজন। দ্বাপর যুগের শেষকালে ভারতে যে ধর্ম্মবিপ্লব হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ৩৬৩ জন ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী ধর্ম্ম প্রচারক সত্যানুসন্ধীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন। মোক্ষমূলর প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণেরও এই ধারণা। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ৭৬ বৎসর বয়সে মোক্ষমূলর বলিতেছেন—"It would be a mistake to imagine that there was a continuing development into the various meanings assumed by or assigned to such pregnant terms as Prajapati, Brahman or even Atman. It is much more in accordance with what we learn from the Brahmans and Upanishads of the intellectual life of India to admit *infinite number of intellectual centres* of thought scattered all over the country, in which either the one or the other view found influential advocates. The Sutras which we possess of six systems of philosophy, each distinct from the other, cannot possibly claim to represent the very first attempts at a systematic treatment, they are rather the last summing up of what had been growing up during *many generations of isolated thinkers* &c."

অতএব প্রাচীন ভারতে যে নানা দর্শন ও নানা ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল,

দেখিতে পাওয়া যায়, তখন যাঁহারা বলেন যে প্রাচীন ভারতে বৈদিক-ধর্ম্ম ও ভুত প্রেত পূজা ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল না, তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। জৈন ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ইহার শাখা বা রূপান্তর নহে। বিশেষতঃ প্রাচীন ভারতে ধর্ম্মান্তর হইতে গ্রহণ করিয়া নূতন এক ধর্ম্মপ্রচার প্রথা ছিল না। মোক্ষ মূলরেরও এই মত। তিনি বলেন "If we are right in the discription we have given of the unrestrained and abundant growth of philosophical ideas in ancient India, *the idea of borrowing so natural to us, seems altogether out of place in ancient India.* A wild mass of guesses at truth was floating in the air··· Hence we have as little right to maintain that Buddha borrowed from Kapila as that kapila borrowed from Buddha &c." মোক্ষমূলর যিনি আজীবন বৈদিক ও বৌদ্ধ সাহিত্য চর্চ্চা করিয়াছিলেন, ৭৬ বৎসর বয়সে এই কথা বলেন। আক্ষেপের বিষয়, অবসরাভাবে তিনি জৈন সাহিত্যের কোন উপকার সাধন করিতে পারেন নাই।

৩। পার্শ্বনাথ জৈনধর্ম্মের প্রথম প্রচারক নহেন।

লোকের এই ভ্রম বিশ্বাস যে পার্শ্বনাথ জৈনধর্ম্মের স্থাপক। কিন্তু ঋষভদেব ইহা প্রথমে প্রচার করেন। ইহার প্রমাণের অভাব নাই।

বৌদ্ধশাস্ত্রে জৈনধর্ম্মের আদি প্রবর্ত্তককে তাহার কোন উল্লেখ নাই। ইহার কারণ এই যে শেষ তীর্থাঙ্কর মহাবীরের সময় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হয়। মহাবীরকে বৌদ্ধেরা নিগ্রন্থদিগের নায়কমাত্র বলেন। Dr. Jacobi এই মতের সমর্থন করেন।

জৈনশাস্ত্র মতে ঋষভদেবের সংসারত্যাগ ও সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণকালে চারি সহস্র নরপতি তাঁহার অনুগামী হয়েন। কিন্তু তাঁহারা ঋষভের

জৈন গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্ত অনেক পাওয়া যায়। প্রাচীন কালে দিগম্বর ঋষি ঋষভ "অহিংসা পরমো ধর্ম্ম" শিক্ষাদান করেন। তাঁহার শিক্ষা দেব, মনুষ্য ও ইতর প্রাণীর অনেক উপকার সাধন করিয়াছে। তৎকালে ৩৬৩ জন পাষণ্ড ধর্ম্ম-প্রচারক ছিলেন, চার্ব্বাকের নেতা শুক্র বা বৃহস্পতি তাঁহাদের মধ্যে একজন। দ্বাপর যুগের শেষকালে ভারতে যে ধর্ম্মবিপ্লব হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ৩৬৩ জন ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী ধর্ম্ম প্রচারক সত্যানুসন্ধীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন। মোক্ষমূলর প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণেরও এই ধারণা। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ৭৬ বৎসর বয়সে মোক্ষমূলর বলিতেছেন—"It would be a mistake to imagine that there was a continuing development into the various meanings assumed by or assigned to such pregnant terms as Prajapati, Brahman or even Atman. It is much more in accordance with what we learn from the Brahmans and Upanishads of the intellectual life of India to admit *infinite number of intellectual centres* of thought scattered all over the country, in which either the one or the other view found influential advocates. The Sutras which we possess of six systems of philosophy, each distinct from the other, cannot possibly claim to represent the very first attempts at a systematic treatment, they are rather the last summing up of what had been growing up during *many generations of isolated thinkers* &c." অতএব প্রাচীন ভারতে যে নানা দর্শন ও নানা ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যখন ৩৬৩ জন ধর্ম্মপ্রচারকের উল্লেখ

দেখিতে পাওয়া যায়, তখন যাঁহারা বলেন যে প্রাচীন ভারতে বৈদিক-ধর্ম্ম ও ভূত প্রেত পূজা ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল না, তাঁহা-দিগকে ভ্রান্ত ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। জৈন ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ইহার শাখা বা রূপান্তর নহে। বিশেষতঃ প্রাচীন ভারতে ধর্ম্মান্তর হইতে গ্রহণ করিয়া নূতন এক ধর্ম্মপ্রচার প্রথা ছিল না। মোক্ষ মূলরেরও এই মত। তিনি বলেন "If we are right in the discription we have given of the unrestrained and abundant growth of philosophical ideas in ancient India, *the idea of borrowing so natural to us, seems altogether out of place in ancient India.* A wild mass of guesses at truth was floating in the air··· Hence we have as little right to maintain that Buddha borrowed from Kapila as that kapila borrowed from Buddha &c." মোক্ষমূলর যিনি আজীবন বৈদিক ও বৌদ্ধ সাহিত্য চর্চ্চা করিয়াছিলেন, ৭৬ বৎসর বয়সে এই কথা বলেন। আক্ষেপের বিষয়, অবসরাভাবে তিনি জৈন সাহিত্যের কোন উপকার সাধন করিতে পারেন নাই।

৩। পার্শ্বনাথ জৈনধর্ম্মের প্রথম প্রচারক নহেন।

লোকের এই ভ্রম বিশ্বাস যে পার্শ্বনাথ জৈনধর্ম্মের স্থাপক। কিন্তু ঋষভদেব ইহা প্রথমে প্রচার করেন। ইহার প্রমাণের অভাব নাই।

বৌদ্ধশাস্ত্রে জৈনধর্ম্মের আদি প্রবর্ত্তককে তাহার কোন উল্লেখ নাই। ইহার কারণ এই যে শেষ তীর্থাঙ্কর মহাবীরের সময় বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হয়। মহাবীরকে বৌদ্ধেরা নিগ্রন্থদিগের নায়ক-মাত্র বলেন। Dr. Jacobi এই মতের সমর্থন করেন।

জৈনশাস্ত্র মতে ঋষভদেবের সংসারত্যাগ ও সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণকালে চারি সহস্র নরপতি তাঁহার অনুগামী হয়েন। কিন্তু তাঁহারা ঋষভের

কঠোর নিয়ম পালনে অসমর্থ হইয়া অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত হন। ইহাদেরই মধ্যে ৩৬৩ জন পাষণ্ডধর্ম্ম প্রচারক হয়েন। চার্ব্বাক দর্শনের নেতা শুক্র বা বৃহস্পতি তাঁহাদের অন্যতম। জৈনমতে ঋষভদের প্রথম প্রচারক। ৩৬৩ জনের ধর্ম্মপ্রচার হইতে ভারতের তদানিন্তন বুদ্ধি-বৃত্তির প্রাখর্য্য ও কার্য্যকারিতা সহজে উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

হিন্দু ও জৈনশাস্ত্র এবিষয়ে একমত। ভাগবৎ পুরাণ, ৫ স্কন্ধ, ৩-৬ অধ্যায়ে ঋষভের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ভাগবতের মত স্বয়ম্ভু মুনি চতুর্দ্দশ মুনির প্রথম। যখন ব্রহ্মা দেখিলেন যে জগতে লোকবৃদ্ধি হইতেছে না, তিনি স্বয়ম্ভূমুনি ও তাঁহার সত্যরূপাকে সৃজন করেন। স্বয়ম্ভূর পুত্র প্রিয়বতার, পৌত্র অগ্নিধ্র এবং প্রপৌত্র নভি। নভি মারুদেবীকে বিবাহ করেন, ঋষভ তাঁহাদের পুত্র। ভাগবতে ঋষভকে দিগম্বর ও জৈন সম্প্রদায়ের আদি বলা হইয়াছে। ঋষভের জন্মকাল জগতের বাল্যাবস্থায়, তিনি স্বয়ম্ভুর অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। এক মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতি কৃতযুগ, ঋষভ প্রথম কৃতযুগের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন। ভাগবৎ, ৬ অধ্যায়, ৯-১১ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে যে কোঙ্ক, বেঙ্ক ও নটের রাজা অর্হৎ ঋষভের চরিত্র (ধর্ম্মনিয়ম) শ্রবণ করিয়া কলিযুগে ব্রাহ্মণবিদ্বেষী এক নূতন ধর্ম্ম প্রচারের মানস করেন। আমি কিন্তু অন্য কোন গ্রন্থে এমন কোন রাজার নাম পাই নাই। অর্হৎকে অন্য কোন গ্রন্থকার কোঙ্ক, বেঙ্ক ও নটের রাজা বলেন না। অর্হৎ অর্থে প্রশংসার্হ (যদি অর্হধাতু হইতে সিদ্ধ করা যায়) বা শত্রুনাশক (যদি অরিহন্ত এই ব্যুৎপত্তি হয়)। শিবপুরাণে অর্হৎ শব্দের ব্যবহার হইয়াছে, কিন্তু অর্হৎ নামে কোন রাজার নাম নাই। ঋষভকে অর্হৎ বলা হইত, কারণ তিনি প্রশংসার্হ ও কর্ম্মরূপ শত্রুহন্তা। অর্হৎ রাজা কলিযুগে জৈনধর্ম্মের প্রচারক হইলে, বাচস্পত্যে ঋষভকে জিনদেব এবং শব্দার্থ চিন্তামণিতে আদি জিনদেব কখন বলা হইত না।

কোন কোন উপনিষদেও ঋষভকে অর্হৎ বলা হইয়াছে। ভাগবৎ রচয়িতা কেন একথা বলেন তাহা বলা যায় না। অর্হৎ রাজা ঋষভের চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া জৈনধর্ম্ম প্রচার করেন, একথা সত্য হইলেও ঋষভের চরিত্রই জৈনধর্ম্মের বীজ স্বীকার করিতে হইবে। মহাভারতের সুবিখ্যাত টীকাকার, শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্ম্ম ২৬৩ অধ্যায়, ২০ শ্লোকের টীকায় বলেন অর্হৎ অর্থাৎ জৈনেরা ঋষভের চরিত্রে মুগ্ধ হইয়াছিল— পুরাণেবা "ঋষভাদীনাং মহাযোগিনা মাচারং দৃষ্ট্বা অর্হতা দয়ো মোহিতাঃ পাষণ্ড মার্গ মনুগতাঃ"। ইত্যুক্তম্। উক্ত অধ্যায়ে তুলাধর ও জাজালির কথোপকথন বর্ণিত আছে। তুলাধর অহিংসা সমর্থন, জাজালি তাহার খণ্ডন করিতেছেন।' এখন দেখা যাইতেছে যে হিন্দুশাস্ত্রমতে ঋষভই জৈনধর্ম্মের প্রথম প্রচারক।

Dr. Fuhrer মথুরার যে সমস্ত প্রস্তরখোদিত ইতিবৃত্ত উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে জানা যায় যে পুরাকালে জৈনেরা ঋষভের মূর্ত্তি পূজা করিত। Epigraphia Indica, Vols I. and II এ সেগুলি অনুবাদসহ মুদ্রিত হইয়াছে। অন্ততঃ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, কাণিষ্ক, হবষ্ক, বাসুদেব প্রভৃতি নরপতির রাজত্বকালে খোদিত হইয়াছিল। স্থানাভাব বশতঃ এখানে সমস্ত উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। Vol I, p 389, No VIII এ লেখা আছে : 'May the divine (and) glorious Rishabha be pleased" ; Vol. I. p. 389, No. XIV. At the request of his female people, the venerable Sama, (was dedicated an image of Rishabha)" ; Vol. II, p. 206-207, No. XVIII. : "Adoration to divine Rishabha," ইত্যাদি। অতএব দেখা যাইতেছে যে দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঋষভকে প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। মহাবীরের মোক্ষকাল খৃঃ পূঃ ৫২৬, এবং পার্শ্বনাথ খৃঃ পূঃ

হইতে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। যদি তাঁহারা জৈনধর্ম্মের প্রচারক হইতেন, দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে লোকে ঋষভের মূর্ত্তি পূজা করিত না।

৪। জৈন-দর্শন।

জৈনদর্শনানুসারে জগৎ অনন্তকাল হইতে বিরাজমান। জগতের স্রষ্টা কেহ নাই। লোক ও অলোক এই দুইভাগে জগৎ বিভক্ত। লোকের আবার তিন উপবিভাগ—ঊর্দ্ধকাল বা স্বর্গ, মধ্যলোক বা পৃথিবী এবং পাতাললোক বা নরক। জীব ও অজীব লইয়া জগৎ। জীব ছয় প্রকার;—পৃথিবী জীব, অগ্নি জীব, বায়ু জীব, বারি জীব, বনস্পতি এবং জঙ্গম জীব বা ত্রিস। জঙ্গম জীব চারি শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা, দ্বি-ইন্দ্রিয়, ত্রি-ইন্দ্রিয়, চত্বারি-ন্দ্রিয় এবং পঞ্চে-ন্দ্রিয় পঞ্চেন্দ্রিয় জীব দুই প্রকার—জ্ঞানি বা মনবিশিষ্ট, ও অজ্ঞানি বা মন-বিবর্জ্জিত। পঞ্চেন্দ্রিয় জীবের মধ্যে মনুষ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; এবং কেবল মনুষ্যই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইতে পারে। সর্ব্বোচ্চ স্বর্গবাসী জীব মোক্ষ-প্রাপ্ত হইতে পারে না। জিন বা অর্হৎ হইতে হইলে মানবরূপে জন্মগ্রহণ আবশ্যক। অজীব পাঁচ প্রকার, যথা— পুদগল (পদার্থ), ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কাল এবং আকাশ।

জীব (আত্মা) এবং পুদগলের (পদার্থ) সম্মিলনে প্রাণীর উৎপত্তি। আত্মা ও পদার্থের এই সম্মিলন অনন্ত। কর্ম্ম পদার্থ মাত্র। কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ আত্মাকে জন্ম হইতে জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয়। নূতন কর্ম্মের আগমের নাম অশ্রাব। তদ্দ্বারা আত্মার বন্ধনের নাম বন্ধ। নব-কর্ম্মাগমের প্রতিবন্ধকতা সম্বর। অতীত কর্ম্ম ফল হইতে অব্যাহতি নির্জ্জর। মোক্ষ শেষাঙ্ক।

জৈনেরা সপ্ততত্ত্বে বিশ্বাস করে পাপ ও পুণ্য যুক্ত সপ্ততত্ত্বকে নব পদার্থ বলে। জীব বা আত্মা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, অনন্ত এবং

অসংখ্য গুণবিশিষ্ট। কর্ম্মও পদার্থ, কর্ম্ম আত্মাকে আবদ্ধ এবং সমস্ত গুণকে আবৃত করে। কর্ম্মাবদ্ধ আত্মার আত্মবিস্মৃতি হয়। আপনার স্বরূপ ভুলিয়া আপনাকে অন্য কিছু জ্ঞান করে। এই আত্মার নাম বহিরাত্মা। কর্ম্ম আট প্রকার। জ্ঞানবর্ণ্য কর্ম্ম জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করে, দর্শনবর্ণ্য কর্ম্ম দর্শনকে ইত্যাদি। আয়ু কর্ম্ম এই অষ্ট কর্ম্মের অন্যতম। জীবন ও মৃত্যু এক আয়ু কর্ম্মের অবসান ও অন্য এক আয়ুকর্ম্মের প্রারম্ভ মাত্র। কোন প্রাণীর এক আয়ুকর্ম্ম শেষ হইলে, আত্মা দেহত্যাগ করে, এবং ইহারই নাম মৃত্যু। দেহবিমুক্ত আত্মার দেহান্তরে প্রবেশের নাম জন্ম। এইরূপ কর্ম্মাধীন আত্মা দেহ হইতে দেহান্তর আশ্রয় করিতে থাকে, অবশেষে আত্মার এমন এক অবস্থা উপস্থিত হয়, যে ইহা কর্ম্ম বিমুক্ত হয়, এবং আপন লুপ্ত ও কর্ম্মাচ্ছাদিত গুণ প্রাপ্ত হইয়া জিন বা অর্হৎরূপে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। মোক্ষের অনন্ত সুখ ও শান্তি আত্মা আপনাতেই ভোগ করে।

দেশ, কাল, পাত্রভেদে নানা মহামুনি, "আমি কে ?" "আমি কি ?" "আমি কোথা হইতে আসিয়াছি এবং কোথায় যাইব ?" "সমস্ত পদার্থের শেষ কি ?" প্রভৃতি প্রশ্নের নানা প্রকার উত্তর প্রদান করিয়াছেন। এই সকল প্রশ্নের মীমাংসাই দর্শন। এই হেতু নানা প্রকার ধর্ম্মও প্রচলিত। প্রাচীন জৈন তীর্থঙ্করগণও এই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদানের চেষ্টা করিয়াছেন। "আমি কে ?" "জগৎ কি ?" ইহার উত্তরে তাঁহারা বলেন আত্মা, কর্ম্ম ও জগৎ অনন্ত ; ইহার স্রষ্টা বা সংহারক কেহ নাই, আত্মা আপন কর্ম্মফল ভোগ করে। আমাদের অদৃষ্ট আমাদের উপর নির্ভর করে। এইজন্য জৈনেরা ঈশ্বরের উপাসনা ও আরাধনা অনাবশ্যক জ্ঞান করে। কর্ম্মফলই, তাহাদের বিবেচনায়, মোক্ষের হেতু ও স্বর্গ। তাঁহারা ঈশ্বরকে কর্ম্মানুযায়ী পুরস্কার ও শাস্তিদাতা স্বীকার করে না। ঈশ্বরের এ ক্ষমতাও নাই।

আরাধনা ও উপাসনায় তুষ্ট ঈশ্বরকে তাহারা ইতর প্রকৃতির মনুষ্য মনে করে। জৈন শাস্ত্রানুসারে মানবাত্মা ও কল্পিত ঈশ্বর একই ব্যক্তি, নির্ব্বাণপ্রাপ্ত আত্মাই ঈশ্বর, এই আত্মা সর্ব্বজ্ঞ, অনন্ত ও অন্যান্য বহু গুণবিশিষ্ট। কিন্তু আবার জৈনেরা আপনাদিগকে নাস্তিক বলিয়া স্বীকার করে না। তাহারা বলে যে, মানবাত্মায় ঈশ্বরের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়; ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা অন্য অন্য সম্প্রদায় হইতে বিভিন্ন মাত্র। ইহাই জৈন দর্শন। মাধবের "সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে জৈন" দর্শনের আলোচনা করা হইয়াছে।

৫। জৈন শিক্ষা।

জীবাদি পূর্ব্বোক্ত রহস্যভেদের নাম সম্যক দর্শন, রহস্যজ্ঞানের নাম সম্যক জ্ঞান এবং জ্ঞানানুযায়ী আচরণের নাম সম্যক চরিত্র। সম্যক দর্শন, জ্ঞান ও চরিত্রকে রত্নত্রয়ী বলা হয়।

সম্যক দর্শন ও জ্ঞান সম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। সম্যক চরিত্র কি, অর্থাৎ কিরূপ চরিত্র হইলে জৈন মোক্ষ লাভ করে? এই চরিত্র দুই প্রকার, শ্রাবক চরিত্র ও মুনি চরিত্র। শ্রাভগী বলিয়া কোন শব্দ নাই। অজ্ঞ লোকে শ্রাবকের অপভ্রংস শ্রাভ্যা বলিয়া থাকে। শ্রাবক দুই প্রকার, অব্রতী শ্রাবক (যাঁহারা ব্রত গ্রহণ করিয়া আপন চরিত্র রক্ষা করিতে পারেন না) এবং ব্রতী শ্রাবক (যাঁহারা ব্রত গ্রহণ করিয়া আপন চরিত্র সংরক্ষণ করেন)। একাদশ প্রতিমার সমষ্টিই ব্রতী-শ্রাবকের চরিত্র। এই একাদশ প্রতিমা ক্রমোন্নত। প্রথম হইতে পঞ্চম প্রতিমা পালনকারী জঘন্য শ্রাবক, ষষ্ঠ হইতে অষ্টম প্রতিমা পালন-কারী মধ্যম শ্রাবক, এবং নবম হইতে একাদশ প্রতিমা পালনকারী উৎকৃষ্ট শ্রাবক নামে অভিহিত। কোন শ্রেণীর শ্রাবককে কি প্রতিজ্ঞা করিতে হয় তাহা নিম্নে লেখা যাইতেছে—

(১) দর্শন প্রতিমা—আমি সত্যদেব, গুরু ও ধর্ম্মে বিশ্বাস করিব।

আমি অষ্টমূল গুণ পালন করিব, অর্থাৎ আমি ত্রি-মকার বা মৎস্য, মত্ত ও মধু স্পর্শ করিব না, ও পঞ্চ উদম্বর বা পিপ্ল (অশ্বত্থ,, বর (বট) উম্বর, কথুমর এবং পাকড় ফল গ্রহণ করিব না। আমি দূত ক্রীড়া (জুয়া) মাংস ভোজন, মদ্যপান, বেশ্যা গমন, চৌর্য্য, মৃগয়া ও পরস্ত্রীগমন এই সপ্ত বিষয় পরিহার করিব। আমি প্রত্যহ মন্দিরে গমন করিব।

(২) এই ব্রত প্রতিমা—আমি নিম্নলিখিত দ্বাদশ ব্রত পালন করিব; (ক) আমি জীব হিংসা করিব না এবং জীবকে কষ্ট দিব না; (খ) আমি পরস্ত্রী গমন করিব না; (গ) আমি চুরি করিব না; (ঘ) আমি আপন সম্পত্তির সীমা নির্দ্দিষ্ট করিব; (ঙ) আমি মিথ্যা কথা বলিব না; (চ) আমি আপন গন্তব্য দিশা নির্দ্দেশ করিব; (ছ) আমি অনর্থ দণ্ড দিব না এবং উদ্দেশ্য বিহীন কার্য্য করিব না, কিম্বা এমন কর্ম্ম করিব না যাহাতে অন্য কেহ দণ্ডার্হ হয়; (জ) আমি প্রাত্যহিক ভোগ বিলাসের সংখ্যা স্থির করিব; (ঝ) আমি প্রত্যহ কোথায় ও কতদুর যাইব তাহা স্থির করিব, (ঞ) আমি সম্যক পালন করিব, (ট) অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে উপবাস রক্ষা করিব; (ঠ) আমি চারি প্রকার দান করিব এবং সমাধি মরণে মরিব (মৃত্যুকালে বিষয়-ভোগ লালসা ও জগতের মায়া ত্যাগকে সমাধিমরণ কহে)।

(৩) সামায়ক প্রতিমা—আমি কোন নির্দ্দিষ্টকালের জন্য প্রত্যহ তিনবার সামায়ক করিব।

(৪) প্রোষাধোপবাস-প্রতিমা—আমি প্রত্যেক অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে ষোড়শ প্রহর পর্য্যন্ত উপবাসী রহিব।

(৫) সচিত্ত-ত্যাগ-প্রতিমা—আমি হরিৎ (green) ফলমূল আহার করিব না।

(৬) নিশভোজন-ত্যাগ-প্রতিমা—আমি রাত্রিকালে চারি প্রকার খাদ্য গ্রহণ, দান বা অন্য কাহাকে গ্রহণ করিতে সাহায্য করিব না।

(৭) ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিমা—আমি স্ত্রীসহবাস, ভূষণ ও সুগন্ধি ব্যবহার করিব না।

(৮) আরম্ভ-ত্যাগ-প্রতিমা—আমি সকল প্রকার কার্য্য, ব্যবসা ও বাণিজ্য হইতে বিরত হইব।

(৯) পরিগ্রহ-ত্যাগ-প্রতিমা—আমি বাহ্যিক ও আন্তরিক পরিগ্রহ সমূহ ত্যাগ করিব।

(১০) অনুমোদন-ব্রত-প্রতিমা—আমি সাংসারিক কার্য্য এবং অনামন্ত্রিত কোন খাদ্য গ্রহণ করিব না।

(১১) উদ্দিষ্ট ব্রত প্রতিমা—এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণকালে সন্ন্যাসী বেশ ধারণ করিতে হয়। ঐলক বা ক্ষুল্লকক শ্রাবকের হইতে হয়। ঐলক শ্রাবক কপ্নী পরিধান ও কমণ্ডলু গ্রহণ করতঃ অরণ্যে সাধুসঙ্গ করেন এই প্রথা। ক্ষুল্লকক শ্রাবক এক বস্ত্র বা চাদর পরিধান ও কমণ্ডলু গ্রহণ করিয়া, মঠ, মণ্ডপ বা মন্দিরে বাস করিবেন এই নিয়ম।

পূর্ব্বোক্ত একাদশ প্রতিমা ব্যতীত প্রত্যেক জৈন দশলক্ষণীধর্ম্ম পালন করিতে বাধ্য। দশ লক্ষণী ধর্ম্ম এই :—

(১) উত্তম ক্ষমাধর্ম্ম—ক্রোধ দমন, অপমান ও ক্ষতিসহ্য এবং ক্ষমা করণ।

(২) মার্জব ধর্ম্ম—অহঙ্কার ত্যাগ।

(৩) আর্জব ধর্ম্ম—শঠতা ও প্রবঞ্চনা পরিহার।

(৪) সত্য ধর্ম্ম—সত্যবাদী হওন।

(৫) শৌচধর্ম্ম—আত্মাকে পবিত্র ও কুচিন্তা পরিত্যাগ এবং স্নানাদি দ্বারা দেহ পরিষ্কার করণ।

(৬) সংযম ধর্ম্ম—পঞ্চ অনুব্রতী (minor vows), পঞ্চ সমিতি ও তিন গুপ্তি পালন এবং পঞ্চেন্দ্রিয় দমন।

(৭) তপধর্ম্ম—দ্বাদশ প্রকার তপস্যাচরণ।

(৮) ত্যাগধর্ম্ম—কুচিন্তা পরিহার, অর্থলালসা ত্যাগ ও দানাদি কর্ম্মানুষ্ঠান।

(৯) অকিঞ্চনধর্ম্ম—জগতে আত্মাতিরিক্ত সম্বলান্তর নাই বিশ্বাস করণ।

(১০) ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম—আত্মাচিন্তারতি ও পরস্ত্রীগমন বিরতি।

ইহা ব্যতীত প্রত্যেক জৈনের দ্বাদশ অনুপ্রেক্ষণ, ভবনা বা বিষয় চিন্তা করা উচিত।

(১) অনিত্য অণুপ্রেক্ষণ—জাগতিক সমস্ত পদার্থ রূপান্তরশীল, অতএব এই অনিত্য জগতের জন্য আমি উৎসুক হইব না।

(২) অশরণ অণুপ্রেক্ষণ—জগতে বিপদ ও মৃত্যুকালে সহায়কারী আমার কেহ নাই। আমাকে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে।

(৩) সংসার অণুপ্রেক্ষণ—পূর্ব্ব জন্মে আমি মনুষ্য, দেবতা, নকী বা ত্রিয়ঞ্চরূপে দুঃখ ভোগ করিয়াছি। এ জীবনে আমাকে দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা করিতে হইবে।

(৪) একত্ব অণুপ্রেক্ষণ—জগতে আমি একাকী এবং অসহায়।

(৫) অন্যত্ব অণুপ্রেক্ষণ—জাগতিক সমস্ত পদার্থ আমা হইতে পৃথক।

(৬) অশুচি অনুপ্রেক্ষণ—অশুচি পদার্থ পূর্ণ দেহের জন্য গর্ব্ব করা অনুচিত।

(৭) আশ্রব অনুপ্রেক্ষণ—আমি কায়মনোবাক্যে এমন কিছু করিব না যাহা নব কর্ম্মোৎপাদক।

(৮) সম্বর অনুপ্রেক্ষণ—ভবিষ্যতে আত্মা বন্ধকারী কর্ম্মের প্রতিরোধ করিবার উপায় করিব।

(৯) নির্জরা অনুপ্রেক্ষণ—অতীত কর্ম্ম বন্ধন হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করিব।

(১০) লোক অনুপ্রেক্ষণ—জগৎ কি? পদার্থ কি? তত্ত্ব কি? এই সকল চিন্তা করিব।

(১১) বোধ দুর্লভ অনুপ্রেক্ষণ—এই জগতে রত্নত্রয়ীধর্ম্ম ব্যতীত সমস্তই সহজ-লভ্য এইরূপ চিন্তা করিব।

(১২) ধর্ম্ম অনুপ্রেক্ষণ—রত্নত্রয়ীধর্ম্মই জগতে প্রকৃত সুখের মূল।

জৈনধর্ম্মের সারশিক্ষা এই—এ জগতের সুখ, শান্তি ও ঐশ্বর্য্য মনুষ্যের চরম উদ্দেশ্য নহে। জগৎ হইতে যতদূর পার নির্লিপ্ত থাক। আত্মার মঙ্গল কামনা কর। তুমি যখন কোন সৎকার্য্যেব্রতী হও, তুমি কে ও কি এই বিষয় স্মরণ রাখিবে। ইহা পরলোক-মোক্ষবিশ্বাস-কারী জৈনীর ধর্ম্ম। জাগতিক ভোগবিলাসেচ্ছা জৈনধর্ম্মের বিরোধী। আত্মত্যাগ, স্বার্থত্যাগ ও সুখত্যাগ (ত্যাগই) এই ধর্ম্মের ভিত্তি।

জৈনধর্ম্ম অশুচি আচরণের সমষ্টি একথা সত্য নহে। একথা সত্য যে ধুন্দিয়া নামে এক শ্রেণী অজ্ঞ জৈন আছে। শ্বাসগ্রহণ এবং কথা বার্ত্তার সময় কীটাদি যাহাতে মুখে প্রবেশ করিতে না পারে, এজন্য একখণ্ড বস্ত্রে মুখ আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। তাহারা অপরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করে, স্নানাদি প্রায়ই করে না। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প। দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর এই দুই শ্রেণীতে জৈনসম্প্রদায় বিভক্ত, এই দুই শ্রেণীর জৈনশুদ্ধাচারী। কলিকাতার রাস্তায় ধুন্দিয়া জৈন দেখিয়া, আমরা জৈনাচার সম্বন্ধে নানাপ্রকার কুসংস্কারে পতিত হই।

জৈনমুনিচরিত্র কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। দিগম্বর জৈনমুণিকে উলঙ্গাবস্থায় অরণ্যেবাস; মৃত্তিকায় শয়ন, সম্মুখে চারিহস্ত পরিমিত স্থান দর্শন করিয়া গমন, ৪৬ দোষ ও ৩২ অন্তরল পরিহার করিয়া একাহার করিতে হয়। কেশবৃদ্ধি হইলে উৎপাটন এবং ২২ পরিসহ বা দুঃখ সহ্য করা বিধি। চতুর্দ্দশ আভ্যন্তরিক এবং দশ বাহ্যিক পরিগ্রহ পরিত্যাগ করতঃ নির্গ্রন্থ হইবে।

সর্ব্বদা ধর্ম্মধ্যান ও শুক্লধ্যানে (আত্মচিন্তায়) মগ্ন থাকিবে। শ্বেতাম্বর জৈনমুণি শ্বেতবস্ত্র পরিধান, নগরে বাস ও শয্যায় শয়ন করিতে পারে। ধর্ম্মধ্যান অর্থে দশ লক্ষণীধর্ম্ম, দ্বাদশ প্রকার তপ, ত্রয়োদশ চরিত্র, ছয় অবশাক্ত এবং দ্বাদশ ভবন বা অনুপ্রেক্ষার আচরণ।

জৈনশাস্ত্রমতে যতদিন না জৈনসাধু আপন উলঙ্গাবস্থা ভুলিতে পারেন, ততদিন তাঁহার মোক্ষ হয় না। এই জন্য জৈনসন্ন্যাসী উলঙ্গ থাকেন। যখন তিনি আপন উলঙ্গাবস্থা বিস্মৃত হন, তখন তিনি ভবসিন্ধু পার হইতে পারেন। জ্ঞান ও চিন্তা লইয়া জৈনধর্ম্ম। মোক্ষ ও ইহার উপর নির্ভর করে। আমি উলঙ্গ, এই জ্ঞান ও চিন্তা যত দিন একেবারে অন্তর্হিত না হয়, ততদিন নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এইজন্য জৈনেরা উলঙ্গমূর্ত্তি পূজা করে। কিন্তু জৈনেরা মূর্ত্তিপূজক একথা স্বীকার করে না। যাঁহাদের মূর্ত্তি পূজা করে তাঁহারা উলঙ্গ ছিলেন, এই জন্য মূর্ত্তিও উলঙ্গ। তাহারা বলে যে মূর্ত্তি কেবলমাত্র মহাপুরুষদিগের সহায়ক। জৈনদিগের উলঙ্গাবস্থা ও উলঙ্গমূর্ত্তি পূজা তাহাদের প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ করে; কারণ মনুষ্য আদিম অবস্থায় উলঙ্গ থাকিত। খৃষ্টানদিগের আদি পিতা আদম, আদি মাতা ইভ নিষ্পাপ অবস্থায় উলঙ্গ ছিলেন। হিন্দু শাস্ত্রের শিব দিগম্বর, দত্তাত্রেয় দিগম্বর, অবধূত সম্প্রদায় দিগম্বর। তাঁহারা সকলেই পাপপুণ্য, ভালমন্দ জ্ঞান রহিত ছিলেন।

জৈনেরা বলে যে তাহারা হিন্দু। জৈনমতে হিন্দু শব্দের ব্যুৎপত্তি এই প্রকার হিম্=হিংসা, দু=দূর, যাহারা হিংসা হইতে দূর। সিন্ধু তীরবাসী আদিম আর্য্য ও তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ হিন্দু নহেন। হিংসা বিরহিত ব্যক্তি মাত্রেই হিন্দু। হিন্দু শব্দের এই জৈন ব্যাখ্যা।

রক্ষণশীল জৈনেরা ইহাকে জৈন ধর্ম্ম বলে; এবং ইহা জৈনশাস্ত্র সঙ্গত। পাঠকের যেন স্মরণ থাকে এই প্রবন্ধে লেখক আপনার কোন মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই।

শ্রীবরদাকান্ত মুখোপাধ্যায়।

পল্লী-জননী।

তোমার স্নেহের বক্ষে আবার
তুলে' লও মোরে, জননি!
দেশে দেশে ফিরি' বৃথা দুরাশায়
শ্রান্ত হৃদয়ে সন্ধ্যা বেলায়—'
তোমার নদার ঘাটে আসি' আজি
বাঁধিয়াছি মোর তরণী।

জুড়াব আবার ক্লান্ত শরীর
তোমার শীতল পবনে;
দেখিব আবার—সুনীল বরণ
তোমার উদার মুক্ত গগন,
দিগ্ দিগন্তে প্রসারিত মাঠ
আবৃত হরিত বসনে;—

সেই বাঁশবন, আম্র কানন,
সেই চাঁপা, সেই করবী,
সেই নারিকেল তাল তরুগুলি
আকাশের পানে আছে শিরতুলি',
নদী তীরে তীরে বঞ্জুল বনে
তেমনি কেতকী সুরভি।

তোমার বনের স্নিগ্ধ ছায়ায়,
তোমার দিব্য আলোকে,
তোমার প্রাচীন অশথের তলে
তোমার দীঘির সুশীতল জলে

পিক মুখরিত বকুল বাগানে
খেলিব আবার পুলকে।

তোমার প্রভাত,　　　তোমার গোধূলি,
তোমার দিবস রজনী,
সকলি পূর্ণ শান্তি শোভায় ;
তোমার আশিষ-অঞ্চল ছায়
রাখিয়া আমায় শত-দুখ তাপ
ভুলাও বারেক, জননি !

তুমি নহ মাগো　　　বেদনা-বিহীনা
প্রস্তরময়ী প্রতিমা ;
ব্যথায়, তোমার চোখে দেখি জল,
সুখে, দেখি তব হাসি নির্ম্মল,
সন্তান তরে হৃদয়ে তোমার
স্নেহ-সুধাধারা অসীমা।

নগরী বিমাতা,　　　ভাণ্ডার তার
থাকনা পূর্ণ রতনে।—
আমি চাহি, শুধু তোমারি যে দান,—
ভক্তি, শক্তি, অকপট প্রাণ ;
তোমার জীর্ণ কুটীরে জননি,
রাখিয়ো আমায় যতনে।

শ্রীরমণী মোহন ঘোষ।

রোমান ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা।

আমরা সচরাচর স্কুল কলেজে যে সমুদয় ইতিহাস পড়ি, তাহাতে বর্ণিত জাতি সমূহের ধর্ম্ম, দর্শন, সাহিত্য, চিন্তা, আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি সম্বন্ধে অল্পই জানিতে পাই। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের ইতিহাস প্রত্যেক কলেজেই পঠিত হইয়া থাকে, কিন্তু অদ্য আমরা যে বিষয়ের আলোচনা করিব তৎসম্বন্ধে অনেক ইতিহাসই একেবারে নির্ব্বাক।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩৫০ সনে জেনো নামক জনৈক গ্রীক সাইপ্রাস দ্বীপে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তিনি ষ্টোইক দর্শনের জন্মদাতা। এই দর্শনের মূল কথা এই,—যুক্তিই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। যুক্তি দ্বারা ইচ্ছাশক্তি নিয়মিত করিয়া চলাই একমাত্র কর্ত্তব্য, ধর্ম্মই একমাত্র পন্থা। ঈশ্বর সম্বন্ধে ষ্টোইকদিগের মত কতকটা বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের ন্যায় পরকাল সম্বন্ধেও তাহারা সন্দিহান। পরকাল থাকিলেও তাহা সুখকর, কষ্টের আকর নহে, এবং, স্নেহ মমতা প্রভৃতি কোমল প্রবৃত্তি সমূহের বশীভূত হইয়া মুক্তিপথ হইতে বিচলিত হওয়া কাপুরুষতার লক্ষণ ও স্ত্রীজনোচিত,—ইহাই তাহাদের মত।

প্রাচীন গ্রীস ও রোমে যদি কোন দর্শন পৃথিবীর প্রচলিত ধর্ম্ম সমূহের ন্যায় সাংসারিক জীবন যাপনে আদর্শ-স্বরূপ পরিগণিত হইয়া থাকে, তবে ষ্টোইসিজমই সেই দর্শন। যখন রোম স্বাধীনতন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া রাজতন্ত্রের অধীন হইয়াছিল, রোমান জনসাধারণের মধ্যে যখন পঙ্কিল বিলাসস্রোত অপ্রতিহতবেগে প্রবাহিত হইতেছিল, তখনও রোমের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, রাষ্ট্রনৈতিক, বাগ্মী, লেখক ও শাসনকর্ত্তৃগণের মধ্যে ষ্টোইকধর্ম্মের প্রভাব বিলক্ষণ প্রবল ছিল।

ষ্টোইকধর্ম্ম বীরের ধর্ম্ম। পরের দুঃখ দূর করিবে, কিন্তু স্বয়ং কখনও তদ্দ্বারা অভিভূত হইবে না, প্রবৃত্তির দাস হওয়া ঘৃণ্য কাপুরুষতা, তাহাদের উপর প্রভুত্বই মানবোচিত স্বাধীনতা, এই সকল নীতি বীরত্বেরই পরিচয় প্রদান করে। ঐহিক কি পারত্রিক কোন প্রলোভনের অভাব সত্ত্বে কঠোর স্বাবলম্বন ও আত্মসংযম দ্বারা উন্নত ধর্ম্মজীবনযাপন যে সম্ভবপর, তাহা প্রাচীন ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসে কেবল ষ্টোইকগণের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। ষ্টোইক রাজর্ষি মার্কাস অরেলিয়সকে বিখ্যাত ফরাসী লেখক রেনান পূর্ণতম মানব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার প্রণীত 'চিন্তা-লহরী' অদ্যাপি ভাবুক হৃদয়ের আদরের বস্তু।

এই ষ্টোইক সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মহত্যা সম্বন্ধে যে মত ও প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহা অতীব বিস্ময়জনক ও বর্ত্তমান সমাজসম্মত নীতি-শাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। গ্রীক দার্শনিকশ্রেষ্ঠ প্লেটো অসহ্য দারিদ্র্য বা ঘোরতর বিপৎপাতে আত্মহত্যার বিধি দিয়াছেন। জেনো স্বয়ং উক্ত উপায়ে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। কিন্তু রোমেই এই মতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠে। সীজার, ওভিড, ইহার সমর্থন করেন। সীজারেরর প্রতিদ্বন্দ্বী মহানুভব কেটো স্বপক্ষের পরাজয়বার্ত্তা শ্রবণে প্লেটোর ফিডন্ নামক গ্রন্থে আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে যে সমুদায় যুক্তি প্রদত্ত হইয়াছে তাহা পাঠ করিতে করিতে প্রশান্তচিত্তে স্বহস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। বাগ্মী শ্রেষ্ঠ সিসিরো ঈদৃশ মৃত্যুর জন্য তাঁহার প্রভূত প্রশংসা করিয়াছেন। যীশুখ্রীষ্টের সহিত অপর যে মহাজনত্রয়ের অমর লেখনী পাশ্চাত্য জাতকে নীতি শিক্ষা দিয়াছে, তাঁহারা সকলেই এই মতের পোষণ করিয়া গিয়াছেন। মার্কাস অরেলিয়স, সেনেকা ও এপিকটেটাস্ কর্ত্তব্য হইতে মুক্তিলাভ নিমিত্ত অথবা ভীরুতা প্রযুক্ত আত্মহত্যা নিন্দনীয় স্বীকার করিলেও অবস্থা বিশেষে আত্মহত্যা

করণীয় বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। ষ্টোইক কবি লুক্রেসিয়স স্বীয় দৃষ্টান্ত দ্বারা এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। প্লিনির মতে মানব ঈশ্বর হইতে এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, কারণ ইচ্ছামাত্র সে ভবযন্ত্রনা এড়াইতে সক্ষম, কিন্তু ভগবান অমর। নীতিবিদ্ সেনেকা জ্বালাময়ী ভাষায় আত্মহত্যার গুণবর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। "জীবন যে কঠোর শাস্তি নহে, অদৃষ্টের তীব্র ভ্রূভঙ্গি সত্বেও আমার চিত্ত যে অবিচলিত ও স্বাধীন, তজ্জন্য আমি মৃত্যুর নিকট ঋণী। এমন একজন আছে যাহার হস্তে সর্ব্বশেষ বিচারভার ন্যস্ত। আমার নৃশংস শত্রুগণের পার্শ্বেও সে দণ্ডায়মান। যখন আমরা স্মরণ করি যে এক পাদবিক্ষেপেই আমরা স্বাধীনতার পরপারে যাইতে সক্ষম, তখনই দাসত্বের তীব্রতা কমিয়া যায়। জীবনের সর্ব্ববিধ দুঃখ হইতে আমার এই এক আশ্রয় আছে। কষ্ট-মৃত্যু ও সুখ-মৃত্যু এ উভয়ের মধ্যে যখন আমার অন্যতর নির্ব্বাচনের ক্ষমতা আছে, তখন আমি শেষোক্তটি কেন না অবলম্বন করিব? যে পোতারোহনে আমি সমুদ্র পার হইব, যে গৃহে আমি বাস করিব, তাহার নির্ব্বাচন যেমন আমার উপর নির্ভর করে, সেইরূপ যে প্রকার মৃত্যু সাহায্যে আমি প্রাণপরিত্যাগ করিব, তাহা আমারই বিবেচনাসাপেক্ষ। কিরূপে জীবন যাপন সঙ্গত তৎসম্বন্ধে মানব অন্যের পরামর্শ গ্রহণ করিবে, কিন্তু কিরূপ মৃত্যু সঙ্গত তদ্বিষয় সে স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইবে। নিষ্ঠুর অত্যাচার ও দারুণ রোগযন্ত্রণা কেন আমি সহ্য করিব যখন স্বহস্তে আমি তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারি? জীবন দুঃখময় বলিয়া আক্ষেপের যে কোন কারণ নাই, তাহা কেবল এই জন্য—ইচ্ছা না হইলে কেহ জীবিত থাকিতে বাধ্য নহে। মানুষ সুখী, কারণ দুঃখ হইতে অব্যাহতি তাহার স্বেচ্ছাধীন। যদি বাঁচিয়া থাকিয়া সুখী হও, ক্ষতি নাই; নতুবা যেস্থান হইতে তুমি আসিয়াছ, তথায় ফিরিয়া যাইতে তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। আমি বৃদ্ধ বয়সকে ভয় করি না, যদি

তখন আমার মানুষত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু যদি মন বিচলিত হইয়া যায়, বৃত্তিসমূহ ক্রমে ক্রমে শিথিলগ্রন্থি হইয়া আসে, প্রকৃতপক্ষে জীবন না থাকিয়া কেবল নিশ্বাসমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে এই পতনোন্মুখ দেহাবাস হইতে বিদায় গ্রহণে আমি দ্বিধাবোধ করিব না। ব্যাধির আরোগ্য সম্ভবনা থাকিলে অথবা চিত্ত সতেজ থাকিলে আমি মৃত্যুমুখে পলায়নপর হইব না। বেদনাক্লিষ্ট হইয়া আমি নিজের বিরুদ্ধে হস্তোত্তলন করিব না, কারণ ঈদৃশ মৃত্যু কাপুরুষতা। কিন্তু যদি বুঝিতে পারি যে বাঁচিয়া থাকিলে অবশিষ্ট জীবন কেবল ভুগিতেই হইবে, তাহা হইলে আমি ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিব না, কষ্টের ভয়ে নহে, যে উদ্দেশ্যে জীবন ধারণ করা যায়, তাহার কিছুই আর সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নাই বলিয়া।" এপিকটেটাস বলেন "সর্ব্বোপরি মনে রাখিও যে, নিষ্ক্রামণের দ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত রহিয়াছে। ক্রীড়ারত বালকগণ অপেক্ষা অধিকতর ভীরু হইওনা। যখন খেলা তাহাদিগকে আমোদ প্রদানে বিরত হয়, তখন তাহারা বলে 'আর খেলিব না।' তুমিও সেইরূপ জীবন দুর্ব্বিসহ বোধ হইলে মর্ত্ত্যধাম হইতে অপসৃত হইও; কিন্তু যদি তাহা না কর, তবে অদৃষ্টের দোষ দিয়া আক্ষেপ করিওনা।" এইরূপ অনেক কথা রোমান ঐতিহাসিক ও নীতিবিদ্‌গণের পুস্তকাদিতে বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। ষ্টোইকগণের ঈদৃশ শিক্ষার ফলে রোমান জন সাধারণের মধ্যে এক সময়ে আত্মহত্যা খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, ঐতিহাসিকগণ ইহাও বলেন। কিন্তু আদর্শ ষ্টোইকগণ কেহই কাপুরুষের ন্যায় ঘৃণিতভাবে স্বীয় কর্ম্মফল এড়াইবার জন্য আত্মহত্যা করেন নাই।

রোমান আইনে আত্মঘাতিদিগের উইল সিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু পরে সামান্য দুই একটি প্রতিষেধক বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ অনেক সময় বিচার শেষের

পূর্ব্বে আত্মহত্যা করিত, কারণ দোষী নির্দ্ধারিত হইলে প্রাণদণ্ডের পর তাহাদের অনাবৃত দেহ জনসাধারণের সমক্ষে প্রদর্শিত হইত, এবং তাহাদের সম্পত্তি সরকারে জব্দ হইত। সম্রাট ডমিসিয়েনের কালে নিয়ম হয় যে, তাদৃশ অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলে আত্মহত্যা দ্বারাও কেহ আইনের হস্ত হইতে মুক্তি পাইবে না। সম্রাট হেড্রিয়ান্ নিয়ম করেন যে, আত্মঘাতী সৈনিক পলাতকের ন্যায় গণ্য হইবে। এই দুই রাজনৈতিক বিধি ব্যতীত আত্মহত্যার বিরুদ্ধে আইনে কোন ধারা ছিল না। গল্‌দেশের মার্সেল্‌স্ নগরেও আত্মহত্যা সম্পর্কে কৌতুকাবহ বিধি প্রচলিত ছিল। সেনেট বিষ রাখিতেন। আত্মহত্যার উপযুক্ত হেতু আছে কেহ প্রমাণ করিতে পারিলে তাহাকে সেই বিষ দেওয়া হইত। সেনেটের অনুমতি ব্যতীত কেহ আত্মহত্যা করিতে পারিত না। হঠাৎ কেহ স্বীয় প্রাণ বিনাশ করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে ঐ আইন প্রণয়ন করা হয়।

আত্মহত্যার প্রতি প্রাচীন রোমে এবম্বিধ অনুরাগ যে যে কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, ঐতিহাসিকগণ তাহাও দেখাইয়াছেন। প্রথমতঃ মনে রাখা উচিত যে, বর্ত্তমানকালে আত্মঘাতীর আত্মীয়-স্বজনকে যে কলঙ্ককালিমা বহন করিতে হয়, তাহাই সাধারণের চক্ষে আত্মঘাতীর পাতক বৃদ্ধি করে। রোমানগণ আত্মঘাতীর পরিবার-বর্গকে কৃপা বা ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন না, আইনেও তাহাদের বিরুদ্ধ-বিধান কিছু ছিলনা, সুতরাং তৎকালে আত্মহত্যা দূষ্য বিবেচিত হইত না। দ্বিতীয়তঃ, গ্লাডিয়েটর অথবা পেসাদারী মল্লগণের নিষ্ঠুর হত্যা রোমে তামাসা স্বরূপ পরিগণিত হইত। ইহাতে রোমের নাবিকগণের মধ্যে নিষ্ঠুরতার বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তৃতীয়তঃ, বিজিত দাসগণ ভবিষ্যৎ অপমান ও অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার উপায় না দেখিয়া অনেক সময় আত্মহত্যা দ্বারা মুক্তিলাভের চেষ্টা করিত,

ইজিপ্টের রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা তাহার সর্ব্বজনবিদিত উদাহরণ। চতুর্থতঃ, নিরো, ক্যালিগুলা প্রভৃতি নৃশংস সম্রাটগণের কঠোর ও অমানুষিক অত্যাচার আত্মহত্যার বহুল বৃদ্ধি সাধন করিয়াছিল। সেনেকা নিরোর রাজত্বকালে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়াই হয়ত মৃত্যুকে পরম সুহৃদরূপে সম্ভাষণ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, ষ্টোইকগণ মৃত্যুকে খৃষ্টানদিগের ন্যায় নরকের দ্বার বলিয়া মনে করিতেন না। মৃত্যু জন্মের পূর্ব্বাবস্থা, জীবনের শেষ পরিণতি ও বিশ্রাম। মৃত্যুই একমাত্র অমঙ্গল যাহার উপস্থিতিতে আমাদের ভয়ের কোন কারণ নাই। যতক্ষণ আমরা আছি, মৃত্যু নাই, মৃত্যু যখন আসে, তখন আমরা নাই। মৃত্যু সকল দুঃখের পরিসমাপ্তি, অথবা (আত্মা অবিনশ্বর হইলে) ভবিষ্যৎ সুখের নিদান। নিতান্ত মন্দপক্ষে (আত্মা নশ্বর হইলে) মৃত্যু তৃপ্তিকর ভোগের অবসান স্বরূপ। ষ্টোইক দার্শনিকগণ মৃত্যুর জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত হইতে, প্রফুল্লতা ও সাহসের সহিত মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে, বহুতর উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। এপিকটেটাস্ বলেন "মৃত্যুতে যে আশঙ্কার বিষয় কিছুই নাই, এরূপ ভাবিতে অভ্যাস কর। কারণ অনুভূতি সমূহ সুখ দুঃখের আকর, এবং মৃত্যু অনুভূতির বিরাম।" পুনশ্চ, রোমানগণের মধ্যে স্বদেশ হিতৈষণা ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়াছিল, দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জনে তাহারা কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত হইত না। দেহের সঙ্গে সঙ্গেই মানবাত্মার পরিসমাপ্তি, এই বিশ্বাস বুকে লইয়াও তাহারা যে জলন্ত আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে, তাহা ইতিহাসে খৃষ্টীয় স্বর্গলিপ্সু মারটার (Martyr) গণের প্রাণত্যাগ অপেক্ষা অনেক উন্নত বলিয়া চিরদিন ঘোষিত হইবে। এইরূপে সর্ব্বদা মৃত্যু চর্চ্চা করিয়া রোমানদিগের মৃত্যুভীতি অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছিল।

এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক লেকি বলেন, "রোমান ষ্টোইক ধর্ম্মের

পরিণতি এই আত্মহত্যাবাদ। ষ্টোইক দার্শনিকের গর্ব্বদৃপ্ত, আত্মনির্ভর-শীল, অনমনীয় স্বভাব ততকাল ঠিক থাকিতে পারে যতকাল যন্ত্রণা ও নৈরাশ্যের শেষ সীমা হইতে মৃত্যুর ন্যায় এক সুনিশ্চিত উদ্ধারোপায় বর্ত্তমান থাকে। যদিও ষ্টোইক ধর্ম্ম (এপিকিউরিয়ানদিগের ন্যায়) সুখকে জীবনের চরম লক্ষ্যরূপে স্থাপন করে নাই, তথাপি যে ধর্ম্ম কর্ত্তব্যের আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে সুখের একটা আদর্শ প্রদর্শিত না হয়, তাহা বহুকাল তিষ্ঠিতে পারে না। ষ্টোইক ধর্ম্ম মানবকে অল্পই আশা করিতে, এবং কিছুতে ভীত না হইতে শিক্ষা দিয়াছে। উহা মৃত্যুকে স্বর্গসুখের দ্বার স্বরূপ উজ্জ্বল বর্ণরাজিতে চিত্রিত করে নাই বটে, কিন্তু দুঃখের সমাপ্তি বলিয়া সর্ব্ববিধ আশঙ্কা হইতে বিমুক্ত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। অদৃষ্টের বৈগুণ্য ও যন্ত্রণা হইতে আশু মুক্তির এক সহজ উপায় আছে জানিলে জীবনের অনেক কষ্ট কষ্ট বলিয়া মনে হয় না। মৃত্যু শাস্তি নহে, শান্তি, এই বিশ্বাস মানিলে তাহা ভয়াবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না। ষ্টোইক ধর্ম্মে জীবন এবং মৃত্যু একই সুরে বাঁধা। মানুষের ধর্ম্মজীবনই ঈশ্বরত্ব, পাপের অনুশোচনা নিষ্ফল ও অনাবশ্যক (কারণ পুণ্যই একমাত্র মঙ্গল), গর্ব্বিত দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, যাহার নিকট আত্মাবমাননা দুরপনেয় কালিমা—উভয়েই প্রকটিত। ষ্টোইক আদর্শ নিজ হিসাবে সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ। আত্মাভিমানের সঙ্গে যে সমুদায় গুণ ও মহত্ব জড়িত, তাহারা সম্পূর্ণ বিকশিত হইয়া উচ্চতম লক্ষ্যের অনুশীলনে নিয়োজিত হইলে যে আদর্শ প্রকটিত হয়, তাহা ষ্টোইক ধর্ম্মে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিনয়, নম্রতা ও আত্মানাদরের সঙ্গে যে সকল গুণ বিকশিত হয়, উহাতে তাহার সম্পূর্ণ অভাব!”

রোমান ষ্টোইকগণের পরবর্ত্তী সময়ে আত্মহত্যা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জগতের ধারণা কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, আমরা এই প্রসঙ্গে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব নীতিবিদ্‌গণ আত্মহত্যার বিরুদ্ধে কি কি যুক্তি প্রদর্শন রিতেন, অগ্রে তাহাই দেখা যাউক। পিথাগোরস ও প্লেটো বলিতেন, মরা সকলেই ভগবানের সৈনিক, কর্ত্তব্যপালনের জন্য নির্দ্দিষ্ট র্মক্ষেত্রে প্রেরিত হইয়াছি, সুতরাং ইহা পরিত্যাগ করা আর গবানের প্রতি বিদ্রোহী হওয়া একই কথা। এরিষ্টটল এবং ক ব্যবহার শাস্ত্রকারগণের মতে আমরা স্বদেশের ... প্রাণধারণ রি, সুতরাং স্বেচ্ছায় প্রাণবিসর্জ্জন করিলে স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্যবিমুখ ইতে হয়। প্লুটার্ক এবং অন্যান্য গ্রন্থকর্ত্তাগণের মতে কষ্টসহিষ্ণুতাই কৃত বীরত্ব, সুতরাং আত্মহত্যা মানবের অযোগ্য কাপুরুষোচিত র্য্য। নব প্লেটোনিষ্টদিগের মতে মানসিক বিচলতা মাত্রই আত্মাকে লুষিত করে; আত্মহত্যা ঈদৃশ বিচলতা প্রসূত, সুতরাং ঘোরতর প। স্বীয় পরিবার ও সমাজের নিকট দায়িত্বজ্ঞানাভাবই যে ত্মহত্যার দোষ, এই আধুনিক মত আদি খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে বিশেষ বল ছিলনা। তাহাদের মত কতকটা প্লেটো ও পিথাগোরাসের মতের নুরূপ ছিল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে খ্রীষ্টানগণ নরকের বড়ই ভীষিকাময় চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহা তাহাদের মধ্যে আত্ম-ত্যার একটি গুরুতর প্রতিষেধক ছিল। এতদ্ব্যতীত, যীশুখ্রীষ্ট লিয়াছেন "Blessed are ye that weap now : for ye shall augh" ইহকালে অসুখী ধার্ম্মিক ব্যক্তির স্বর্গলাভের এই সান্ত্বনাটি, বং ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা খ্রীষ্টানদিগের আত্মহত্যার প্রতি ণা আরও প্রবর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছিল।

কিন্তু তথাপি তিন শ্রেণীর খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে আত্মহত্যা অনেক াল প্রবল ছিল। রোমান সম্রাটগণের অত্যাচারের ফলে 'মার্টায়ের' আবির্ভাব হইয়াছিল; তাহারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণ বর্ণিত স্বর্গের চিত্রে তটা বিমোহিত হইয়াছিল যে, গায়ে পড়িয়া দলবদ্ধ ভাবে তাহারা

পরিণতি এই আত্মহত্যাবাদ। ষ্টোইক দার্শনিকের গর্ব্বদৃপ্ত, আত্মনির্ভর-শীল, অনমনীয় স্বভাব ততকাল ঠিক থাকিতে পারে যতকাল যন্ত্রণা ও নৈরাশ্যের শেষ সীমা হইতে মৃত্যুর ন্যায় এক সুনিশ্চিত উদ্ধারোপায় বর্ত্তমান থাকে। যদিও ষ্টোইক ধর্ম্ম (এপিকিউরিয়ানদিগের ন্যায়) সুখকে জীবনের চরম লক্ষ্যরূপে স্থাপন করে নাই, তথাপি যে ধর্ম্ম কর্ত্তব্যের আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে সুখের একটা আদর্শ প্রদর্শিত না হয়, তাহা বহুকাল তিষ্ঠিতে পারে না। ষ্টোইক ধর্ম্ম মানবকে অল্পই আশা করিতে, এবং কিছুতে ভীত না হইতে শিক্ষা দিয়াছে। উহা মৃত্যুকে স্বর্গসুখের দ্বার স্বরূপ উজ্জ্বল বর্ণরাজিতে চিত্রিত করে নাই বটে, কিন্তু দুঃখের সমাপ্তি বলিয়া সর্ব্ববিধ আশঙ্কা হইতে বিমুক্ত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। অদৃষ্টের বৈগুণ্য ও যন্ত্রণা হইতে আশু মুক্তির এক সহজ উপায় আছে জানিলে জীবনের অনেক কষ্ট কষ্ট বলিয়া মনে হয় না। মৃত্যু শাস্তি নহে, শাস্তি, এই বিশ্বাস মানিলে তাহা ভয়াবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না। ষ্টোইক ধর্ম্মে জীবন এবং মৃত্যু একই সুরে বাঁধা। মানুষের ধর্ম্মজীবনই ঈশ্বরত্ব, পাপের অনুশোচনা নিষ্ফল ও অনাবশ্যক (কারণ পুণ্যই একমাত্র মঙ্গল), গর্ব্বিত দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, যাহার নিকট আত্মাবমাননা দুরপনেয় কালিমা—উভয়েই প্রকটিত। ষ্টোইক আদর্শ নিজ হিসাবে সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ। আত্মাভিমানের সঙ্গে যে সমুদায় গুণ ও মহত্ব জড়িত, তাহারা সম্পূর্ণ বিকশিত হইয়া উচ্চতম লক্ষ্যের অনুশীলনে নিয়োজিত হইলে যে আদর্শ প্রকটিত হয়, তাহা ষ্টোইক ধর্ম্মে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিনয়, নম্রতা ও আত্মানাদরের সঙ্গে যে সকল গুণ বিকশিত হয়, উহাতে তাহার সম্পূর্ণ অভাব।"

রোমান ষ্টোইকগণের পরবর্ত্তী সময়ে আত্মহত্যা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জগতের ধারণা কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, আমরা এই প্রসঙ্গে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব নীতিবিদ্গণ আত্মহত্যার বিরুদ্ধে কি কি যুক্তি প্রদর্শন করিতেন, অগ্রে তাহাই দেখা যাউক'। পিথাগোরস ও প্লেটো বলিতেন, আমরা সকলেই ভগবানের সৈনিক, কর্ত্তব্যপালনের জন্য নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মক্ষেত্রে প্রেরিত হইয়াছি, সুতরাং ইহা পরিত্যাগ করা আর ভগবানের প্রতি বিদ্রোহী হওয়া একই কথা। এরিষ্টটল এবং গ্রীক ব্যবহার শাস্ত্রকারগণের মতে আমরা স্বদেশের জন্য প্রাণধারণ করি, সুতরাং স্বেচ্ছায় প্রাণবিসর্জ্জন করিলে স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্যবিমুখ হইতে হয়। প্লুটার্ক এবং অন্যান্য গ্রন্থকর্ত্তাগণের মতে কষ্টসহিষ্ণুতাই প্রকৃত বীরত্ব, সুতরাং আত্মহত্যা মানবের অযোগ্য কাপুরুষোচিত কার্য্য। নব প্লেটোনিষ্টদিগের মতে মানসিক বিচলতা মাত্রই আত্মাকে কলুষিত করে; আত্মহত্যা ঈদৃশ বিচলতা প্রসূত, সুতরাং ঘোরতর পাপ। স্বীয় পরিবার ও সমাজের নিকট দায়িত্বজ্ঞানাভাবই যে আত্মহত্যার দোষ, এই আধুনিক মত আদি খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে বিশেষ প্রবল ছিলনা। তাহাদের মত কতকটা প্লেটো ও পিথাগোরাসের মতের অনুরূপ ছিল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে খ্রীষ্টানগণ নরকের বড়ই বিভীষিকাময় চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহা তাহাদের মধ্যে আত্ম-হত্যার একটি গুরুতর প্রতিষেধক ছিল। এতদ্ব্যতীত, যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছেন "Blessed are ye that weap now : for ye shall laugh" ইহকালে অসুখী ধার্ম্মিক ব্যক্তির স্বর্গলাভের এই সান্ত্বনাটি, এবং ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা খ্রীষ্টানদিগের আত্মহত্যার প্রতি ঘৃণা আরও প্রবর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছিল।

কিন্তু তথাপি তিন শ্রেণীর খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে আত্মহত্যা অনেক কাল প্রবল ছিল। রোমান সম্রাটগণের অত্যাচারের ফলে 'মার্টারের' আবির্ভাব হইয়াছিল; তাহারা খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মযাজকগণ বর্ণিত স্বর্গের চিত্রে এতটা বিমোহিত হইয়াছিল যে, গায়ে পড়িয়া দলবদ্ধ ভাবে তাহারা

রোমান শাসন কর্ত্তৃকগণের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিত "আমরা খ্রীষ্টান; তোমাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছুই মানি না, অতএব আমাদিগকে ক্রুশবিদ্ধ কর।" অনেক খ্রীষ্টিয় রমণী আমাদের প্রাতস্মরণীয়া রাজপুত-ললনাগণের ন্যায় রোমান অত্যাচার হইতে স্বীয় সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত আত্মহত্যা করিতেন। আবার অনেক কুসংস্কারাচ্ছন্ন গোঁড়া খ্রীষ্টান ভিক্ষু স্বর্গকামী হইয়া কঠোর দৈহিক কৃচ্ছ্র অবলম্বন পূর্ব্বক স্বয়ং মৃত্যুকে আহ্বান করিয়া আনিত। St. Simeon Stylites নামক এই শ্রেণীর এক ব্যক্তির সম্বন্ধে টেনিসনের একটি কবিতা আছে। মহম্মদের আবির্ভাবের পর আত্মহত্যা পরায়ণতা আরও প্রশমিত হইয়াছিল। যীশুখ্রীষ্ট এ সম্বন্ধে কোন মতামত ব্যক্ত করেন নাই। কিন্তু কোরাণে ইহা স্পষ্ট নিষিদ্ধ আছে। স্পানিয়ার্ডগণ দক্ষিণ আমেরিকা জয় করিয়া অমানুষিক নৃশংসতা সহকারে তদ্দেশীয় আদিম অধিবাসিদিগকে হত্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তজ্জন্য ষোড়শ শতাব্দীর আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণের মধ্যে আত্মহত্যা খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইউরোপে ডাইনিদিগকে যখন আগুণে পোড়াইয়া হত্যা করা হইত, তখন তাহাদের মধ্যেও আত্মহত্যা অত্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর নাস্তিক ফরাসী দার্শনিকগণ এই বিষয়টী লইয়া অনেক আলোচনা করিয়াছেন; অনেকে ইহা সমর্থনও করিয়াছেন, এবং রোমান ষ্টোইকগণের আদর্শই অবলম্বনীয় বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু রুষো দেখাইয়াছেন যে অধিকাংশ আত্ম-হত্যার মূলে ঘোরতর স্বার্থপরতা নিহিত। ম্যাডাম ডি ষ্টেল্ এ সম্বন্ধে একখানি সুন্দর যুক্তি পূর্ণ গ্রন্থরচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে যদিও আত্মহত্যা অপেক্ষা গুরুতর পাপ আরও আছে, তথাপি ভগবানে অবিশ্বাস ও নির্ভরের অভাব এই পাপে যতদূর প্রকাশ পায়, এরূপ আর কিছুতে নহে। ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লবের পর আত্মহত্যার খুব

একটা হুজুগ পড়িয়াছিল। অধুনা খ্রীষ্টধর্ম্মের বিশ্বাসের অবনতি ও দয়াবৃত্তির অধিকতর অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যার বিরুদ্ধে আইনের কঠোরতাও অনেক কমিয়া আসিয়াছে। ফ্রান্স এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে এখন ইহার বিরুদ্ধে কোন আইন বিধিবদ্ধ নাই। পূর্ব্বে ইংলণ্ডে আত্মঘাতীকে যষ্ঠিবিদীর্ণ করিয়া চৌরাস্তার নীচে প্রোথিত করা হইত। এখন সে আইন নাই বটে, কিন্তু আত্ম-ঘাতীর সমস্ত সম্পত্তি রাজসরকারে জব্দ হইবে এই একটি অতি অন্যায় নিয়ম বিধিবদ্ধ রহিয়াছে; তবে সহৃদয় জুরিদিগের কল্যানে এই আইন কার্য্যতঃ প্রতিপালিত হয় না। ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারে আত্মঘাতীর সহায়কারীর দশবৎসর, এবং যে আত্মহত্যার চেষ্টা করে তাহার এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড অথবা উভয়দণ্ড হইতে পারে।

বর্ত্তমান কালে সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, সরকারি হিসাব পত্র দ্বারাই ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক ও সমাজবিদ্‌গণের মতে আত্মহত্যা উন্মাদেরই প্রকার ভেদ মাত্র। যে সকল জাতি সভ্যতম ও সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান, তাহাদের মধ্যেই ইহার বিকাশ বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অনেক কারণ আছে। ধর্ম্মবিশ্বাসের শিথিলতা তন্মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। মানসিক পরিশ্রমই উন্মত্ততার প্রধান কারণ, এবং আত্মঘাতীকে লইয়া স্বীয় পরিবারে, স্বসমক্ষে এবং সংবাদপত্রাদিতে যে আন্দোলন উপস্থিত হয়; দুর্ব্বলচিত্তের পক্ষে তাহাই একটা প্রবল আকর্ষণ। সভ্যজগতে বিলাস ও অর্থসম্পদের যেরূপ আধিক্য দেখা যায়, দারিদ্র্যের তীব্রতাও তদনুরূপ। জীবন সংগ্রামের কঠোরতাও তথায় অত্যধিক, অভাব অসংখ্য, বাণিজ্যের অভাবনীয় হ্রাসবৃদ্ধিবশতঃ হঠাৎ বহুলোকের ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। সভ্যসমাজে অনুভূতসমূহও তীক্ষ্নতম হইয়া উঠে, এবং নানাপ্রকার অভিনব স্নায়বিক পীড়া ও মানসিক

উৎকেন্দ্রিকতা জন্মে; মানব সতত কর্ম্মশীল, চঞ্চল ও উচ্চাকাঙ্খ হয়, সুতরাং স্বীয় অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, নানাবিধ মানসিক অশান্তিতে কালাতিপাত করে। ইত্যাদি কারণ সমূহের সমবায়ে বর্ত্তমান ইউরোপ ও আমেরিকায় আত্মহত্যা প্রবণতা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ঈদৃশ আত্মহত্যায় এবং কঠোর আত্মসংযমী ও মনুষ্যত্বদৃপ্ত রোমান-ষ্টোইকের দার্শনিকযুক্তিমূলক আত্মহত্যায় কোন প্রভেদ আছে কি না, তাহা পাঠকবর্গ বিচার করিবেন।

সঙ্কল্প।

এতদিন ঘুরিয়াছি মৃগশিশুসম
প্রতি প্রতিবেশী দ্বারে ;—সাগর কানন,
প্রান্ত সরিৎ, শৈল, গিরি প্রস্রবন,
তরুলতা বনানীর, উদার গগন,
নিত্য নব মেঘরাজি, নিকটে সবার
পেয়েছি অমৃতকণা, অভয় অপার!
হইনি কখনো তৃপ্ত, ঘুরিতে ঘুরিতে,
কাটায়েছি এতদিন তৃপ্তিহীন চিত্তে!
আজি এই মধ্যদিনে বসিয়া একেলা
বিরাট জগৎ স্রোতে ভাসাইয়া ভেলা
চলেছিনু কোন্ তীর্থে কিছু নাহি জানি;
চারিদিকে সিন্ধুবুকে বহু রাজধানী

লক্ষ্য করি' ছুটিয়াছে নানা পণ্যতরী ;
আমি মোর ভেলা'পরে শুধু খেলা করি'
শ্রান্ত প্রাণে নয়ন মুদিয়া বিশ্ব হ'তে
অতল হৃদয় গর্ভে ডুবিতে ডুবিতে
হেরিতেছি,—প্রাণমূলে বিরাজে ভাস্কর
অপূর্ব্ব অলোক রাজ্য অচিন্ত্য সুন্দর !
হৃদয় গুহায় বহি অমৃত রতন
জানিনা ঘুরেছি কেন বিশ্বত্রিভুবন
মুষ্টিমেয় ভিক্ষা চাহি ; নিয়ে বংশীবেণু
আজি হ'তে চরাইব শত কামধেনু
হৃদয়ের গভীর বিজন সানুদেশে ;
পূর্ণ পরিতৃপ্তি বহি' প্রতি দিবা শেষে
তাহাদের উৎসারিত নিত্য স্নেহক্ষীরে
আত্মারে করিব পুষ্ট সামান্য কুটিরে।

শ্রীগঙ্গাচরণ দাস গুপ্ত।

ডুমুনী ও তাহার পতিপুত্র।

ময়নাগড়ের অধিপতি লাউসেন গৌড়াধিপের আজ্ঞায় কোন উৎকট তপশ্চরণের জন্য দূর প্রবাসে গিয়াছেন, ডোম সেনাপতি কালুর উপর ময়নারাজ্যের ভার ন্যস্ত হইয়াছে। গৌড়েশ্বরের মহাপাত্র, লাউসেনের মাতুল ও চিরশত্রু মহামদ এই সুযোগে বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া গোপনে ময়নাগড় অবরোধ করিয়া ফেলিলেন ;

নগরবাসিগণ সম্পূর্ণ অতর্কিত, তাহারা এ সংবাদ তখনও পায় নাই। সেনাপতি কালুর স্ত্রী লখ্যা* বীররমণী, সে মহামদের এই চক্রান্ত অবগত হইয়া হাতিয়ার হস্তে সেই বিশাল সৈন্যরাশি দেখিয়া গেল; পাত্র মহামদ ডোম-রমণীর আগমনের আভাষ পাইয়া এক সেট্ স্বর্ণ-চুড়ি উপহার সহ তাহার সঙ্গে দেখা করিলেন এবং অনেক প্রলোভন দেখাইলেন—

"কালুকে করিব রাজা, তুমি হবে রাণী।"†

ময়নাগড়ে প্রবেশের পথে কেহ অন্তরায় না হয়, ইহাই তাঁহার প্রার্থনা। ডুমুণী তাহার জাতীয় ভাষায় যে উত্তরটি দিয়াছিল তাহা আধুনিক সমাজের রুচিসঙ্গত না হইলেও তাহাতে সৎসাহস ও বীরত্ব ছিল। ধনের লোভ দেখাইয়া কে তাহাকে কর্ত্তব্যে বিমুখ করিতে পারিবে? লখ্যা বীর-স্বামীর সোহাগিণী, বীরপুত্রের জননী; ইহা হইতে শ্রেষ্ঠতর ধন কেহ তাহাকে দিতে পারে না, সেই গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া লখ্যা বলিল:—

"ধন মোর অতুল জিনিয়া ধনপতি।"

ডুমুণী শুধু স্বীয় স্বজনবর্গের গৌরবে গর্ব্বিত নহে, দেশের রাজা লাউসেনের ধর্ম্মিষ্ঠ-চরিত্র ও অপূর্ব্ব বিক্রমও তাহার গর্ব্বের বিষয়; সে বলিল:—

"সেনের প্রভাবে মোর অভাব কিসের?"

গৌড়েশ্বরের মহাপাত্র অমিত সৈন্যবল লইয়া যে স্থানে সাহঙ্কারে বিজয়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সেইস্থানে যাইয়া স্পর্দ্ধার সহিত লখ্যা বলিয়া উঠিল,—

* লক্ষ্মী শব্দের অপভ্রংশ।

† এই প্রবন্ধের উদ্ধৃত স্থানগুলি মাণিক গাঙ্গুলী রচিত ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। উক্ত কাব্যখানি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ শীঘ্রই প্রকাশিত করিবেন।

"নাউসেনে ধরাইব গউড়ের ছাতা।"

তাহার হৃদয় শুধু স্বামী ও পুত্রের বীরত্বগৌরবে তৃপ্ত নহে, লখ্যার দক্ষিণ হস্ত হাতিয়ার পরিচালনে সুদক্ষ; সে নিজেও বীরস্বামী ও বীর-পুত্রের সঙ্গে শত্রুর গতিরোধ করিতে দাঁড়াইতে পারে, প্রয়োজন হইলে তাঁহাদেরই সঙ্গে রণক্ষেত্রে সমাধি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে। লখ্যার বীরমূর্ত্তি কবি আঁকিয়াছেন; তাহার মাথায় রণটোপ, তন্মধ্যে মুক্তার থরজ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতেছে—তাহার কটিতে সুসম্বদ্ধ কটিবন্ধ, অঙ্গে কবচ, এক হস্তে ঢাল এবং অপর হস্তে তীক্ষ্ণ অস্ত্র। কবি লিখিয়াছেন সেই যুদ্ধক্ষেত্রে এই ডুমুনীকে একাকিনী ভৈরবীর বেশে দেখিয়া মনে হয়;

"অসুর সমরে যেন উন্মত্ত কালিকা।"

তাহার সঙ্গে সেইস্থানে একটি ক্ষুদ্র যুদ্ধের অভিনয় হইয়া গেল। লখ্যার স্পর্দ্ধিত উক্তি সহ্য করিতে না পারিয়া সীতারাম খাঁ প্রভৃতি কয়েকজন সেনা তাহাকে আক্রমন করিল;—

যুঝে লখ্যা ডুমুনী জীবনে নাহি ভয়।"

এই অশোভন যুদ্ধ শীঘ্রই শেষ হইয়া গেল। লখ্যা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কালীপূজা করিতে বসিল।

মহাপাত্র কূটনীতিতে বিশেষ প্রাজ্ঞ ছিলেন; তিনি মধুচক্রে ঢিল নিক্ষেপ করিয়া শীঘ্র উহা অধিকার করিতে পারিবেন, এরূপ সম্ভাবনা দেখিলেন না। ডোমসৈন্য অপ্রমিত তেজশালী, উহাদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন কি না সন্দেহ, সুতরাং কৌশলে রাজ্যটি করায়ত্ত করিবার জন্য ঙিদা নামক এক সিদ্ধ-তস্করকে নিযুক্ত করিলেন। "ঙ"এর সঙ্গে "ই"কারের যোগ দেখিয়া পাঠকের যেরূপ বিস্ময় হইতে পারে, আমারও তাহা অপেক্ষা অল্প হয় নাই, কিন্তু কি করিব, কাব্যে যে নামটি পাইয়াছি তাহার পরিবর্ত্তন বা শোভাবর্দ্ধন

করিবার আমার কোন ক্ষমতা নাই। এস্থলে পাঠক মহাশয়ের কাছে আর একটি কথা বলিয়া রাখি, ধর্ম্ম-মঙ্গল ইতিহাস নহে, ইহা কাব্য, সুতরাং বর্ণিত বিষয়গুলির কোথায়ও যদি কল্পনাদেবী একটু লীলাখেলা করিয়া থাকেন, তবে তাহা মার্জ্জনীয় মনে করিবেন।

ভিঁদা চোর অনেক পুরস্কারের লোভে কালীমূর্ত্তির পায়ের ফুল কানে গুঁজিয়া বহির্গত হইল; কালীদেবীর বরে সে নিদ্রাকে আয়ত্ত করিয়া সঙ্গে লইয়া আসিল; ময়নাগড়ে যাইয়া নিদ্রাদেবীকে তথায় অবাধে রাজত্ব করিতে হুকুম দিল। এক বৎসরের দীর্ঘ বিচ্ছেদান্তে সম্মিলিত চন্দ্রমুখ স্বামী ও চন্দ্রমুখী স্ত্রী পরস্পরের প্রতি নির্নিমেষ দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া আলাপ করিতেছিলেন, সহসা তাঁহাদের চক্ষু মুদ্রিত হইল, হাত হইতে পান পড়িয়া গেল; তাঁতি মাকুর উপর ঘুমাইয়া পড়িল; পোদ্দার কড়ি পরখ্ করিতেছিল, সে ঝুলি হস্তে হেলিয়া পড়িল;—

"কুতুহলে রন্ধন করিতেছিল কেহ।
উননের উপর অলস হৈল দেহ॥
ভোজনে বসিয়া কেহ ভাবে জনার্দ্দন।*
হাতে ভাত পাতের উপর অচেতন॥"

যখন শত্রু সৈন্য সর্ব্বনাশ করিবার জন্য দ্বারের নিকট উপস্থিত, তখন একি নিদ্রা! যখন ময়নাগড়ের স্বাধীনতার কীরিট লোভে দুষমন্ হস্ত প্রসারণ করিয়াছে, তখন অধিবাসিগণের একি নিদ্রা! কিন্তু এই নিদ্রিত পুরীতে একজন অনিদ্র ব্যক্তি ছিল;—

"কালীপূজা করে লখ্যা কায়মনোবাক্যে
নিশি দিবা জাগরণ নিদ্রা নাই চক্ষে।"

এই নিদ্রিত পুরীর দুর্দ্দশা দেখিয়া অসম্বৃত কেশপাশে লখ্যা

* "ভোজনে তু জনার্দ্দনং।"

উন্মাদিনীর মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। পুরবাসিগণের একি মোহ! তাহাদের সর্ব্বস্ব পর-হস্তে লুণ্ঠিত, ভাণ্ডার অপহৃত ও জীবন বিনষ্ট হইবার সময় একি মোহ? লক্ষ্যা দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ডাকিল, সেই বিপন্ন মোহগ্রস্ত পুরীর লক্ষ্মীর মত একবার শোভাসৌন্দর্য্যদীপ্ত নগরখানি দেখিয়া অশ্রুপূরিত করুণ চক্ষে লখ্যা কালীর নিকট শক্তি ভিক্ষা করিল, সে নিজগৃহে যাইয়া সপত্নীকে তাড়না করিয়া জাগাইতে চেষ্টা করিল, বলিল, উঠগো, একবার উঠ, রাজা প্রবাসে তিনি আমাদের ধর্ম্মরক্ষক,

"ধর্ম্মরক্ষা করিলে সুধিতে হয় ধার।"

কিন্তু সতিনী তাহাকে ক্রুর উত্তর প্রদান করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া পড়িল। উদ্গত অশ্রু হস্ত দ্বারা মার্জ্জনা করিয়া লখ্যা স্বামীর প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইল।

সেনাপতি কালু ডোম সুখ শয্যায় সুপ্ত—"হে ময়নাগড়ের ভার-প্রাপ্ত রক্ষক, এই কি তোমার সুষুপ্তির সময়? তোমার বহুমূল্য ন্যাস যে অজ্ঞাতসারে শত্রু অপহরণ করিতেছে, একবার উঠ,

"উঠহে পরাণ ধন অভাগিনী ডাকে৭
সেন গেল রাজ্যভার সঁপিয়া তোমাকে॥"

কিন্তু কালু জাগিল না, তখন সুগন্ধ কুঙ্কুম ও চন্দন তাহার দেহে লিপ্ত করিয়া লখ্যা ঘুম ভাঙ্গাইতে চেষ্টা করিল; আরামে সুনিদ্রা বর্দ্ধিত হইল। লখ্যা এবার এমন একটী কার্য্য করিল যাহার জন্য কুসুম প্রাণা বঙ্গীয় প্রেমিকা তাঁহাকে ধিক্কার দিবেন এবং কবিকেও কুটিল ভ্রুভঙ্গী দেখাইতে ছাড়িবেন না। লখ্যা মিষ্ট উপায়ে কালুর ঘুম ভাঙ্গিতে না পারিয়া,—

"বসায় চাপড় গোটা বুকের উপর।"

লখ্যার চাপড়টী বালকের গণ্ডের সংস্পর্শে কোমল হইয়া পড়ে নাই,

উহা যুদ্ধক্ষেত্রে অনেকবার শত্রুর মেরুদণ্ড বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছে; এইবার কালু জাগিয়া নিদ্রারক্তিম চক্ষে স্ত্রীর এই ব্যবহার দেখিয়া—

"লাফ দিয়া লখ্যার অমনি ধরে ঝুটি।"

লখ্যা তখন অশ্রুপূর্ণ চক্ষে স্বামীর পদতলে পড়িয়া বলিল;—

বিশেষ বারতা শুন বিপত্য-সাগর। ১
ময়না বেড়েছে এসে মাহুম্মা পাতর।২
জাতিকুল সেনের জীবন দিয়া রাখ।"

কিন্তু কালু রাত্রে কুস্বপ্ন দেখিয়াছে—সে উৎসাহহীনভাবে বলিল;—

আজ রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি অমঙ্গল।
না যাইব সমরে না সরে বুদ্ধিবল॥
পিতার প্রভুত্য ৩ গুণ পুত্র কিছু পাগু ৪
সাথা ৫ আজি সমরে সাজন করে জাগু॥৬

এই উত্তর শুনিয়া ডুমুনী ব্যথিত হইয়া ছল ছল চক্ষে তাহার দিকে চাহিল। স্বামী কুস্বপ্ন দেখিয়াছেন তথাপি তাহাকে যুদ্ধে পাঠাইতে যে চাহে, বঙ্গীয় রমণী মহলে সে পাষাণী আখ্যা পাইবে; লখ্যা সেই পাষাণী—সে স্বামীর দিকে চাহিয়া একবার দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল,

"এত দিনে হায় নাথ হইলে অবোধ।
না করিলে সেনের নবন ৭ পরিশোধ॥

কালু লাউসেনের দক্ষিণ হস্ত, চিরবিশ্বস্ত অনুচর; আজ তাহার এই

১ বিপাত্ত।
২ মাহদ্যা পাতর=মহামদ পাত্র।
৩ প্রভুত্য=বীরত্ব।
৪ পাগু=পায় বা পা'ক্।
৫ সাথা=কালুর পুত্র।
৬ জাগু=থাক্।
৭ নবন=লবন।

ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়া লখ্যা সজল চক্ষে স্বামীর গৃহত্যাগ করিল। পুত্র সাখা স্বীয় ষোড়শী স্ত্রী সরুজা ডুমুণীর কক্ষে আরামে ঘুমাইতেছিল, ব্যথিতা লখ্যা যাইয়া তাহার দ্বারে "হায় হায় ক[illegible] কাঁদিতে লাগিল; তাহার কান্না শুনিয়া পুত্রবধূ সাখাকে জাগাইয়া দি[illegible]

"গা তুল পরাণ নাথ ডাকেন গৃহিণী।"

সাখা জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, লখ্যা গৃহ দ্বারে পড়িয়া [illegible]ছাড়ি বিছাড়ি কাঁদিতেছে—সে পুত্রকে দেখিয়া বলিল;—

"সেন গেল হাকণ্ডে সেবিতে সনাতন।*
হাতে হাতে ময়না করিয়া সমাপন॥
বল করে মাহুদ্যা বেড়েছে এসে গড়।
তোর বাপ নিদ্রা যায় [illegible]র উপর॥
নিমকের চাকর না রাখে ধর্ম্মবল।
এই পাপে আমার হবেক অমঙ্গল॥
মিটাও মায়ের তুমি মনের যাতনা।
সমর করিয়া রাখ সেনের ময়না॥"

সাখার প্রশান্ত ললাট মাতৃ আশীষ লাভ করিয়া বরেণ্য হইয়া উঠিল; লখ্যা তাহাকে নিজ হস্তে সাজাইয়া দিল,—তাহার গলায় হরিপদ চিহ্নিত পদকখানি জ্বলিতে লাগিল, দুই সূত্র সুবর্ণহার তাহার কণ্ঠে বিলম্বিত হইল, বাহুতে বাজুবন্ধ শোভা পাইল, কটিবন্ধ দৃঢ়সন্নিবদ্ধ হইল, ঢাল অসি ও ধনুঃশর লইয়া যখন সে বহির্গত হইল, তখন ডোম সেনাগণ জয়ধ্বনি করিয়া তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল, অগ্রে অগ্রে শিঙ্গাদার শিঙ্গা ফুকরিয়া যাইতে লাগিল।

জননীর পদধূলি লইয়া সাখা কালীমন্দিরে প্রবেশ করিল, সাখা

* সেন (লাউসেন) হাকণ্ড নামক স্থানে ধর্ম্ম পূজা করিতে গিয়াছেন।

কালীর প্রিয় পুত্র, কিন্তু মন্দির মধ্যে আজ একি স্বপ্ন! একি বিঘোর দর্শন! কালী করালী হইয়া আজ সাথাকে যুদ্ধে যাইতে মানা করিলেন; আজ যুদ্ধে গেলে [illegible] প্রাণ যাইবে—কালীর এই আদেশ। মাতৃকর-অঙ্কিত আশীষ [illegible] মুহূর্ত্ত মধ্যে সাথার ললাটে ম্লান হইয়া গেল। কিন্তু সাথা যুদ্ধক্ষেত্রে [illegible] সাজিয়াছে, প্রাণ রক্ষার উদ্দেশ্যে সে গৃহে ফিরিতে পারিবে না। [illegible]লীর আদেশের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া,—"সাথা বলে প্রাণ দিব সেনের কারণে।" আর কোন কথা নাই, লখ্যার যোগ্য পুত্র যুদ্ধে গমন করিল।

মহাপাত্র সাথাকে প্রলোভন দেখাইতে লাগিল;

"বাজা করে [illegible]লুকে রাখিব রাজ্য দিয়ে।
তুমি নাতি থা[illegible]বে রাজার বেটা হয়ে।"

সাথা বেশী কথা না বলিয়া মহাপাত্রকে বধ করিবার জন্য ধনুঃশর তুলিয়া লইল। এই স্বল্প-ভাষী, পরাক্রান্ত বীর যুবক বহ্নিশিখার ন্যায় শত্রুসৈন্যের মধ্যে যাইয়া পড়িল। কালী দেবার ভ্রূকুটি, পথে যে সকল অশুভ চিহ্ন দেখাইয়াছিল তাহা, মাতার উত্তেজনা,—প্রভৃতি বিবিধ ভাবের স্মৃতি তাঁহাকে নৈরাশ্য-মিশ্র-বীরত্বে স্ফুলিঙ্গবৎ জ্বালাইয়া তুলিল; যে মরিবে জানিয়া যুদ্ধ করে—তাহার সম্মুখে কে দাঁড়াইবে? লখ্যার বীর পুত্র একাকী রামসিংহ, হাসেন হুসেন প্রভৃতি বীরগণকে পরাস্ত করিয়া সোৎসাহে শত্রু সৈন্য বিধ্বস্ত করিতে লাগল। তাহার সঙ্গীরা সেই অপূর্ব্ব বীরত্বের স্ফুরণে মাতিয়া গেল; লখ্যার পুত্র যুদ্ধ করিতেছে, আজ ময়নাগড় অধিকার করিবে কে? কিন্তু সহসা চূড়া নামক মহাপাত্রের এক সেনা সাথার নাভি নিম্নে এক তীক্ষ্ণ শূল নিক্ষেপ করিল, সাথার অন্ত্র বাহির হইয়া পড়িল, কিন্তু তথাপি অমিততেজা যুবক অস্ত্র দ্বারা চূড়ার মাথা কাটিয়া নিজে অচিরাৎ রণধূলিমণ্ডিত [illegible] পার্শ্বে

আসিয়া তাহাকে ধরিল, ভগ্নীপতির দিকে সজল চক্ষে চাহিয়া সাখা বলিল—

"বাপাকে জানায়ো যেয়ে আমার বিষয়।
বল শুধিতে সেনের ধার এই ত সময়॥"

মাতাকে বলিতে বলিল,

"জঠরে ধরেছ বহু পেয়েছন দুঃখ!
না পানু শুধিতে ধার বিধাতা বিমুখ॥"

আর স্ত্রীর জন্য শেষনিদর্শন প্রদান করিয়া সাখা প্রাণান্ত সময় হরিহরের কণ্ঠ লগ্ন হইয়া বলিল—

"কর্ণমূলে কৃষ্ণ নাম হরি নাম কর।"

সাখার প্রাণ বায়ু বাহির হইয়া গেল। হরিহর তাহার মস্তক কাটিয়া লইয়া পুত্রের প্রত্যাগমন তৃষিত লখ্যাকে উপহার দিল। এই বজ্রপাত সদৃশ দুর্ঘটনায় মাতৃহৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল; অশ্রুচক্ষে শোকের ম্লানচ্ছবি লখ্যা সাখার মস্তক হস্তে তুলিয়া লইল; যে মুখে সে স্তন্য দিয়াছে, যাহার হাসি দেখিয়া পৃথিবাতে সে স্বর্গের স্বপ্ন দেখিয়াছে, সেই মুখ খানির দুইটী নিশ্চল চক্ষুর উপর শোকাচ্ছন্ন বিবর্ণ স্নেহাতুর দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিয়া লখ্যা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তৎপর অশ্রুচক্ষে কালী দেবীর পাদপদ্মে তাহা রাখিয়া স্বামীর কক্ষে পুনরায় উপস্থিত হইল। কালুর নিদ্রা ভাঙ্গিতে এবার বিলম্ব হইল না, বীর পত্নী যখন সেই মর্ম্মবিদারক সংবাদ বলিয়া স্বামীকে কহিল—

"এখনও সেনের ধার ধারি অভাগিনী।
তবে শুধি সময়ে সাজন কর তুমি॥"

তখন দ্রুতপাদক্ষেপে কালু তাহার স্বর্ণটোপ মাথায় পরিয়া তীক্ষ্ণ অসি ও ঢাল লইয়া যুদ্ধে যাত্রা করিল; পুত্র শোকে উন্মত্ত হইয়া কালু যুদ্ধ করিতে লাগিল, ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় সে মহাপাত্রের সৈন্য বিনষ্ট

করিল, হাসন, হুসেন হস্তীর উপর হইতে আকৃষ্ট হইয়া ধরাশায়ী হইল,—কেহ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতে সাহসী হইল না; রাজ্যধর ও রায়ধর রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। মহাপাত্রের সৈন্যগণ ডোমদিগের হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইল।

সেই ঘোর যুদ্ধের দিবাবসানে পুত্রশোকদগ্ধ হৃদয়ে রণশ্রান্ত কালু সঙ্গীগণ হইতে দূরে এক বৃক্ষতলে একাকী বসিয়া ব্যথিত প্রাণকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিতেছিল। রণজয় করিয়া রণজয়ীর আজ আনন্দ নাই—সাথার মুখখানি তাহার হৃদয়ে শেলের মত বিদ্ধ হইয়া আছে। যুদ্ধের সময় সেই শোক তাহার বাহুতে শক্তি দিয়াছিল—এখন সে অবসন্ন; জীবনে বীতস্পৃহ, কালু হরিৎচ্ছদ একটি দীর্ঘ তরুমূলে বসিয়া উদ্ভ্রান্তভাবে কি চিন্তা করিতেছিল?

ঠিক এই সময় অপমানিত মহাপাত্র শিবিরে প্রত্যাগমন করিয়া কৌশলে কালুকে হত্যা করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলেন; অচিরাৎ আদেশ প্রচারিত হইল কালুর মস্তক যে আনিয়া দিবে, ময়নার রাজচ্ছত্র ও রাজটীকা তাহার প্রাপ্য।

কাম্বা (কামদেব) নামক এক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া করজোড়ে বলিল—"হুজুরের হুকুম হইলে আমি কালুর মাথা আনিয়া দিব।" মহাপাত্র তাহাকে বিশেষরূপে সম্বর্দ্ধনা করিলেন; কাম্বা নাপিত ডাকিয়া নিজের মাথা মুণ্ডন করিয়া তাহাতে ঘোল ঢালিল এবং রাজদ্বারে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইলে যে প্রকার হয়, সেই শোচনীয় অবস্থার ছদ্মবেশ স্বীকার করিয়া বৃক্ষমূলে আসীন চিন্তান্বিত কালুর নিকট যাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কালু কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিল—"মহাপাত্র তাহাকে বিনাদোষে অপমান করিয়া শিবির হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন; কাম্বা এখন নিরাশ্রয়—রাজসৈন্য-অনুসৃত এবং কালুর আশ্রয় প্রার্থী। কালু তখনই তাহাকে আশ্রয় প্রদান করিতে

প্রতিশ্রুত হইল, শোকে কালুর চিত্ত সেই মুহূর্ত্তে কুসুম কোমল হইয়া পড়িয়াছিল; সে একজন ব্যথিত ব্যক্তিকে পাইয়া তাহাকে প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন দিয়া বলিল, "এস ভাই কিসের কষ্ট, তুমি যাহা চাহিবে, আমি তাহাই দিয়া তোমার দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করিব।" কাম্বা বলিল—"তাই কি ঠিক, আমি যাহা চাহিব, তাহাই দিয়া কি আমাকে সান্ত্বনা করিবে?" কালু প্রতিশ্রুতি পুনরায় উচ্চারণ করিল; তখন বিশ্বাসঘ্ন কাম্বা বলিল, "কালু আমি তোমার মাথা চাই।" শঠ কাম্বা শাস্ত্রের নানা উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া সত্যরক্ষার জন্য আত্মবিসর্জ্জনের আদর্শ কালুর মনে জীবন্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু কালু সে সকল কথা শুনিতে পায় নাই, একবার যাহা বলিয়াছে, সে তাহার অন্যথাচরণ করিতে পারিবে না, সে জীবনে তাহা কখনও করে নাই; একবার কম্পিত কণ্ঠে বলিল "ভক্তবৎসল ভগবান এ কি করিলে?" এই বলিয়া কালু তিনবার 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল; জীবনের প্রতি তাহার উপেক্ষা জন্মিয়াছিল, দৃঢ়ব্রত তাপসের ন্যায় জীবন পণে সত্যরক্ষা করিবার জন্য কালু বারাসনে পূর্ব্ব মুখ হইয়া উপবেশন করিল, তখন সন্ধ্যাদেবী একটী মাত্র নক্ষত্রের উজ্জ্বল সাশ্রুনেত্রে নিম্নে দৃষ্টি করিতেছিলেন, তাঁহার অসম্বৃত তিমির-অঞ্চলখানি ময়নাগড়ের প্রাসাদাবলীর উপর লুণ্ঠিত হইতেছিল; পশ্চিম আকাশের লোহিত শিখা মুছিয়া ফেলিয়া প্রকৃতি দিগন্ত মসীলিপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন; বীরাসনে আসীন নিশ্চল সত্যব্রত কালু ঘাতকের সান্নিধ্যে বসিয়া প্রাণান্ত সময় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া ডাকিতেছিল, এদিকে সম্মুখে গঙ্গার তরঙ্গে শ্বেত ফেন-চূর্ণ অন্ধ বারি-রাশিকে কি এক অস্পষ্ট মহিমা-মণ্ডিত করিয়া ক্ষণে প্রকাশ এবং পর ক্ষণে লয় পাইতেছিল। কালুর শির এখনই কাম্বার হস্তে ছিন্ন হইবে, এই সময় দৈবাৎ লখ্যা জল আনিতে যাইয়া দূর হইতে দেখিল ঘাতক

সে শাণিত করিতেছে ও মুদিত চক্ষু কালুর সান্নিধ্যে রক্তলোলুপ পশুর ন্যায় ভীষণভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে ;—

"চপলে চলিল রামা চঞ্চল চরণ।
বাতাসে পড়িল এসে বাঘিনী যেমন ॥"

সহসা প্রাণাধিকা পত্নীকে দেখিয়া কালু বলিল—"মৃত্যুকালে তোমাকে দেখিলাম, আমার বড় সৌভাগ্য।" লখ্যা বলিল "কোন ছার কাম্বা, সেই তোমার শিরশ্ছেদ করিবে, আর আমি তাহাই দাঁড়াইয়া দেখিব! এখনই আদেশ কর, আমি উহার মাথা কাটিয়া তোমার চরণে উপহার দি।" কালু ধীরে ধীরে বলিল "শুন লখ্যা আমি প্রতিশ্রুত হইয়াছি, উহাকে আমার মাথা দিব, এই ছার মাথার কি মূল্য! যদি সত্যের জন্য দিতে পারি তবেই ইহার মূল্য—না হইলে ডোমের মাথা স্পর্শ-যোগ্য নহে। তুমি বীরপত্নী, সর্ব্বদা আমাকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিয়াছ, আজ সত্য রক্ষার পথে দাঁড়াইও না ; অগ্নির ন্যায় পুত্রশোক আমাকে দগ্ধ করিতেছে। শ্রীহরির উপর নির্ভর করিয়া আমায় শেষ বিদায় দাও।" লখ্যা নিশ্চল পাষাণের মত স্বামীর কথা শুনিল,— তাহার একটী কেশাগ্র নড়িল না ; তাহার হৃদয়ে যে প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল, কে যেন সজোরে সেই প্রবৃত্তি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখিল ; যে অশ্রু উচ্ছলিত হইয়া চক্ষুপ্রান্তে আসিতে চাহিতেছিল তাহা ততদূর পৌঁছিতে পারিল না ; বিদ্যুতের মত যে খর রোষদীপ্ত কথা জিহ্বাগ্রে ফুটিতে চাহিতেছিল, কে যেন 'তিষ্ঠ' উচ্চারণ করিয়া সেই জ্বলন্ত ভাষার গতি রোধ করিয়া দাঁড়াইল ; আশীর্ষ দেহযষ্টি ঘোর চাঞ্চল্যে কম্পনোন্মুখ, কিন্তু লখ্যা অচঞ্চল প্রস্তর বিগ্রহের ন্যায় তুষ্ণীম্ভাব পরিগ্রহ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে নির্ব্বাক, তুষার-স্তব্ধ বিমূঢ়তায় স্ফীত চক্ষে দাঁড়াইয়া দেখিল, ঘাতক ধ্যান-নিষ্পন্দ কালুর মস্তক কাটিয়া ফেলিল। কাম্বা সেই মস্তক লইয়া মহাপাত্রের নিকট ছুটিয়াছে, আর

, লখ্যার ধৈর্য্য শেষ হইল, পাষাণ-কুদ্ধী
ভাঙ্গিয়া উন্মাদিনী হইয়া ভীষণ শক্তিতে ছুটিয়াছে—লখ্যা স্বামীহন্তার
পশ্চাতে চলিল ;—

"তাড়িয়া ধরিল লখ্যা সাপিনী যেমন।
প্রলয় প্রহার করে পিঠে যেন পুড়া।
অমনি আছাড়ি ভূমে অস্থি করে গুঁড়া॥"

কাম্বাকে হত্যা করিয়া লখ্যা গৃহে ফিরিল, স্বামী-পুত্রের মস্তক দেখিয়া তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, সে চক্ষের কজ্জল, মাথার সিন্দুর মুছিয়া ফেলিল; শাঁখা ও সুরঙ্গ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া অনাথিনী বেশে কাঁদিতে কাঁদিতে সেই দুই প্রাণাধিক মস্তক লইয়া লাউসেনের রাজ প্রাসাদে উপস্থিত হইল। রাণীগণ একান্ত দুঃখিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে স্বামীপুত্রের মস্তক দেখাইয়া লখ্যা বলিল,

"পতিপুত্র প্রাণপণে পরিশোধ করেছে লবণ।"

"মহাপাত্র ময়নাগড় অধিকার করিবে, আমাদিগের যাহা সাধ্য করিয়াছি, ঠাকুরাণীগণ এখন যাহা ভাল; আপনারা তাহা করুন।"

এইমাত্র বলিয়া নিরাশার প্রতিমূর্ত্তি লখ্যা শ্মশানসদৃশ স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

এই ডোম পরিবারে যে সত্যনিষ্ঠা, যে কর্ত্তব্য বুদ্ধি, যে আত্ম-ত্যাগের গৌরব দৃষ্ট হইতেছে, ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে তাহার শেষ শিখার আলোটুকু খেলিয়া বাঙ্গলা দেশ হইতে অস্ত গিয়াছে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

নারায়ণী।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রত্যুষেই রতন গৃহত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ভাবিলেন বিলম্ব করিলে ঘরের মায়া ত্যাগ করিতে পারিব না। তখন রাণীপ্রদত্ত মোহর কয়টী গণিয়া দেখিলেন। দেখিলেন পাঁচশত, মুখে তাঁহার হাসি আসিল। বলিলেন, "মৃত্যুসৌধের প্রবেশদ্বার সমীপে আসিয়া রাণীর কৃপায় আমি ধনী হইলাম।"

বাস্তবিক রতনের এত ধনে কি হইবে? পথে ইহার শতাংশের একাংশও প্রয়োজন হয় কিনা সন্দেহ।

পথে বাহির হইলে তখন কোনও ব্রাহ্মণ অতিথির অন্নাভাব ঘটিত না। একবার "ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া হিন্দুগৃহস্থের দ্বারে দাঁড়াইলে, গৃহস্থ রাজোপচারে তাঁহার সেবা করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিত। যদিই বা অন্নের জন্য অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হইত, সামান্য খরচেই তাহা নিষ্পন্ন হইত। তখনকার দ্রব্যাদি আজি কালিকার মত দুর্ম্মূল্য ছিল না।

রতন থলিয়ার ভিতর হইতে পঁচিশটী মোহর গ্রহণ করিলেন। বাকী মোহর একটী থলিয়ার মধ্যে পূরিয়া জুনিয়ার মাকে ডাকিলেন। জুনিয়ার মা বহুকাল রতনের গৃহে চাকুরী করিতেছে। সকলেই চলিয়া-গিয়াছে, কিন্তু সে আর ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই।

জুনিয়ার মা আসিলে রতন থলিয়াটী তাহার হাতে দিবার উদ্যোগ করিলেন, বলিলেন, "ইহা তোর কাছে রাখিয়া দে।" ব্রাহ্মণ চিরদিনই রহস্য-প্রিয়। রহস্য করিবার অবকাশ পাইলে, তিনি প্রায়ই প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিতেন না।

জুনিয়ার মা থলিয়ার মূর্ত্তি দেখিয়া অগ্রাহ্য করিয়াই হাতে লইতে গেল। মুহূর্ত্ত মধ্যে হস্তচ্যুত হইয়া সেটা মাটিতে পড়িয়া গেল। অপ্রতিভ হইয়া বৃদ্ধা ব্রাহ্মণের মুখের পানে চাহিল।

রতন হাসিয়া বলিলেন, "উহার ভিতরে মোহর আছে, যত্ন-পূর্ব্বক রাখিয়া দে। আমি তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইব। যদি ফিরি, তবে আমাকে ফিরাইয়া দিস্। না ফিরি এ সমস্ত তোর হইল।"

কথাটা শুনিবামাত্র বৃদ্ধার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। "না ফিরি" এরূপ কথা সে ব্রাহ্মণের মুখে কখনও শুনে নাই। শুনিবার প্রত্যাশাও করে নাই। অনেক দিন সে ব্রাহ্মণকে ঘর ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে দেখিয়াছে, কিন্তু সে জানিত আগের দিন ফিরিতে পারিলে, ব্রাহ্মণ সহস্র প্রলোভনেও পরদিন গৃহের বাহিরে থাকিতে পারিতেন না। ব্রাহ্মণের কুটীরপ্রিয়তা সে যত বুঝিয়াছিল, আর কেহ সেরূপ বুঝে নাই।

বিশেষতঃ ব্রাহ্মণকে সে বড়ই ভক্তি করিত। অর্থ-প্রলোভনে সে পণ্ডিতজীর গৃহে দাসীত্ব করিত না। দুইবেলা এক মুঠা করিয়া আহারই তাহার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

আহারান্তে নির্জনে বসিয়া যে সময় রতন ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন, তখন কেবল জুনিয়ার মা তাঁহার নিকটে বসিয়া ভক্তিগদ্‌গদ হইয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিত। সেই জুনিয়ার মা ব্রাহ্মণের মুখে প্রথম এই "না ফিরি" কথা শুনিল।

পদতলে মোহরের থলিয়া পড়িয়া রহিয়াছে, দরিদ্রা বৃদ্ধা তাহার দিকে লক্ষ্য করিবার অবকাশ পাইল না। বিস্মিত নেত্রে রতনের মুখের পানে চাহিল, বলিল—"তুমি কি আর আসিবে না?"

রতন। বাঁচিয়া থাকি, আসিব।

বৃদ্ধা। বুঝিতেছি, তুমি আর আসিবেনা।

রতন। বোধ হয় আর আসতে পারিব না।

বৃদ্ধা। তা হ'লে আমার উপায় কি হবে?

রতন থলিয়ার মুখ খুলিয়া বৃদ্ধাকে মোহর গুলি দেখাইলেন। বলিলেন—"এই সম্পত্তি তোরই হইল। ইচ্ছামত ব্যবহার করিবি।"

মোহরের মূর্ত্তি দেখিয়াই বৃদ্ধা শোকতাপ ভুলিয়া গেল। থলিয়ার ভিতর হইতে গোটাকতক মুদ্রা বাহির করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল।

মুহূর্ত্তেই জুনিয়ার মা নিজের অবস্থার পরিবর্ত্তন উপলব্ধি করিয়া লইল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার বাঁচিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। সে ভাবিল—"পণ্ডিতজী ত ঘর ছাড়িয়া চলিল, আমি ত পারিবনা। তখন, যাহাতে এস্থানে চিরদিন সুস্থশরীরে এই সম্পত্তি ভোগ করিতে পারি, এই সময়ে তাহারও একটা ব্যবস্থা করিয়া লই।" এই ভাবিয়া সে ব্রাহ্মণকে বলিল "ধন ত দিলে। কিন্তু আমার থাকিবার ব্যবস্থা করিলে কি?"

রতন তাহার মনোগত ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "—কেন! এই ঘরেই থাকিবি। আমি এস্থানে যাহা যাহা রাখিয়া যাইতেছি, সমস্তই তোর হইল।"

বৃদ্ধা। খাইব কি?

রতন। খাইবার ভাবনাই যদি তোর রাখিয়া যাইব, তবে কিসের জন্ম এত মোহর দিলাম। যখনই অভাব বুঝিবি, তখনই মোহর ভাঙ্গাইয়া খাইবি।

বৃদ্ধা অবাক হইয়া ব্রাহ্মণের মুখের পানে চাহিল। ব্রাহ্মণ বলে কি! তুচ্ছ দুই মুঠা চাউলের জন্ম মোহর ভাঙ্গাইতে হইবে! বৃদ্ধা স্থির করিল, পণ্ডিতজী পাগল হইয়াছে।

সে পূর্ব্বে অনেক পাগল দেখিয়াছে। পাগল হইলে লোকের মুখচোখের ভাব কিরূপ বিকৃত হয়, তাহাও সে অনেকবার লক্ষ্য

করিয়াছে। তাই সে স্থির হইয়া ব্রাহ্মণের মুখ চোখের পরিবর্ত্তন অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

রতন বৃদ্ধার মুখের ভাব দেখিয়া হাসিলেন। বুঝিলেন এত অধিক ধন পাইয়া বুড়ী বড়ই বিপদে পড়িয়াছে। হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁ করিয়া মুখের পানে কি দেখিতেছিস্?"

বৃদ্ধা তবু কথা কহে না। সে অনেক চেষ্টাতেও ব্রাহ্মণের মুখে চক্ষে উন্মত্ততার লক্ষণ খুঁজিয়া পাইল না। যে হাসি যে কথা বৃদ্ধার অশান্ত মনকে অনেক সময় প্রফুল্ল করিয়াছে, আজিও সে ব্রাহ্মণের মুখে সেইরূপ স্নিগ্ধ মধুর হাসি দেখিল, মৃদু মধুর বাক্য শুনিল। বৃদ্ধা এবার কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল—"তুমি কি সত্য সত্যই ফিরিবে না?"

রতন। ফিরিবার ইচ্ছা আছে। তবে অনেক তীর্থে ঘুরিব—অনেক বয়স—যদি মরিয়া যাই!

পণ্ডিতজীর মরণের কথা চিন্তা করিতেও জুনিয়ার মার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। বলিল "না, যেমন করিয়া পার ফিরিয়া আইস।"

রতন। সে পরের কথা। এখন এই মোহরগুলি তুই গ্রহণ কর্। এ গুলি তোরই হইল জানিয়া রাখ্।—তুই ইচ্ছামত ইহার ব্যবহার করিবি।

বৃদ্ধা। তুমি কবে রওনা হইবে?

রতন। কবে কি? আজ—এখনি।

এই বলিয়াই ব্রাহ্মণ গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। জুনিয়ার মাও মোহরের থলিয়া লুক্যাইতে চলিয়া গেল।

ব্রাহ্মণের ফিরিতে বিলম্ব হইল না। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন জুনিয়ার মা চলিয়া গিয়াছে। ঘরে সন্ধ্যা দিবার কথা, প্রতিদিন গৃহটী পরিষ্কার রাখিবার কথা, তুলসীমঞ্চে জল দিবার কথা,—আরও দুই চার কথা, যাইবার পূর্ব্বে তাহাকে উপদেশ দিয়া যাইবেন, এইজন্য বৃদ্ধাকে

আর একবার ডাকিলেন। উত্তর পাইলেন না। আবার ডাকিলেন। বাটী জনশূন্য বলিয়া বোধ হইল। আর জুনিয়ার মা'র সহিল না।

তখন মোহর কয়টা গেঁজিয়ার মধ্যে পূরিয়া কোমরে বাঁধিলেন। তারপর একটী কাপড়ের পুঁটুলি, একটী কমণ্ডলু, একখানি মৃগচর্ম্ম ও একগাছি বাঁশের লাঠী লইয়া দুর্গাস্মরণ করতঃ ব্রাহ্মণ বহুাদনের প্রিয়-সঙ্গী গৃহটীকে বুঝি জন্মের মত পরিত্যাগ করিলেন!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ব্রাহ্মণ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলে, জুনিয়ার মা মনে করিল, "এই অবকাশে মোহর গুলা লুকাইয়া আসি।" তাহার ইচ্ছা ছিল, কিছুদূর সে ব্রাহ্মণের সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। এদিকে রাশীকৃত ধন পাইয়াছে, ওদিকে অমূল্য রত্নসদৃশ পণ্ডিতজীকে সে হারাইতে বসিয়াছে। আনন্দ প্রকাশ করিবে কি কাঁদিবে বৃদ্ধা স্থির করিতে পারিতেছিল না। তাই সে মনে করিল, মোহর কয়টা আপাততঃ একটু নিরাপদ স্থানে রাখিয়া আসি। রাখিয়া ব্রাহ্মণের সঙ্গে যতদূর পারি যাই। ফিরিয়া, দেবতায়ও না জানিতে পারে, এমন স্থানে মোহর লুকাইয়া রাখি।

বৃদ্ধার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইল না। ধন লুকাইয়া রাখা সে যতটা সহজ মনে করিয়াছিল, কার্য্যে তাহার বিপরীত দেখিল। প্রথমেই সে নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু সেখানে সে মনোমত স্থান খুঁজিয়া পাইল না। ঘরের এক কোণে ঘুঁটে রাখিবার একটী জালা ছিল। অন্য কোথাও রাখিতে সাহস না করিয়া, বৃদ্ধা সেই জালাটার ভিতর হইতে যা কিছু ছিল বাহির করিয়া লইল। পরে, অতি ধীরে, পাছে ঘরের ভিতরের পিপীলিকাটী পর্য্যন্ত জানিতে পারে, এইরূপভাবে মোহরের থলিয়াটী তাহার ভিতরে স্তস্ত করিল,—

অতি সাবধানে মুখে সরা চাপা দিল। তবু যেন মনঃপুত হইল না। তাহার বোধ হইল যেন মোহরগুলা দেখা যাইতেছে। ভ্রম মনে করিয়া সে একবার চক্ষু মুছিল। দেখিল মোহরগুলা জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে।

এমন সময় পণ্ডিতজীর কথা তাহার কাণে গেল। কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে, যেথান হইতে পারিল সেই খান হইতেই কাঁথা, কাপড়, থলিয়া মৃগচর্ম্ম শেষে হাঁড়ি, ভাঁড়, মাটী যেথান হইতে যাহা আনিতে পারিল, তাই দিয়া জালা ঢাকিতে লাগিল। কিন্তু যতই বৃদ্ধা মোহরগুলাকে আবৃত করিবার চেষ্টা করে, ততই সেগুলা যেন অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া তাহার চোখের উপর আসিয়া পড়ে।

ক্রমে জানালা, দেওয়াল, দরজা, ঘরের চাল—বুড়ীর চক্ষে সমস্তই যেন স্বচ্ছ, সমস্তই যেন ফাঁকা দেখাইতে লাগিল। ভয়ে ভয়ে বৃদ্ধা মোহর বাহির করিল। দুইহাতে বুকে চাপিয়া বাহিরে আসিল। দেখিল পণ্ডিতজী চলিয়া গিয়াছে।

সন্দেহ দূর করিবার জন্য দুই একবার সে "পণ্ডিতজী—পণ্ডিতজী" বলিয়া ডাকিল। উত্তর পাইল না। ব্রাহ্মণের ঘর খুঁজিল। দেখিতে পাইল না। পা টিপিয়া টিপিয়া দরজার কাছে গেল। সাবধানে শুধু মুখটী বাহির করিয়া সুবর্ণরেখার তীরস্থ পথের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল—যতদূর দেখা যায় দেখিল। দেখিল রাজপথে জনপ্রাণী নাই। বৃদ্ধা দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

বৃদ্ধা এইবারে যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হইল। ভাবিল, মনোমত স্থান সন্ধান করিয়া এইবারে মোহরগুলাকে লুকাইতে পারিব। ব্রাহ্মণের গৃহের সম্মুখে একটা তুলসী মঞ্চ। তাহার নিকটবর্ত্তী অনেকটা স্থান বাঁধান। সেখানে বসিলে, বাড়ীর সমস্ত অংশই দেখিতে

পাওয়া যায়। বৃদ্ধা মোহরগুলি ব্রাহ্মণের ঘরের মধ্যে রাখিয়া সেখানে বসিল। বসিয়া কাঁদিবার উদ্যোগ-আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল।

বৃদ্ধার ত্রিসংসারে কেহ ছিল না। জুনিয়া বলিয়া একটীমাত্র কন্যা ছিল। সেটী বিশ বৎসর পূর্ব্বে মারা পড়িয়াছে। সুতরাং এত ধন লইয়া বৃদ্ধা কি করিবে? তাই আজ বিশ বৎসর পরে সে কন্যার অভাব অনুভব করিল। বাঁচিয়া থাকিলে জুনিয়া এক সঙ্গে এত মোহর দেখিতে পাইত। মোহরগুলি দেখাই বৃদ্ধা চরম উপভোগ মনে করিয়াছিল। জুনিয়া বাঁচিয়া থাকিলে তাহাকেও স্পর্শ করিতে দিত না। তথাপি বৃদ্ধার জুনিয়াকে মনে পড়িল। এবং সেইজন্য যেটুকু চক্ষুজল নিক্ষেপের প্রয়োজন, তাহা সম্পন্ন করিতে সে কিছুমাত্র ত্রুটী করিল না। নিকট হইতে একখানা পিঁড়ি লইয়া একখানা কাঁথা গায়ে দিয়া, বুড়ী কাঁদিতে বসিল।

কিন্তু বিধাতা তাহাকে কাঁদিতে দিল না। কাঁদিবার উপক্রমটী করিয়াছে মাত্র, এমন সময় বুড়ীর বোধ হইল যেন কে সদর দরজার কড়া নাড়িতেছে। চুপ করিয়া বুড়ী কাণ পাতিয়া রহিল, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিল বুঝিল বাতাসের কার্য্য। এমন অসময়ে রহস্য করিবার জন্য বাতাস কতকগুলা গাল খাইল। এবার বুড়ী নীরবে কাঁদিবার ব্যবস্থা করিল। এ সময় চীৎকার করাটা বুদ্ধিমতীর কার্য্য নয়। বুদ্ধিমতী জুনিয়ার মা আর কোনও মতে কণ্ঠ হইতে শব্দ বাহির হইতে দিল না। যদিই বা ফাঁকে ফুঁকে দুই একটা কথা কহিয়া গলা ছাড়াইবার উপক্রম করিল, অমনি সে হাতে মুখে চাপিয়া দাঁতে পিশিয়া তাহাদের বিনাশ সাধন করিতে লাগিল। পাছে কেহ বাহির হইতে কথা শুনিতে পায়,—পাছে কেহ বাড়ীতে আসিয়া তাহাকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করে।

অতি সন্তর্পণে জুনিয়ার মা শোকাবেগ কার্য্য নিষ্পন্ন করিল।

তারপর আবার পুঁটলি বুকে করিয়া বসিল। বুড়ী কোথায় যে মোহর লুকাইবে, তাহা এখনও স্থির করিতে পারে নাই। ভাবিল দিনটা যে কোন প্রকারে কাটাইয়া দিই। রাত্রে এর যাহ'ক একটা বিলি ব্যবস্থা করিব।

সহসা বিষম লোককোলাহল তাহার কাণে গেল। বৃদ্ধা শুনিতে পাইল, কাছারী বাড়ীর নিকটে একটা বিষম গোলমাল বাধিয়াছে। বৃদ্ধা স্থির করিল, এ আর কিছু নয় পণ্ডিতজী ঘরে নাই জানিয়া তাহার মোহরের গন্ধে সিপাহীগুলা তাহার ঘর লুটিতে আসিতেছে। সে তাড়াতাড়ি, যেখানে যা পাইল পাথর, ইট, কাঠ দরজায় চাপা দিতে আরম্ভ করিল। এদিকে কোলাহলে অন্তঃপুর পরিপূর্ণ হইয়াছে। জুনিয়ার মা দেখিল, রাজবাটীর ছাদে—রাজা, রাণী ও রাজকুমারী তিন জনেই উদ্‌গ্রীব হইয়া কি দেখিতেছেন।

বৃদ্ধার আর বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না। সে থলিয়া লইয়া ব্রাহ্মণের ঘরে প্রবেশ করিল। কবাট বন্ধ করিল। এবং মোহরের থলিয়া বুকে করিয়া, জীবনে প্রথম স্বেচ্ছায় উপবাসব্রত গ্রহণ করিল।

মোহর কয়টী দিয়া যথার্থই ব্রাহ্মণ প্রভুপরায়ণা পরিচারিকার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া গিয়াছেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

ঘর হইতে বাহির হইয়াই রতন ভাবিলেন,—"একবার দুষ্ট দেওয়ানকে দেখিয়া যাই। এই স্থির করিয়া তিনি কাছারী বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। ইংরাজের অধীনে আসিয়া, অভ্যাগত সাহেব-দিগের অভ্যর্থনাদির জন্য রাজা সাহেবীধরণে অট্টালিকাটী নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন। এখন ইহার নিম্নে কাছারী হয়, উপরে আনন্দদেব পরিবার লইয়া বাস করেন। সাহেবদিগের জন্ত একটী স্বতন্ত্র আবাস-

স্থান নির্ম্মিত হইয়াছে। কাছারী বাড়ীর পূর্ব্বে কালাবাঁধ বলিয়া একটী প্রকাণ্ড দিঘী। তাহার পূর্ব্বে ঠিক কাছারী বাড়ীর পরপারে রামবাগ বলিয়া উদ্যান। তাহার মধ্যে সুনির্ম্মিত একখানি বাঙ্গলা। সাহেবেরা এখন সেই স্থানে আসিয়াই থাকেন।

কাছারী বাড়ার পূর্ব্বে প্রায় দুই রশী দূরে সুবর্ণরেখাতীরে রাজপ্রাসাদ। রতনের ঘরখানি রাজবাটীর সংলগ্ন একটী অনতিবৃহৎ উদ্যানের পশ্চাতে। তাঁহার ঘরের দিকের প্রাচীরে একটী দ্বার ছিল। রাজার সহিত সাক্ষাতের সময়, কিম্বা কাছারী বাটীতে যাইবার সময় ব্রাহ্মণ সেই দ্বার দিয়া বাগান পার হইয়া যাইতেন। তখন কাছারি বাড়ী তাহার ঘরের অতি নিকটে ছিল। এখন কিন্তু তাহা অনেক দূর হইয়া পড়িয়াছে। আনন্দদেব সেই দ্বারটী বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। পাছে তাঁহার অলক্ষ্যে ব্রাহ্মণ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসে।

আজকাল তাঁহাকে সুবর্ণরেখার তীরস্থ পথ ধরিয়া কিছুদূর উত্তর মুখে যাইতে হইত। তারপর রামবাগ বেড়িয়া উজান বাহিয়া কাছারী বাড়ী ও রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইতে হইত। পূর্ব্বে রতন অন্তঃপুরদ্বার দিয়া রাজগৃহে প্রবেশ করিতেন। এখন সিংহদ্বার ভিন্ন গৃহ প্রবেশের অন্য পথ ছিল না। সেখানে যে সমস্ত দ্বারবান ছিল তাহারা আনন্দদেবের চরের কার্য্য করিত।

সুতরাং গত রাত্রিতে রতনের রাজবাটীতে আগমন ও বহুক্ষণ অবস্থান রাত্রি মধ্যেই আনন্দদেবের কাণে উঠিয়াছে। আনন্দদেব আরও শুনিয়াছেন, একটা থলিয়ার মধ্যে কি জানি কি দ্রব্য লইয়া রতন গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছেন।

চিন্তায় সমস্ত রাত্রি আনন্দদেবের নিদ্রা হয় নাই। ব্রাহ্মণকে ভয় করিলেও আনন্দদেব মনে মনেও তাহাকে ঘৃণা করিতে সাহস করিতেন না। ব্রাহ্মণের নিস্পৃহতা তাঁহার অবিদিত ছিল না। প্রয়োজন

সাধনের জন্য তিনি নিজেই কতবার তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়াছেন। বহু অর্থে ব্রাহ্মণকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। চেষ্টায় ফল হয় নাই। সেই ব্রাহ্মণ থলিয়া করিয়া আনিল কি? সম্ভবতঃ মুদ্রা। মুদ্রার বৈদ্যুতিক শক্তি আনন্দদেবের অপরিজ্ঞাত ছিল না। আনন্দদেব জানিতেন যে মুদ্রার সহায়তায়, ভিখারী হইয়াও তিনি আজ রাজার তুল্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই মুদ্রার সাহায্যে বুদ্ধিমান বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ না করিতে পারে কি? বিশেষতঃ অগ্রে কোনও সংবাদ না দিয়া রঁাচি হইতে জয়েণ্ট সাহেব একজন বন্ধু লইয়া গতরাত্রে অনন্তপুরে আসিয়াছেন। অবশ্য চরের সাহায্যে আনন্দদেব জানিয়াছেন যে সাহেবদের সহিত রতনের সাক্ষাৎ হয় নাই, তথাপি দেওয়ান বৃশ্চিকদষ্টের ন্যায় সমস্ত রাত্রি বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিয়াছেন।

শেষরাত্রে যখন মুকুন্দ আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল, যে সাহেবেরা মৃগয়ার জন্য অনন্তপুরে আসিয়াছে, তখন কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া দেওয়ান একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন। তন্দ্রাটী আসিয়াছে; এমন সময় বাহিরে একটা বিষম কোলাহল, তাঁহার আগমনোন্মুখী নিদ্রাকে একেবারে বৈতরণী পার করিয়া দিল।

সভয়ে আনন্দ শয্যা ত্যাগ করিলেন। কোলাহলের কারণ জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া জানালার কাছে ছুটিলেন। কিছু দেখিতে পাইলেন না। মুকুন্দকে ডাকিলেন, উত্তর পাইলেন না। পর প্রকোষ্ঠে যাইয়া মুকুন্দের সন্ধান করিলেন। দেখিলেন, মুকুন্দ নাই। প্রাণপণ চীৎকারে ভৃত্যদের ডাকিলেন। কোনও ভৃত্য উত্তর দিল না। কোলাহল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আনন্দদেবের বোধ হইল অনন্তপুরের গগন কি যেন এক অলৌকিক ভীমনাদে আলোড়িত হইতেছে। তিনি পুনরায় জানালার নিকটে গিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন। দেখিলেন জনস্রোত সুবর্ণরেখার তীরাভিমুখে প্রবাহিত

হইতেছে। ভয়ে তিনি জানালা বন্ধ করিলেন। দ্বারের কবাট বন্ধ করিতে যাইতেছেন এমন সময় স্ত্রী ও পুত্রবধূ অন্তঃপুর হইতে তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিল।

স্ত্রীকে তদবস্থায় দেখিয়া সভয়ে আনন্দদেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপার কি!"

স্ত্রী বলিল—"সর্ব্বনাশ হইয়াছে। মুকুন্দ বুঝি নাই।"

পুত্রবধূ জানকী সকরুণ চীৎকার করিয়া উঠিল।

স্ত্রী আবার বলিল—ব্রাহ্মণ রতন তাহাকে হত্যা করিয়াছে।

মূর্চ্ছিতপ্রায় আনন্দদেব ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন। সহসা একজন ভৃত্য ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া ঘরে প্রবেশ করিল এবং ভূপতিত প্রভুকে দেখিয়াই, সত্বর তাঁহাকে স্থানত্যাগ করিতে অনুরোধ করিল। বলিল—"এখনি ঘর ছাড়িয়া পালান। নইলে প্রাণে বাঁচিবেন না। ব্রাহ্মণ এই দিকেই আসিতেছে।"

মৃত্যুর আশঙ্কায় দেওয়ান তখনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।—প্রভুকে সাবধান করিয়া ভৃত্যও ফিরিয়া চলিল। একবারমাত্র আনন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন—"মুকুন্দ?"

ভৃত্য। সাহেবেরা তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে।

সংবাদ দিয়াই আত্মরক্ষার্থ সে দ্রুতবেগে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

এদিকে বাহিরের কোলাহল কাছারী বাড়ীর ভিতরে আসিয়াছে। আনন্দ পত্নীকে বলিলেন—"ব্যাপার বুঝিতেছ না? পালাও।"

আনন্দপত্নী পুত্রবধূর হস্ত ধরিয়া অন্তঃপুরাভিমুখে ছুটিল। বিপদে জ্ঞানশূন্যা, স্বামীর ভবিষ্যৎ ভাবিবার আর অবকাশ পাইল না।

আনন্দদেবের বোধ হইল, তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য যেন চারিদিক হইতে নরঘাতক তাঁহার গৃহাবরোধ করিতে ছুটিয়া আসিতেছে।

এরূপ অবস্থায় পলায়ন ভিন্ন গত্যন্তর নাই। বাহির হইবার জন্য ঘরের চৌকাটে যেই পা দিয়াছেন অমনি সোপানে অসংখ্য পদশব্দ শ্রুত হইল। তাঁহার হস্তপদ অবশ হইয়া আসিল। তিনি বুঝিলেন, বাহির হইলেই নরঘাতকের সম্মুখে পড়িব। আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি পর্য্যঙ্কতলে আত্মগোপনের উদ্যোগ করিলেন। বিপদে আত্মহারা—দ্বাররোধ কার্য্যটা পর্য্যন্ত তাঁহার মনে আসিল না।

বিভীষিকায়, ঘটনার আকস্মিকতায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় আনন্দ নিজের শারীরিক অবস্থার কথা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। ভুলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার দেহ বহুকাল হইতে কতকগুলা অপ্রয়োজনীয় মাংসরাশির অপ্রীতিকর ভারবহন করিয়া আসিতেছে। ভুলিয়া গিয়াছেন, যে এই *অযথা-সঞ্চিত মাংসরাশি তাঁহার দেহের সর্ব্বাংশে সমানুপাতে বিন্যস্ত ছিল না,*—কোথাও অল্প কোথাও বা অধিক ছিল। এটাও বুঝিতে পারেন নাই তলদেশে প্রবেশমুখে পর্য্যঙ্ক তাঁহার অনধিকার প্রবেশের ন্যায়সঙ্গত প্রতিবাদ করিতে সর্ব্বতোভাবে সমর্থ।

যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিল। অর্থাৎ পর্য্যঙ্কতলে অতি আগ্রহে প্রবেশ করিতে গিয়া আনন্দদেবের সেই বিশাল অঙ্গ মধ্যভাগে আবদ্ধ হইয়া গেল। মস্তক ও স্কন্ধের কিয়দংশ পর্য্যঙ্কের নিম্নে স্থান পাইল। অঙ্গের অবশিষ্টাংশ বাহিরে পড়িয়া রহিল।

নিরুপায় আনন্দদেব কুক্কুরতাড়িত ধৃতপ্রায় ক্লান্ত শশকের ন্যায় অর্দ্ধ-লুক্কাইত দেহে চক্ষু মুদিয়া আপনাকে নিরাপদ জ্ঞান করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

সাহেব দুইজনের মধ্যে যিনি রাঁচির জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, তাঁহার নাম হার্‌লি, সঙ্গীরের নাম ব্রাউন। হার্‌লি পাঁচ বৎসর এদেশে আসিয়াছেন। ব্রাউন নবাগত। তিনি সম্ভ্রান্তবংশীয়। বিলাতের জনৈক লর্ডের ভাগিনেয় ও উত্তরাধিকারী। তাঁহার পিতৃব্য সে সময়

ছোটনাগপুরের কমিশনর। হিন্দুস্থান দেখিবার অভিলাষে, অতি অল্পদিন হইল তিনি এদেশে আসিয়াছেন। আসিয়া পিতৃব্যের গৃহেই অতিথি হইয়াছেন। মৃগয়াব্যাপদেশে হারলির সহিত তাঁহার অনন্তপুরে আগমন।

যে সময় রতন গৃহত্যাগ করিয়া কাছারী বাড়ীতে আসিতেছিলেন, তাহার অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই ব্রাউন শয্যাত্যাগ করিয়াছেন। হারলি তখনও নিদ্রিত।

ব্রাউন শয্যাত্যাগ করিয়া বাংলাসংলগ্ন পুষ্পোদ্যানে বিচরণ করিতেছিলেন। সেইস্থান হইতে সুবর্ণরেখাতীর পর্য্যন্ত একটী বিশাল তৃণ প্রান্তর। মাঝে কেবল একটী প্রকাণ্ড বটগাছ।

সুবর্ণরেখার পরপারে, অনন্তপুর হইতে প্রায় একক্রোশ দূরে একটী অনতিউন্নত অধিত্যকা ভূমি হইতে জনার সেই বহুযোজনব্যাপী জঙ্গলের আরম্ভ। ছোট বড় শালগাছ বুকে লইয়া, স্তরে স্তরে উন্নত সেই বিশাল অরণ্য স্থিরতরঙ্গবক্ষ মহাসিন্ধুর ন্যায় অনন্ত আকাশ নীলিমাকে আলিঙ্গন করিতেছিল। মাঝে মাঝে দুই চারিটী পাহাড় নোঙ্গরে আবদ্ধ ধূসরবর্ণ জাহাজের ন্যায় সেই শ্যাম সমুদ্রে ভাসিতেছিল। বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে ব্রাউন সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব মহান অরণ্যের সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

এমনি সময়ে রতন সুবর্ণরেখার তীরভূমি পরিত্যাগ করিয়া প্রান্তরে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার মাথায় উষ্ণীষ, গায়ে বেনিয়ান, পরিধান মালকোচা করা ধুতি, পায়ে নাগরাজুতা এবং হস্তে তৈল-নিষেকোজ্জ্বল-লোহিতাভ বংশযষ্টি। বহুদিন হিন্দুস্থানীদের সংশ্রবে থাকিয়া তাঁহার আচার ব্যবহার অনেকটা তাহাদেরই মতন হইয়াছিল। তিনি সর্ব্বদা পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভাল বাসিতেন। ঘরে থাকিলেও তিনি কখন মলিন

প্রান্তরে আসিয়াই রতন সর্ব্বাগ্রে বট বৃক্ষের সমীপস্থ হইলেন, এবং তাহার একটী ভূমিলগ্ন শাখায় কমণ্ডলু, মৃগচর্ম্ম, কাপড়ের পুঁটুলি ও লাঠী গাছটী রক্ষা করিলেন, এবং রিক্তহস্তে কালাবাঁধের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কাছারী বাড়ীতে যাইতে হইলে বরাবর পূর্ব্বমুখে সরোবরের তীর ধরিয়া বাংলাকে পশ্চাতে রাখিয়া আবার তাঁহাকে পশ্চিম-মুখী হইতে হইবে।

পূর্ব্বমুখে ফিরিতে রতনের মুখে প্রাতঃসূর্য্যের কিরণ পতিত হইল। তাঁহার কষিত-কাঞ্চনোজ্জ্বল বর্ণ বয়সের আধিক্যে গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার বিশাল বক্ষ, অত্যুন্নত দেহ, সৌম্য ও ধীরতাব্যঞ্জক মুখশ্রী, পক্ককেশ-মণ্ডিত শুভ্র মস্তক, মুহূর্ত্ত মধ্যে ব্রাউনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। প্রান্তরপথে চলিতে চলিতে মন্থরগামী বৃদ্ধ সুশুভ্র পরিচ্ছদে অরুণ কিরণে প্রতিফলিত হইয়া গতিশীল কাঞ্চনজঙ্ঘার ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন।

জনার জঙ্গলের শোভা দেখিতে দেখিতে ব্রাউনের ভাবরাজ্যে একটা তরঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল। অরণ্যের বিশালতায় আপনাকে নিক্ষেপ করিয়া তন্ময় যুবক সেই দূরদেশ হইতেই ধ্যানমগ্ন যোগীর ন্যায় আত্মবিস্মৃতির সুখে মুহুর্ম্মুহু আন্দোলিত হইতেছিলেন। জীবনটা তাঁহার স্বপ্নবৎ বোধ হইতেছিল। পূর্ব্বজীবনের ঘটনা পরম্পরা স্বপ্নকুহেলিকাবৃত ফুলরাশির ন্যায় তাঁহার মনশ্চক্ষুর উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। এমন সময়ে রতনের দিব্যমূর্ত্তি একাধার-নিবিষ্টপুষ্প-গুচ্ছের ন্যায় তাঁহার স্বপ্নাবিষ্ট দৃষ্টির উপর সহসা প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। ব্রাউনের বোধ হইল, যেন পশ্চিমাকাশ হইতে ভূতলাবতীর্ণ প্রভাতারুণ-স্নাত দেবদূত প্রান্তরে বিচরণ করিতেছে। বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তিনি চারলিকে ডাকিলেন। চারলি তখনও ঘুমাইতেছিলেন। ঘুমাইতে ঘুমাইতে, তিনি এজলাসে বসিয়া এক বৃদ্ধ বলিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে, সূক্ষ্মাত্র

বলিষ্ঠতার অপরাধে, কিছু কালের জন্য শ্রীঘরে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। এমন সময় সহচরের কথা কর্ণে প্রবিষ্ট হওয়ায় তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

চোখ মুছিতে মুছিতে হারলি বাহিরে আসিলে, ব্রাউন তাঁহাকে ব্রাহ্মণকে দেখাইয়া, বলিলেন—"দেবদূত দেখিয়াছ ?"

দেবদূত দেখিয়াই হারলি উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।—বলিলেন—"কিছুদিন এদেশে থাকিয়া, এ স্থানের জলবায়ুতে অভ্যস্ত হইয়া নেটিভ দেখিবার চক্ষু প্রস্তুত কর। তারপর উহার পানে চাহিও। দেখিবে উহার মূর্ত্তি কত কুৎসিৎ!"

ব্রাউন এ সকল কথার এক বর্ণও বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিলেন—"চক্ষুর কি অবস্থা হইলে এরূপ সুন্দর কুৎসিত দেখায়।"

এদিকে দিঘীর পাড়ের আড়ালে পড়িয়া রতন সাহেবদিগের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ব্রাউনের হাত ধরিয়া হারলি তাঁহাকে বাংলার ভিতর লইয়া চলিলেন। চলিতে চলিতে ব্রাউন একবার ফিরিলেন—ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলেন না। হারলির কথায় তাঁহার মনটা বড়ই বিষণ্ণ হইয়া গেল। তথাপি ব্রাহ্মণ যে ছবি তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়াছিলেন, সেটী আর বিলুপ্ত হইল না।

এদিকে রতন ধীরে ধীরে কাছারী বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। মুকুন্দও সেইপথ দিয়া সাহেবদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছিল। আসিতে আসিতে সম্মুখে দেখিল রতন। মুকুন্দের মুখ শুকাইয়া গেল। দেওয়ানের কথা জানিবার জন্য রতন তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেন।

এমনি সময়ে চারিজন সিপাহী কাছারীর কাজে সেই পথ ধরিয়া কোথায় যাইতেছিল। দেখিল মনিবের সম্মুখে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রতন। কৌতূহল-পরবশ হইয়া তাহারা উভয়ের নিকটে আসিল। প্রত্যেকেরই

ন্তে একগাছি করিয়া দীর্ঘ যষ্টি ছিল। যষ্টি স্কন্ধন্যস্ত করিয়া তাহারা কুন্দের পার্শ্বে দাঁড়াইল।

সিপাহীদের দেখিয়া মুকুন্দের সাহস ফিরিল। ভাবিল—"ব্রাহ্মণকে জের শক্তি দেখাইবার এই একটী শুভ অবকাশ। ব্রাহ্মণ কথায় থায় আমার ও আমার পিতার অপমান করিত। আমিই বা এই বকাশ ছাড়িব কেন।" ব্রাহ্মণ সমীপস্থ হইবা মাত্র রুক্ষস্বরে জ্ঞাসা করিল—"কি চাও।" রতনের সম্মুখে মাথা তুলিয়া মুকুন্দ ীবনে এই প্রথম কথা কহিল।

স্বরের রুক্ষতায় রতন বিরক্ত হইলেন। তথাপি সাবধনতার সহিত নোভাব গোপন করিয়া উত্তর দিলেন—"তোমার পিতার সহিত াক্ষাৎ করিতে চাই।"

মুকুন্দ পূর্ব্ববৎ রুক্ষস্বরে রতনকে বুঝাইল, তাহার পিতার ন্যায় ানননীয় ব্যক্তির সহিত, রতনের ন্যায় দরিদ্র ভিক্ষুকের সাক্ষাতের অভিলাষ ধৃষ্টতা। মুকুন্দের বড়ই ধৈর্য্য যে বৃদ্ধের ধৃষ্টতার শাস্তি না দিয়া স এখনও পর্য্যন্ত তাহার অসভ্যজনোচিত মূর্ত্তি সম্মুখে অবস্থিত হইতে অনুমতি প্রদান করিয়াছে। রুক্ষতর স্বরে মুকুন্দ বৃদ্ধকে স্থানত্যাগ করিতে আদেশ করিল।

সিপাহীগণও বৃদ্ধের আগমন প্রভুর অপ্রীতিকর বুঝিয়া, তাহাকে গমনে বিরত করিতে অগ্রসর হইল। ইহাদের মধ্যে একজন রতনকে বহুকাল হইতে জানিত। অপর তিনজন নবাগত। তাহারা একে-বারে রতনের গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। ভাবিল, এরূপ করিলে বৃদ্ধ ভয়ে আপনা হইতেই স্থানত্যাগ করিবে।

রতন কিন্তু প্রতিনিবৃত্ত হইতে আসেন নাই। সুতরাং মুকুন্দের রুক্ষ আদেশবাক্য ও সিপাহীদিগের বীরত্ব কার্য্যকর হইল না। বৃদ্ধ বরং মুকুন্দের দিকে অগ্রসর হইবার ভাব দেখাইল।

পরিচিত সিপাহী ভাবিল, গতিক ভাল নয়। অপর সিপাহীরা স্থির করিল বৃদ্ধ উন্মাদ। মুকুন্দ বুঝিল, ব্রাহ্মণ কি একটা কাণ্ড করিতে আসিয়াছে। তথাপি সাহসে ভর করিয়া বলিল—"বৃদ্ধ, যদি মঙ্গল চাও, তাহা হইলে এই দণ্ডেই স্থানত্যাগ কর"।

রতন দেখিলেন মিষ্টবাক্যে কার্য্য হইবে না, তাহাতে বৃথা সময় নষ্ট। অগ্রসর হইয়া তিনি একেবারে মুকুন্দকে ধরিয়া ফেলিলেন। সিপাহীগণ হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল।

রতন তাহাদের চীৎকার কানে তুলিলেন না। একজন সিপাহী ছুটিয়া রতনকে ধরিল। রতন ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। কিঞ্চিৎ বল প্রয়োগে মুকুন্দকে দাঁড় করাইয়া, ঈষৎ গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"মূর্খ! স্থানত্যাগ করিবার জন্য আমি সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া এতটা পথ আসি নাই। তুমি যদি মঙ্গল চাও,—তোমার পিতা যদি মঙ্গল চায়, তাহা হইলে আমাকে তাহার কাছে লইয়া চল।"

তখন মুকুন্দ প্রকৃতিস্থ হইল। রতনের প্রকৃত মূর্ত্তি তাহার চক্ষে প্রতিভাত হইল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, বাগ্‌-রহিত মুকুন্দ কাতর-নেত্রে প্রহরীদিগের পানে চাহিল। প্রভুকে অপমানিত দেখিয়া সিপাহীগুলা রতনকে আক্রমণ করিল। বিনা আয়াসে তাহাকে কুটুম্বিতা প্রদান করিয়া, প্রেমবিহ্বলচিত্তে সবলে আকর্ষণ করিল এবং মুকুন্দের হস্ত হইতে তাহার হস্তমুক্ত করিবার চেষ্টা করিল।

চেষ্টায় ফল হইল না। সিপাহীগুলার বোধ হইল, মানুষ ধরিতে গিয়া তাহারা নরদেহধারী কি এক প্রস্তরবৎ কঠিন পদার্থে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। অতি আকর্ষণেও তাহারা ব্রাহ্মণকে স্থানচ্যুত করিতে পারিল না। মুকুন্দেরও মুক্তিলাভ হইল না। বিস্ময়ে তিনজনে পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করিল। রতনের পরিচিত সিপাহী দূরে দাঁড়াইয়া প্রমাদ গণিতেছিল।

প্রাণপণে মুকুন্দ চীৎকার করিয়া উঠিল। প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিতে অনেক সিপাহী কালাবাঁধের তীরে উপস্থিত হইয়াছিল। পর-পার হইতে তাহারা মুকুন্দের চীৎকার শুনিল, শুনিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে তাহারা মুকুন্দের রক্ষার্থ ছুটিল।

চীৎকার সাহেবদিগেরও কানে পঁহুছিয়াছে। কারণ নির্দ্ধারণের জন্য তাঁহারাও বাংলার বাহিরে আসিয়াছেন। সাহেবদের দেখিয়া মুকুন্দ চীৎকার করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিল। বলিল—"সাহেব! দস্যুর হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা কর।"

[ক্রমশঃ]

বিপদের প্রতি।

১

হে ভৈরবি, কাণ্ডজ্ঞান শূন্যা, চিরনগ্না,
করোটি—কপাল লয়ে' করে,
তপ্তসুরা-পান-মগ্না, অয়ি অশোভনা,
তাণ্ডবিয়া আনন্দ অন্তরে
থেই থেই,—বৃকোদর, কীচকে যেমত,
বাঁধ মোরে, ছাঁদ মোরে, অয়ি ক্রূরমতি!

২

এস, এস, হে বিপদ, অট্ট অট্ট হাসে,
এস চণ্ডি, বেতালের প্রায়,
জন্মান্ধ কবন্ধ বায়ু, সাহারা-আকাশে
করে যথা ঘোর "হায়, হায়,"
তেমতি গো আর্ত্তনাদে, এস ভয়ঙ্করি,
বাসনা—মায়ার কন্যা মরুক শিহরি।

৩

হে বিপদ, শাঁকমূর্ত্তি, পাণ্ডুর-অধরা,
নত-আঁখি সজল লোচনা,
এস, এস, নিজ-রঙ্গে নিজেই জর্জ্জরা,
তন্ত্র মন্ত্র-সাধন-মগনা।
মারণ-বশীকরণ-উচাটন-রতা,
এস কাপালিক-বধূ! পর-পীড়া ব্রতা!

৪

হবে যবে সর্ব্বনাশ, হাহাকার করি'
দানা যবে ঘরে দিবে হানা,
বিপদ মৃণালোপরি পদ্মরূপ ধরি'
দেখা দিবে হরি আরাধনা,
সূচিময়ী লতা ভেদি' সৌরভ ছুটিবে,
সে ফাল্গুনে হরিনাম-গোলাপ ফুটিবে!

৫

হে বিপদ, দাউ দাউ উল্কা-মুখ মেলি'
চারিধারে মহা বহ্নি জ্বালি'।
এস, এস, ঢালি' হৈম বাসনার চেলী,
আমি দিব আপনারে ডালি।
বৈদেহী হাসিলা যথা অগ্নি-দেব-কোলে,
আমিও হাসিব রঙ্গে হরি-ক্রোড়-দোলে!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

বাঙ্গালা পুস্তকের বিবরণী।

আমরা এখন হইতে নবপ্রকাশিত বাঙ্গালা পুস্তক সমূহের বিষয়ানুক্রমিক একটি তালিকা "ভারতীতে" দিতে চেষ্টা করিব। এই তালিকায় পুস্তকগুলি সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংক্ষেপ উল্লেখ থাকিবে। উপযোগিতানুসারে পুস্তক বিশেষের বিস্তৃত সমালোচনাও "ভারতীতে" প্রকাশিত হইবে। আপাততঃ *যে সকল পুস্তক আমাদের হাতে আছে, নিম্নপ্রদত্ত বিবরণীতে তাহার কতকগুলি* উল্লিখিত ও আলোচিত হইল।

সাহিত্য (১) সন্দর্ভ-শাখা—

১। পত্রালী। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় সম্পাদিত। কলিকাতা ২৫ নং রায় বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে সন্ন্যাল এণ্ড কোং দ্বারা মুদ্রিত এবং ২৮।৪ অখিল মিস্ত্রির লেন শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বসু বি, এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বাঁধাই ও ছাপা উৎকৃষ্ট। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ফর্ম্মার ২২৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; মূল্য ১৷৹ টাকা। বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্য সম্বন্ধে সুখপাঠ্য পত্রাবলী। মহিলাগণের বিশেষ, উপযোগী; অবসর কালে পাঠ করিলে, অবসর সুবর্ণপ্রসূ হইবে। পুস্তকের সূচী,—প্রথম অধ্যায় প্রকৃতিবৈচিত্র্য (১) বিষয়—গান, চন্দ্র, শুকতারা, কান্না, দুগ্ধ। দ্বিতীয় অধ্যায়—প্রকৃতি বৈচিত্র্য (২) বিজ্ঞতা, অঙ্গরাগ কি বিড়ম্বনা নয়? ভূষণ, কবিতা, জগৎ কি আঁধার? ভূকম্প, পর্ব্বত। তৃতীয় অধ্যায়=প্রকৃতি বৈচিত্র্য (৩) এক দুই তিন, বিজ্ঞান চর্চ্চা বা প্রকৃতি আরাধনা, বিজ্ঞানে নাস্তিকতা, সখ্য চিত্রকলা, সুখ দুঃখ।

২। ধর্ম্মানন্দ প্রবন্ধাবলী। প্রণেতা শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী। প্রথম খণ্ড ডবল ক্রাউন্ ১৬ পেজী ফর্ম্মার ৩১৪ পৃষ্ঠায় পূর্ণ। ৩০।৫ মদন মিত্রের লেন, নব্যভারত প্রেসে শ্রীভূতনাথ পালিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সন ১২১০। মূল্য ১৷৹ টাকা। হাভারতী মহাশয় নব্যভারত, ভারতী, প্রবাসী, বঙ্গদর্শন, সাহিত্য, নবপ্রভা, সুধা প্রভৃতি বিবিধ পত্রিকায় যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, ভূতনাথ বাবু তাহারই মধ্যে কতকগুলি নির্ব্বাচন করিয়া এই পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। বিষয়ের সূচী;—মহাত্মা শৈষ, অগ্রহর, অসম্পূর্ণ আদর্শ, শ্রীনাথদ্বার, দ্বিতীয় যুগের নবদ্বীপ, সংযম সামর্থ্য, বাবা ব্রহ্মানন্দ, ইটের বই, সাসারামের রোজা, হিন্দুশব্দতত্ত্ব, বউ কথা

কণ্ঠ, পদচিহ্ন, শ্বেতীমারী, অদৃষ্ট খণ্ডন, রাণীভবানীর পত্র, বঙ্গ সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগ, শাক্ত ও শৈব, ব্রহ্মতত্ত্ব-শব্দ, কাশীদাসের সংস্কৃতাভিজ্ঞতা। প্রকাশক ভূতনাথ বাবু পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"শ্রীযুক্ত মহাভারতী মহাশয়ের অনেক প্রবন্ধ ইংরাজী, হিন্দী, তামীল এবং উর্দ্দু ভাষার সমাচার পত্রে অনুবাদিত হইয়া গিয়াছে এবং কেবল বঙ্গদেশ বা ভারতবর্ষে কেন সুদূর ইংলণ্ড, আমেরিকা ও অষ্ট্রালিয়া দেশেও তিনি যথেষ্ট প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছেন।" অতঃপর আমাদের ভরসা আছে, এই প্রবন্ধগুলির প্রভাবে বঙ্গভাষা জগতের অপরাপর স্থানেও শীঘ্র সুপরিচিত হইবে।

৩। শিবাজীর মহত্ত্ব। শ্রীসখারামগণেশ দেউস্কর প্রণীত। ১৩১০ সাল, আষাঢ়। শিবাজী-মহোৎসব উপলক্ষে কলিকাতা শিবাজি-উৎসব-সমিতির দ্বারা বিনামূল্যে বিতরিত। ২০ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পুস্তিকা। আকারে ক্ষুদ্র হইলেও এই পুস্তিকাখানি গুণে ক্ষুদ্র নহে, চিত্রটি ক্ষুদ্র হইলেও উহা জীবন্ত।

৪। অশ্রুধারা, শ্রীঅনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মিঃ এস, সি, আঢ্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ফ্যাক্টরি প্রেসে। শ্রীতারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত। সন ১৩১০। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মার ৬৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। পত্নীর বিয়োগ হইলে কিরূপে বিলাপ করিবেন, লেখক কল্পনায় তাহা অনুভব করিয়া পত্নীর জীবদ্দশায়ই এই অশ্রুধারার অভিনয় করিয়াছেন। ইহা উদ্ভ্রান্তপ্রেমের ধরণে লিখিত। পুস্তকখানির মূল্য ।৶০। গ্রন্থকার তাঁহার এক বন্ধুর কথা উল্লেখ করিয়াছেন "ঈশ্বর না করুন, তিনি (গ্রন্থকারের সহধর্ম্মিণী) যদি আপনার পূর্ব্বে পরলোকে গমন করেন, তাহা হইলে আপনি তাঁহার নিমিত্ত কিরূপ অশ্রুধারা বর্ষণ করিবেন, তিনি জীবিত অবস্থায় তাহা জানিতে পারিয়া আপনার আদরের মাত্রা বাড়াইয়া দিবেন।" বটে!

৫। বৌদ্ধযুগের ভারত মহিলা বা বিশাখার উপাখ্যান। শ্রীচারুচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক পালি ভাষা হইতে অনুবাদিত, ডিমাই ৮ পেজী ফর্ম্মার ৩৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। পারুসিভিয়ারেন্স যন্ত্রে শ্রীযুক্ত চিন্তামণি ক্ষেত্রী দ্বারা মুদ্রিত। ১৯০০ ইং সন। মূল্য ।৶০ আনা। ইহা একখানি অতি সুপাঠ্য শিক্ষাপ্রদ পুস্তিক, মহিলাগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

৬। পৌরাণিক কাহিনী। শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা বসু প্রণীত। ডবল ফুলস্কেপ ১৬ পেজী ফর্ম্মার ৭৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। কলিকাতা ৮ নং কলেজ স্কোয়ার চেরি প্রেসে মুদ্রিত এবং ২০৮।২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট মুকুল কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। মূ

।০ আনা। ১৩০৯ সন। এই পুস্তকে সরল ও সুন্দর ভাষায় নিম্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ, একলব্য, কচ ও দেবযানী, শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানী, রুরু ও প্রমদ্বরা, সাবিত্রী, ভীষ্ম ও অম্বা, ভীষ্ম ও শিখণ্ডী।

৭। আভাষ। কুমার শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র দেব বর্ম্মা প্রণীত। কুমিল্লা, কৈ যন্ত্রে গোপালচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত। ১৯০২ সন। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মা ৩৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এই সকল পুস্তকে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি সন্নিবেশিত হইয়া আত্মমর্য্যাদা, একাগ্রতা, ইচ্ছা, কল্পনা, শিক্ষা গ্রন্থ ও প্রকৃতি, চরিত্র। অল্প ব গ্রন্থকারের সাহিত্যে এই প্রথম উদ্যম বিশেষ প্রশংসার্হ। রাজপ্রাসাদ হইতে কুমারগণ বঙ্গভাষার প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, তাহাতে মনে হয় জাতীয় ভা অবশ্যই শ্রীশালিনী হইয়া উঠিয়াছেন।

৮। শ্রীরামচরিত্র। ৺ স্বর্গীয় রাখালদাস হালদার প্রণীত। ৬৪ নং আ মিস্ত্রির লেন, হিন্দু মেশিন প্রেসে মুদ্রিত ও ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে শ্রীগুরু চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৩০৮ সন। মূল্য ।০ আনা। পুস্তকখানি ডি ১২ পেজী ফর্ম্মার ৩৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এই পুস্তকের পূর্ব্ব ভাগে গ্রন্থকারের শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার স্বর্গীয় গ্রন্থকার মহাশয়ের একটী সুন্দর জীবনী প্রদ করিয়াছেন। সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ভূমিকায় লিখি ছেন—"কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমাদের শিক্ষিত সমাজের চিন্তাপ্রণালীর আ এই গ্রন্থ হইতে অনেকটা পাওয়া যাইবে। গ্রন্থখানি তজ্জন্য আদৃত হইবে।"

৯। পুরী যাইবার পথে। ডাক্তার রায় শ্রীচুনীলাল বসু বাহাদুর এম, এফ, সি, এস সঙ্কলিত ও ১৩১০ সালের ২৭শে বৈশাখ রবিবার "সাহিত্য সভা পঠিত। কলিকাতা ৫৯ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, 'বকুলগু' প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকা ক্ষুদ্র পুস্তিকা, মূল্য ৵০ আনা। রায় বাহাদুর পুরী হইতে বেশ উপাদেয় সাম পূর্ণ একখানি ক্ষুদ্র প্লেট সাজাইয়া সাহিত্যসমাজে উপহার দিয়াছেন। তিনি নি ডাক্তার, অনেক সামগ্রী পরিবেশন করিয়া মন্দাগ্নি জন্মাইবার লোক নহেন, দিয়াছেন, কিন্তু যেটুকু দিয়াছেন, তাহা স্বাদু, সরস ও হিতকর। এই ক্ষুদ্র পু খানি পুরী সম্বন্ধে নানা কৌতূহলোদ্দীপক তত্ত্বে পূর্ণ।

১০। স্ত্রীদিগের প্রতি উপদেশ। (চতুর্থ বার মুদ্রাঙ্কিত) শ্রীঈশানচ বসু প্রণীত।৺ কলিকাতা ৬নং কলেজ স্কোয়ার, সাম্য যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশি

কণ্ড, পদচিহ্ন, রেতীমায়ী, অদৃষ্ট খণ্ডন, রাণীভবানীর পত্র, বঙ্গ সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগ, শাক্ত ও শৈব, ব্রহ্মতত্ত্ব-শব্দ, কাশীদাসের সংস্কৃতাভিজ্ঞতা। প্রকাশক ভূতনাথ বাবু পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"শ্রীযুক্ত মহাভারতী মহাশয়ের অনেক প্রবন্ধ ইংরাজী, হিন্দী, তামীল এবং উর্দ্দু ভাষার সমাচার পত্রে অনুবাদিত হইয়া গিয়াছে এবং কেবল বঙ্গদেশ বা ভারতবর্ষে কেন সুদূর ইংলণ্ড, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া দেশেও তিনি যথেষ্ট প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছেন।" অতঃপর আমাদের ভরসা আছে, এই প্রবন্ধগুলির প্রভাবে বঙ্গভাষা জগতের অপরাপর স্থানেও শীঘ্র সুপরিচিত হইবে।

৩। শিবাজীর মহত্ত্ব। শ্রীসখারামগণেশ দেউস্কর প্রণীত। ১৩১০ সাল, আষাঢ়। শিবাজী-মহোৎসব উপলক্ষে কলিকাতা শিবাজি-উৎসব-সমিতির দ্বারা বিনামূল্যে বিতরিত। ২০ পৃষ্ঠায় ক্ষুদ্র পুস্তিকা। আকারে ক্ষুদ্র হইলেও এই পুস্তিকাখানি গুণে ক্ষুদ্র নহে, চিত্রটি ক্ষুদ্র হইলেও উহা জীবন্ত।

৪। অশ্রুধারা, শ্রীঅনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মিঃ এস, সি, আঢ্য কর্তৃক প্রকাশিত। ফ্যাক্টার প্রেসে। শ্রীতারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত। সন ১৩১০। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মার ৬৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। পত্নীর বিয়োগ হইলে কিরূপে বিলাপ করিবেন, লেখক কল্পনায় তাহা অনুভব করিয়া পত্নীর জীবদ্দশায়ই এই অশ্রুধারার অভিনয় করিয়াছেন। ইহা উদ্ভ্রান্তপ্রেমের ধরণে লিখিত। পুস্তকখানির মূল্য ।৵০। গ্রন্থকার তাঁহার এক বন্ধুর কথা উল্লেখ করিয়াছেন "ঈশ্বর না করুন তিনি (গ্রন্থকারের সহধর্ম্মিণী) যদি আপনার পূর্ব্বে পরলোকে গমন করেন, তাহা হইলে আপনি তাঁহার নিমিত্ত কিরূপ অশ্রুধারা বর্ষণ করিবেন, তিনি জীবিত অবস্থায় তাহা জানিতে পারিয়া আপনার আদরের মাত্রা বাড়াইয়া দিবেন।" বটে!

৫। বৌদ্ধযুগের ভারত মহিলা বা বিশাখার উপাখ্যান। শ্রীচারুচন্দ্র বসু কর্তৃক পালি ভাষা হইতে অনুবাদিত, ডিমাই ৮ পেজী ফর্ম্মার ৩৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। পারসিভিয়ারেন্স যন্ত্রে শ্রীযুক্ত চিন্তামণি ক্ষেত্রী দ্বারা মুদ্রিত। ১৯০০ ইং সন। মূল্য ।৵০ আনা। ইহা একখানি অতি সুপাঠ্য শিক্ষাপ্রদ পুস্তিক, মহিলাগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

৬। পৌরাণিক কাহিনী। শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা বসু প্রণীত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মার ৭৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। কলিকাতা ৮ নং কলেজ স্কোয়ার চেরি প্রেসে মুদ্রিত এবং ২০৮।২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট মুকুল কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। মূল

।০ আনা। ১৩০৯ সন। এই পুস্তকে সরল ও সুন্দর ভাষায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ, একলব্য, কচ ও দেবযানী, শর্ম্মিষ্ঠা ও দেবযানী, রুরু ও প্রমদ্বরা, সাবিত্রী, ভীষ্ম ও অম্বা, ভীষ্ম ও শিখণ্ডী।

৭। আভাষ। কুমার শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র দেব বর্ম্মা প্রণীত। কুমিল্লা, কৈলাশ যন্ত্রে গোপালচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত। ১৯০২ সন। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মায় ৩৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এই সকল পুস্তকে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে আত্মমর্য্যাদা, একাগ্রতা, ইচ্ছা, কল্পনা, শিক্ষা গ্রন্থ ও প্রকৃতি, চরিত্র। অল্প বয়স্ক গ্রন্থকারের সাহিত্যে এই প্রথম উদ্যম বিশেষ প্রশংসার্হ। রাজপ্রাসাদ হইতে যে কুমারগণ বঙ্গভাষার প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, তাহাতে মনে হয় জাতীয় ভাষা অবশ্যই শ্রীশালিনী হইয়া উঠিয়াছেন।

৮। শ্রীরামচরিত্র। ৺ স্বর্গীয় রাখালদাস হালদার প্রণীত। ৬৪ নং অখিল মিস্ত্রির লেন, হিন্দু মেশিন প্রেসে মুদ্রিত ও ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৩০৮ সন। মূল্য ।০ আনা। পুস্তকখানি ডিমাই ১২ পেজী ফর্ম্মার ৩৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এই পুস্তকের পূর্ব্ব ভাগে গ্রন্থকারের পুত্র শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার স্বর্গীয় গ্রন্থকার মহাশয়ের একটী সুন্দর জীবনী প্রদান করিয়াছেন। সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমাদের শিক্ষিত সমাজের চিন্তাপ্রণালীর আদর্শ এই গ্রন্থ হইতে অনেকটা পাওয়া যাইবে। গ্রন্থখানি তজ্জন্য আদৃত হইবে।"

৯। পুরী যাইবার পথে। ডাক্তার রায় শ্রীচুনীলাল বসু বাহাদুর এম, বি, এফ, সি, এস সঙ্কলিত ও ১৩১০ সালের ২৭শে বৈশাখ রবিবার "সাহিত্য সভায়" পঠিত। কলিকাতা ৫৯ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, 'বকুলও' প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত ক্ষুদ্র পুস্তিকা, মূল্য ৵০ আনা। রায় বাহাদুর পুরী হইতে বেশ উপাদেয় সামগ্রী পূর্ণ একখানি ক্ষুদ্র প্লেট সাজাইয়া সাহিত্যসমাজে উপহার দিয়াছেন। তিনি নিজে ডাক্তার, অনেক সামগ্রী পরিবেশন করিয়া মন্দাগ্নি জন্মাইবার লোক নহেন, অল্প দিয়াছেন, কিন্তু যেটুকু দিয়াছেন, তাহা স্বাদু, সরস ও হিতকর। এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি পুরী সম্বন্ধে নানা কৌতূহলোদ্দীপক তত্ত্বে পূর্ণ।

১০। স্ত্রীদিগের প্রতি উপদেশ। (চতুর্থ বার মুদ্রাঙ্কিত) শ্রীঈশানচন্দ্র বসু প্রণীত।" কলিকাতা ৬নং কলেজ স্কোয়ার, সাম্য যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ডিমাই ১২ পেজী ফর্ম্মার ৮১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য ।৵০ আনা। রমণীগণের প্রতি নানা উপদেশ সম্বলিত পত্রাবলী।

সাহিত্য (২) উপন্যাস শাখা।

১। স্নেহময়ী। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি, এ, এল, এম, এস প্রণীত। মণিকা প্রেসে (৫১/২ সুকিয়া ষ্ট্রীট কলিকাতা) মুদ্রিত এবং ৫০ নং গ্রে ষ্ট্রীট হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত ডিমাই ১২ পেজী ফর্ম্মার ১৫৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য ১৲ টাকা সামাজিক উপন্যাস। শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়াছেন, এবং পুস্তকের আদর্শের সুখ্যাতি করিয়াছেন।

২। যদুরায়। সামাজিক উপন্যাস। শ্রীযুক্ত কালিদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা সাথী প্রেসের প্রকাশিত। সন ১৩০৫। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মার ২৭৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। কাগজের মলাটের উপর হাকিম ও আমলাপূর্ণ এজলাসের একখানি ছবি আছে।

৩। ত্রিবেণী। তিনটি ছোট গল্প। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবিহারী দাস প্রণীত। কলিকাতা নিউ ব্রিটানিয়া প্রেসে মুদ্রিত। ১৯০১ সন। ডিমাই ১২ পেজী ফর্ম্মার ৮৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "আমি এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি বলিয়া এক সম্প্রদায় পাঠকের নিকট কিঞ্চিৎ অসন্তোষোক্তি শুনিতে পাওয়া যায়।" "মৎপ্রণীত পূর্ব্ব পুস্তক তিনখানি এবং বর্ত্তমান "ত্রিবেণী" কেবলমাত্র পাঠক সংগ্রহার্থে লিখিত—অন্য উদ্দেশ্য সাধনার্থে নহে।" সাধু!

৪। লহরী। শ্রীঅমরচন্দ্র দত্ত প্রণীত। কলিকাতা সান্যাল এণ্ড কোং কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সামাজিক উপন্যাস। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মার ১৯১ পৃষ্ঠায় পূর্ণ, মূল্য ৸০ আনা। (১৩০৯ সাল)।

৫। বিদায়। সামাজিক উপন্যাস। শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা, ৯৮ নং হেরিসন রোড, হরসুন্দর মেসিন প্রেসে মুদ্রিত এবং ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। (১৩১০ সাল)। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মার ৪২৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

সাহিত্য (৩) নাট্য-শাখা।

১। সংসার। সামাজিক নাটক। শ্রীমনোমোহন গোস্বামী বি, এ প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা চৈতন্য প্রেসে মুদ্রিত। ডিমাই ১২ পেজী ফর্ম্মায় ১১৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

২। প্রতাপ-আদিত্য। (ঐতিহাসিক নাটক।) ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত। শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ প্রণীত। ২ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, "ভিক্টোরিয়া প্রেসে" মুদ্রিত এবং ২০১ নং কর্ণওয়ালি ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডিমাই ১২ পেজী ফর্ম্মায় ১৮৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ১, টাকা। এই নাটক অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে ষ্টার থিয়াটারের ভাগ্যলক্ষ্মী ফিরিয়া আসিয়াছেন। দর্শকগণ রঙ্গমঞ্চে যাহা দেখিয়া আসিবেন, তাহা হইতে এই পুস্তকখানিতে আর একটু বেশী জিনিস আছে। জেনেরাল এসেম্ব্লির অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বি, এ মহাশয় এই পুস্তকের যে ভূমিকাটি লিখিয়াছেন, তাহা নাট্য সাহিত্যে তাঁহার সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক; সেই ভূমিকার আলোকপাতে এই নাটকের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য ও রহস্য অনেকের চক্ষে ধরা পড়িবে।

৩। আক্কেল সেলামী। সামাজিক প্রহসন। শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে গুরুদাস বাবুর দোকানে প্রাপ্তব্য। ডিমাই ১২ পেজী ফর্ম্মায় ৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ।০ আনা। সন ১৩০৭ সাল।

৪। লহরী-লীলা। গীতি নাট্য। শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা ৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডেন প্রেসে মুদ্রিত। ১৩০৭ সাল। ডিমাই ১২ পেজী ফর্ম্মায় ৭৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ॥০ আনা।

৫। লীয়ার। সেক্ষপীয়ার প্রণীত নাটকের বঙ্গানুবাদ। শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঘোষ কর্ত্তৃক রচিত। কলিকাতা ২৯ নং বিডন ষ্ট্রীট, এলেম প্রেসে মুদ্রিত ও ৩৫।৩ রাধামাধব সাহার লেন হইতে প্রকাশিত। ১৩০০ সাল। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মায় ১৫৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ১, টাকা মাত্র। অনুবাদখানি অনেকটা মূলের অনুযায়ী বলিয়া বোধ হইল।

৬। নীরদ-নীরজা (পারিবারিক চিত্র)। ৭৯।৩।২।৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, নিউটন প্রেসে মুদ্রিত এবং ১০ নং আনন্দ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গলি হইতে গ্রন্থকার

শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডিমাই ১২ পেজী ফর্ম্মার ৯২ পৃষ্ঠায় পূর্ণ। ১৩০৮ সাল। মূল্য ॥০ আনা। গোলাপী রঙ্গের পুরু কাগজে পুস্তকখানি মুদ্রিত।

সাহিত্য (৪) অধ্যাত্ম শাখা॥

১। সোহং তত্ত্ব। হিমালয়বাসী পরমহংস সোহং স্বামীর তত্ত্বোপদেশ। "শ্রীসূর্য্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ঢাকা বৈকুণ্ঠনাথ যন্ত্রে মুদ্রিত। ডিমাই ১২ পেজী ফর্ম্মার ৯১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ॥০ আনা। ১৩০৯ সাল। এই পুস্তক খানিতে নিম্নলিখিত বিষয় গুলির সম্বন্ধে উপদেশ আছে। ১। মানব ভাষা। ২। মানবধর্ম্ম। ৩। পৈত্রিক ধর্ম। ৪। গুরু। ৫। সৃষ্টিতত্ত্ব। ৬। সাধন তত্ত্ব। ৭। ধর্ম্ম সম্প্রদায়। ৮। প্রলোভন ত্যাগ। ৯। নাস্তিকতা। ১০। আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মতত্ত্ব। ১১। ব্রহ্মাণ্ড গোলক। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। যিনি "সোহং স্বামী" নামে এখন পরিচিত, তিনি বঙ্গদেশের সুপরিচিত সারকাস্‌বীর শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ভিন্ন আর কেহ নহেন ;—একদা ইঁহার ব্যাঘ্রের সঙ্গে ক্রীড়া বাঙ্গালীর বিস্ময় উৎপন্ন করিয়াছিল, ভারতবর্ষের নানা দেশের রাজন্যবর্গের প্রদত্ত স্বর্ণ পদকের উজ্জ্বল মাল্য পরিয়া যখন ইনি রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইতেন, যখন তাঁহার বিশাল উরস্থলে বিপুল প্রস্তরখণ্ড প্রহারোত্থিত অগ্নিকণা বিক্ষেপ করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইত,—তখন দর্শক মণ্ডলীর আনন্দ ও বিস্ময়ের সীমা থাকিত না ; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের সহিত শোনা গিয়াছিল যে এই অসম সাহসী, অনতিক্রান্ত যৌবন, সুগঠিত সুন্দরদেহ ব্যক্তি এক দিন কৌষের বাস পরিহিত যোগী সাজিয়া হিমালয়ে গিয়াছেন। "সোহং স্বামী"র এই উপদেশ মালা পড়িতে বাঙ্গালী মাত্রেরই কৌতুহল হইবার কথা। এই পুস্তক খানিতে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। স্বামীজী এক স্থলে লিখিয়াছেন ;—"প্রেম মনেরই ভাব, মন দ্বারা জীব আপনাকে পাইতে পারে না, অপর জীবকেও পাইতে পারে না, ব্রহ্মকেও পাইতে পারেনা, জীব এবং ব্রহ্ম মন ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর,—একই বস্তু।" ব্রহ্মের স্বরূপ কেহ নির্ণয় করিতে পারেন নাই, ঋষিগণ তাঁহাকে মন ও বাক্যের অগোচর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তবে প্রেম-পথের অনেক যাত্রীও তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াছেন ; সেই পথে যে শুধু জ্ঞানিগণের একাধিপত্য স্বামীজীর সঙ্গে আমরা সে বিষয়ে একমত হইতে পারি না। প্রেম অনেক সময় অন্ধ হয়, জ্ঞান অনেক সময় শুষ্কতা প্রাপ্ত হয় ; প্রেম যদি জ্ঞানকে সরলতা প্রদান করে,

এবং জ্ঞান যদি প্রেমকে দৃষ্টিদান করে, তবে ধর্ম্মের গৃহস্থালীটির একটা সামঞ্জস্য থাকে ; জ্ঞান যদি প্রেমের গণ্ডী ছাড়িয়া যায় তবে তাহা দাম্ভিক ও অবিমৃষ্যকারী হইয়া উঠে, এবং প্রেম যদি জ্ঞানের শাসন অগ্রাহ্য করে তবে অন্ধতা ও কুসংস্কার তাহাকে জড়াইয়া ধরে ; স্বীয় রাজ্যের গৃহে ও বাহিরে ঝগড়া চলিলে ধর্ম্মের দেবতা বড় বিপন্ন হন। "সোহংতত্ত্ব"—জ্ঞানের পক্ষপাতী, সুতরাং আমরা যোগীকে প্রেমের পক্ষ হইতে একটু আর্ত্তনাদ শুনাইতে বাধ্য।

২। ষট্‌চক্র ও ষট্‌চক্রগীতাবলী। শ্রীরাখালদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা ৯ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, বঙ্গভূমি কার্য্যালয় হইতে শ্রীশ্রীনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৩০৭ সাল। মূল্য ৵৹ আনা। এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানিতে পয়ার ছন্দে চতুর্দ্দশ প্রধান নাড়ী, দশ বায়ুর বিবরণ এবং আধার পদ্ম, স্বাধিষ্ঠান পদ্ম, মণিপুর পদ্ম, অনাহত পদ্ম প্রভৃতি তান্ত্রিক বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

৩। প্রকৃতি ও পুরুষ বা রাধাকৃষ্ণ। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক বিরচিত, কলিকাতা ১৬৬ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটস্থ "ছাত্র" কার্য্যালয় হইতে শ্রীঘনেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। রয়েল ১৬ পেজী ফর্ম্মার ৮৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ॥৹ আনা। সন ১৩০৯ সাল। এই পুস্তকে রাধা কৃষ্ণের অধ্যাত্ম ব্যাখ্যা আছে—সোলেমানের গানে যে প্রেম তত্ত্বের আভাষ পাওয়া যায়,—বৈষ্ণব সাহিত্যে সেই আভাষের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে—গ্রন্থকার ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি রাধাকৃষ্ণের মর্ত্ত্য লীলার মধ্যে চিরন্তন অধ্যাত্ম লীলার পরিচয় পাইয়াছেন, এবং তাহা নিপুণভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন।

সাহিত্য (৫) কাব্য-শাখা।

১। অরুণ। শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত। কলিকাতা ভৈষজ্য ষ্টীম মেসিন প্রেসে (৪ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীটে শোভাবাজার) মুদ্রিত এবং ৪১ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মার ৫৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। অরুণ, তরুণ কবির প্রতিভারুণের তরুণালোক। ইহার ভাষাটি সহজ ও সুখবোধ্য,—কবিতা গুলিতে সরস্বতীর ক্রীড়াশীল পদের মঞ্জীর ধ্বনি শোনা যায় না—কিন্তু শান্ত সৌম্য ধীর গমনে তিনি যেন তরুণ কবির কুঞ্জে আসিয়া তাঁহার ললাটে ভাবী সুযশের স্বপ্ন আঁকিয়া দিতেছেন। এই ক্ষুদ্র

গীতিকাব্য খানিতে, বঙ্গ ভাষার প্রতি, প্রার্থনা, মলয় ও কোকিল, রহস্য, একমাত্র গতি, মহাশক্তি, আত্মকাহিনী, সংকল্প প্রভৃতি কতকগুলি কবিতা আছে। পুস্তকের মূল্য ১৲ টাকা, ইহার বাঁধাই, ছাপা প্রভৃতি এত সুন্দর যে দরিদ্র গ্রন্থকারগণের পক্ষে তাহা আকাশ কুসুম।

২। অর্ঘ্য। শ্রীবিপিন বিহারী নন্দী প্রণীত। ৫ নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর "বিশ্বকোষযন্ত্রে" মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মার ২০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এই পুস্তকখানি প্রথম অঞ্জলী, দ্বিতীয় অঞ্জলী, তৃতীয় অঞ্জলী ও চতুর্থ অঞ্জলী, এই চারটি ভাগে বিভক্ত ইহাতে আভাষ, ভ্রান্ত পথিক, অতীতের স্মৃতি, ভিখারী, ভারতী, বাণী বিলাপ, আত্মপরিচয়, নিবেদন, রহস্য, বেতসীকুঞ্জে, শকুন্তলা, অসিহস্তে ওথেলো প্রভৃতি বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা আছে। পুস্তকের মূল ১৲ টাকা। কবিতা গুলিতে বঙ্গীয় সরস্বতীর নূতন কৃপার আলোক পড়ে নাই; হেমবাবু, নবীন বাবু পূর্ব্বে যে ভাবে কবিতা লিখিতেন, ইহাতে সেই প্রাচীন ছন্দ ও ধ্বনির ঝংকার উঠিয়াছে, তবে ঝংকারটি বেসুরে বলিয়া বোধ হইল না।

৩। রামচন্দ্র গীতাবলী। কলিকাতা, ৫ নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর, "বিশ্বকোষ প্রেসে" মুদ্রিত। গ্রন্থকার শ্রীরামচন্দ্র রায়—দাঁতনের রাজা। ইহার মুদ্রাঙ্কন ও বাঁধাই সুচারু। ইহাতে অনেকগুলি ধর্ম্ম-সঙ্গীত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গানগুলি প্রাচীন ভাবের,—কিন্তু ভক্তি, সহৃদয়তা ও সরল প্রাণের উচ্ছ্বাস সেই প্রাচীন ভাবগুলিকে নবশ্রী প্রদান করিয়াছে।

৪। হৃদয় গাথা। শ্রীঅখিল চন্দ্র পালিত প্রণীত। কলিকাতা ন৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন, কালিকাষ্টিম্-মেসিন্ যন্ত্রে মুদ্রিত। ডবল ফুলস্কেপ ১৬ পেজী ফর্ম্মার ২৭৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ১৷০ আনা। এই পুস্তকে বিদ্যুতের প্রতি, বিসর্জ্জিত দেব প্রতিমা, কে তুমি? বিদায়, সেই এক দিন আর এই এক দিন, আদর, সে, দেখা, সেই মুখ, একা সরোজিনী, স্বপনের মত হায় হয়েছে বিলীন, শোনরে উম্মত্ত মন, উপকথা? বিষাদ, কে তুই, একটী দৃশ্য, খোকা প্রভৃতি বহু সংখ্যক কবিতা আছে।

৫। গাথা। শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস প্রণীত। কলিকাতা ১৭নং মদন মিত্রের লেন, বেঙ্গল প্রেসে মুদ্রিত। ১৩০৯। ডবল ক্রাউন্ ১৬ পেজী ফর্ম্মার ৭৮ পৃষ্ঠায়

পূর্ণ। মূল্য ।৵০ আনা। এই পুস্তকে দান, কোন শিশুর প্রতি, এই ত সংসার, হায় বঙ্গে বক্র দৃষ্টি কোন দেবতার, পাগলের দেশ, বাঙ্গালীর দেশ, স্বর্গীয় বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শান্তি, মিলনে, আমরা সরলা, প্রভৃতি ৩৫টি কবিতা আছে।

৬। হরিকথা। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু কৃত। ঢাকা আদর্শ প্রেসে মুদ্রিত, ডিমাই আট পেজী ফর্ম্মার ১৪৪ পৃষ্ঠায় পূর্ণ, মূল্য ॥০ আনা, ১৩০৭ সন। এই পুস্তকে প্রাচীন পদকর্ত্তাদের অনুকরণে রাধা কৃষ্ণ লীলা সম্বন্ধীয় নানা রূপ পদ সন্নিবেশিত হইয়াছে। শ্রীমতীর বিপ্রলব্ধ, অভিসার, প্রাবৃটমিলন প্রভৃতি নানা অবস্থার বর্ণনা আছে ; পদগুলি যে রাগিণীতে গীত হইতে পারে, তাহাও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

৭। যোগেশ কাব্য। কবি হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় ঈশান চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলিকাতা ২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীটে ভারতমিহির যন্ত্রে সান্ন্যাল এণ্ড কোং কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৩১০ সাল। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মার ১৪৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য ১৲ টাকা। পুস্তক খানিতে মৃত গ্রন্থকারের একখানি হাফ্‌টোন্ ছবি প্রদত্ত হইয়াছে।

যোগেশ কাব্য সাহিত্য সমাজে পরিচিত হইলেও এ স্থলে তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

মন্দাকিনী ও উর্ম্মিলা—দুই শৈশব সঙ্গিনী ; যোগেশের সঙ্গে উর্ম্মিলার বিবাহ হইয়া গেল ; কিন্তু মন্দাকিনীর মূর্ত্তি যোগেশ হৃদয়ে আঁকিয়াছিল, তাহা মুছিয়া ফেলিতে চাহিল, মুছিতে পারিল না। মন্দাকিনীর নিকট যোগেশ স্বীয় প্রেমের নৈবেদ্য লইয়া উপহার দিতে গেল,—কিন্তু মন্দাকিনী ভাবিল, যোগেশ লালসার দাস সে ইতিপূর্ব্বে যোগেশের যে সুনির্ম্মল চিত্র খানি মানসপটে আঁকিয়া তাহার ললাটে ভাই ফোঁটা দিয়া বরণ করিয়াছিল, যোগেশের উচ্ছ্বসিত আত্মনিবেদনে সেই চিত্র-খানি মলিন হইয়া গেল ; ঘৃণার সহিত মন্দা যোগেশকে উপেক্ষা করিল। যোগেশ তদবধি দেশান্তরী হইল ;—মন্দার ঘৃণা—বিশেষত সে তাহাকে ইন্দ্রিয়সেবী মনে করিয়াছে, এই ঘোর মনস্তাপ ও লজ্জায় দূর সমুদ্রতীরে যাইয়া দুঃখদাহনে দগ্ধ হইতে লাগিল। প্রকৃতির রহস্যময় সৌন্দর্য্যজাল,—তাঁহার স্বীয় রহস্যময় অদৃষ্ট, পিতার প্রেতাত্মা ও ভাগ্যের নির্দ্দেশ, পর পর এ সমস্তই তাহার জীবনের অশুভ পরিণাম দেখাইল, কিন্তু প্রেমের উন্মাদনাময় আবেগে সে তাহা দেখিয়াও দেখিল না—যাহা

শুনিল, তাহার ধ্বনি মর্ম্মে স্পর্শ করিল না ; যোগেশ প্রকৃতির অঙ্কে একটি ফুলের মত নির্জ্জনে ব্যর্থপ্রেম-পরিতাপে শুকাইয়া যাইতে লাগিল। মন্দাকিনীর সঙ্গে ভৈরবীর কৃপায় তাহার শেষ সাক্ষাৎকার হইল এবং তাহার অব্যবহিত পরেই সে প্রাণত্যাগ করিল।

গল্প ভাগ কিছু নহে, উহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাপাত বা সূক্ষ্ম বর্ণ বৈচিত্র্য উজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই। বৃহৎ তুলিকার প্রশস্তবর্ণক্ষেপে কাব্যখানিতে একটি সুগম্ভীর সৌন্দর্য্য ফলিয়া উঠিয়াছে। মন্দাকিনীর সঙ্গে যোগেশের শেষ দেখার সময় সেই স্থলে মন্দার স্বামী উপস্থিত ছিলেন ; এখানে ইহাদের ভাব বৈচিত্র্য একটু জটিল ; কিন্তু এ স্থলে কবির অপূর্ব্ব সারল্য চরিত্রবর্গের ভাবসঙ্গতি রক্ষা করিয়াছে এবং কাব্য খানি গূঢ় নাট্য শিল্পখচিত করিয়া তুলিয়াছে। যে যোগেশ মৃত্যু পর্য্যন্ত মন্দাকিনীকে পূজা করিয়া আসিয়াছে, সে মৃত্যুর পরে স্বর্গে তাহার নিজের স্ত্রীর জন্য কেন উন্মত্ত পিপাসায় ছুটিতেছে—তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। যে মন্দাকিনী যোগেশের জন্য তাহার মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এক ফোঁটা চোখের জল ফেলে নাই, সে কেন যে যোগেশের চিতা নির্ব্বাণের পর স্বীয় স্বামীর কণ্ঠলগ্না হইয়া "চিতা যে নিবিল নাথ" বলিয়া অধীরভাবে কাঁদিয়া উঠিল, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। কবি সমস্ত জটিলতাকে সহজ ও সরল করিয়া তুলিয়াছেন। এই কাব্যের সর্ব্বত্র একটি গার্হস্থ্য পবিত্রতার শুভ্র-চন্দন-দীপ্তি আছে। যোগেশের চিন্তা কোন সময় হঠাৎ মনে হইলে,—নিদ্রিত ব্যক্তির বক্ষে সরিসৃপ উঠিলে সে যেরূপ আতঙ্কে তাহা ঝাড়িয়া ফেলে,—মন্দাও সেই ভাবে তাহা মন হইতে সভয়ে দূর করিয়া দিতেন,—এই উপমাটিতে সেই পবিত্রতার শুভ্র দীপ্তি পাড়িয়াছে। আবার এই নারীই যখন ব্যাকুলভাবে যোগেশের জন্য কাঁদিতেছেন, তখন সেই পবিত্রতা নারী হৃদয়ের কারুণ্যমণ্ডিত হইয়া বরেণ্য হইয়া উঠিয়াছে। মন্দাকিনীর স্বামী যখন তাহাকে বলিলেন, তুমি ধর্ম্ম রক্ষার জন্য যাহা করিয়াছ, তাহাতে তুমি শ্রদ্ধার পাত্রী, কিন্তু তদুপলক্ষে যোগেশের প্রতি যদি কোনরূপ রূঢ় ব্যবহার করিয়া থাক, তবে তুমি তজ্জন্য দায়ী কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না,—তখন সেই একটি কথায় মন্দার স্বামীর উদার মূর্ত্তি অতি সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে এবং তিনি যে মন্দার স্বামী হইবার যোগ্য, তাহা প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে।

এই কাব্যের গতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উর্ম্মিভঙ্গে ললিত মন্থর হয় নাই,—ইহা বেলা

প্রহারী সমুদ্রের চলোর্ম্মির ন্যায় দূর দূরান্তর হইতে আলোড়িত হইয়া আসিয়া আমাদিগের হৃদয়ে আঘাত করে। ইহা কাল্পনিক চিত্রপূর্ণ, কিন্তু সেই কল্পনারাশি মানবচিত্তের গূঢ় রহস্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট ; তাহা মনস্তাপ ও নৈরাশ্যকে সুস্পষ্ট করিয়া অদৃষ্টের দুর্দ্দমনীয়তা প্রতিপন্ন করিয়াছে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

জীবন-সঙ্গীত।

(১)

বোলোনা আমারে করুণ ক্রন্দনে,
এ জীবন হায় শুধু স্বপ্ন,
ধাঁধাঁ লাগিয়াছে তোমার নয়নে,
কাচ নয়, অমূল্য এ রত্ন।

(২)

এ জীবন সত্য,—জ্বলন্ত এ সত্য
মৃত্যু নহে জীবনের শেষ;
দেহ ধূলামাটি, আত্মা কিন্তু খাঁটি
অজর, অমর ও অশেষ।

(৩)

ভোগ তৃষ্ণা শুধু? ভগ্ন মনোরথে
হা হুতাশ মোদের কি লক্ষ্য?
এস অগ্রসরি' উন্নতির পথে,
হাস্যমুখে প্রসারিয়া বক্ষঃ।

(৪)

বিদ্যা যে অকূল; কাল যায় চলে,
এ হৃদয় যদিও নির্ভীক,
শব ঘাড়ে, ধীরে, বিনা হরি বোলে
যায় চুপে শ্মশানের দিক্।

(৫)

এস পশি সবে কর্ম্ম-ধর্ম্ম-বর্ম্মে,
বীর বেশে সংসার আহবে,
মেষ গরু হয়ে (লজ্জা নাই মর্ম্মে?)
গলাধাক্কা কে সবে নীরবে?

(৬)

ভবিষ্যের সুখ ; কি বিশ্বাস তাতে ?

[illegible] হয়ে গেছে, যাক্,

কর্ম্মযোগী হয়ে, উদ্যমে উৎসাহে

হিয়া তুই অভয়ারে ডাক্।

(৭)

মহাজন কত পন্থা গেছে রাখি,

শিরে সে চরণ ধূলি ধরি'

সমুদ্র সৈকতে পদচিহ্ন আঁকি,

এস সবে যাত্রা শেষ করি !

(৮)

আমাদেরও সেই পদাঙ্কের চিহ্ন

অন্য কোন অভাগা জনারে

দিবে আহা বল, আশা তরী ছিন্ন

জলমগ্ন ভব পারাবারে।

(৯)

কি ভয় ? কি ভয় ? বল "জয় জয়,

"জয় জয় দুর্গা" রবে,

স্মরিয়া মহেশে, কর্ম্ম কর হেসে,

পিতার সুপুত্র সবে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

মোস্‌লেম-জগতে বিজ্ঞান-চর্চ্চা।

প্রস্তাবনা।

অজ্ঞলোকে অবৈজ্ঞানিক বলিয়া ইস্‌লামের একটা অখ্যাতি প্রচার করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকে, তাহা যে নিতান্ত অমূলক, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। অধিকন্তু, আধুনিক সভ্য-জগতের বিজ্ঞানোৎকর্ষসাধনব্যাপারের উপর সহস্র বর্ষ পূর্ব্ব হইতে ইস্‌লাম কতখানি উন্নতিশীল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, অদ্য আমরা তাহার কথঞ্চিৎ আভাষ প্রদানে যত্নবান্ হইব।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত-মণ্ডলীর উদার স্বভাব।

গভীর তত্ত্বানুসন্ধিৎসু, বহুদর্শী ও চিন্তাশীল ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ ইস্‌লামের বিজ্ঞানানুশীলন-প্রিয়তার অশেষ প্রশংসা করিয়া অসংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন; এবং সেই ইস্‌লামেরই বিজ্ঞানোন্নতির অমৃতময় ফলস্বরূপ অধুনা বিজ্ঞানশাস্ত্রে চরমোৎকর্ষলাভে সমর্থ হইয়া সেই সকল উদারমতি লেখকবৃন্দ শতমুখে ইস্‌লামের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশেও পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। আধুনিক সভ্যতা ও উন্নতিশৈলের সর্ব্বোচ্চ-শিখরবিহারী পাশ্চাত্য জাতিসমূহ কোন্ কোন্ বিষয়ে ইসলামের নিকট কতদূর ঋণী, অদ্য আমরা তাহাই বিচার করিয়া দেখিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি।

হজরতের উপদেশ।

অজ্ঞানতামসারি প্রশান্ত-জ্যোতির্বিমণ্ডিত প্রভাতসূর্য্যসদৃশ প্রেরিত-পুরুষ মহম্মদ উপদেশ প্রদান করিতেন, "তোমরা জ্ঞান অর্জ্জন করিবার জন্য যত্নবান হও, কেননা যাঁহারা জ্ঞানী, বাস্তবিক পুণ্যবান তাঁহারাই। যাঁহারা জ্ঞানের কথা আলোচনা করেন, তাঁহারা জগৎপিতারই গুণকীর্ত্তন করেন, এবং জ্ঞানানুসন্ধিৎসুগণ তাঁহাকেই ভক্তি পূজা প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন। জ্ঞান আমাদিগের স্বর্গপথে প্রদীপ, মরুশ্মশানে বন্ধু, নির্জ্জনে

সঙ্গী, নির্ব্বাসনে পরম-সুহৃৎ। একমাত্র জ্ঞানই সর্ব্বসুখশান্তির পথপ্রদর্শক, দুঃখদারিদ্র্যের অবলম্বন, বন্ধুসমাজের অলঙ্কার, এবং শত্রুগণমধ্যে রক্ষাকবচ। জ্ঞানী ব্যক্তিই জগতে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করেন, মহাপরাক্রান্ত লোকপালগণ তাঁহারই সৌহার্দ্দলাভার্থ সমুৎসুক হন, এবং তিনিই পরকালে পরমশান্তির অধিকারী হয়েন।" "স্বদেশের জন্য উৎসর্গিতপ্রাণ স্বদেশ-প্রেমিকের পুণ্যরক্ত অপেক্ষা পণ্ডিতের ব্যবহার্য্য-মসী অধিকতর পবিত্র"। "জ্ঞানান্বেষণে গৃহত্যাগী মহাপুরুষেরা ঈশ্বরের পথে প্রয়াণ করেন; যাঁহারা জ্ঞানলাভার্থ দেশভ্রমণ করেন, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে স্বর্গের পথ দেখাইয়া দেন।" এই বলিয়া তিনি শিষ্যবর্গকে জ্ঞানানুসন্ধানে দেশদেশান্তরে গমন করিবার জন্য সদাসর্ব্বদা উৎসাহিত করিতেন। "স্রষ্টার সৃষ্টিকীর্ত্তির কথা অল্পক্ষণ গভীর চিন্তা করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি ৭০ বৎসরের উপাসনাপেক্ষা অধিক পুণ্য অর্জ্জন করেন।" "সহস্র রজনী দণ্ডায়মান থাকিয়া শুধুই উপাসনা করা অপেক্ষাও কিয়ৎকাল বিজ্ঞান এবং তত্ত্বকথা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করা সমধিক শ্রেয়স্কর।" "জ্ঞানীর ও জ্ঞানী ব্যক্তির সমাদর করিলে ঈশ্বরের সমাদর করা হয়।" "জ্ঞানই মানবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার।"

কোরাণের মূলমন্ত্রই জ্ঞান। মহাপুরুষ মহম্মদও পদে পদে জ্ঞানের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। কার্য্যক্ষেত্রে মোস্লেমগণ ইহাতে কতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই আমাদিগের আলোচ্য বিষয়।

খ্রীষ্টিয় সপ্তম শতাব্দী।

হেজিরার প্রথম শতাব্দী যদিও শক্তিবহুল উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি ধর্ম্ম-শত্রুদিগের হস্ত হইতে ইস্লামকে রক্ষা করিতে, এবং তাঁহার অমৃতময় প্রভাব অমিত তেজে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিতেই ব্যাপৃত হইয়াছিল, তথাপি জ্ঞানালোচনা ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের প্রতি ভক্তপ্রাণ মোস্লেমগণ কোন প্রকার ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন নাই। নবগঠিত ইস্লাম-প্রাসাদের সুদৃঢ়

স্তম্ভ-রাজিস্বরূপ মহারথিবৃন্দের সহিত দলে দলে মুসলমানগণ যখন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইতেন, তখন নাগরিকগণ কাব্য, ইতিহাস, ব্যাকরণ বিদ্যা (Philology), গণিত শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতাদি প্রদানে শ্রোতৃবর্গের চিত্তরঞ্জন করিতেন। গ্রীক এবং মোস্‌লেম পণ্ডিতগণ প্রকাশ্য সভায় দার্শনিক বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন। যোহান্‌স্ ডামাসেন্‌সাস্, (Johannes Damascenus), থিওডোরাস্ আবুকারা (Theodorus Abocara) প্রমুখ খ্রীষ্টান পণ্ডিতগণ, অজ্ঞানতার প্রিয়সন্তান ইউরোপীয় বর্ব্বরদিগের দ্বারা নির্দ্দয়রূপে বিতাড়িত হইয়া ইস্‌লামেরই শান্তিচ্ছায়াতলে আসিয়া আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টিয় অষ্টম শতাব্দী।

কিন্তু হেজিরার দ্বিতীয় শতাব্দী হইতেই ঐস্‌লামিক জগতে সাহিত্য-বিজ্ঞানের সমধিক উৎকর্ষের সূত্রপাত হয়। এতদিনে আব্বাসীয় খলিফাগনের "শান্তিনগর" (দার-উস্-সালাম) নামধেয় রাজধানী বোগ্দাদ হইতে ইউরোপের সুদূর পশ্চিম সীমান্ত স্পেন পর্য্যন্ত অসংখ্য বিদ্যালয় সমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। এই সমস্ত বিদ্যালয়-বৃক্ষোৎপন্ন সুস্বাদু ফলরাশি উত্তরকালে ইউরোপে নীত হয়; এবং বহুশতাব্দী পরে তাহারি সুধার আস্বাদনে প্রলুব্ধ হইয়া বর্ব্বর ইউরোপীয়গণ নূতন অমৃত ফলের সুবিশাল কানন স্থাপন করিতে যত্নবান হইয়াছিল।

আব্বাসবংশীয় দ্বিতীয় খলিফা আবুজাফর অল্‌মন্‌সুরের (খ্রীঃ ৭৫৪-৭৭৫) আদেশক্রমে যাবতীয় বিদেশীয় সাহিত্য এবং বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থসমূহ আরবী ভাষায় অনুবাদিত হয়। খলিফা স্বয়ং একজন সাহিত্য এবং গণিত শাস্ত্রবিদ্ পরম পণ্ডিত ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ "হিতোপদেশ", এবং জ্যোতিঃশাস্ত্র বিষয়ক "সিদ্ধান্ত", আরিষ্টট্‌ল্, টলেমী, ইউক্লিড প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন পণ্ডিতগণের গ্রন্থাবলী,

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য গ্রীক, পারসীক, সীরিয় প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ ভাষান্তরিত করিয়া তিনি স্বীয় পুস্তকালয় পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী খলিফাগণও ইঁহার পদাঙ্ক সম্যক্ অনুসরণ করিয়া আপনারা জ্ঞানোপার্জ্জনে তৎপর হইতেন, এবং জ্ঞানের সম্যক্ সমাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রবলবেগে উন্নতিস্রোত প্রবাহিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

সপ্তম খলিফা আব্দল্লাহ্-অল্-মামুনের (৮১৩ ৮৩৩) রাজত্ব কালে মোস্লেম সভ্যতাসূর্য্য তীব্র-নির্ম্মল ময়ূখ-মালা-মণ্ডিত হইয়া জগতের মধ্যাকাশে সমুপস্থিত হইয়াছিল, এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সেই মধ্যাকাশেই বিরাজ করিয়াছিল। এই সময়ে মোস্লেমগণই জগতের যাবতীয় জ্ঞানরাশির একমাত্র আধারস্বরূপ ছিলেন। খলিফাদিগের প্রতিনিধিগণ দিগ্বিদিকে ধাবিত হইয়া প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া বোগদাদ নগরীর গ্রন্থাগারসমূহ পরিপূর্ণ করিতেন, এবং তদ্দ্বারা আরবীয় বিদ্বৎ-সমাজ আপনাপন বিশ্বশোষিকা জ্ঞানপিপাসার কথঞ্চিৎ শান্তিবিধান করিয়া ধন্য হইতেন। এই সময়ে মোস্লেম রাজ্যের প্রত্যেক অংশে বৃহৎ বৃহৎ বিদ্যালয় ও পুস্তকালয়সমূহ স্থাপিত হইতে লাগিল, এবং দেশীয় বিদেশীয়, স্বধর্ম্মী বিধর্ম্মী নির্ব্বিশেষে পৃথিবীর যাবতীয় অধ্যয়নচিকীর্ষু ছাত্রমণ্ডলীর জন্য তাহাদের দ্বার সর্ব্বথা উন্মুক্ত রহিল। ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এসিয়ার দূর দূরান্ত হইতে ছাত্রগণ কর্দ্দভা, কায়রো, এবং বোগদাদ, এই জ্ঞানকেন্দ্রত্রয়ে সমবেত হইতেন। এমন কি খ্রীষ্টিয় পুরোহিতগণও বিদ্যাশিক্ষার্থ মোস্লেম বিদ্যালয়সমূহে প্রবেশ করিতেন। খৃষ্টধর্ম্মযাজক-মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় ইউরোপের সর্ব্বময় কর্ত্তা ধর্ম্মগুরু পোপগণের মধ্যে যাঁহারা মোস্লেমরাজ্য হইতে জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া উত্তরকালে তেমন উন্নতিমার্গ অবলম্বন করিতে সক্ষম

খ্রীষ্টিয় নবম শতাব্দী।

বিদ্যালয় ও পুস্তকালয়।

হইয়াছিলেন, পোপ দ্বিতীয় সিল্‌ভেষ্টার (Sylvester II.) তাঁহাদিগের অন্যতম। ইনি কর্দ্দভা নগরের এক ইস্‌লামীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। তদানীন্তন মোস্লেমগণ জ্ঞানগৌরবে পৃথিবীর মধ্যে কত উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, ইহা হইতেই তাহার যৎকিঞ্চিৎ উপলব্ধি হইতে পারে।

খ্রীষ্টিয় দশম শতাব্দী।

আফ্রিকার সুলতান অল্‌মাইজ (৯৫৩-৯৭৫) পূর্ব্বে মিসর ও পশ্চিমে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের উপকূল, এই তিন সহস্র মাইল ব্যাপী মহারাজ্য একছত্র শাসনাধীনে আনয়ন পূর্ব্বক সর্ব্বত্র বিশ্ববিদ্যালয় ও বৃহৎ বৃহৎ পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। যে বৈজ্ঞানিক আদর্শ অবলম্বনে তিনি কাইরো নগরে "দার-উল-হেকৃমৎ" নামধেয় বিশ্ববিদ্যালয় স্বয়ং স্থাপিত করেন, বহুশতবর্ষ পরেও ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত পণ্ডিতকুল-শিরোভূষণ লর্ড বেকন তাঁহার "Advancement of Learning" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে তদপেক্ষা উচ্চতর আদর্শে উপনীত হইতে সক্ষম হয়েন নাই। আজ হইতে সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ইস্‌লাম এমনি উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল!

সমসাময়িক ভারতবর্ষ।

মোস্লেমগণের উন্নতির প্রাক্কালে পৃথিবীর অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা যাউক। ভারতবর্ষের অন্ধকার-যুগ এই সময়ে সবে মাত্র আরম্ভ হইতেছিল। ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব ঘোর স্বার্থপর ব্রাহ্মণদিগের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, এবং অন্যান্য নিম্নস্তর শ্রেণীর হতভাগ্যগণের জন্য দুর্ব্বোধ-জটিল, সমস্যাপূর্ণ, ঘোর, কুসংস্কারজনক ও চিত্ত-সঙ্কীর্ণকারী পৌত্তলিকতাই একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া প্রকীর্ত্তিত হইতেছিল। অনুদার, একাঙ্গপ্রবল জাতিভেদের বিষময় ফলস্বরূপ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি সকলেই ঘৃণিত শূদ্রশ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সতীত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শনচ্ছলে বিধবাগণ (কখন বা স্বেচ্ছায়, কখন বা বাধ্য

হইয়া), এবং দুর্ব্বহ সংসারভারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য শনিগ্রস্ত পুরুষেরা দল আড়ম্বর সহকারে আত্মহত্যা করিয়া আত্মার সদ্গতির মস্তকে বজ্রাঘাত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।* মোস্লেমগণ যখন সংখ্যাতীত বিশ্ববিদ্যালয় খুলিয়া ইহুদী খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিধর্ম্মীগণকে আপনাদের জ্ঞানানুশীলনক্ষেত্রে সাদরে আহ্বান করিয়া লইয়া তাহাদিগের সহিত একযোগে জ্ঞানার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইয়া উদারতা এবং সহনশীলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছিলেন, তখন শঙ্করাচার্য্যের উত্তেজনায় প্রোৎসাহিত হইয়া ঘোর অসহনশীল ব্রাহ্মণেরা নিরীহ বৌদ্ধধর্ম্মকে ভারতবর্ষ হইতে নির্ম্মূল করিয়া দিতেছিলেন।* এবং অমানুষিক, অসভ্যতা ও বর্ব্বরতার লীলাক্ষেত্র ইউরোপে ভিন্নমতাবলম্বিগণ পাশবিক উত্তেজনাবশে পরস্পর কাটাকাটি করিয়া মরিতেছিল!

সমসাময়িক ইউরোপ; অন্ধকার-যুগ।

সাহিত্যাদি ললিতশাস্ত্রের সমাদর দূরে থাকুক, জ্ঞানচর্চ্চামাত্রই তদানীন্তন ইউরোপে ঘোর রাজদ্রোহিতাজনক ইন্দ্রজালে পরিগণিত হইয়া বিধিমত দণ্ডিত হইত। প্রাচীন রাজগণ-সংস্থাপিত পাঠাগারগুলি ভস্মীভূত, এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা ও জ্ঞানের নির্ম্মল জ্যোতিঃ ইউরোপ হইতে সম্পূর্ণ রূপে তিরোহিত হইয়া বহুশতাব্দাব্যাপী ঘন অমানিশার অবতারণা করিতেছিল। স্বনামধন্য পোপ গ্রীগরী দি গ্রেট রোমরাজ্য হইতে যাবতীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতকে নির্ব্বাসিত, এবং অগষ্টাস্ সীজার কর্ত্তৃক বহুযত্নে স্থাপিত বিশাল দার্শনিক পুস্তকাগারের দাহক্রিয়া মহা সমারোহে সুসম্পন্ন করিয়া, "মূর্খতাই ধর্ম্মনিষ্ঠার প্রসূতি," এই তৎকালপ্রচলিত প্রবাদবাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার সুশাসনে সমগ্র রাজ্যে প্রাচীন গ্রীক ও রোমক গ্রন্থাদি পাঠ সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল; এবং প্রবল নিষ্ঠাবান ঘোর অনুদার

* R. C. Dutt's "History of India."

খৃষ্টানগণ মূর্খতাপিশাচ কর্ত্তৃক অন্ধউৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্যাদি শাস্ত্রের উপর তীব্র অভিসম্পাত বর্ষণ করিয়া ধর্ম্ম সঞ্চয়ের চেষ্টা প্রদর্শন করিতেন। এইরূপেই ইউরোপের সুদীর্ঘ অন্ধকারযুগের উৎপত্তি হইল। কিন্তু উত্তরকালে ইস্‌লামেরই জ্ঞান-সূর্য্য ইউরোপের আকাশমার্গে সমুদিত হইয়া সে অন্ধকারের অবসান করিয়াছিল।

জ্যোতিঃশাস্ত্র।

কিন্তু চিরন্তন ঐকান্তিক বিজ্ঞানাসক্তিই মোস্লেম জাতির মানসিক উৎকর্ষের প্রধান পরিচায়ক। খলিফা আবুজাফর অল্ মনস্থরের সময়ে (৭৫৪-৭৭৫) মাশ-আল্লাহ্ এবং মহম্মদ অল্ নেহাভেন্দী নামক দুইজন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী আবির্ভূত হয়েন। অন্তরীক্ষবিহারী ভ্রাম্যমান জ্যোতিষ্কমালার স্থিতি, গতি, প্রকৃতি এবং অবস্থান নিরূপণার্থ নানা প্রকার যন্ত্রের ব্যবহার বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া মাশ-আল্লাহ্ যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ তাহা পাঠ করিয়া স্তম্ভিত ও চমৎকৃত হইয়া থাকেন। আহ্‌মদ-অল্-নেহাভেন্দী স্বীয় পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া অল্ মুস্তামাল নামক যে গ্রহনক্ষত্রের গতিস্থিতিকাল নিরূপক তালিকা (Astronomical Table) প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা যে গ্রীক অথবা হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ্যা অপেক্ষা অধিকতর উন্নতির পরিচায়ক, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

খলিফা আবদুল্লাহ্ অল্-মামুনের (৮১৩-৮৩৩) শাসনকালে প্রসিদ্ধ গ্রীক জ্যোতির্ব্বিদ্ টলেমী কৃত Altamgetএর অনুবাদ দ্বিতীয় বার প্রকাশিত হয়। মহম্মদ অল্ খারেস্‌মী এই সময়ে সংস্কৃত জ্যোতিষীয় তালিকা ও "সিদ্ধান্তের" সটীক অনুবাদ প্রকাশিত করেন। সেন্দ, ইয়াহ্‌ইয়া, খালেদ প্রভৃতি সুবিখ্যাত জ্যোতিষীগণ প্রচলিত তালিকার বহু ভ্রম সংশোধন করিয়া যশঃস্বী হইয়াছিলেন। বিষুবকাল, গ্রহণ,

ধূমকেতুগণের আবির্ভাব তিরোভাব প্রভৃতি অন্তরীক্ষ সম্বন্ধীয় ঘটনা-বৈচিত্র্য বিষয়ক মোস্লেম পরীক্ষাসিদ্ধান্ত আবিষ্কার পরম্পরা দ্বারা জগতে অভিনব জ্ঞানালোক প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিল।

এই সময়ে জ্ঞানবীর আলফিন্দি জ্যামিতি, গণিতবিদ্যা, দর্শনশাস্ত্র, বায়ুতত্ত্ব (Meteorology), আলোকবিজ্ঞান (Optics) এবং আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র সম্বন্ধে অন্যূন ২০০ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এরূপ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ অসীম প্রতিভাসম্পন্ন মহাপণ্ডিতের কথা সচরাচর শ্রুত হওয়া যায় না। পণ্ডিত আবুমা-আশর আজীবন জ্যোতিঃশাস্ত্রের গভীর তত্ত্বান্বেষণে ব্যাপৃত ছিলেন, এবং তাঁহার সূক্ষ্ম গণিত, জ্যোতিষ্কীয় তালিকা সমূহ অদ্যাপি উক্ত শাস্ত্রের একটী প্রধান অবলম্বন বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

অলমামুন এবং তাঁহার পরবর্ত্তী খলিফাদ্বয়ের সময়ে মহম্মদ, আহমদ এবং হাসান নামক ভ্রাতৃত্রয় জ্যোতিষ্কমালার আনুপাতিক গতি, রাশিচক্রের মধ্যরেখার বক্রতা প্রভৃতি বিষয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গণনা দ্বারা যে সকল স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, আধুনিক ইউ-রোপীয় জ্যোতির্ব্বেত্তাগণের সিদ্ধান্ত অপেক্ষা সেগুলি কোন ক্রমে কম নির্দ্দোষ নহে। চন্দ্রমণ্ডলের চক্রপথের দূরতম বিন্দুর দূরত্ব ইহারাই সর্ব্বপ্রথমে নির্ণয় করেন। খ্রীষ্টীয় রাজ্যসমূহে ধরণীবক্ষের অসীমতা এবং সমতলতার কথা প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছিল, তখন ইঁহারা লোহিত সাগরের উপকূল হইতে এক ডিগ্রীর পরিমাণ গ্রহণ করিয়া সমস্ত পৃথিবীর পরিধি নির্ণয় করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত-প্রবর আবুল হাসন দূরদর্শন যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। পরে মারাগা এবং কায়রোর অন্তরীক্ষ-পরিদর্শনাগারে (Observatories) উহা ব্যবহৃত হইয়া অত্যাশ্চর্য্য সুফল প্রদান করিয়াছিল।

দূরদর্শন যন্ত্র।

দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে "মোস্লেম টলেমী" অল্‌বাত্তাণীর আবির্ভাব-কালে জ্যোতিঃশাস্ত্র সর্ব্ব প্রথম একটী সুসম্বদ্ধ ধারাবাহিক বিজ্ঞানে গঠিত হইয়াছিল। বাত্তাণী-রচিত জ্যোতিষ্কীয় তালিকাসমূহ লাটিন ভাষায় অনুবাদিত হইয়া বহুশতাব্দী ধরিয়া ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্যার সর্ব্ব-প্রধান ভিত্তিরূপে পরিগণিত ছিল। জ্যোতিষ-সম্বলিত গণিত শাস্ত্র এবং ত্রিকোণমিতির সূক্ষ্মগননায় জ্যামিতিক "জ্যা"র পরিবর্তে "সাইন" এবং "কোসাইনের" (Sine and Cosine) আবিষ্কার এবং ব্যবহার করিয়া ইনি গণিত-শাস্ত্রের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে অপানার নাম অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

ধারাবাহিক জ্যোতিঃশাস্ত্র।

সাইন ও কোসাইন।

দশম শতাব্দীর শেষভাগে যে সকল জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ বোগদাদ-নগরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে আলি এবং আবুল হাসান আলি এই দুজনের নাম উল্লেখ না করিলে সংক্ষিপ্ত বিবরণও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। চন্দ্রমণ্ডলের কুটিলগতি বিষয়ক অসংখ্য সূক্ষ্ম গণনার জন্য ইঁহারা বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ।

এই উন্নতিশীল বিজ্ঞানানুশীলন যে শুধু বোগদাদনগরেই আবদ্ধ ছিল এমত নহে ; ইস্‌লামের নির্ম্মল জ্যোতিঃ পৃথিবীর যে যে স্থানে বিকীর্ণ হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানা-লোক তত্তৎস্থান সম্যক আলোকিত করিয়াছে। আফ্রিকার ফেজ, মিক্‌নাসা, সেগেলমেসা, তাহারত, লেমসেন, কায়রোয়ান, এবং সর্ব্বোপরি কায়রো মহানগরী বিজ্ঞানচর্চ্চার এক একটী প্রধান প্রধান কেন্দ্র বলিয়া খ্যাত ছিল। খোরাসান, ট্রান্সক্সিয়ানা, তাবরিস্তান প্রভৃতি দূর দূরান্তরের মুসলমান রাজ্যসমূহে অসংখ্য জ্যোতিষী, পদার্থবিদ্‌ এবং গণিতশাস্ত্রগুরু জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অল্‌কোহী ও আবুল ওয়াফাই সর্ব্বপ্রধান। অলকোহী গ্রহনিচয়ের গতিবিধি

বিজ্ঞান-চর্চ্চার বিস্তার।

সম্যক পর্য্যালোচনা করিয়া সৌরচক্রসংক্রান্ত যে নানাবিধ নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা জ্যোতিঃশাস্ত্রের মহদুপকার সাধিত হইয়াছিল।

সেকাণ্ট ও ট্যান্‌জেণ্ট।

ত্রিকোণমিতির সেকাণ্ট ও ট্যান্‌জেণ্টের (Secant and Tanjent) আবিষ্কার করিয়া খোরাসান নিবাসী আবুলওয়াফা চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন চন্দ্রমণ্ডলের গতিবিধি সম্বন্ধে গ্রীক জ্যোতির্ব্বিদ্ টলেমীর নানা ভ্রমাত্মক অনুমান সংশোধিত করিয়া তিনি যে সকল অভিনব তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, পরবর্ত্তী ছয়শত বর্ষের মধ্যেও ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ তাহার মর্ম্ম অবগত হইতে সক্ষম হয়েন নাই। তাঁহার জিযুশ্-শামিল (Zij-ush-Shamil) গ্রন্থখানি বিজ্ঞানচর্চ্চার অক্লান্ত পরিশ্রম, অধ্যবসায়, এবং গভীর গবেষণাপূর্ণ পরীক্ষা-পরম্পরার একটী অভ্রভেদী কীর্ত্তিস্তম্ভ।

নক্ষত্রমালার দীপ্তিবিজ্ঞান।

এতদ্ভিন্ন তদানীন্তন পদার্থ বৈজ্ঞানিক মহাপণ্ডিত আবদুর রহমান সূফী নক্ষত্ররাজির দীপ্তিবিজ্ঞানে সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন।

রাজপরিবারে বিজ্ঞান-চর্চ্চা।

খলিফাগণ স্বয়ং পরমবিদ্বান্ এবং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। জ্ঞানানুশীলনে তাঁহারা প্রজাবৃন্দের সহিত একযোগে উৎসাহ প্রকাশ করিতেন। খলিফা আবু মহম্মদ আলি অলমুক্তাফির (৯০২-৯০৮) পুত্র যুবরাজ জাফর (পরে আবুল ফজল জাফর অলমুক্তাদির বিল্লাহ, ৯০৮-৯৩২), ধূমকেতুগণের উচ্ছৃঙ্খল গতিবিধি বিষয়ে একখানি বহুমূল্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

আফ্রিকায় মোস্লেম শাসনাধীনে বিজ্ঞানচর্চ্চা কি পরিমাণে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাহা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত সমাজের উজ্জ্বলতম রত্ন

ইব্‌নে ইউনাসের বিষয় আলোচনা করিলে সম্যক্ উপলব্ধি হইবে। ইনি কায়রোর পঞ্চম ও ষষ্ঠ খলিফা অল্‌আজিজ (৯৭৫-৯৯৬) ও অল্ হাকিমের সময়ে (৯৯৬-১০২১) আবির্ভূত হন। নিত্যব্যবহার্য্য সময়-নিরূপক ভারযুক্ত দোলকের (Pandulum) বিচিত্র ধর্ম্মের আবিষ্কার করিয়া, আধুনিক সভ্য জগৎকে ইনি কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। ইঁহার প্রণীত "জিযূল-আকবর-উল-হাকিমী" নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ টলেমী কল্পিত প্রাচীন জ্যোতিঃশাস্ত্রের ভ্রমাত্মক যুক্তিসমূহ সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত করিয়া দিয়াছিল। উক্ত মহামূল্য গ্রন্থ গ্রীস্, পারস্য,* মঙ্গোলিয়া,এমন কি চীন দেশেও সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। ইঁহার মৃত্যুর কিঞ্চিন্ন্যূন দুই শতাব্দী পরে চীন জ্যোতিষী কে-চু-কিং উক্ত গ্রন্থ হইতে নূতন তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া যশঃস্বী হইয়াছিলেন।†

দোলক।

অশেষ প্রতিভাসম্পন্ন ইব্‌নেইউনাস নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। কাব্যেও ইনি সিদ্ধহস্ত বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ১০০৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

ইহার কিছুকাল পরে পণ্ডিত-প্রবর হাসান পদার্থবিদ্যা-বিষয়ক অসংখ্য অভিনব তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া, তদানীন্তন পণ্ডিতসমাজকে স্তম্ভিত ও চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিলেন। বায়ুমণ্ডলে প্রবেশমাত্র আলোক-রশ্মি বক্রগতি প্রাপ্ত হয় (Refraction), এ বিষয় ইনিই সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। গ্রীক পণ্ডিত-গণের বিশ্বাস ছিল যে, আলোকরশ্মি চক্ষু হইতে

পদার্থবিদ্যা সম্বলিত আবিষ্কার পরম্পরা।

আলোক রশ্মির বক্রগতি।

* বিখ্যাত পারসীক জ্যোতিষী কবি ওমার খৈয়াম এই গ্রন্থখানি পারস্য প্রদেশে প্রচলিত করেন।

† প্রাচীন সভ্যতার জন্য মোসেমগণেরই নিকট চীন অনেকটা ঋণী।

বহির্গত হইয়া বাহ্যবস্তুর উপর পতিত হয় বলিয়াই দর্শনানুভূতি জন্মে। কিন্তু মহাপণ্ডিত হাসানের মতে আলোক বাহ্যবস্তু হইতে বহির্গত বা প্রতিফলিত হইয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়; এইরূপে দর্শনানুভূতি জন্মিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদ্বারা ইহা প্রতিপন্ন করিয়া তিনি গ্রীকদিগের ভ্রান্ত বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করেন।

দর্শনানুভূতি।

চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ জালবৎ ত্বক-বিশেষই (Retina) দৃষ্টিশক্তির উৎপাদক, এবং সেই ত্বক হইতে মস্তিষ্কসংযুক্ত শিরা বিশেষের (optical nerve) অনুভূতি-বাহিকাশক্তির প্রভাবেই যে দর্শনানুভূতি জন্মে, পরীক্ষাদ্বারা এই স্থিরসিদ্ধান্তে তিনিই সর্ব্বপ্রথম উপনীত হয়েন। কি প্রকারে দুই চক্ষুর সাহায্যে আমরা একই মাত্র বস্তু নিরীক্ষণ করি, তাহাও তিনি সর্ব্বপ্রথম বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন।* বায়ুমণ্ডলের গুরুত্বের সহিত তাহার গাঢ়ত্বের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, বায়ুর গাঢ়ত্বভেদে তন্মধ্যস্থিত পদার্থের গুরুত্বের তারতম্য, উচ্চতানুসারে বায়ুমণ্ডলের গাঢ়ত্বের ন্যূনতা, বায়ুর গাঢ়ত্বানুসারে তৎপ্রবিষ্ট আলোকরশ্মির বক্রগতি প্রাপ্তির ন্যূনাধিক্য,—এই সকল পদার্থ-ধর্ম্মের কথা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত হাসানেরই উর্ব্বর-মস্তিষ্ক সমুদ্ভূত। তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে স্বাভাবিক উদয়াস্তের কিয়ৎকাল পূর্ব্বেই জ্যোতিষ্কমালার উদয়াস্ত অনুভূত হইয়া থাকে; এবং বায়ুমণ্ডলে আলোকরশ্মির বক্রগতিই যে তাহার একমাত্র হেতু, তাহা তিনিই নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন।

চক্ষু।

বায়ুমণ্ডল।

আলোকরশ্মির এই বিচিত্র বক্রগতি, এবং বায়ুমণ্ডল হইতে অবস্থাবিশেষে তাহার সম্পূর্ণ প্রতিফলন, এতদুভয়ের সংমিশ্রনে কিরূপে গোধূলির মনোহর

গোধূলি।

---

* ইঁহার চক্ষুবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাবলী ইউরোপে সুপরিচিত। Risner তাহার একখানি লাটিনে অনুবাদ করেন।

আলোক বৈচিত্র্যের উৎপত্তি হয়, এ বিষয় পণ্ডিতপ্রবর হাসানই বিশদ-রূপে ব্যাখ্যা করেন। "জ্ঞানের তুলাদণ্ড" নামক তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে তিনি গতিশক্তি-গণিত (Dynamics) সম্বন্ধে এক বিস্তারিত আলোচনা প্রকাশিত করেন; সুতরাং, গতিশক্তিগণিত যে একমাত্র ইউরোপীয় পণ্ডিতগণেরই একচ্ছত্র অধিকার, একথা কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে। মাধ্যাকর্ষণের (Gravitation) কথাও তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন; এবং মাধ্যাকর্ষণকে তিনি "শক্তি" বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন (মহাত্মা নিউটনের বহুশতাব্দী পূর্ব্বে!)। ভাসমান ও মজ্জমান পদার্থের অবলম্বিত শক্তি; পতনশীল পদার্থের বেগ, ভ্রমিত পথের পরিমাণ এবং পতনকাল, এই তিনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ (Laws of falling bodies), এবং কৈশিক আকর্ষণ (Capillary attraction) এই সকল সূক্ষ্ম পদার্থবিজ্ঞান-তত্ত্বের আলোচনা, তাঁহার অতি পরিষ্কার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বোধেরই পরিচায়ক। সুবিখ্যাত সিদ্ধান্ত-শিরোমণি প্রণেতা ভাস্করাচার্য্য মাধ্যাকর্ষণের বিষয় অবগত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারও শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে মূরীয় পণ্ডিত হাসান মাধ্যাকর্ষণশক্তির রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলেন।* এ বিষয়ে পৃথিবীর কোন পণ্ডিতই তাঁহার অগ্রগামী হইতে সক্ষম হয়েন নাই। এই অসাধারণ শক্তি-সম্পন্ন জ্ঞানবীর পণ্ডিত হাসানের অলৌকিক প্রতিভার আবিষ্কার ইউরোপে পদার্থবিদ্যার ভিত্তি-রূপে সাদরে গৃহীত হইয়াছিল।

গতিশক্তি গণিত।

মাধ্যাকর্ষণ।

পদার্থ বিদ্যার ভিত্তি।

স্পেনরাজ্যেও এমনি অপ্রতিহত উৎসাহে বিজ্ঞানানুশীলন চলিয়াছিল। সেভীলী, কর্দ্দভা, গ্রেনাডা, মার্সিয়া, টলেডো, জীন, মালাগা

* ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত-শিরোমণি ১১৫০ সালে লিখিত হয়—[ভারতী, আষাঢ়, ১৩১০, ২০৫ পৃঃ]। হাসানের আবির্ভাব কাল ১০৪০।

প্রভৃতি মহানগরীতে অসংখ্য বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ও বৃহৎ বৃহৎ সাধারণ পুস্তকালয় বিদ্যোৎসাহী মোস্লেমগণের বিজ্ঞান ক্ষুধার নিবৃত্তি করিত। একমাত্র গ্রাণাডাতেই ১৮টী উচ্চ এবং ২০০টী প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। কর্দ্দভানগরে ৭০টী সাধারণ পাঠাগার, এবং একটী পঞ্চলক্ষাধিক গ্রন্থে পরিপূর্ণ পুস্তকালয় ছিল। ইউরোপের মধ্যযুগ এই সকল জ্ঞানকেন্দ্র-প্রবাহিত সভ্যতা-স্রোতাভিঘাতে উত্তেজিত হইয়া, অন্ধকার-যুগের বর্ব্বরতা ও অবনতির গভীর পঙ্কসাগর হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল। এই সময়ে ইউরোপের দূর দূরান্ত হইতে দুই একজন করিয়া উৎসাহী ছাত্র আরবীয় অধ্যাপকগণের নিকট বিদ্যাশিক্ষার্থ আগমন করিতে আরম্ভ করেন। এমন কি খ্রীষ্ট জগতের ধর্ম্মগুরু পোপগণেরও কেহ কেহ মোস্লেম বিজ্ঞানাগারেই সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। জ্যোতিষ, ভূগোলশাস্ত্র, রসায়ন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, গণিত প্রভৃতি স্পেনীয় মোস্লেমগণ অসাধারণ অনুরাগের সহিত অনুশীলন করিতেন। কাব্যকলালোচনা ও কবিতা রচনা ত সাধারণ লোকের ক্রীড়া বিশেষের মধ্যেই দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। ইস্‌লামের রাজ্যে জ্ঞানালোচনা বা জ্ঞানদান সম্বন্ধে জাতি বা ধর্ম্মভেদ ছিল না; এমন কি ইউরোপীয় পণ্ডিত Renanএর মতে, আধুনিক জগতও ইস্‌লামের এতখানি উচ্চ আদর্শের অনুসরণ করিয়া ইস্‌লামের সমতুল্য উদারতা প্রদর্শনে সক্ষম হয় নাই! ইস্‌লামের মাহাত্ম্যের ইহা একটী প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল।

স্পেনরাজ্যে বিজ্ঞান-চর্চ্চা।

এই সময়ে স্পেনে ওমার ইব্‌নে খালেদুম, ইয়াকুব ইব্‌নে তারিক, মোস্লেমা-অল্‌-মগরবী, আবুল অলিদ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পদার্থ বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ প্রতিভাবলে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। সুবিখ্যাত গণিতশাস্ত্রজ্ঞ মহাপণ্ডিত জাবর ইব্‌নে আফিয়াহ

আকাশমার্গে ভ্রাম্যমান জ্যোতিষ্কমণ্ডলী পর্য্যবেক্ষণার্থ সেভিলী নগরে "জিরাল্ডা" নামক একটী অত্যুচ্চ দুর্গচূড়া নির্ম্মাণ করেন। ইহাই ইউরোপের সর্ব্বপ্রথম অবজারভেটরী জ্ঞানবীর মোস্লেমগণ স্পেন হইতে বিতাড়িত হইলে বর্ব্বর মূর্খ স্পানিয়ার্ডগণ সেই উচ্চ গৃহের দ্বারা কি করিতে হয় বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে ঘণ্টাগৃহে পরিণত করিয়াছিল! হায়রে বিধির লীলা!

অন্তরীক্ষ-পরিদর্শনাগার।

পশ্চিম আফ্রিকাও এ সময়ে নিশ্চেষ্ট ছিল না। তথায় অসংখ্য দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত জন্ম পরিগ্রহ করিয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করিতেছিলেন। কিউটা, টাঞ্জিয়ার, ফেজ, মরক্কো প্রভৃতির বিশ্ববিদ্যালয় সেভিলী, কর্দ্দভা, গ্রাণাডা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। বাহুল্য ভয়ে আমরা এ সকলের বিশেষ বিবরণ প্রদান করিলাম না।

একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে মধ্য-এসিয়ায় যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। ভারত-বজ্র গজনীপতি সুল্তান মাহমুদ যে কেবল বাহুবলে মধ্য-এসিয়া, আফগানরাজ্য ও পারস্য প্রদেশ স্বীয় একছত্র শাসনাধীনে আনয়ন করিয়াছিলেন, এমত নহে; অধিকন্তু, বিদ্যোৎসাহবলে তিনি আপনার রাজসভাকাশ অসংখ্য প্রতিভাজ্যোতিষ্কমালায় পরিশোভিত করিয়া দিগ্বিদিক্ জ্ঞান ও সভ্যতার বিমলালোকে সমুদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। কবিকুল-চূড়ামণি ফারদৌসী, দাফিকী, আন্সার, এবং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ অল্বেরুণী প্রভৃতি রত্নরাজি ইঁহারি রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। অল্বেরুণী বহু শতাব্দী পূর্ব্বে যে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক আদর্শে নানাশাস্ত্র বিষয়ক অশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা আধুনিক পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণেরও

মাহমুদের বিদ্যোৎসাহ।

অনুকরণায়। ইঁহার "অল্‌কানুন-মসুদী" (Canon Masudlicus) নামক জ্যোতিষ গ্রন্থখানি, পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্বানুসন্ধান ও গভীর জ্ঞানানুশীলনের একটী বিশাল কীর্ত্তিমন্দিরস্বরূপ। প্রাচীন গ্রীক-কর্ষিত বিদ্যাক্ষেত্র হইতে

গ্রীকবিদ্যা।

মোস্লেমগণ কত বিভিন্ন প্রকার সুরসাল ফল উৎপন্ন করিয়াছিলেন, তাহা বেরুণীর বহু বিখ্যাত গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন উচ্চগণিত, কালবিজ্ঞান (Chronology), ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, রসায়ণ প্রভৃতি বিষয়ে বহুবিধ গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন। ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিয়া, বোগদাদ ক্ষেত্রোৎপন্ন দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্যাদির বিনময়ে তিনি সংস্কৃত ভাষা, ভারতীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান দর্শনাদি সম্যক্‌রূপে আয়ত্ব করিয়া লইয়াছিলেন, এবং তদ্বিষয়ে কএকখানি গ্রন্থও রচনা করেন। দিগ্বিজয়ী আলেকজণ্ডার ও তাঁহার পরবর্ত্তী গ্রীক সম্রাটগণের সমসাময়িক গ্রন্থাদিতে জ্যোতিঃশাস্ত্রে হিন্দু-

হিন্দু-জ্যোতিষ।

গণের অসাধারণত্ব সম্বন্ধে কোন উল্লেখ দেখা যায় না, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়; অথচ খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ভারত-ভ্রমণ করিতে আসিয়া পরিব্রাজক অল্‌-বেরুণী ভারতে বহুবিধ প্রাচীন গ্রীক সংস্কারের চিহ্নবিশেষ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এই কারণে সেডিলট প্রমুখ ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে হিন্দুগণও পুরাকালে বিদেশীয় উন্নত সংস্কারের কিছু কিছু আপন প্রকৃতি অনুসারে রূপান্তরিত করিয়া লইয়াছিলেন।

সুলতান মাহমুদের বংশধরগণ তাঁহারই ন্যায় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। সেল্‌জুকীয় রাজগণের অভ্যুত্থানকালে বিজ্ঞান এবং কলাচর্চ্চার সমধিক উন্নতি হইয়াছিল। সুলতান জালালুদ্দিন মালিক সাহ (১০৭৩-৯২) ও তদীয় সুযোগ্য মন্ত্রী খাজা হাসান অসংখ্য জ্যোতির্ব্বিদ্; ঐতিহাসিক, দার্শনিক, এবং কবিমণ্ডলীতে রাজসভা পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে সুবিখ্যাত জ্যোতিষী-কবি ওমার খৈয়াম এবং পণ্ডিত আবদর

রহমান অল্‌ হাজিনীর তত্ত্বাবধানে প্রাচীন ভ্রমসঙ্কুল পঞ্জিকার যে সংস্কার হইয়াছিল, ছয় শতাব্দী পরবর্ত্তী গ্রীগরীয় সংস্কৃত পঞ্জিকাও ততদুর সূক্ষ্ম ও নির্দ্দোষ হইতে পারে নাই। (Sedillot)। উক্ত সংস্কার ব্যাপারের স্মরণার্থ এই সময় হইতে "জালালা সনের" (সুলতানের নামানুসারে) গণনারম্ভ হয়।

পঞ্জিকা-সংস্কার।

একাদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া, সমগ্র দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া, "ক্রুসেডকার" নামধারী একদল খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী-নরঘাতক ইউরোপীয় দস্যু-পঙ্গপাল উপর্য্যুপরি বহুবার মোস্লেম রাজ্যসমূহে পতিত হইয়া উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এসিয়ার বিস্তৃত বিদ্যাক্ষেত্র গুলির সমূহ ক্ষতি ঘটাইয়াছিল। বিকৃতমস্তিষ্ক পুরোহিতবৃন্দ কর্ত্তৃক উত্তেজিত, পৈশাচিক রক্ত পিপাসায় ও প্রবাদ-প্রসিদ্ধ প্রাচ্য ঐশ্বর্য্যে এবং রমণী-সৌন্দর্য্যে প্রলুব্ধ ও জঘন্য পাশব প্রবৃত্তির তীব্র দংশনে উন্মত্ত হইয়া এই অসভ্য বর্ব্বরগণ আবাল-বৃদ্ধবনিতা নির্ব্বিশেষে নিরীহ মোস্লেম নাগরিকগণকে হত্যা ও রমণী-কুলের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া এবং জগদ্বিখ্যাত বৃহৎ বৃহৎ বিদ্যালয় ও পুস্তকালয় ভস্মীভূত করিয়া ঐস্লমিক জ্ঞান ও সভ্যতার অভ্রভেদী মস্তক বজ্রাহত করিয়াছিল। এই ধ্বংসপ্রিয় খৃষ্টানগণের অমানুষিক লোমহর্ষণ অত্যাচারে প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্য ও উর্ব্বরতার লীলাভূমি এসিয়া মাইনর প্রদেশের অধিকাংশই এমনি বিধ্বস্ত, জর্জ্জরিত ও ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল যে, বিগত অষ্ট শতাব্দী মধ্যেও তাহার আর সংস্কার হইয়া উঠিল না! যে প্যালেস্তাইনের নয়নাভিরাম অলৌকিক সৌন্দর্য্যে যীশুখ্রীষ্ট আত্মহারা হইয়া প্রাণস্পর্শী প্রশান্ত ভাষায় সেই করুণাময় জগৎপিতার মহিমা কীর্ত্তনে পৃথিবী রোমাঞ্চিত করিয়া দিয়াছিলেন,—সেই যীশু খ্রীষ্টের বর্ব্বর শিষ্যগণ ক্রুসেডচ্ছলে সেই স্বর্গ-সুলভ সৌন্দর্য্য-পরিপূর্ণ তপোভূমির এমনি দুর্দ্দশা করিয়াছিল যে, অদ্যাপি সেই স্থান

ক্রুসেড।

জনপ্রাণিশূন্য ভয়ঙ্কর মরুভূমির ন্যায় হইয়া রহিয়াছে! ইহারাই আবার ইহাদেরই স্বহস্ত রচিত মরুভূমিগুলি মুসলমান শাসনের দেশহিত-কামনা-শৈথিল্যসমুদ্ভূত বলিয়া তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করে, এবং উচ্চ-পুচ্ছে লম্ফঝম্ফ প্রদান করিতে থাকে! আবার এই ইউরোপীয় খ্রীষ্টান বর্ব্বরগণ, ইহাদিগেরই বর্ব্বরতর পূর্ব্বপুরুষগণ-কৃত আলেক্‌জেন্দ্রিয়ার পুস্তকাগার ভস্মীভূত করার অপরাধ * চীৎকারস্বরে মোস্লেমগণের স্কন্ধে আরোপ করিবার জন্য লালায়িত হইয়া থাকে,—এমনি ঘোর নির্লজ্জ ইহারা! ইস্‌লামের নির্ম্মল আলোক পৃথিবীর যে যে অংশে বিকীর্ণ হইয়াছে, জ্ঞান ও সভ্যতার ঐকান্তিক উৎকর্ষ অনতিবিলম্বেই তত্তৎ-স্থানের প্রকৃতিগত ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইয়াছে;—প্রাচীন জ্ঞানের ভাণ্ডার পুস্তকালয় ভস্ম হওয়া,—সেত বহু দূরের কথা! পুস্তকালয় ভস্ম করার শত অপরাধে অপরাধী ..ক, এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে ইতিহাস অম্লানবদনে দুই হস্তের দশ অঙ্গুলি তুলিয়া একমাত্র প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইউরোপীয়গণকেই দেখাইয়া দিবে!

আলেকজান্দ্রিয়ার পুস্তকাগার।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অসুরপরাক্রম দস্যুকুলগুরু চেঙ্গিজের পঙ্গপালগণ বর্ষার ঘোর ঘনঘটার ন্যায় মোস্লেম রাজ্যসমূহ সমাচ্ছন্ন করিয়া মোস্লেম জ্ঞান ও সভ্যতার মাথায় দ্বিতীয় ভীষণ বজ্রাঘাত করিয়াছিল। মহা জলপ্লাবনের ন্যায় ঘোর-গর্জ্জনে পৃথিবীর কর্ণ বধির করিয়া তাহারা পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, নির্ধন, বৃদ্ধ, শিশু, নারী, বিদ্যালয়, পুস্তকালয়—এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্তই নিহত, চূর্ণীকৃত, ভস্মীভূত ও পর্য্যুদস্ত করিয়া দিয়া, বহুশতাব্দীসঞ্চিত বোগ্দাদের অমূল্য জ্ঞান-ভাণ্ডার ভাসাইয়া লইয়া, অতলস্পর্শ ধ্বংশ-সাগরে অনন্তকালের জন্য ডুবাইয়া দিয়াছিল।

চেঙ্গিজ।

* জুলিয়স্ সীজরের আমলে উহা ভস্মীভূত হয়।

সেই আঘাত চূড়ান্ত আঘাত! সেই আঘাতে মোস্লেম জগৎ হইতে পৃথিবীর এক বিশাল রত্নভাণ্ডার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।—অনন্তকালেও আর তাহার পুনরুদ্ধার হইবে কিনা সন্দেহ।

ইস্‌লামের প্রভাব।

কিন্তু ইস্‌লামের প্রভাব এমনি চমৎকার যে সেই পাপাত্মা সভ্যতা-শত্রু চেঙ্গিজের সন্তানগণ যেদিন পবিত্র ইস্‌লামে দীক্ষিত হইল, সেইদিন হইতেই তাহারা বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যার একান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িল। কলাবিজ্ঞানের সর্ব্বনাশ-সাধক কৃতান্তগণই কলাবিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনার্থ মন-প্রাণ উৎসর্গ করিয়া বসিল! আপনারা অশেষ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়া, পণ্ডিতসমাজের সম্যক্ সমাদর করিয়া, অসংখ্য জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থাদি প্রণয়ণ করিয়া করাল-প্রাণ হালাকুর বংশধরগণ তাহারই স্বহস্ত বিনষ্ট রত্নভাণ্ডারের পুনরুদ্ধার মানসে প্রাণপণ পরিশ্রম করিতে লাগিল!—ইস্‌লামের পবিত্র জ্যোতিঃ এমনি উজ্জ্বল, এমনি নির্ম্মল, এমনি প্রাণস্পর্শী!

তৈমুর ও তাঁহার বিদ্যোৎসাহ।

উপর্য্যুপরি এই সকল প্রচণ্ড আঘাতে ক্ষতবিক্ষত ও ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইয়াও মোস্লেম-জগৎ জ্ঞানচর্চ্চায় পুনরায় স্বস্থান অধিকারার্থ প্রয়াস পাইতে লাগিল, এবং কিয়দ্দূর সফলতা লাভও করিয়াছিল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধকালে মধ্য-এসিয়ায় অদ্ভুত-প্রকৃতি মহপরাক্রান্ত তৈমুরের অভ্যুত্থান হইল। স্বীয় বাহুবলে তিনি চীন হইতে রুষিয়ার কিয়দংশ এবং দক্ষিণে আরব-সাগরের উপকূল পর্য্যন্ত একছত্র শাসনাধীনে আনয়ন করিয়াছিলেন। অদম্য বিজয়লালসা এবং দিগ্বিজয়ে অমানুষিক-কঠোর-প্রাণতা সত্বেও তাঁহার উদার, উন্নত প্রকৃতি, ঐকান্তিক সাহিত্য-সেবা, কলাবিজ্ঞানাসক্তি, অসংখ্য বিদ্যালয় ও পুস্তকালয় স্থাপন ও বিশাল বিশাল মস্‌জিদ নির্ম্মাণ প্রভৃতি মহদনুষ্ঠান তাঁহাকে জগতের ইতিহাসে অদ্বিতীয় বলিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে। তদীয় মহিষী "বিবি

খানম্” যে সুবিশাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহার শিল্প-সৌন্দর্য্য ও গঠনগাম্ভীর্য্য অবলোকন করিয়া পথিকগণ স্তম্ভিত হইয়া থাকেন। তদানীন্তন মুসলমান রমণী-কুলের মানসিক উৎকর্ষের ইহাই প্রধান পরিচায়ক।

তৈমূরের উত্তরাধিকারিগণ।

তৈমূরের উত্তরাধিকারিগণও বিদ্যোৎসাহে তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন। পুত্র শাহরোখ মির্জার অর্দ্ধ-শতাব্দী-দীর্ঘ শান্তিপূর্ণ রাজত্বকাল কলাবিজ্ঞানোৎকর্ষের বিশেষত্বের জন্যই বিখ্যাত। পৌত্র উলুঘ বেগ স্বয়ং একজন খ্যাতনামা জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত ছিলেন। তৎপ্রণীত গভীর গবেষণাপূর্ণ জ্যোতিষ গ্রন্থরাজি আরবীয় জ্যোতিঃশাস্ত্রের অসম্পূর্ণ অংশ সম্পূর্ণ করিয়া তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। ইহার মৃত্যুর প্রায় দেড়শতবর্ষ পরে কেপ্‌লার আধুনিক ইউরোপীয় জোতিঃ-শাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেন।

মোস্লেমগণ যে কেবল জোতিঃশাস্ত্রেরই অনুশীলন করিয়াছিলেন, এমত নহে। তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যান্য বিজ্ঞানশাস্ত্রেরও প্রভূত চর্চ্চা ছিল। আগামী সংখ্যায় তাহার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করিতে চেষ্টা করিব।*

শ্রীইম্‌দাদুল হক।

* এই প্রবন্ধ মূলতঃ জষ্টিস আমির আলির The Spirit of Islam নামক গ্রন্থাবলম্বনে লিখিত।

চাঁদের বিয়ে।

(১)

উন্মাদ শশী হাসিয়া উঠিল
  ফুল্ল আকাশ-বাসরে ;
ক্লান্ত কিরণ ঢলিয়া পড়িল,
আমোদে কুমুদী আঁখিটি মেলিল,
চক্ষে চক্ষে মধুর মিলিল,
  হাসিটি ভাসিল অধরে,—
শত শত গান গাহিয়া উঠিল
  ফুল্ল আকাশ-বাসরে।

(২)

জগত মুগ্ধ, সরস স্নিগ্ধ
  সুন্দর সেই সঙ্গীতে ;
অন্তর যেন উঠে গুমরিয়া
আধ ঘুম ঘোরে রহিয়া রহিয়া,
পঞ্চমে পাখী উঠে ফুকরিয়া
  অলস মন্দ ভঙ্গীতে।
সহসা থমকি' থেমে গেল মেঘ
  অম্বর-পথ লঙ্ঘিতে।

(৩)

তারকার দল এয়ো হ'য়ে এল
  আকাশ-কুঞ্জ-বাসিনী।
ভাসিয়া উঠিল সুখ নিরমল,
দম্পতি-প্রেম জ্যোৎস্না-শীতল,
নির্ব্বাণ-গীত শান্ত বিমল
  গাহিল মঞ্জু-ভাষিনী।
নাচিয়া উঠিল আকাশে আকাশে
  লক্ষ মনোহারিণী।

(৪)

নন্দন হ'তে আসিল নামিয়া
  অম্বর নীল প্রাঙ্গনে,
অঞ্চল ভরি আনে পারিজাত,
চন্দন চুয়া লয়ে' আসে সাথ,
নব-জীবনের ললিত প্রভাত
  লয়ে' এল সুরাঙ্গনে।
লয়ে' এল আর দেব-আশীর্ব্বাদ,
  অম্বর নীল প্রাঙ্গনে।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।

ভাষার গঠন ও উন্নতি।

ভাষা সৃষ্ট হইয়া তাহা ব্যবহার বশে নানারূপে গঠিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। বাক্যের পর বাক্য সাজাইয়া মনোভাব জ্ঞাপন করা হইত। কিন্তু দ্রুত বা শ্লথ উচ্চারণ বশে এক একটী আদিম শব্দ সম্প্রসারিত বা সঙ্কুচিত হইয়া যাইতে লাগিল, কোথাও বা দুই বা ততোধিক শব্দ একত্র মিলিত হইয়া একটী সম্পূর্ণ নূতন শব্দ গঠিত করিয়া তুলিতে লাগিল। এইরূপে বাক্যস্থিত পদ সকলের ব্যাকরণগত সম্বন্ধ গঠিত হইতে লাগিল, এ সম্বন্ধে বিস্তারিত-ভাবে ক্রমশঃ বলিব। এক একটা সমাজ বা দল যখন জন্মস্থান ছাড়িয়া অন্য দেশে যাইতে লাগিল, তখন সেই সকল দেশের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক ক্রিয়াবশেও ভাষাস্থ শব্দসকলের পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। এই পরিবর্ত্তনই ভাষা গঠনের অস্থিমজ্জা। ভাষা গঠনে তিনটি স্তর নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় (Curtius সাতটি স্তর নির্দ্দেশ করিয়াছেন)।

১। ধাতু সকলের স্বাধীন, স্বতন্ত্র ব্যবহার। ইহার উদাহরণ চীন ভাষায় আজিও যথেষ্ট বর্ত্তমান। ইহার নাম **একাক্ষর বা ধাত্বেক কোষ,** যথা, ক = জল, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সূর্য্য, আত্মা, রাজা, পক্ষী, ময়ূর ইত্যাদি। অক্ষ্ ধাতু = অক্ষপাত করা; অংশ্ ধাতু = বিভাগ করা, ইত্যাদি বহু ধাতুপ্রত্যয় নিরপেক্ষ হইয়া (প্রত্যয় থাকিলেও তাহারা নিরবয়ব বলিয়া বাদ দেওয়া চলিতে পারে। সংস্কৃতে প্রত্যয় ভিন্ন কোন পদ সিদ্ধ হয় না, এজন্য উহাদের ঘাড়ে অনর্থক এক একটা প্রত্যয়ের দোহাই চাপান হইয়া থাকে) ভাষায় স্বাধীনভাবে অবস্থান করিবার ক্ষমতা রাখিয়া থাকে। এই স্তরে ধাতুর আকারগত বা শব্দগত কোন পরিবর্ত্তনই লক্ষিত হয় না। ভাষা সৃষ্টির সময়ে এইরূপ ধাতু সকলই ব্যবহৃত হইত বলিয়া বোধ হয়। Curtius এই মতের

পোষ্টা, কিন্তু মুলর ইহাতে সন্দেহ উত্থাপন করিয়াছেন। এই মতের পক্ষপাতীদিগের যুক্তি এই যে, যাহা সহজ সাধ্য তাহাই প্রথমতঃ আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি, ভাষা প্রথমতঃ আবশ্যকীয় উপকরণ মাত্রই যোগাইয়া থাকে, বিলাস বিভবের প্রতি লক্ষ্য বহুপরে হয়। আবার বিরুদ্ধবাদীরা বলেন যে জটিলভাব হইতে তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারাই আমরা ক্রমশ সহজ সত্যে উপনীত হইয়া থাকি। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদিগের পরস্পর বিরোধী উক্তিসকল আলোচনা করিলেই ইহার মীমাংসা সহজ হইবে। তাঁহারা চীন ভাষাকে যথেষ্ট প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহা প্রায় আদিম অবস্থায়ই আছে, বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। তাহার বাক্য সকল প্রায়ই একমাত্রিক (monosyllabic), তবু তাঁহাদের মতে আদিম ভাষা একমাত্রিক শব্দময় ছিল না, এরূপ বিবদমান মতের সামঞ্জস্য রক্ষা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির সাধ্যায়ত্ত নহে। আরও বাঙ্গালা ভাষার প্রতিও দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায়, বাঙ্গালা অধিক প্রাচীন ভাষা নহে কিন্তু সে প্রাচীন সংস্কৃতের বংশধরী বলিয়া অনেকটা উন্নত, তথাপি তাহা বিচিত্র বিভবশালিনী নহে। বহু ভাব প্রকাশের জন্য এখনও ইংরাজি, পার্সীর আশ্রয় লইতে হয়, সংস্কৃতের ত কথাই নাই।

২। দুইটী ধাতু একত্র সংশ্লিষ্ট করিয়া বাক্য গঠিত হয় এবং এই মিশ্রণ ফলে অন্যতর ধাতু তাহার স্বাধীনতা হারাইয়া তাহার সহযোগীর অর্থাগমে সাহায্যকারী মাত্র হইয়া থাকে। এই স্তরকে **প্রত্যয় সিদ্ধ** বা **সংযোগবাহ** বলা যাইতে পারে।। (ইংরাজিতে এই স্তরের নাম agglutinative, for gluten = glue.) এই স্তরেও প্রধান ধাতু শরীরে কোনই পরিবর্ত্তন ঘটে না, কেবল যুক্ত দ্বিতীয় ধাতু মিশ্রণ সাধনের সুবিধার জন্য অল্প পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যথা—অংশ + উ = অংশু ; পক্ষ + অল্ = পক্ষ = পণ্ + স ইত্যাদি।

পণ্ডিতেরা বলেন যে, সমস্ত প্রত্যয়ই আদিম ধাতুর সঙ্কুচিত বা পরিত্যক্ত অংশ মাত্র, কিন্তু কোন্‌টি কোন্ ধাতু হইতে আগত তাহা সকল সময় নির্ণয় করা সুকঠিন। তবে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের অসাধারণ অধ্যবসায় যে দুই একটার সন্ধান পাইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

সংস্কৃতে ত্য প্রত্যয় যোগে বিশেষণ হয়, যথা দাক্ষিণাত্য। অধ্যাপক ম, মূলর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে এই ত্য প্রত্যয় সর্ব্বনাম সমুদ্ভূত এবং স্যস্, স্য, ত্যদ্ প্রভৃতি সর্ব্বনামের সহিত একার্থক। ত্য সর্ব্বনাম প্রত্যয় হইলে, 'দক্ষিণাত্য বা আপ্ত্য' জল সম্বন্ধীয়, আপ্ + ত্য) প্রভৃতি বিশেষণগুলি আদৌ 'দক্ষিণ-ঐ,' 'জল-ঐ' রূপে সাধিত হইয়াছিল। আপ্ত্যঃ = আপ্ + ত্য + স্ (সঃ) = জল – ঐ – সে। তাঁহারা বলেন যে এই বিভক্তির 'স্' সর্ব্বনাম 'সা' এর রূপান্তর মাত্র; সংস্কৃত 'উদকস্য'র 'স্য,' ত্য প্রত্যয়ের সহিত অভিন্ন। কেবল 'স্য' বিভক্তি, ত্য প্রত্যয়তুল্য আর কোন বিভক্তি স্বীকার করে না। অতএব উদকস্য বিশেষণ হইতেও পারে। (See MaxMuller's Science of Language).

Curtius ইহা আরও সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। নাশয়ামি = নাশ + যামি, আমি নাশে প্রেরণ করিতেছি বা নাশ করিতেছি। এখানে দুইটি স্বতন্ত্র ধাতু মিলিত হইয়াও স্বাকার ঠিক রাখিয়াছে। Curtius ও Sayce বলেন যে যুধ্, যুগ্, যুৎ প্রভৃতি ধাতু সকল যু ধাতু ও অন্যান্য ধাত্ববয়ব ধ, গ, ত প্রভৃতির যোগে বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। আদিম ভাষার ধাতু যু, কিন্তু কালক্রমে আদিম অন্যান্য ধাতু সংযুক্ত হইয়া বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। মূলর বলেন যে এইরূপ সংযোগ ব্যাপার আর্য্যভাষা গঠনের পরও বহুকাল পর্য্যন্ত ব্যাপক হইয়া রহিয়াছিল। এইরূপে সংস্কৃতে কারকের বিভক্তি সত্ত্বেও ধাতু সকল (যথা, বায়োঃ = বায়ু + ওস্ = বা ধাতু + উ প্রত্যয় + ওস্.) সহজে

আমাদের দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। বিভক্তি প্রভৃতির ব্যবহার দ্বারা আমরা একই ধাতু হইতে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকি, কিন্তু নিত্য ব্যবহার দ্বারা অভ্যস্ত হওয়ায় আমাদের মন বিশেষ কোন নূতনত্ব বোধ করে না।

৩। দুইটা ধাতু গাঁথিয়া একটা বাক্যের সৃষ্টি হয় কিন্তু উভয় ধাতুই তাহাদের স্বাধীনতা হারাইয়া ফেলে। ইহাকেও প্রত্যয়সিদ্ধ বলা যাইতে পারে; ইহার অন্তর্গত ভাষার নাম amalgamating or organic, এই স্তরে গঠিত বাক্যের উভয় ধাতুই বিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা এই তৃতীয় স্তরে উপস্থিত হইয়াছে। যথা, ধূয়মান = ধূ (কম্পন) + শানচ, এখানে ধূ হইয়াছে ধূয়, এবং শান স্থানে হইয়াছে মান।

অনেকে (তন্মধ্যে Curtius অন্যতম) বলেন যে আদিম আর্য্য ভাষায় প্রত্যয়, বিভক্তি, বচন প্রভৃতি কোন চিহ্নই ছিল না, কেবল মাত্র ধাতু সকলই ব্যবহৃত হইত। কেবল ধাতু মাত্র ব্যবহারে সকল সময় অর্থ সহজ বোধ্য হইত না, এজন্য কোন ব্যক্তি একটু পরিবর্ত্তন করিলে তাহা ক্রমশঃ সর্ব্বগ্রাহ্য হইয়া স্থিরত্ব প্রাপ্ত হইত; এইরূপ নানা উপায়ে বৈয়াকরণিক চিহ্নাদির সৃষ্টি হইতেছিল। ভাষা যে পরস্পরের সাহায্যে রচিত ও পুষ্ট ইহা তাহার সমর্থন করিতেছে। কোন কোন পণ্ডিত ধাতু সংযোগে ব্যাকরণানুযায়ী বাক্য গঠনকেও প্রাথমিক ভাষা সৃষ্টির মত প্রাকৃতিক সহজ-জ্ঞানলব্ধ (instinctive) বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাহেন।

এইরূপে ভাষা যখন গঠিত হইয়া উঠিল, তখন তাহার আরও পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। প্রাকৃতিক নিয়মবশে জাগতিক দ্রব্য সমূহের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তত্তৎবোধক শব্দ সকলও অল্লাধিক পরিমাণে বিপর্য্যস্ত হইয়া ভাষায় সুমহান পরিবর্ত্তন ঘটাইতে লাগিল। মানুষের

জ্ঞানান্বেষণ বৃত্তিগুলি পরিপুষ্ট হইয়া ভাষাকে নূতন ভূষণে বিভূষিত করিতে লাগিল। ভাষার পরিবর্ত্তনের কারণ দ্রুত ও শ্লথ উচ্চারণ, উপনিবেশ ও জল বায়ুর প্রভাব, এই তিন প্রকার নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের গ্রন্থানুসন্ধান আরম্ভ করিয়া অধ্যাপক ম, মূলর ও সেসের Science of Language, Whitney's Life and Growth of Language, Mr. Horatio Hales' The Origin of Language 1888 প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে যাহা পাইয়াছি, তাহারই সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

Mr. W. Gile একজন পাদ্রি, তিনি অধ্যাপক মূলর কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বহু অসভ্য জাতির ভাষা গঠনের প্রতি অবহিত থাকিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা তিনি উক্ত অধ্যাপককে জানাইতেছেন।

"যখন কোন প্রধান বা পুরোহিত কোন নূতন শব্দ (witticism or a new phrase) গঠন করেন তাহা শীঘ্রই নিম্নশ্রেণীতে 'অমুক বলেন' বলিয়া চলিত হইয়া যায়। পরে তাহা ভাষায় স্থায়ী হইয়া পড়ে। বৃদ্ধদিগের দন্তহীনতা প্রভৃতি কারণে বহুশব্দ বিকৃতভাবে উচ্চারিত হইয়া থাকে; অন্যান্য লোকে বৃদ্ধের প্রতি সম্মানবশতঃ ঐ সকল শব্দ বিকৃত করিয়াই উচ্চারণ করে; ইহা শব্দ পরিবর্ত্তনের এক কারণ। প্রাচীন কালে সর্ব্ব সাধারণের নিকট হইতে মন্ত্রার্থ গোপন রাখিবার জন্য পুরোহিতগণ ভাষা বিকৃত করিয়া ব্যবহার করিত। যাযাবর জাতির আগম ও মিশ্রণও ভাষা পরিবর্ত্তনের একটি প্রধান কারণ। বৃহৎ জাতি সকলের মধ্যে পরস্পরের যুদ্ধ, পূজা-পদ্ধতি, ও বড় বড় সভা সমিতিতে বক্তৃতা ও বাকযুদ্ধ প্রভৃতিও ভাষা পরিবর্ত্তনের সাহায্য করিয়া থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে ভাষা পরিবর্ত্তনের কারণ খুব অল্পই বর্ত্তমান থাকে"।

মিঃ মেলাওও আমেরিকার অসভ্যদিগের সম্বন্ধে ইহাই বলিয়াছেন;

যে 'যখন বৃদ্ধেরা পরস্পরে আলাপ করে, যুবকেরা তাহা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারে না। প্রাচীন ভাষার দীর্ঘ নাম সকল পরবর্ত্তী ভাষায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।'

ভাষা ব্যক্তি বিশেষের রুচি বা ইচ্ছানুসারে বা চেষ্টায় কখনও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না; পরন্তু ইহা সমাজের সমবেত চেষ্টায় অথচ অজ্ঞাত ও অদৃশ্যভাবে হইয়া থাকে। বাঙ্গালা ভাঙ্গিয়া গড়িবার চেষ্টা অনেকে করিয়াছেন, কিন্তু সে ঐ সমস্ত চেষ্টা উপেক্ষা করিয়া স্বাধীনভাবে ক্রমশঃ গঠিত হইয়া উঠিতেছে, এবং ইহা শিক্ষিতাশিক্ষিত সমাজের সমবেত কার্য্য ভিন্ন আর অন্য উপায়ে নহে। ভাষায় যখন দৈন্য জাগিয়া উঠে, সে তখন একের মুষ্টিভিক্ষা বড় সহজে গ্রহণ করিতে চাহে না, সমাজ চাঁদার খাতা খুলিয়া সকলকে সহি করাইলে সে অম্লানবদনে সেই সব contribution and donations আত্মসাৎ করিয়া থাকে। এই পরিবর্ত্তন দুই উপায়ে ঘটিতে পারে—

১। প্রাদেশিক কথায় ভাষাপুষ্টি। যথা—সংস্কৃতে পর্য্যাপ্ত = যথেষ্ট, অপর্য্যাপ্ত = অল্প; কিন্তু চলিত কথায় ভুলক্রমে এই অপর্য্যাপ্তও যথেষ্ট অর্থে চলিত হইয়া ভাষায় গৃহীত হইয়াছে। 'আমায় অপর্য্যাপ্ত ভোজন করাইয়াছে' বলিলে এখন আর কেহ বুঝিবে না যে, আহারে আমার উদরপূর্ত্তি হয় নাই। আধিক্যতা (স্ত্রীলোকে ইহা সচরাচর 'আদিখ্যেতা' উচ্চারণে ব্যবহার করিয়া থাকেন) বাড়াবাড়ি অর্থ হইতে কিঞ্চিৎ ভ্রষ্ট হইয়া ন্যাকামির সহিত কিঞ্চিৎ নৈকট্য স্থাপন করিয়াছে। নাগাল, একঘেয়ে, ন্যাকা, খুনসুটি, আবদার প্রভৃতি বহু প্রাদেশিক কথা সময়ে সময়ে লিখিত ভাষায়ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইরূপে কথিত ভাষার চলিত বহু দুষ্ট বাক্য কালে শিষ্ট হইয়া ভাষায় গৃহীত হইতেছে।

২। শব্দক্ষয়ে ও শব্দ বিকৃতিতে ভাষার পরিবর্ত্তন। বিংশতি ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বিংশতি (Latin, Viginti) = দ্বি + দশতি

(Dviginte) ; কালক্রমে ব্যবহারিক ভাষায় 'দ্বি' র 'দ' ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে এবং 'বি'র পর এক 'ং' অনুস্বার আগম হইয়া পূর্ব্বরূপ সম্পূর্ণ বিকৃতি লাভ করিয়াছে এবং তাহার চলিত রূপ হইয়াছে "বিশ"। স্বসর্=পারস্য খাহর। (সংস্কৃতের স, পারস্য ভাষায় হ্ বা খ হয়)। অধ্যাপক ম, মূলর লিখিয়াছেন Hvahar ; দুই তিনখানি পারস্য অভিধান খুঁজিয়া হ্বাহর' শব্দ পাইলাম না ; পরন্তু পারস্য খাহর মানে ভগ্না জ্ঞাত আছি। বোধ হয় 'খে'র নোক্তা (বিন্দু) ত্যাগ করিয়া 'খে' স্থানে 'হে' পাঠ করিয়াছেন, কেন না উভয় অক্ষরে একটি নোক্তা (বিন্দু) মাত্র প্রভেদ। (বাঙ্গালার 'র' কে 'ব' পড়া মারাত্মক ভ্রম নহে)। এই খাহর পেহেলি ভাষায় বিকৃত হইয়া হইয়াছে 'চোহর' ; তৎপরে আরো ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশ 'চোর,' পরে 'চো' মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সংস্কৃত 'চতুরঙ্গ' শব্দেরও এইরূপ বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে (বঙ্গদর্শন, নবপর্য্যায়, প্রথম বর্ষ দ্রষ্টব্য)।

এই দ্বিবিধ পরিবর্ত্তনে বহু বৈয়াকরণিক শব্দ দ্বারা ভাষা একস্তর হইতে স্তরান্তরে উন্নত হইয়া উঠে (isolating হইতে agglutinative ও তাহা হইতে inflectional ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, বিশেষ বিবরণের জন্য Morris' Historical Outlines of English Accidence প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

প্রাদেশিক কথা তাহার ইতর, অসংবৃত, ব্যক্ত, অব্যক্ত কথা, এবং সমাজ বা পরিবার বা ব্যক্তিগত অনন্য সাধারণ বিশেষ বিশেষ বাক্য-সমন্বিত হইয়া ভাষা গঠনে সাহায্য করিয়া থাকে। প্রাদেশিক ভাষাকে সকল সময় লিখিত ভাষার অপভ্রংশ বিবেচনা করা প্রমাদকর। তাহারাও লিখিত ভাষার মত বহু স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাষা হইতে স্বাধীনভাবে মসলা সংগ্রহ করিয়া স্বাধীন ভাবেই গঠিত হইতেছে, ও লিখিত ভাষাকে পুষ্ট করিতেছে। লিখিত ভাষা তাহা অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ ভাষার অধিক

অনুকরণ করিয়াছে (যথা—বাঙ্গালা সংস্কৃতের, উর্দ্দু পার্সীর, মারহাট্টি প্রাকৃতের অধিক অনুকারী) কথিত ভাষাও যদি সেই শ্রেষ্ঠ ভাষার অনুকরণ কিঞ্চিৎ পরিমাণেও করে তবে সেই কথিত ভাষাও লিখিত ভাষার কতকটা অনুরূপ হইয়া তাহারই অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হইবে। লিখিত ভাষা ও প্রাদেশিক কথায় যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই, তাহার আভাস পূর্ব্বেই দিয়াছি; এককালে ঢাকাই কথা আদর্শ লিখিত ভাষায় পরিণত হইয়াছিল, এবং তৎকালিক বহু পুঁথি শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু দিন দিন বঙ্গীয় পাঠককে উপহার দিতেছেন। "লিখিত ভাষার সঙ্গে কথিত ভাষার ব্যবধান সত্ত্বেও সে ব্যবধানের একটা সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম করিলে, লিখিত ভাষা মৃত হইয়া পড়ে ও তৎস্থলে কথিত ভাষা একটু বিশুদ্ধ হইয়া লিখিত ভাষায় পরিণত হয়" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)। সংস্কৃতের পর প্রাকৃতের একাধিপত্য ইহার উদাহরণ। প্রথম লিখিত ভাষার সৃষ্টিই কথিত ভাষা হইতে, এবং আজিও সে তাহা হইতে অবিরত খাদ্য সংগ্রহ করিয়া, কিঞ্চিৎ পরিমার্জ্জিত করিয়া স্ব-সদৃশ করিয়া লইতেছে মাত্র।

প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে একটা স্বীয় বিশেষত্ব থাকায় তাহা সকল প্রদেশের আয়ত্বাধীন হয় না। এজন্য সকল প্রাদেশিকতার সামঞ্জস্যের জন্য একটা লিখিত ভাষার মধ্যস্থ হওয়া আবশ্যক। চট্টলের অনেক কথা আমরা বুঝি না, আমাদের বহুকথা তাঁহাদের দুর্ব্বোধ্য। লিখিত ভাষার মধ্যস্থতায় আমরা পরস্পর মনোভাবের বিনিময় করিয়া থাকি। মুদ্রিত পুস্তকে আজকাল অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক কলিকাতার খাঁটি-নিজস্ব ভাষা ব্যবহার করিতেছেন; পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ নিজস্ব পেটারিকা খুলিয়া আসরে অবতীর্ণ হইলে বিরক্ত হইবার কারণ দেখি না। সত্য বটে কলিকাতা অন্যান্য সকল প্রদেশের অনুকরণীয় হইয়া উঠিলেও তাহার লিখিত ভাষায় পরিণত হইবার বিলম্ব আছে। লিখিত

নির্দ্দিষ্ট ভাষার সার্থকতা সম্বন্ধে জ্ঞানবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত চন্দ্র নাথ বসু মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গভাষার বর্ত্তমান অবস্থা' অভিধেয় পুস্তিকায় অনেক সদ্‌যুক্তি দেখাইয়াছেন, সে সকলের পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

ভারতে লিখিত ও প্রাদেশিক ভাষার সৃষ্টি বৈদিক রচনার কাল হইতেই আরম্ভ হইয়াছে! অধ্যাপক ম, মূলর কতগুলি প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়াছেন যে বহু প্রাচীন কালে সংস্কৃতই এদেশের কথিত ভাষা ছিল। প্রধান প্রমাণ এই—

হেকাটিয়স (৫৪৯-৪৮৬ খৃঃ পূঃ) ভারতবর্ষের অস্তিত্ব জ্ঞাত ছিলেন, এবং তাঁহার সিন্ধুনদ বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে সংস্কৃতই তাৎকালিক কথিত ভাষা ছিল।

আর্য্যগণ পঞ্জাবের নাম রাখিয়াছিলেন 'সপ্ত-সিন্ধবঃ,' তাহা পারস্য ভাষায় হইল হপ্তহিন্দু (জেন্দাবেস্তা)। (এ সম্বন্ধে ১৩০৮ সালের 'ভারতী'তে শ্রীযুক্ত মহাভারতী মহাশয় নানা কথা বলিয়াছেন)। তৎপরে তৎপ্রদেশ ও অধিবাসীর নাম হইল হিন্দু, এবং য়ুরোপে 'হ' লোপে হইল 'ইন্দুঃ' বা 'ইন্দুস্', তৎপরে ইণ্ডস্ বা ইণ্ডিয়া। (চীনে ইহার নাম হইয়াছিল ইন্‌তু বা ইণ্ডিকা, প্রমাণ হুয়েন্থসাঙের গ্রন্থ)।

হেরোডোটস্ Gandariori (গান্ধার) প্রদেশের উল্লেখ করিয়াছেন। এই গান্ধার নাম ১।১২৬।৭ ঋকেও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা বর্ত্তমান কান্দাহার।

Ktesias(৪০০ খৃঃ পূঃ) ইনি Darius I. ও Artaxaraxes Mnemonএর সভাসদ ছিলেন) সংস্কৃতের পরিচয় দিয়াছেন।

মেগাস্থিনিস্ (২৯৫ খৃঃ পূঃ) পালিবোথ্রা (পাটালিপুত্র) ও সান্দ্রকোট্টস (চন্দ্রগুপ্ত) প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া সংস্কৃতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। (For particulars see MaxMuller's Science of Language.)

যখন লিখন প্রথার সৃষ্টি হইল, তখন কথিত ভাষা লিখিত গণ্ডিবদ্ধ হইয়া একটা স্থায়িত্ব লাভ করিল, কিন্তু কথিত ক্রমসঞ্চরমান সংস্কৃত বিকৃত হইয়া লিখিত (ও পূর্ব্ব.. কথিত) সংস্কৃত হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িল। তখন ইহার নাম হইল প্রাকৃত, বা প্রকৃতিপুঞ্জ-কথিত। অতএব প্রাচীন ভারতের ভাষাকে দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

সংস্কৃত—(ক) বৈদিক সংস্কৃত; ব্রাহ্মণ, সূত্র প্রভৃতির জটিল অপরিপুষ্ট ভাষা, ১৫০০-১৩০০ খৃঃ পূঃ। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৩য় পৃষ্ঠা দেখ) যখন এই ভাষা আদিম অনার্য্যভাষার সহিত সংমিশ্রণে কথিত ভাষায় সহজ হইয়া আসিল, তখন তদপেক্ষা সহজোচ্চার্য্য ভাষার আবশ্যক হইল এবং এই আকাঙ্ক্ষায় গঠিত হইল (খ) পানিনায় সংস্কৃত ৩০০ খৃঃ পূঃ হইতে বর্ত্তমান কালের সংস্কৃত এই শ্রেণীভুক্ত।

"বোধ হয়, যে ভাষায় আদিম হিন্দুগণ কথা কহিতেন, বেদে ঠিক সেইরূপ ভাষাই রক্ষিত হইয়াছিল।* কিন্তু তৎপরে ভাষার শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা ও ব্যাকরণের সৃষ্টি হইতে কথিত ও লিখিত ভাষা স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই রামায়ণ, কালিদাস প্রভৃতির ভাষা ঠিক কথিত ভাষা বলিয়া স্বীকার করা যায় না।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)। লিখিতের সঙ্গে কথিত ভাষা পৃথক হইয়া পড়িয়া কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহার নিদর্শন সংস্কৃত নাটকাদিতে পাওয়া যায়। ক্রমশঃ "সংস্কৃতের আদর্শ লোকচক্ষু হইতে অন্তর্হিত হইল ও তৎস্থানে শিথিল প্রাকৃত রাজ সভায় প্রচলিত হইল।" (বঙ্গভাষা)। আবার বুদ্ধদেবের অনুজ্ঞাক্রমে পালিভাষা (প্রাকৃত) লিখিত ভাষায় পরিবর্ত্তিত হইয়া (২) প্রাকৃতকেই প্রভাবান্বিত করিয়া তুলিল। প্রাকৃতও দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে—(ক) অবৈয়াকরণিক প্রাকৃত। ইহার অপর

* "The language and dialect of India begin with the Sanskrit of the Vedas about 1500 B. C. Some are for placing it to an early date."—MaxMuller.

নাম অপভ্রংশ। ব্যাপ্তিকাল ২৫০ খৃঃ পূঃ—২০০ খৃষ্টাব্দ। যখন প্রাকৃত প্রথম লিখিত ভাষায় পরিণত হইতে আরম্ভ করিল, তখনই তাহার ব্যাকরণ প্রস্তুত হয় নাই, হইতেও পারে না। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ এই কথিত প্রাকৃত ভাষা অশোকের শেষ কালের লিপি সকলে প্রথম লিখিতরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছেন (৩য় খৃষ্টীয় শতাব্দী)। এই শেষ লিপিসকল ব্যাকরণের নিয়মাধীন নহে, পূর্ব্ব লিপিসকল বিশুদ্ধ সংস্কৃতে লিখিত। বোধ হয় সর্ব্বজনগোচরীভূত করিবার জন্য অশোকই প্রাকৃতকে লিখিত রূপ দিয়া, প্রাকৃতের সম্মান বাড়াইয়া দিয়া যান, পরে তদনুকরণে লিখিত প্রাকৃত সাহিত্য জন্মগ্রহণ করিতে থাকে। M Senart তাঁহার Journal Asiatique প্রাকৃত ব্যাকরণের কাল খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে প্রসিদ্ধ ব্যাকরণ-কার বররুচির কাল নির্ণয়ে কিঞ্চিৎ গোলযোগ ঘটে। এ বিষয়ে আমাদের বাক্‌বিতণ্ডার আবশ্যক করে না; বুদ্ধের মৃত্যু-সমকালে প্রাকৃত বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল; এ সময়ে তাহার যথেষ্ট প্রসার হওয়াতেই ব্যাকরণ প্রস্তুত হওয়াও অনুমান করা যাইতে পারে। অতএব তৎপরে আসিল (খ) বৈয়াকরণিক প্রাকৃত—পালি, জৈন, মাধবী, মহারাষ্ট্রী, গৌড়সেনী প্রভৃতি। ২০০ খৃষ্টাব্দ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ইহার ব্যাপকতা। যখন ব্যাকরণ সৃষ্ট হইয়া প্রাকৃতও নিয়মাধীন হইয়া পড়িল তখন সে আর পূর্ব্ববৎ কথিত ভাষা রহিল না। "কথিত ভাষা পূর্ব্বাপেক্ষা মৃদুভাব অবলম্বন করিল ও ব্যাকরণানুযায়ী প্রাকৃত হইতে বহুদূর হইয়া পড়িল।" (বঙ্গভাষা)। এই কথিত ভাষা হইতেই বোধ হয় বর্ত্তমান গৌড়ীয় ভাষা সকলের উৎপত্তি। "পূর্ব্বে ভারতের কথিত ভাষা মাত্রই বোধ হয় 'প্রাকৃত' সংজ্ঞায় অভিহিত হইত। এই বঙ্গভাষাকেও একজন প্রাচীন লেখক (রাজেন্দ্র দাস) প্রাকৃত সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন"। (বঙ্গভাষা)।

সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালার ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়া শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু অতি সুন্দর ভাবে দেখাইয়াছেন, এস্থলে তাহারই কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম, "যখন সংস্কৃতের সঙ্গে কথিত ভাষার প্রভেদ ঘটিল, তখন কথিত পালি ভাষা কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধ হইয়া লিখিত ভাষা হইয়া দাঁড়াইল। যখন পুনশ্চ প্রাকৃতের সঙ্গে কথিত ভাষার প্রভেদ বেশী হইল, তখন বর্ত্তমান গৌড়ীয় ভাষাগুলি কিঞ্চিৎ পরিশুদ্ধ হইয়া লিখিত ভাষায় পরিণত হইল"।

এইরূপে বঙ্গভাষার সৃষ্টি সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে বা তৎসমকালে হইয়াছে সন্দেহ নাই। এদেশে যখন আর্য্যগণ উপনিবেশ স্থাপন করিলেন তখন তাহাতে অনার্য্য আদিম অধিবাসীর ও পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সমূহের কত কথা আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল; তৎপরে মুসলমান রাজত্বকালে পার্সীর প্রভাব ও ইংরাজাধিকারে ইংরাজির প্রভাবে সেই ভাষা বহু পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান আকারে উপনীত হইয়াছে।

প্রাকৃত বৈয়াকরণেরা প্রাকৃতশব্দপুঞ্জের তিনটী বিভাগ করিয়াছেন—(১) তৎসম—যে সমস্ত বাক্য খাঁটি-সংস্কৃতের অনুরূপ; (২) তদ্ভব—যে সকল বাক্য সংস্কৃত হইতে গ্রহণ করিয়া প্রাকৃত নিয়মানুসারে কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। (৩) দেশী—দেশীয় চলিত কথা যাহা ব্যবহার দ্বারা ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়াছে।

Beams সাহেব বাঙ্গালাকে 'তদ্ভব' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন (Beams' Comparative Grammar), কিন্তু আমি ইহাকে কেবলমাত্র তদ্ভব না বলিয়া, ইহাতে প্রাকৃতের উক্ত ত্রিবিধ লক্ষণ ভিন্ন আরও একটি চতুর্থ লক্ষণ 'বিদেশী' আরোপ করিতে চাহি। এখনকার বাঙ্গালায় উক্ত চারিটি লক্ষণই বিদ্যমান আছে।

(১) তৎসম—যাহা খাঁটি-সংস্কৃত কথা। (২) তদ্ভব—যাহা সংস্কৃত হইতে গৃহীত হইয়া পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, যথা—হিন্দী, ব্রিজবুলি, মারাঠী,

উড়িয়া প্রভৃতির বহু কথা বাঙ্গালায় কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছে। (৩) দেশী—অনার্য্য আদিম অধিবাসী হইতে গৃহীত হইয়া যাহা আজিও রক্ষিত হইয়াছে এবং যাহা প্রদেশ বিশেষ, পরিবার বিশেষ বা ব্যক্তি বিশেষের উদ্ভাবনী শক্তিতে সৃষ্ট হইয়া কালক্রমে ভাষায় স্থানলাভ করিয়াছে। (৪) বিদেশী—যথা, বহু পার্সী ও ইংরাজি কথা ভাষায় ব্যবহৃত হইতেছে।

এহেন বঙ্গভাষার ব্যাকরণ খাঁটি সংস্কৃত হইতে পারে না, এবং সংস্কৃত নিরপেক্ষ হইয়া স্বাধীনও হইতে পারে না। এক্ষেত্রে উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইবে।

প্রত্যেক ভাষাকে প্রত্যেক জাতির প্রকৃতি, শিক্ষা ও চাল চলনের মানচিত্র বলা যাইতে পারে। জাতীয় ভাষা সেই জাতির বুদ্ধি, বিদ্যা, স্বভাব, প্রবৃত্তি এবং এমন কি সেই জাতিকে সমগ্রভাবে জানিবার প্রধান উপায়। প্রত্যেক ব্যক্তির কথা হইতে তাহার ব্যক্তিগত স্বভাব জ্ঞাত হইতে পারা যায়. যাহার যেরূপ স্বভাব সে সেই অনুযায়ী কথা জাতীয় ভাষা হইতে বাছিয়া লয়, এবং নিজের মনোমত বাক্য রচনা করিয়া ব্যবহার করে। এই রচিত বাক্য মুকুররূপে তাহার আন্তর-ব্যক্তিকে অর্থাৎ মনকে প্রতিফলিত করে। এক ব্যক্তির বাক্যের সহিত অপরের যেটুকু সাদৃশ্য থাকে, তাহা হইতে তাহাদের উভয়ের আন্তর সাদৃশ্য অনুমিত হয়, এবং এইরূপে সমগ্র জাতির বিশেষত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়।

কোন ভাষাই অমিশ্ররূপে পরিগণিত হইতে পারে না; প্রত্যেক ভাষাতেই অপর ভাষা হইতে গৃহীত শব্দ কিছু না কিছু পাওয়া যাইবেই; এই উভয়বিধ শব্দের নাম—সহজ ও গৃহীত বা দেশী ও বিদেশী, রাখা যাইতে পারে।

যখনই কোন জাতি অন্যবিধ ঋতুবিশিষ্ট দেশে উপনিবেশী হয়, বা

তাহাদের মধ্যে বিদেশীয়ের প্রচুর সংমিশ্রণ ঘটে, কিংবা রাজনৈতিক, ধর্ম্ম বা কোন বিশিষ্ট সমাজবিপ্লবদ্বারা নূতন দ্রব্য, বিষয়, অবস্থা, চিন্তা বা কার্য্যের সহিত পরিচয় ঘটে, তখনই মানসিক ভাব প্রকাশের জন্য পুরাতন ভাষা সঙ্কীর্ণ বোধ হয়, এবং নূতন নূতন শব্দ ধার করা বা গঠন করা আবশ্যক হইয়া পড়ে; কিংবা কোন পুরাতন কথাকে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া নূতন অর্থে প্রয়োগ করিতে হয়; এরূপস্থলে সমগ্র জাতি যদি ঐ অভাব অনুভব করে, তবে অতি শীঘ্রই ঐ সকল শব্দ গ্রাহ্য ও চলিত হইয়া যায়।

যখন বিজ্ঞান, রসায়ণ বা গণিতশাস্ত্রে কোন দ্রব্য বা প্রক্রিয়ার নূতন আবিষ্কার করে, তখন তদ্বোধক কোন নূতন শব্দ সৃষ্টির আবশ্যক হয়। এই সমস্ত বিশেষ শব্দ ক্রমে শিক্ষিতমণ্ডলীদ্বারা ভাষা-প্রবিষ্ট হইয়া বহু বিস্তৃত ও পরিচিত হইয়া পড়ে। দেশজ ধাতু হইতে শব্দ গঠন বাঙ্গালায় প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে; পরিভাষা সৃষ্টির জন্য দেশে যে আন্দোলন চলিতেছে তাহার ফলে বঙ্গীয় ধাতু হইতে নূতন শব্দ গঠন প্রণালী পুনর্জীবিত হইবে আশা করা যায়।

পরিচিত নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যেরও নাম যে মধ্যে মধ্যে কেন নূতন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, তাহা সচরাচর স্থির করা সহজ নয়। দেখা যায়, আমরা কোনও ব্যক্তি বা বস্তুর সহিত অত্যধিক পরিচিত হইয়া পড়িলে, তাহাদের নাম ত্রস্ত ও অসতর্কভাবে, এবং কখন বা বিকৃত করিয়াও উচ্চারণ করিয়া থাকি; পুত্র, ভৃত্য প্রভৃতিকে অনেক সময় এইরূপে ডাকা হয়। এই পরিবর্ত্তন দ্বারা ক্রমে লিখিত ও কথিত ভাষার স্বাতন্ত্র্য সূচিত হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। বহু ব্যবহার দ্বারা অনেক শব্দ ক্রমশঃ তাহাদের রূপ ও অর্থ কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া ভিন্নরূপ ও ভিন্নার্থক হইয়া পড়ে; কখন বা অর্থশূন্য হইয়া নিরর্থক হইয়া যায়। অর্থের এইরূপ পরিবর্ত্তনে প্রায় মন্দের প্রতিই প্রবণতা দৃষ্ট হয়।

অল্প প্রচলিত, উচ্চভাবব্যঞ্জক শব্দ ক্রমশঃ সাধারণ হইতে সামান্যার্থক হইয়া পড়িতে দেখা যায়। এই অর্থবিকৃতি জাতীয় আদর্শ বা ভাব বা চারিত্র বিকৃতির ইতিহাসরূপে গণ্য হইতে পারে। 'ভদ্র' শব্দ ইহার একটি উদাহরণ। ভদ্র=ভন্দ্+র, অর্থাৎ যাহাকে দেখিয়া প্রীত হওয়া যায়; প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে এই অর্থে ইহার ভূরি প্রয়োগ দেখা যায়,—সে সকল স্থলে ইহা স্নেহাস্পদের প্রতিই অধিক প্রযুক্ত দেখা যায়। তৎপরে সকলের প্রতিই ইহার প্রয়োগ চলিতে লাগিল; এই সময়ে ভারত উন্নতাবস্থায় ছিল, সেইহেতু যাঁহারা সৎকর্ম্মী, সুশীল, গুণশালী তাঁহারাই কেবল ভদ্র অর্থাৎ প্রীতিপ্রদ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে লাগিলেন। তৎপরে গুণ অপেক্ষা অর্থের অধিক আদর হইল, এবং এক্ষণে ত' পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইলেই 'ভদ্র' হওয়া যায়। এককালে এই শব্দ এত শূন্যার্থক হইয়াছিল যে নাটকের সূত্রধার ও নটের সম্বোধনে ব্যবহৃত হইত। এই শূন্যতা কি জাতীয় চরিত্রের শূন্যতা জ্ঞাপন করে না? 'মাহিনা' অর্থে মাসিক বেতন; কিন্তু অবশেষে যখন ঐ শব্দে সকল প্রকার বেতনই বুঝাইতে লাগিল, তখন শুভঙ্করকে মাসিক বেতন বুঝাইবার জন্য 'মাস মাহিনা' লিখিতে হইয়াছে।

বিদেশীয় ভাষার গ্রন্থানুবাদ দ্বারা বহু নূতন শব্দ ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। প্রত্যেক জাতির ভাষাই যে কেবল পৃথক তাহা নহে; তাহাদের ভাব, চিন্তা প্রণালী, রুচি ও স্বভাবও স্বতন্ত্র; এবং তাহাদের ভাষাও সেই সকল প্রকাশের উপযোগী হইয়া গঠিত; অপর কোন জাতির কোন নূতন কথা বা ভাব অনুবাদের সময় অনুবাদককে হয় সেই কথাটিই নিজভাষায় লইতে হয়, আর নয় ত নিজভাষার ধাতুপ্রত্যয় যোগে একটী নূতন শব্দ গঠন করিতে হয়। এই গঠিত বা গৃহীত কথা ক্রমে সর্ব্ব ব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে।

সম্ভবতঃ ইহাদের অধিকাংশই বিদেশীয় ভাষা হইতে কল্পিত: কারণ

সামাজিক নূতন উদ্দেশ্য বা অবস্থা প্রায়ই ভিন্ন জাতির সংশ্রবে ঘটিয়া থাকে, আপনা আপনি হইতে প্রায়ই দেখা যায় না, নূতন কথার প্রচলনে পুরাতনের বিনাশ ঘটে।

বাঙ্গালী চিরকাল অ-তৎপর; তাহার ভাষায় কাজেকাজেই punctuality বোধক কোন শব্দ নাই। 'তৎপরতা' বা 'নিষ্ঠা' শব্দ দ্বারা punctualityর প্রকৃত অর্থ বা spirit টুকু হৃদয়ঙ্গম হয় না। ভারতীয় অন্যান্য ভাষায় ইহার সমার্থক কোন শব্দ আছে কিনা, তাহা সুধীগণের অনুসন্ধাতব্য।

বহু শব্দ পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত না, পরবর্ত্তী কালে প্রচলিত হইয়াছে, এবং বহু শব্দ প্রচলিত ছিল এক্ষণে লোপ পাইয়াছে দেখা যায়। ইহা দ্বারা ঐ ঐ ভাবের বিকাশ ও বিনাশ কবে, কি করিয়া হইল জানা যায়। এই সকল শব্দ সঙ্কলনে সাহায্য করিতে যদি কেহ অগ্রসর হয়েন, বঙ্গ-ভাষা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।

প্রজ্ঞা, নীতি ও ধর্ম্মের উৎকর্ষবোধক উপযুক্ত বাক্য ভাষায় থাকিলে সেই জাতিকেও ঐ ঐ বিষয়ে উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিতে হইবে। যে ভাষায় উচ্চ ও মহৎ অর্থবাচক শব্দ পাওয়া যায়, সে জাতির মধ্যে ঐ সব গুণ বর্ত্তমান বা অবসরাভাবে ছন্নাবস্থায় আছে বুঝিতে হইবে। ফরাশীগণ বলিতে চাহেন যে, তাঁহাদের ভাষায় ঘুস অর্থে কোন শব্দ ছিল না, অতএব তাঁহাদের মধ্যে পূর্ব্বে ঐ পাপও অজ্ঞাত ছিল। সংস্কৃত 'উৎকোচ' শব্দ বাঙ্গালায় প্রচলিত নহে, 'ঘুষ' প্রচলিত। 'ঘুষ' শব্দের উৎপত্তি কবে, কোথা হইতে হইল তাহার অনুসন্ধান কর্ত্তব্য।

মানুষের প্রকৃতিভেদে ভাষাভেদ ঘটে। এই প্রকৃতিভেদ বহির্জ্জগতের ক্রিয়া ও ক্ষমতার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। মানুষ যেজন্য দেশভেদে কৃষ্ণ বা গৌর, দীর্ঘ বা খর্ব্ব, বলিষ্ঠ বা দুর্ব্বল, সাহসী

বা ভীরু, বাচাল বা মিতবাক্ হয়, দেশভেদে ভাষাভেদও সেই সেই কারণে হইয়া থাকে।

দেশভেদেরও আবার ক্রমানুযায়ী তারতম্য আছে। এমন কি এক বাড়ীর দুইজনের ভাষাও কখন ঠিক একরূপ হয় না, কিছু না কিছু পার্থক্য বা বিশেষত্ব থাকেই থাকে। ইহার কারণ মানবচিত্তের বহুরূপিত্ব।

জয়, বিদেশ গমন, ধর্ম্ম ও কুসংস্কারও অনেক সময় প্রাদেশিক ভাষাসৃষ্টির সহায়তা করে। যেস্থানে সামাজিক শিক্ষিত নেতার সংখ্যা অত্যল্প হয়, সেখানে নানা প্রাদেশিক ভাষা মাথা তুলিয়া উঠে। বৌদ্ধকালে সর্ব্বগ্রাহ্য সংস্কৃত স্থানে পালি প্রভৃতি ভাষার প্রসার হইয়াছিল। একই দেশে বিভিন্ন ভাষায় অস্তিত্ব রাজনৈতিক একতা পক্ষে বিশেষ অন্তরায়; ভাষার একতা ধর্ম্ম বা রাজার একত্ব হইতে অধিক কার্য্যকরী। আমরা ভারতবাসী, এক ইংরাজ রাজার প্রজা, অধিকাংশ সমধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও পরস্পর ঘনিষ্ঠ নহি। অথচ কলিকাতাবাসী ও ফরাশডাঙ্গাবাসী, বা বাঙ্গালী হিন্দুমুসলমানের মধ্যে যথেষ্ট সম্প্রীতি ও এক-প্রাণতা দেখিতে পাওয়া যায়; ইহার একমাত্র কারণ ভাষা। এবং এই ভাষাভেদে কি সামাজিক, কি নৈতিক, কি রাষ্ট্রীয় সর্ব্বপ্রকার উন্নতিরই তারতম্য লক্ষিত হয়। বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী পার্সী, মান্দ্রাজী বিভিন্নক্রমে উন্নত হইতেছে। আমরা আট কোটি বাঙ্গালী উন্নতির পথে আমাদের প্রতিবাসী উড়িষ্যাকে টানিয়া তুলিতে পারি নাই, মধ্যে ভাষার প্রতিবন্ধক পড়িয়া তাহাদিগকে অপরদিকে টানিয়া রাখিয়াছে। প্রকৃতিগত সাদৃশ্য না থাকিলে সমভাষা হইতে পারে না। ভারতকে "পৃথিবীর ক্ষুদ্র অনুরূপ (miniature world)" বলা হইয়াছে, অর্থাৎ এখানে সর্ব্বপ্রকার দেশ ও জলবায়ু বর্ত্তমান; এখানে প্রবল শীত ও প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, তৃণমাত্রশূন্য মরু ও সুজলা সুফলা শস্য-

শ্যামলা ভূমি, বন্ধুর পার্ব্বত্য ও সমতল সামুদ্রিক প্রদেশ বর্ত্তমান; তাই ভাষারও এত পার্থক্য ও প্রাচুর্য্য। একত্রিত ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়রলণ্ডে এক ইংরাজি ভাষাই প্রাদেশিক ভেদে ব্যবহৃত, চীন রাজ্যখণ্ডে চৈন ভাষারই একাধিপত্য, কিন্তু ভারতে উনিশ রকম সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাষার প্রচলন ইহাই আমাদের অবনতির প্রধান কারণ।

এক রাজ্যতন্ত্রের অধীন থাকিয়া লিখিত ভাষার উন্নতি হইলে প্রাদেশিকতার বাঁধ শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায়। ইংরাজীর অনুশীলন আমাদিগকে 'নেশন' করিবার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে। আমাদের বড় অভাবের সময় ইংরাজকে ঈশ্বর এদেশে লইয়া আসিয়াছিলেন।

বিভিন্ন জাতি প্রত্যেকে জগৎকে যেরূপভাবে দেখিয়াছে ও বুঝিয়াছে তাহাদের প্রত্যেকের ভাষাও তদ্রূপ হইয়াছে। এই জন্যই ভাষা প্রত্যেক জাতির সর্ব্বোত্তম ইতিহাস। চীন সাম্রাজ্যের সমস্ত লিখিত ইতিহাস ধ্বংশ হইয়া যাওয়ার পর, ভাষা হইতে ইতিহাসের কণিকা সংগ্রহ করিয়া ইতিহাস বিরচিত হইয়াছে। প্রাকৃতিক ঘটনা ও তাহাদিগের সহিত জগতের ও নিজেদের সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য আদিম মনুষ্য যে রূপকের আশ্রয় লইয়াছিল তাহাই mythology.

প্রত্যেক জাতির বাগ্‌যন্ত্র স্থানীয় জলবায়ু, প্রাকৃতিক অবস্থা, প্রধান খাদ্য, জাতীয় স্বভাব এবং পুরুষানুগত বিশেষত্ব বশে গঠিত হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উচ্চারণের সৃষ্টি করিয়া থাকে, যে বাহ্য অবস্থার দ্বারা একটি সমাজের সমত্ব (unity) বুঝা যায়, সেই বাহ্য অবস্থাই সেই সমাজের উচ্চারণের সমত্ব স্থির করিয়া দেয়; এবং সেই উচ্চারিত শব্দ সকলের সমষ্টিই সেই সমাজের ভাষা। শাব্দিক উচ্চারণের সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন হয়, এবং এই পরিবর্ত্তন, অবস্থা ও প্রাকৃতিক নিয়মবশেই হয়, স্বেচ্ছায় কদাচিৎ ঘটে।

ভাষা মানব মনের প্রকাশক; মানসিক ভাব সদা পরিবর্ত্তনশীল ও চলিষ্ণু; এজন্য তৎপ্রকাশক ভাষাও পরিবর্ত্তনশীল ও চলিষ্ণু। বাক্‌যন্ত্র, ঋতু ও খাদ্যাদির পরিবর্ত্তনে কিংবা মানুষের স্বভাবিক আলস্য প্রবণতা হইতেও ভাষা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। আর একটি কারণ অনুকরণ—বাক্য, শব্দ, এবং এমন কি ব্যাকরণ পর্য্যন্ত এক জাতীয় ভাষা হইতে অন্য জাতীয় ভাষায় গৃহীত হইয়া থাকে। সভ্যজাতির ভাষা অমিশ্র নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই সমস্ত ঋণপ্রাপ্ত শব্দ হইতে জাতির পরস্পর নৈকট্য ও অভাবের ইতিহাস পাওয়া যায়। ঋণী ভাষার কোন অনুরূপ শব্দের সহিত সাদৃশ্য রাখার জন্য অনেক সময় ঐই ঋণপ্রাপ্ত শব্দ সকলের বাহ্য আকার এবং এমন কি অর্থেরও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। অসংশ্লিষ্ট জাতি অপেক্ষা যে সকল জাতি অপর জাতির সংশ্রবে আসে, তাহাদেরই ভাষায় শব্দ ক্ষয়ের সম্ভাবনা অধিক।

সাধারণত্ববাচী শব্দ কখন কখন বিশেষ অর্থ প্রাপ্ত হয়, এবং তদ্বিপরীত। মৃগ অর্থে পূর্ব্বে পশুমাত্রকেই বুঝাইত (ইংরাজি Deer শব্দও এইরূপ), কিন্তু এক্ষণে তাহাতে বিশেষ জন্তু সংজ্ঞিত হইতেছে। এইরূপ শব্দ ও অর্থের ক্ষয়দ্বারা ভাষার প্রাচীনত্ব জানা যায়। লিখিত অপেক্ষা কথিত ভাষায় শাব্দিক ক্ষয়ের সম্ভাবনা অধিক। এ সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা পূর্ব্বে করিয়াছি।

যদি কোন অসভ্যজাতি (যথা—গথ, ভাণ্ডাল, শক, হুন প্রভৃতি) কোন সভ্যদেশ জয় করে বা অল্পসংখ্যক বিজেতা বহুজিতদিগের মধ্যে বাস করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে জেতা বিজিতের ভাষা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। মুসলমানেরা জিতদেশকেই আপনার স্বদেশ করিয়া লইতেন, এজন্য তাঁহারা বহুসংখ্যক হইলেও দেশীয় ভাষা ও আচার ব্যবহার অনেক পরিমাণে নিজস্ব করিয়া লইতে বাধ্য হইতেন; এবং

অপর পক্ষে বিজিতগণও জেতার ভাষা হইতে বহু শব্দ চয়ন করিয়া স্বকীয় ভাষার পুষ্টি করিত। এইরূপে প্রসিদ্ধ উর্দ্দু ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। উর্দ্দু নামের ইতিহাস প্রসিদ্ধ 'বাগ্ ও বাহার' গ্রন্থে (আমির খসরুর 'চাহার দরবেশ' নামক পারস্যগল্পের উর্দ্দু অনুবাদ) এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

মুসলমান বিজয়ে হিন্দু মুসলমানের কথার কিঞ্চিৎ সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। আমির তৈমুরের বিজয়ের পর সৈন্যদিগের বাজার (যাহাকে উর্দ্দু বাজার বলিত) সহরে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং সহরের বাজারেরও নাম 'উর্দ্দু বাজার' হইল। তৎপরে সম্রাট আকবরের রাজ্যকালে তাঁহার সুনামে আকৃষ্ট হইয়া নানা দিগ্দেশ হইতে নানা জাতীয় লোক রাজধানীতে সমবেত হইয়া ক্রয় বিক্রয় ও কথোপকথনে এক নূতন মিশ্রভাষার সৃষ্টি করিল, তাহারই নাম হইল 'উর্দ্দু' ভাষা*

ইংরাজের আগমনে নূতন ভাষা সৃষ্টি না হইয়া বরং বিভিন্ন ভাষার একীকরণ হওয়ার সম্ভাবনা হইয়াছে। সভ্যতার বিস্তারে ভাষার অল্পতা ও প্রাদেশিকতার বিনাশ হয়। ইহা হইতে অনেকে অনুমান করেন যে কালে যখন সমস্ত জগতে সভ্যতা সর্ব্বোচ্চ পদবীতে আরূঢ় হইবে তখন সমগ্র জগতের ভাষাও একমাত্র হইবে। কিন্তু দেশ কাল ঘটনা সমান না হইলে প্রত্যেক জাতির উন্নতি ও স্বভাব একেবারে সমান হইতে পারে না; এবং সেই কারণেই সার্ব্বজাতিক সাধারণ ভাষাও বুঝি অসম্ভব।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

* ইংরাজ পণ্ডিতেরা বলেন উর্দ্দু দ্বাদশ শতাব্দীতে গঠিত হইয়াছিল। উপরের বর্ণনার সহিত সময়ের পার্থক্য হইতেছে মাত্র। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সময় নির্দ্ধারণের কোন আবশ্যকতা নাই।

শীতের পল্লী

(চিত্র ।)

ডিসেম্বর মাস পড়িতে না পড়িতে এবার আমাদের পল্লী অঞ্চলে বড় শীত পড়িয়াছে, কলিকাতায় বসিয়া সে শীতের মাধুর্য্য অনুভব করা দুরূহ। যদি এ সময় কাহারও শীত উপভোগের বাসনা থাকে, তাহা হইলে নগর ছাড়িয়া তাঁহাকে বঙ্গের কোন সভ্যতা-বিরল পল্লীবক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ দিই।

শীতকালের দীর্ঘরাত্রি লেপের কোমল অন্তরালে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া স্নেহময়ী নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে রজনী অতিবাহিত হইল। অতি প্রত্যূষে আমার শির-প্রান্তবর্ত্তী বাতায়ন খুলিয়া দিলাম, দেখিলাম চতুর্দ্দিক পরিষ্কার হইয়াছে, কিন্তু ঘন কুয়াসা ভেদ করিয়া দূরের বস্তু ভাল করিয়া দেখা যায় না, কে যেন আকাশ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গে সাদা থান মুড়িয়া দিয়াছে। এমন সময় শয়ন করিয়া থাকা কষ্টকর বিবেচনা করিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিলাম, বাড়ীর সম্মুখ দিয়াই রাজপথ—পথ জনশূন্য। প্রাঙ্গনে শেফালিকার একটী গাছ, দেখিলাম টুপ্‌টাপ করিয়া লোহিত-বৃন্ত শুভ্র ফুলগুলি শাখাভ্রষ্ট হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, বৃক্ষের পাদদেশ ফুলে ফুলে ভরিয়া গিয়াছে, পাড়ার কয়েকটী মেয়ে গায়ে দোলাই জড়াইয়া ফুল কুড়াইতেছে, ফুলের ভাগ লইয়া কলহ করিতেছে, পরস্পরকে গালাগালি দিতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ পরস্পরে ভাব করিয়া নিজ নিজ ছেলে মেয়ের (মাটির পুতুল) বিবাহ প্রস্তাব পাকা করিতেছে। এই দারুণ শীতে ইহাদের শেফালিকা পুষ্প সংগ্রহে আপত্তি নাই, ইহারা পুষ্প সংগ্রহ করিতেছে, কারণ শেফালিকার বৃন্তগুলি চয়ন করিয়া তাহা রৌদ্রে শুকাইয়া, তদ্দ্বারা

ইহারা কাপড় রঙ্গ করিবে। এক পয়সার রঙ্গ কিনিলে অনায়াসে যে-কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, তাহাই করিবার জন্য ইহারা এত শীতের মধ্যে প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে পুষ্প সংগ্রহ করিতে আসে। একথা ভাবিয়া বৈষয়িক লোকের মুখে হাস্যের সঞ্চার হইতে পারে, কিন্তু প্রতিদিন প্রভাতে পাখী না ডাকিতে, সূর্য্য না উঠিতে, বেত্র-নির্ম্মিত পাত্রে এইভাবে পুষ্প সঞ্চয় করিয়া, ইহারা—পল্লীগামের এই সকল শ্রমজীবি-তনয়া, যে আনন্দ লাভ করে, যে তৃপ্তিতে তাহাদের সুকোমল শিশুহৃদয় ঐ প্রস্ফুটিত শেফালিকাদলের ন্যায়ই বিকশিত হইয়া উঠে, জ্ঞানবৃদ্ধ সমালোচক সম্প্রদায়ের তাহা লাভ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই।

এই সকল দার্শনিক তত্ত্বের সমালোচনা করিতে করিতে প্রাঙ্গনস্থিত চামেলি কুঞ্জের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম, দেখিলাম শুভ্র চামেলি ফুটিয়া গাছ আলো করিয়া রহিয়াছে; সেফালির মৃদুগন্ধের সহিত তাহার গন্ধ মিশিয়া মিশ্রসৌরভরাশি নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিতেছিল, এবং তাহা যেন শীতের জড়তা দেহের প্রতিগ্রন্থি হইতে খসাইয়া দিতেছিল। বাগানের দিকে চাহিয়া দেখিলাম সূর্য্যমুখী তরুণ সূর্য্যের অভিনন্দনের জন্য পূর্ব্বদিকে চাহিয়া আছে, রাশি রাশি স্থূল স্থলপদ্ম ফুটিয়া বাগানের এক অংশ শোভাময় করিয়াছে, তাহাদের সুবিস্তীর্ণ পত্র হইতে শিশির বিন্দু অবিরল ধারে ঝরিয়া পড়িতেছে, এক পাশে লাল করবী কুঞ্জ—গুচ্ছ গুচ্ছ করবী ফুটিয়া রহিয়াছে। তাহাদের পদতলে নীলবর্ণ অপরাজিতা সবুজ পাতার ভিতর হইতে আপনার বর্ণ-গৌরব প্রকাশ করিতেছে; বড় বড় লাল গোলাপ রাঙ্গা আঁখি মেলিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া আছে এবং বকফুলের গাছে থোকা থোকা বকফুল ফুটিয়া ধরণীর পুষ্পগুলির দিকে যেন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বিস্তার পূর্ব্বক বলিতেছে—দেখ আমরা কত উচ্চকুল অলঙ্কৃত করিয়া ফুটিয়াছি, দুই হাত উর্দ্ধে তুলিয়াও কেহ আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না।

এ অহঙ্কার বুঝি বিধাতার সহ্য হইল না, দেখিলাম বাচস্পতি দাদা নামাবলীতে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া—অস্ফুটস্বরে সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করিতে করিতে বামহস্তে একটী সাজি ও দক্ষিণহস্তে একটী অনতিদীর্ঘ আঁকুশি লইয়া সেই বকবৃক্ষমূলে সমাগত হইলেন। দেখিতে দেখিতে ফুলে তাঁহার সাজি ভরিয়া উঠিল, তখন তিনি বাগান হইতে আরও কতকগুলি অন্য পুষ্প সংগ্রহ করিয়া প্রফুল্ল মনে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

বিহঙ্গদল এতক্ষণ তরুশাখায় কূজন করিতেছিল, ক্ষুধিত কাকের দল ঘরের চালে বসিয়া কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করিতেছিল, এবং একটা দহিয়াল বাঁশের অগ্রভাগে বসিয়া সুস্বরে গান করিতেছিল। প্রাতঃ-সূর্য্যের কিরণ কুহেলিকার ঘন যবনিকা ভেদ করিয়া তখনও ধরাতল স্পর্শ করিতে পারে নাই। রাজপথে তখনও লোকের সমাগম হয় নাই। র‍্যাপারে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িলাম।

অপ্রশস্ত ধূলাবর্জ্জিত ক্ষুদ্র গ্রাম্যপথ, মিউনিসিপালিটীর রাবিসের ভারে তাহা কোন দিন ভারাক্রান্ত হয় নাই। পথের দুই পাশে তরু, লতা, গুল্ম, বাঁশের গাছ, খেজুর গাছ, বন হলুদের জঙ্গল, একটু দূরে আম কাঁঠালের বাগান। দেখিলাম, এই নিদারুণ শীতের মধ্যেও একজন গাছি প্রায় অনাবৃত দেহে খেজুর গাছে উঠিয়া রস সঞ্চয়ার্থ বৃক্ষকণ্ঠ-সংলগ্ন কলসগুলি পাড়িতেছে। পথের উপর 'বাঁক', বাঁকের দুইদিকে রজ্জুবদ্ধ আট দশটি কলস; অতি প্রত্যুষে উঠিয়া গাছ হইতে সে এই কলসগুলি পাড়িয়াছে এবং সমস্ত রস দুইটি স্বতন্ত্র কলসে ঢালিয়া তাহা পূর্ণ করিয়াছে। এই রসে গুড় প্রস্তুত হইবে।

আমার বাম পার্শ্বে পথের উপরই একটা খেজুর গাছ, তাহার কণ্ঠে তখনও কলসি বাঁধা আছে। কলসটি যেখানে বাঁধা আছে সে স্থান মাটি হইতে দুই হাত উচ্চ হইতে পারে, একটা বেজী রসাস্বাদনের লোভে সেই কলসের মুখে উঠিয়াছিল, আমাকে দেখিয়া দ্রুত নামিয়া

গেল। দেখিলাম, একটা মানকচুর পাতা কলসের মুখে প্রহরীর ন্যায় দণ্ডায়মান আছে। কলসির ভিতর মানকচু থাকিলে সে কলসির রস চুরি যাইবার ভয় নাই। রাত্রে যদি কেহ চুরি করিয়া তাহা পান করে, তাহা হইলে মুখ ফুলকাইয়া তাহাকে তিনদিন ছুটিয়া বেড়াইতে হয়,—এ শাসন পিনাল কোডের শাসন অপেক্ষা গুরুতর,—এ চুরীর দণ্ডের আপাল নাই।

প্রথমেই গোপ পল্লীতে প্রবেশ করা গেল। সঙ্কীর্ণ পথের উভয় পার্শ্বে এই পল্লী অবস্থিত। বৃক্ষাদি পরিবেষ্টিত পর্ণ কুটিরগুলি বৃহৎ না হইলেও প্রত্যেক গৃহস্থের প্রাঙ্গনটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত, এই প্রাঙ্গনে অনেকখানি স্থান বাঁশ দিয়া শক্ত করিয়া ঘেরা, ইহাই খোঁয়াড়, গোয়ালাদের গরুগুলি এখানেই প্রধানতঃ রাত্রিকালে আবদ্ধ থাকে। খোঁয়াড়ের পাশে একখানি চালা ঘর, অধিকাংশ ঘরই কঞ্চির বেড়া দ্বারা পরিবেষ্টিত, সেই বেড়া মাটি দিয়া লেপা; কোন কোন অট্টালিকার মধ্যে অতি দুর্গম অংশে যেমন চোর কুঠুরী থাকে—অথবা সেকালে থাকিত, সেইরূপ এই কঞ্চির বেড়া বেষ্টিত গোয়াল ঘরের মধ্যে আর একটা কুঠুরী, রাত্রে অনাবৃত খোঁয়াড়ে পয়স্বিনী গাভীগুলিকে রাখিলে এই পৌষের প্রচণ্ড শীতে পাছে তাহাদের দুগ্ধের অল্পতা ঘটে এই ভয়ে দুগ্ধবতী গাভীগুলিকে খোঁয়াড়ের ভিতর না রাখিয়া সেই ঘরের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের বাছুরগুলি সেই ক্ষুদ্র কুঠুরিটির মধ্যে আবদ্ধ আছে। প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া বৎসগুলি মাতৃস্তন্য পানের জন্য কাতর ভাবে ব্যা ব্যা করিয়া ডাকিতেছে; তাহাদের জননী দুগ্ধভারে উধঃস্ফীত করিয়া দীন নেত্রে সেই ক্ষুদ্র কুঠুরীটার দিকে চাহিতেছে,—তাহার সন্তান-অদর্শন জনিত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিবার জন্য 'হাম্বা, হাম্বা' করিয়া ডাকিতেছে; কিন্তু আর্ত্তনাদ করিয়া কোন ফল নাই, গোয়ালিনী জানে এত সকালে বাছুর ছাড়িলে দুধ কম

হইবে, বেলা নয় ঘটিকার পূর্ব্বে তাহার দুধের কেঁড়ে দুধে পূর্ণ হইবে না।

এখনও কুয়াশা কাটিয়া রোদ উঠে নাই। গরুগুলা, দুই চারিটা বলদ ও মহিষ খোঁয়াড়ের মধ্যে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছে, কোন কোনটা বসিয়া বসিয়া রোমন্থন কার্য্যে নিযুক্ত দুই একটা শালিক পাখী কোন গরুটার স্কন্ধে উপবেশন করিয়া তাহার কর্ণমূলের কীট ভক্ষনপূর্ব্বক পরোপকারে প্রবৃত্ত। ঘোষাণী একটা বড় ঝুড়িতে খোঁয়াড়ের গোময় সংগ্রহ করিয়া এক স্থানে স্তূপাকারে রাখিতেছে, যে স্থানটিতে তাহা রক্ষিত হইতেছে—সেখানে গোময়ের একটী ক্ষুদ্র গিরি গোবর্দ্ধন সৃষ্টি হইয়াছে। গরুগুলিকে শীতের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ঘোষ খোঁয়াড়ের ভিতর দুই তিন স্থানে 'সাঁজাল' করিয়াছে। কতকগুলি কাঠ, বাঁশ বা ঘুঁটে একত্র করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে, কোথাও বা তুষ জ্বলিতেছে—ইহাই সাঁজাল। ধূমে চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, প্রভাতের গাঢ় কুয়াশাকে গাঢ়তর করিয়া তুলিয়াছে। ঘোষেরা গিঁটে কল্কেয় দা-কাটা মোটা তামাক সাজিয়া তাহাতে সাঁজালের আগুন স্থাপন করিতেছে, এবং সাঁজালের পার্শ্বে বসিয়া বহ্নি-সেবন করিতে করিতে তিন পয়সা দামের ডাবা হুঁকাতে সেই তাম্রকুট ধূম্র পরম পরিতৃপ্তি ভরে উদরস্থ করিতেছে। গাত্রে ময়লা নেকড়া জড়ান দুই তিনটী ছেলে মেয়ে সেই সাঁজাল বেষ্টন করিয়া বসিয়া অগ্নিতে হাত পা শেঁকিতেছে, কেহ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে, কেহ কোঁচড়ে এক কোঁচড় মুড়ী লইয়া এক এক থাবা করিয়া তাহা মুখ-গহ্বরে নিক্ষেপ করিতেছে। ঘরের পাশে ছাই গাদায় একটা কুকুর কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া আছে।

অনেক বেলায় রৌদ্র উঠিল, কুয়াসা ধীরে ধীরে কাটিয়া যাইতেছে; গোপপল্লী ছাড়াইয়া বাগ্দী পাড়ায় প্রবেশ করিলাম। প্রকাণ্ড তেঁতুল

গাছ, বৃক্ষতল সুপরিচ্ছন্ন, [illegible]নে বাগ্দীরা খেজুরে গুড়ের 'বাইন' করিয়াছে। বৃক্ষ ছায়ার অনেকখানি স্থান খর্জ্জুর পত্রের বেড়া দিয়া ঘেরা, সেখানে বড় বড় দুটি উনন খুঁড়িয়া বাগ্দীরা প্রকাণ্ড 'খোলায়' খেজুর রস জ্বাল দিতেছে; যেমন খোলা তেমই উনন, মাটিতে গর্ত্ত কাটিয়া, এই উনন প্রস্তুত হইয়াছে, কাল কাসিন্দা, আশ্শাওড়া, ভাঁট প্রভৃতি আগাছা উননের চতুর্দ্দিকে স্তূপাকারে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা দিয়াই উননে জ্বাল দেওয়া হইতেছে। চট্‌পট্ করিয়া শব্দ উঠিতেছে, খোলায় রস ফুটিতেছে। অনেকে ঘটি লইয়া 'তাত রসা'র জন্য দাঁড়াইয়া আছে। রস একটু ফুটিয়া উঠিলে তাহাকেই 'তাত রসা' বলে। পল্লীগ্রামের নিম্নশ্রেণীর অনেক লোক এই উত্তপ্ত খর্জ্জুর রসের পক্ষপাতী। কতকগুলি ছেলে উননের কাছে বসিয়া জটলা করিতেছে, কেহ কেহ উভয় বাহু বিস্তার করিয়া বহ্নি সেবন করিতেছে। গলায় দড়িবাঁধা কতকগুলি ছোট ছোট কলস উননের এদিক ওদিকে গড়াগড়ি যাইতেছে। প্রভাতে তাহারা এই ভাবে গড়াগড়ি যায়, এবং সন্ধ্যার সময় খর্জ্জুর বৃক্ষের স্কন্ধে আরোহনপূর্ব্বক রস সঞ্চয় করে।

ছোট ছোট ঘর, মাটির দেওয়াল, উপরে খড়ের চাল, বারান্দায় ছাগল শুইয়া রোমন্থন করিতেছে। একটা বাড়ীর প্রাঙ্গনে কাঁঠাল গাছের একটী চারা, গাছটিতে বোধ হয় ফল ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে, গৃহস্থ গাছে 'ওম' বাঁধিয়া দিয়াছে। শীতকালে কাঁঠাল গাছের গুঁড়ির চতুর্দ্দিকে কতকগুলি জঙ্গল দড়ি বা 'কঞ্চির চটা' দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়, ইহারই নাম 'ওম বাঁধিয়া' দেওয়া,—পল্লীবাসিগণের বিশ্বাস এরূপ করিলে গাছে অধিক ফল ধরে। এ অঞ্চলে বাগ্দীরাই তরকারী বিক্রেতা। হাটের বেলা হইল ভাবিয়া কোন রমণী এক পয়সা দামের ছোট একখানি বঁটি দিয়া গৃহ-প্রাঙ্গনজাত পালঙ্গ শাক কাটিয়া চুপড়ীতে ফেলিতেছে। কাহারও চালে থোকা থোকা আল্‌তা-পাতি

শিম ফলিয়াছে, স্বামী স্ত্রীতে মিলিয়া শিম তুলিয়া 'কোঁচড়' পূর্ণ করিতেছে। কেহ বাড়ীর সম্মুখে কাটাখানেক জমিতে বেগুন লাগাইয়াছে, বেগুনের সন্ধানে গৃহস্থ একটা বাঁশের আঁকুশি দিয়া গাছের শাখাগুলি উল্টাইয়া দেখিতেছে, একটী বড় বেগুণ দেখিলেই তাহা তুলিয়া ঝোড়ায় ফেলিতেছে। কেহ মাচার উপর হইতে লাউ পাড়িতেছে; কেহ বা অনন্যকর্ম্ম হইয়া বেড়ার প্রান্তে প্রকাণ্ড একটা গর্ত্ত খুঁড়িতেছে; প্রথমে মনে হইল, লোকটা বুঝি কোন গুপ্ত ধনের সন্ধান পাইয়াছে, পরে শুনিলাম সে মাটীর আলু তুলিতেছে। গাছটী লতাইয়া একটা প্রকাণ্ড নোনা গাছের উপর উঠিয়াছে, নোনার শাখাগুলিকে প্রেমবন্ধনে এমনই করিয়া বাঁধিয়াছে যে নোনার অস্তিত্ব লোপ হয় হয় হইয়া উঠিয়াছে। কে ভাবিয়াছিল—ইতি মধ্যে ভগবানের ইচ্ছায় বাগ্দীযুবকের সেই আলুর উপর দৃষ্টি পড়িবে? পাশেই একটা কলাবাগান, কত কাঁদি কলা পড়িয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। বাগানস্বামী এক কাঁদি কাঁচা কলা কাটিয়া থোড় সংগ্রহের প্রত্যাশায় গাছটিকে খণ্ডখণ্ড করিয়া চিরিতেছে, দুই তিনটা গরু ঊর্দ্ধমুখে ভূপতিত কলার 'ডেগড়ো' চর্ব্বণ করিতেছে। শীতকালে পল্লীগ্রামে প্রকৃতিদেবী তাহার সন্তানগণকে খাদ্যসুখ দানে কৃপণতা করেন না।

গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী মাঠে আসিয়া পড়িলাম। দৃশ্য সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল। অগ্রহায়ণের মধ্যেই ধান কাটা শেষ হইয়াছে; সে সকল জমীতে এখন পুনর্ব্বার চাষ আরম্ভ হইয়াছে, কোন জমীতে লাঙ্গল চলিতেছে, সারি সারি কৃষক হলমুষ্টি ধরিয়া হল চালনা করিতেছে, বলদগুলি 'জোঁয়াল' কাঁধে লইয়া অতি কষ্টে লাঙ্গল টানিয়া লইয়া যাইতেছে। শীতের রৌদ্র মিষ্ট লাগিতেছে বলিয়া আইলের পাশে মাথালটি খুলিয়া রাখিয়াছে, দুই একটা মাথালে শিল্প নৈপুণ্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাদের উপরের সাজটি সবুজ ও লাল রঙ্ করা। এক-

জন কৃষক লাঙ্গল ছাড়িয়া দিয়া, "পোয়ালের বুঁদিরে' আগুনে তামাক সাজিতেছে। মাঠের ধারে উঁচু পথ দিয়া একখানি সোয়ারির গাড়ী গ্রামের অভিমুখে যাইতেছে, গাড়োয়ানের মাথায় ময়লা চাদর জড়ান, শীত নিবারণের অভিপ্রায়ে কানদুটিও তদ্দ্বারা ঢাকিয়াছে, গায়ে একখানি অপরিষ্কার কাঁথা, স্থানেস্থানে নীলাম্বরী কাপড়ের তালি দেওয়া; গাড়োয়ান যখন কোন এক পাশ ঝুঁকিয়া পড়িয়া, বলদের লেজে মোচড় দিয়া "চ, চ, বাবা ধন্‌ডা" বলিয়া বলদ দুটিকে দ্রুত গমনে বাধ্য করিতেছে, তখন তাহার সেই কাঁথার ভিতর দিয়া তাহার অঙ্গের একটি ছেঁড়া গঞ্জীফ্রক দেখা যাইতেছে। হিম নিবারণের অভিপ্রায়ে গাড়ীর ছৈয়ের উপর একখানি শতরঞ্চ বিস্তীর্ণ করিয়া দড়ি দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। গাড়ীর সম্মুখভাগ একখানি ময়লা হলুদে আলোয়ানে ঢাকা। একটী বার তের বৎসর বয়সের নলকপরা সুন্দরী বধূ সেই আলোয়ান ফাঁক করিয়া এক একবার সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে অদূরবর্ত্তী গ্রামের দিকে চাহিয়া—আবার তখনই আলোয়ানের অন্তরালে মুখ লুকাইতেছে,—বোধ করি এই গ্রামে মেয়েটির বাপের বাড়ী। হয়ত সে কত দিন পরে তাহার শ্বশুরবাড়ী হইতে বাপের বাড়ী আসিতেছে। সেখানে মা আছে, ছোট ভাই আছে, ভগিনী আছে, প্রতিবেশিনী সখীগণ তাহার জন্য এতক্ষণ পথ চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গাড়ী কতক্ষণে বাড়ী পৌঁছিবে, ভাবিয়া বালিকা সেই মন্থর গামী শকটে কি অধীরতার সহিত সময় কাটাইতেছে, তাহা তাহার অবস্থায় না পড়িলে অন্যে কিরূপে বুঝিবে!

একটা টাটু ঘোড়ায় চড়িয়া একটি বাবু আসিতেছেন, কোন নীল কুঠির দেওয়ান বা আমিন হইবেন। বাবুটির পরিচ্ছদ দেখিয়া আশঙ্কা হয় হয়ত বা তিনি শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করিয়াছেন। হাতে এক গাছি ছোট বেত, তাহার মাথাটা রূপা দিয়া বাঁধান, পরিধানে কালাপেড়ে

ধুতি, পায়ে ফুল মোজা, বাদামী রঙ্গের জুতা জোড়াটিতে দুই তিন স্থানে তালি দেওয়া, দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়,—জুতা জোড়াটি অনেক নীলের জমীর উপর পরিভ্রমণ করিয়া অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছে। বাবুর গরদের কোটের উপর—প্রকাণ্ড হাঁসিয়াদার শাল; গরদের কোটের কলরের পাশ দিয়া কাঠের মালা একটু বাহির হইয়া রহিয়াছে; পাঁচরঙ্গা উলের গৃহনির্ম্মিত কম্ফর্টারটি মাথার উপর কুণ্ডলী করিয়া জড়ান। পথের ধুলা উড়িয়া বাবুর কৃষ্ণবর্ণ শ্মশ্রুজাল ধূসরবর্ণে পরিণত করিয়াছে। তাহার পশ্চাতে অশ্বরক্ষক, অথবা ভৃত্য। তাহার মাথায় একটা টিনের পোর্টম্যাণ্ট, কটিতটে একটি বোঁচকা গামছায় বাঁধা, এই বোঁচকাটি বোধ করি তাহার নিজস্ব। জানু পর্য্যন্ত ধূলার-ফুলষ্টকিং পরিয়া ভৃত্য প্রভুর অশ্বের পশ্চাতে একবার ছুটিয়া যাইতেছে এক একবার বা ক্লান্তিভরে পিছাইয়া পড়িতেছে।

পথের এক পাশে একখানি ছোলার ক্ষেত, তিন চারিটী স্ত্রীলোক বসিয়া ছোলার শাক তুলিতেছে,—শাকে অঞ্চল পূর্ণ হইলে তাহা ঝোড়ায় ঢালিতেছে, এই ঝোড়া পূর্ণ হইলে শাকগুলি পল্লীবাসীগণের গৃহে গৃহে বিক্রয় করিয়া বেড়াইবে, গৃহিণীগণ চাউল দিয়া শাক ক্রয় করেন।

পথের অন্য পাশে শর্ষপক্ষেত্র, পীতবর্ণ ফুলে তিন চারি বিঘা জমি পূর্ণ, যেন কে পল্লী জননীর অঙ্গ সোনার ফুলে মুড়িয়া দিয়াছে। শর্ষপ ফুলের একটা উগ্র মিষ্ট গন্ধ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিতেছে, শুভ্রপক্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য প্রজাপতি সেই সকল ফুলের উপর ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে, মধ্যে মধ্যে দুই চারিটি মশিনা গাছ, তাহাদের নীল ফুল গুলি বৈচিত্র্য ভঙ্গ করিতেছে। কোথাও অপেক্ষাকৃত অল্প পীতবর্ণ তারামণি ফুলের ঝাড়, দুই একটী রমণী তারামণির ফুল সংগ্রহে ব্যস্ত। তারামণি ফুলে বেগুন ও বড়ি দিয়া যেমন চচ্চড়ী পল্লীবাসিনীগণ রাঁধিয়া থাকেন, তাহার সহিত কপি কড়াইসুঁটীসংযুক্ত চিংড়ি মাছের

মাথার তরকারীর তুলনা চলিতে পারে না। যেন একটা নূতন খেজুরে গুড়ের পায়েস, অন্যটি কৃষ্ণনগরের সর পুরিয়া।

অদূরে অরহর ক্ষেত্রের নীল শোভা। শ্যামল পত্র, মধ্যে মধ্যে কাঞ্চন-কান্তি পুষ্পগুচ্ছ। গাছগুলি সরল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের লম্বা লম্বা কাণ্ড, নিম্নে সবুজ তৃণদল দেখা যাইতেছে—দুই পাঁচটি ছাগ চরিতেছে। গাছের ছায়ায় দুই চারিটি কপোত কম্পিত পক্ষে উড়িয়া আসিয়া বসিতেছে। গাছের শাখায় বসিয়া ঘুঘু গলা ফুলাইয়া, মাথা দোলাইয়া ঘুঘূ শব্দে প্রেমালাপ করিতেছে।

কয়েক শত গজ দূরে নদী—নদীতে অধিক জল নাই; শ্যামল শস্য ক্ষেত্র নদীর উপকণ্ঠ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, নদীর মধ্যে সূক্ষ্ম জলরেখা,— দুই পাশে নিবিড় শৈবালরাশি, কেবল স্নানের ঘাটটি পরিচ্ছন্ন। তীরে বালুকা রাশি—সূর্য্য কিরণ পড়িয়া চিক্ চিক্ করিতেছে—জলের ধারে একখানি স্থূল দীর্ঘ কাষ্ঠখণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে, কতকালের কাঠ কেহ বলিতে পার না, আমরা যখন শিশু ছিলাম তখনও এ কাঠখানি এই ভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি। পুরুষেরা শীতকালের বেশী বেলায় এই ঘাটে স্নান করিতে আসেন। সুতরাং পল্লীরমণীগণ সকালে এখানেই স্নান সারিয়া লন, ঘাটটি ভাল তাই রমণীগণ এ ঘাটের কিছু পক্ষপাতিনী, তবে সকলেই যে এ ঘাটে আসেন তাহা নহে। গ্রাম্য বধূরা এ ঘাটে আসিতে সঙ্কোচ বোধ করেন, কিন্তু পল্লীদুহিতাদের সে সঙ্কোচ নাই। আজ দেখিলাম এই কাঠের উপর বসিয়া দত্তদের জয়দুর্গা বালি দিয়া ঘড়া মাজিতেছে,—আজ সে বিধবা, সাদাথানে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত। মুখ খানি মলিন, কেশ লাবণ্য হীন,—কিন্তু এই জয়দুর্গা একদিন এই কাঠে বসিয়াই তাহার আগুল্‌ফ লম্বিত কৃষ্ণ কুন্তলরাশির বেণী মুক্ত করিত, সুকোমল পুষ্পগন্ধে বায়ুস্তর সৌরভাকুল হইয়া উঠিত, এবং তাহার সুগঠিত, সুন্দর চরণপ্রান্তের অলক্তরাগ বালুকারাশির

উপর প্রতিফলিত হইত, তাহার ফিতেপেড়ে মিহি শান্তিপুরে শাড়ীখানি সর্ব্বাঙ্গে লিপ্ত হইয়া সুন্দরীর বর্ণগৌরবে আপনাকে নিষ্প্রভ করিয়া তুলিত, এবং গামছাখানি তাহার স্কন্ধ হইতে সম্মুখভাগে বিলম্বিত থাকিয়া দেহের একটি ললিতভঙ্গি বিস্তার করিত। তখন জয়দুর্গার নবযৌবন, সে তখন সধবা, রসিকা, আমোদিনী এবং পতি-সোহাগিনী ছিল—আর এখন সে গত যৌবনা, বিধবা, পরুষভাষিণী, গম্ভীরা এবং নারীর মাতৃত্ব-বঞ্চিত, উভয়ের মধ্যে প্রভেদ স্মরণ করিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম, কিন্তু সেই কাঠ অচলভাবে তাহার পদতলে পড়িয়া রহিয়াছে। শীতের ভয়ে স্ত্রীলোকেরা দুই একটা মাত্র ডুব দিয়া তীরে উঠিতেছে এবং আর 'শীতকালটা গেলে নেয়ে বাঁচি!' বলিয়া শীত ঋতুর পরমায়ু হ্রাসের কামনা করিতেছে। সম্মুখের দুই পা বাঁধা একটা পুকুরে ঘোড়া—ইটের পাঁজার কাছ হইতে লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া পাঁকে পড়িল।

ময়রারা রাশি রাশি শৈবাল কাটিয়া গরুর গাড়ীতে বোঝাই দিয়া লইয়া যাইতেছে। গুড়ের 'পেছে'র উপর দিয়া—চিনি প্রস্তুত করিবার জন্য এগুলির আবশ্যক। একজন জেলে একগলা জলে হাঁড়ি মাথায় বাঁধিয়া ঠেলাজালে মাছ ধরিতেছে, ছোট ছোট দুই একটা পুটী বা বেলে যাহা পাইতেছে, মস্তকের হাঁড়িতে পুরিতেছে। লোকটির কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতা দেখিয়া—সেকালের যোগীঋষি—যাঁহারা গ্রীষ্মকালে অগ্নিরাশির মধ্যে বসিয়া পঞ্চতপা করিতেন—তাঁহাদের কথা মনে পড়িয়া গেল। এত কষ্ট করিয়াও দিনে সে চারি পয়সার মাছ ধরিতে পারেনা, এবং সেই অনির্দ্দিষ্ট উপার্জ্জনের উপর তাহার স্ত্রীপুত্রাদির প্রতিপালন নির্ভর করিতেছে! এতদ্ভিন্ন সে জমিদারের খাজনা, মিউনিসিপালিটীর টেক্স, প্রভৃতি সরবরাহ করে। দূরস্থ বাঁশজাল হইতে মাছ ধরিয়া কয়েকজন জেলে দুইখানি জেলেডিঙ্গি বাহিয়া ঘাটের দিকে আসিতেছে।

তীর সংলগ্ন একখানি নৌকার দাঁড়ের উপর বসিয়া একটা মাছরাঙ্গা পাখী রোদ পোহাইতেছে।

বেলা অধিক হইয়াছিল, কুয়াসার পর রৌদ্র, বেশ তীক্ষ্ণ বোধ হইতে লাগিল। লোকে বাজার করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে, কাহারও গামছাতে দুটো বেগুন ও দুই চারিটা মূলো; কেহ, এক পয়সার চিংড়ি কিনিয়া কচুর পাতায় জড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে।—কুলোর উপর 'সয়া-গুড়' রাখিয়া, গামছা কাঁধে বাগ্দীযুবক তাহা বাজারে বিক্রয় করিতে যাইতেছে। বাজারের নিকটবর্ত্তী হইয়া নানা সামগ্রী সংগ্রহ পূর্ব্বক বহু সংখ্যক ক্রেতাকে চলিতে দেখিলাম।

টহাবাজার তরকারীতে পূর্ণ,—বেগুন, মাটির আলু, লাল আলু, মুলো, কচু, লাউ, কুমড়ো, থোড়, কাঁচাকলা, নানা প্রকার শাক, বরবটি প্রভৃতি বিক্রয় হইতেছে। কপি, কড়াইশুটি, শালগম, গাজর, বীট প্রভৃতির সহিত আমাদের পল্লীর সংশ্রব পূর্ব্বে ছিল না। এখন কিছু কিছু হইয়াছে, কিন্তু সে সংশ্রব কলিকাতার আমদানি। যে গরীব পালঙশাকের ব্যবস্থা করিতে পারেনা, ধার করিয়া সেও আটপয়সা দিয়া একটা কপি কিনিতে পরাঙ্মুখ হইতেছেনা। চার্ব্বাক্ বলিয়াছেন, 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।'

বাড়ীতে ফিরিয়া দেখি হারা চাকরটা প্রকাণ্ড একটা শজিনার ডাল ভাঙ্গিয়াছে, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা পাকা পাকা ফুলগুলি বাছিয়া লইতেছে। কন্যাকে বলিলাম—"যা বুড়ী, তোর কর্ত্তামাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আয়, আজ কি রান্না হচ্ছে।"

চারি বৎসরের বুড়ী তেল ও গামছা লইয়া ফিরিয়া আসিল, একে-বারে আমার পিঠের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "বাবা, ভাত হয়েচে, নাওগে। আজত আর মাছ নেই, আজ পালঙশাক, লাউর ঘাট, পুঁই ডাঁটার চচ্চড়ি, মেটে আলুর ডাল্না, অরহরের ডাল, বেগুণ

ভাজা আর কুল দিয়ে বড়ি দিয়ে শজনে ফুলের অম্বল, আর তুমি খেজুরের রসের পায়েস খেতে চেয়েছিলে, ক্ষ্যান্তর মা রস এনে দিয়েছে —খাসা পায়েস হয়েছে। কর্ত্তামা তোমার জন্যে এক বাটী তুলে রেখেছে। বাবা শীগ্‌গির স্নান করোগে।”

অতএব আজ আর অগ্রসর হইবার সাধ্য নাই।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

ক্ষ-কার।

(৩)

১৩০৮ সালের জ্যৈষ্ঠ ও আশ্বিন মাসের ভারতীতে আমি নানা প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে ক্ষ-কার একটী স্বতন্ত্র মূল ব্যঞ্জন বর্ণ বলিয়া পরিগণিত হইত। ক্ষ-কারের প্রাচীনতা ও মৌলিকতা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আর্য্যজাতির ভারতে আগমনের পূর্ব্বেও ক্ষ-কার আর্য্য বর্ণমালায় বিনস্ত ছিল। যখন মূর্দ্ধন্য বর্ণ সমূহ (অর্থাৎ ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ষ, ষ্ম, ষ্ম) সৃষ্ট হয় নাই, তখনও ক্ষ-কার বিত্তমান ছিল। ক্ষ-কারের ইতিহাস সবিশেষ রহস্যজনক। ইউরোপীয় বর্ণমালায় “x” ও ভারতীয় বর্ণমালায় “ক্ষ”—উভয়ই এককার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। সংস্কৃত “দক্ষতর” ও লাটীন “dex-ter” একই শব্দ। সংস্কৃত ভাষার “অক্ষ” শব্দ ও গ্রীক ভাষার “axōn,” লাটীন ভাষার “axis,”

শাক্সেন ভাষার "eax"—ইহারা মূলতঃ একই শব্দ। এইরূপ আরও অনেক উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। এই সকল উদাহরণ দৃষ্টে স্পষ্ট জানা যায় যে ইউরোপীয় ভাষার "x" ও সংস্কৃত ভাষার "ক্ষ" প্রকৃত প্রস্তাবে ভিন্ন বর্ণ নহে। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় পাশ্চাত্য আর্য্যগণ "x" কে স্বীয় বর্ণমালায় অবিকৃতভাবে রাখিয়াছেন কিন্তু প্রাচ্য আর্য্যগণ "ক্ষ"কে একেবারে বর্ণমালা হইতে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। বৈয়াকরণগণ "ক্ষ"কে তাড়াইয়াছেন বটে কিন্তু চলিত ব্যবহারে "ক্ষ" এখনও বর্ণমালায় বিরাজ করিতেছে।

কেন বৈয়াকরণগণ "ক্ষ"-কারের প্রতি নির্দ্দয় হইলেন তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া আমরা দেখিতে পাই তাঁহারা "ক্ষ"কে "ক" ও "ষ" এতদুভয়ের সংযোগ হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া মনে করেন। যদি "ক্ষ" যথার্থই সংযুক্ত বর্ণ হয় তাহা হইলে বর্ণমালায় উহার পৃথক্ স্থান প্রদান করা অন্যায্য তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি বলি উহা প্রথমে সংযুক্ত বর্ণ ছিল না। ভারতীয় আর্য্য জাতির এক্ষণে প্রৌঢ়াবস্থা, বিগত দুই তিন সহস্র বৎসর হইতে ইহাঁদের উচ্চারণের অনেক বৈকল্য ঘটিয়াছে, এই হেতু "ক্ষ"এর প্রকৃত উচ্চারণ এখন নাই। "ক" ও "ষ" এই দুই বর্ণের উচ্চারণের সহ "ক্ষ"এর উচ্চারণের অনেক সাম্য থাকায় "ক্ষ"কে "ক" ও "ষ"এর সংযোগে উৎপন্ন বলিয়া অবধারণ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে "ক্ষ"এর উচ্চারণ "ক+ষ"এর উচ্চারণের তুল্য নহে।

পূর্ব্বকালে ক্ষএর প্রকৃত উচ্চারণ কিরূপ ছিল তাহা নির্ণয় করা এক্ষণে দুঃসাধ্য। কালসহকারে উহার উচ্চারণের নানা বৈচিত্র্য ঘটিয়াছে। স্থল বিশেষে "ক্ষ," "ক+শ," "ক+ষ," "ক+স," "ক+খ," "গ+শ," "গ+ষ," "গ+স," "হ+ষ," "হ+স," "খ+স," "চ+ষ," ইত্যাদির তুল্য হইয়া পড়িয়াছে। যথা—

Fox = জার্ম্মান্—Fuchs.
Ox = জার্ম্মান্—Ochs.
Axe = জার্ম্মান্—Achse.
} ইত্যাদি।

উল্লিখিত স্থলে "x" বা "ক্ষ," "ch + s" এতদুভয়ের তুল্য।

ভিক্ষু = পালি ভাষার ভিক্‌খু।

দুঃখ = পালি ভাষার দুক্‌খ।

উল্লিখিত স্থলে "ক্ষ" বা "x," "ক + খ" এতদুভয়ের তুল্য।

ক্ষয় = পালি ভাষার "খয়"।

ক্ষান্তি = পালি ভাষার "খান্তি"।

উল্লিখিত স্থলসমূহে "ক্ষ" এই অক্ষর "খ" এর তুল্য।

"অক্ষ" এই শব্দটী ডেনমার্ক দেশীয় ভাষার "ökse" এই শব্দটীর তুল্য। এস্থলে "ক্ষ" ও "ks" পরস্পর অভিন্ন।

সংস্কৃত 'অক্ষ" ও গথিক "auhsa" একই শব্দ। এস্থলে "ক্ষ" ও "hs" কে একই বর্ণ বলিতে হইবে।

"অবাক্ষীৎ" পদে "ক্ষ" এই অক্ষরটী "চ" ও "ষ" এতদুভয়ের যোগে উৎপন্ন।

Six এই ইংরাজী শব্দটী সংস্কৃত "ষষ্" এই শব্দের তুল্য। ইহাতে বোধ হয় "ক্ষ" রূপান্তরিত হইয়া "ষ"কারে পরিণত হইয়াছে।

আবার দেখুন চক্ষ্ ধাতু হইতে অক্‌সান্ত পদ নিষ্পন্ন হয়। এস্থলে "ক্ষ" এই বর্ণ "ক্স" এই ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে।

ইউরোপীয়, পারসীক ও ভারতীয় ভাষা সমূহ হইতে এইরূপ অসংখ্য শব্দ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে এবং এই সকল শব্দ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় প্রাচীন আর্য্য অক্ষর "ক্ষ" কালক্রমে কত প্রকার রূপান্তর লাভ করিয়াছে। ইউরোপীয় ভাষা সমূহে "ক্ষ" বা "x" এই অক্ষর, সংযুক্ত বর্ণরূপে পরিণত হইবার উপক্রম করিতেছে বটে

কিন্তু উহা এখনও বর্ণমালার তালিকা হইতে একেবারে বিতাড়িত হয় নাই। গ্রীক্, লাটিন, জার্ম্মান্, শাক্সেন প্রভৃতি ভাষায় এখনও "x" স্বতন্ত্র বর্ণ রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব সংস্কৃত ভাষা হইতেই বা কেন "ক্ষ"কে বিদূরিত করা হইতেছে?

আর যদি "ক্ষ"কে সংযুক্ত বর্ণ বলিয়াই মনে করা হয়, তাহা হইলে উহাতে কোন্ কোন্ বর্ণের সংযোগ আছে, তাহাও বিচার করিতে হইবে। আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি "ক্ষ" যে কেবল "ক+ষ" এই দুই অক্ষরে বিভক্ত হইয়াছে এরূপ নহে। উহা নানা ভাষায় এবং এক ভাষায় ও ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরে বিভক্ত হইয়াছে। অতএব "ক্ষ" এইটী যুক্তাক্ষর এবং ইহা "ক" ও "ষ" এতদুভয়ের সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ কথা বলা অসঙ্গত। প্রকৃত কথা "ক্ষ" পূর্ব্বে ক, চ, ইত্যাদির ন্যায় অসংযুক্ত বা মূল অক্ষর ছিল। কাল-সহকারে উহা নানা ভাবে বিশ্লেষিত হইয়া পড়িতেছে, "ক্ ষ" এই বিশ্লেষণের অন্যতম।

মূর্দ্ধন্য বর্ণ সমূহ অর্থাৎ ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ঋ, ৠ, ষ এই সকল বর্ণ পূর্ব্বকালে আর্য্য বর্ণমালায় বিদ্যমান ছিল না। ইউরোপীয় আর্য্যগণ একই বর্ণ দ্বারা মূর্দ্ধন্য ও দন্ত্য বর্ণের কার্য্য নিষ্পাদন করিয়া থাকেন। যথা, তাঁহাদের "t" এই বর্ণ আমাদের "ট" ও "ত" এতদুভয়ের কার্য্য করে। প্রাচীনতম কালে ভারতীয় আর্য্যগণও ঐরূপভাবে একই বর্ণ দ্বারা মূর্দ্ধন্য ও দন্ত্য বর্ণের ব্যবহার নিষ্পাদন করিতেন। পরে যখন তাঁহারা ভারতের আদিম অধিবাসিগণের সংসর্গে আসিলেন তখন দেখিলেন দ্রাবিড়ীয়গণ মূর্দ্ধন্য বর্ণ সমূহের সুস্পষ্ট উচ্চারণ করে। এই দ্রাবিড়ীয় উচ্চারণের প্রভাবেই আর্য্য বর্ণমালায় একই শ্রেণীর অক্ষর দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া মূর্দ্ধন্য ও দন্ত্য বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছিল। অধিকাংশ মূর্দ্ধন্য ও দন্ত্য বর্ণের সৃষ্টি প্রণালী এইরূপ। এই প্রণালী

অনুসারে বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় আর্য্যজাতির ভারতে আগমনের পূর্ব্বে "স" ও "ষ" এতদুভয়ের ভেদ ছিল না। যখন "স" ও "ষ" একই বর্ণ ছিল, তখন "ক্ষ" এই অক্ষর অবশ্য "ক+স" এবং "ক+ষ" এই উভয়ভাবে এবং পূর্ব্বে যে সকল বিশ্লেষণ প্রকারের কথা বলিয়াছি সেই সকল ভাবে উচ্চারিত হইত। অতএব "ক্ষ" যে "ক+ষ" হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ কথা বলা নিতান্ত অসঙ্গত। বস্তুতঃ "ষ" যখন বর্ণমালায় পৃথক্ বর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল না তখনও "ক্ষ" বিদ্যমান ছিল। "ক্ষ" যখন "ষ"এর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল, তাহাতে কি করিয়া বলা যায় "ক+ষ" হইতে "ক্ষ"এর উৎপত্তি হইয়াছে?

মানবজাতির বাক্‌শক্তির অনেক দৌর্ব্বল্য ঘটায় "ক্ষ"এর মূল অসংযুক্ত উচ্চারণ বিলুপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে উহার উচ্চারণ সৌকর্য্যার্থে উহাকে অধিকাংশ স্থলে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। স্থল বিশেষে "ক্ষ" যে সকল ভাগে বিভক্ত হইয়াছে "ক+ষ" উহাদের অন্যতম।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

রতন পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন দুইজন সাহেব। সম্মুখে দেখিলেন, দলে দলে সিপাহী মুকুন্দের উদ্ধারার্থ ছুটিয়া আসিতেছে; পরিণাম বুঝিতে ব্রাহ্মণের বাকী রহিল না। তিনি মনে মনে ভাবিলেন "করিলাম কি? নারায়ণীর উপকার করিতে গিয়া, তাহার অধিকতর অনিষ্ট করিয়া বসিলাম!" বুঝিলেন, কার্য্য নিষ্পন্ন হওয়া সুদূর-পরাহত। এত লোকের বাধা অতিক্রম করিয়া, আনন্দদেবের সমীপস্থ হওয়া তাঁহার সাধ্যাতীত। পরন্তু মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিলে তাঁহাকে বন্দী হইতে হইবে।

এরূপ অবস্থায় আর অধিকদূর অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য নয় বুঝিয়া রতন মুকুন্দের হাত ছাড়িয়া দিলেন। প্রহরীগুলা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তখনও পর্য্যন্ত তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছিল। ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে নিরস্ত হইতে বলিলেন।

কথা শেষ করিতে তাহারা ব্রাহ্মণকে অবকাশ দিল না। প্রভুপুত্রকে ছাড়িতে দেখিয়াই, ব্রাহ্মণের চপেটাঘাতের মধুরত্ব তাহাদের অঙ্গের পক্ষে বিশেষ প্রীতিকর হইবেনা বুঝিয়া, তাহারা মুহূর্ত্তের মধ্যে দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। মুকুন্দও সাহেবদিগের আশ্রয় গ্রহণের অভিলাষে সেস্থান হইতে ছুটিয়া পলাইবার উদ্যোগ করিল। ভয়ে যুবক মৃতবৎ হইয়াছিল। তাহার অঙ্গে শিথিলতা আসিয়াছিল। পদদ্বয় ঘনঘন কম্পিত হইতেছিল। সুতরাং ইচ্ছা সত্ত্বেও মুকুন্দ একপদও অগ্রসর হইতে পারিল না। রতন তাহার অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়া আবার তাহাকে ধরিলেন। বলিলেন, "ভয় নাই। আমা হইতে

বিন্দুমাত্রও অনিষ্টের আশঙ্কা করিও না। তবে আমি যা বলি, শুন। কি নিমিত্ত তোমার পিতার কাছে চলিয়াছি; তোমাকেই বলিতেছি।"

কথা মুকুন্দের কানে পৌঁছিল না। সে কেবল সাহেব দুইজনের আগমন প্রত্যাশায় তাঁহাদের দিকে চাহিয়াছিল। তাঁহারাও মুকুন্দকে বিপন্ন বুঝিয়া তাঁহার দিকে আসিতেছিলেন। রতনের কথা শেষ হইতে না হইতে, হার্‌লি তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। হার্‌লিকে সমীপস্থ দেখিয়াই, মুকুন্দ পুনরায় চীৎকার করিয়া বলিল "সাহেব আমাকে রক্ষা কর।" প্রহরীগণ সেলাম করিতে করিতে সরিয়া সাহেবকে পথ দিল। রতনও সাহেবকে দেখিবার জন্য পশ্চাতে ফিরিলেন। কিন্তু যেই মুখ ফিরাইয়াছেন, অমনি হার্‌লির বজ্রমুষ্টি দ্বারা নাসিকা দেশে বিষম প্রহৃত হইলেন। দেখিতে দেখিতে শোণিত-স্রোতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মুখ প্লাবিত হইয়া গেল। বিষম আঘাতে ব্রাহ্মণ চারিদিক অন্ধকারময় দেখিলেন। নাসিকায় হস্ত দিয়া তন্মুহূর্তেই তাঁহাকে ভূমির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল।

অবকাশ পাইয়া, মুকুন্দ উপবিষ্ট ও অবনত মস্তক ব্রাহ্মণের পৃষ্ঠে দুই চারিটা মুষ্টি প্রহার করিয়া অপমানের শোধ লইল। প্রহরীগুলাও ব্রাহ্মণকে ধরিয়া ফেলিল। কালাবাঁধের অপর পার হইতে অনেক সিপাহীও ইতিমধ্যে সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

হার্‌লি মুকুন্দকে বৃদ্ধের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মুকুন্দের উত্তরে বুঝিলেন, বৃদ্ধ পাগল রাজার সঙ্গী। বৃদ্ধ সম্বন্ধে বুঝিতে, তখন আর তাঁহার কিছু বাকী রহিল না! ইতিমধ্যে ব্রাউন তথায় উপস্থিত হইলেন। হাসিতে হাসিতে হার্‌লি সহচরকে তাঁহার প্রিয় দেবদূতের মানসিক বিকারের কথা বিবৃত করিলেন। এবং তাঁহাকে 'দেব দূতের' দুই একটী কথা শুনাইবার জন্য, ও পাগল রাজার সঙ্গীর পাগলামির

পরিমাণ কত, এবিষয়েরও একটা মীমাংসা করিবার জন্য, মধুর আত্মীয়তাজ্ঞাপক বাক্যবিন্যাসে, ও মধুরতর পদপ্রহারে বৃদ্ধকে উঠাইবার চেষ্টা করিলেন।

এরূপ সদ্ব্যবহার ব্রাউনের প্রীতিকর হইল না। বৃদ্ধ পাগল, একথা শুনিয়াও তৎপ্রতি তাঁহার প্রীতির হ্রাস হইল না। ব্রাহ্মণের নাসিকাস্রুত রক্তে প্রায় বর্গগজ পরিমিত ভূমি সিক্ত হইয়াছে। দেখিয়া ব্রাউন দুঃখিত হইলেন। হার্লিকে বলিলেন, "আর কেন বৃদ্ধকে প্রহার কর। বৃদ্ধের যথেষ্ট শাস্তি হইয়াছে।" ব্রাউনের কথায় হার্লি ব্রাহ্মণকে আর প্রহার করিলেন না। তবে মনে মনে স্থির করিলেন, বৃদ্ধের পাগলামীর শাস্তি দিতে হইবে। সিপাহীদের ডাকিলেন, তাহারা নিকটে আসিলে বৃদ্ধকে বাঁধিতে আদেশ করিলেন। বলিলেন, "বৃদ্ধকে বাঁধিয়া রাঁচি লইয়া যাও। আমি যখন শীকার করিয়া সদরে ফিরিব, তখন বৃদ্ধের অপরাধের বিচার করিব।"

একজন সিপাহী ব্রাহ্মণকে বাঁধিবার জন্য দড়ীর চেষ্টায় চলিল। অপরে ব্রাহ্মণকে আগুলিয়া রহিল। আর আপনাআপনির ভিতর যে যার পরাক্রমের প্রশংসা আরম্ভ করিল। যে তিনজন প্রথমে ব্রাহ্মণকে বাধা দিতে গিয়া পরাভূত হইয়াছিল, তাহারা কেবল ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বের উপর দোষারোপ করিতে লাগিল। রতনকে শিক্ষা দিতে যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা কোনমতেই তাহারা প্রয়োগ করিতে পারে নাই। রতন ব্রাহ্মণ বলিয়া, বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে সে শক্তির চতুর্থাংশ খরচ করিতে হইয়াছে।

ব্রাউন দেশীয় ভাষা বুঝিতেন না। সুতরাং সিপাহীগুলার সহিত হার্লির কথা শুনিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বলিতেছ?"

হার্লি। বৃদ্ধকে রাঁচি লইয়া যাইতে আদেশ করিতেছি।

ব্রাউন। কেন?

হার্‌লি। চক্ষের উপর অপরাধ দেখিলাম। বিচার করিয়া শাস্তি দিব।

ব্রাউন। বিনা বিচারে শাস্তি দিয়াও কি তৃপ্তি হইল না?

হার্‌লি। একি শাস্তি? এত শিক্ষা; পাগলের ঔষধ।

ব্রাউন। স্বদেশে তোমার এরূপ ঔষধের প্রয়োগ দেখিলে, আমার বিশ্বাস, জনসাধারণ বৃদ্ধকে ছাড়িয়া তোমাকে একটী গারদে পুরিয়া রাখিত।

কথা শুনিয়া হার্‌লির মুখ লাল হইয়া উঠিল। বলিল, অনুগ্রহ করিয়া শাসন ব্যাপারে কোনও কথা কহিও না। এ উষ্ণ প্রধান দেশ,—ইংল্যাণ্ড নয়।

ব্রাউন। তা বোধ হয় আমিও জানি। কিন্তু উষ্ণ-প্রধান দেশে আসিলে, ইংলণ্ড সন্তানের মস্তিষ্ক এত উষ্ণ হয়, তা জানিতাম না।

হার্‌লি কোন উত্তর দিলেন না। তবে ব্রাউনের কথায় তাঁহার বড়ই বিরক্তি হইল। মনে মনে সহচরের উপর তাঁহার ঘৃণা জন্মিল। হার্‌লি ভাবিলেন, এ পুরুষ বেশী স্ত্রীলোকটা হইতে জগতের কি কার্য্য হইতে পারে!

ব্রাউনও আর দাঁড়াইলেন না। এক অসহায় বৃদ্ধের উপর এত অত্যাচার, তাঁহার দেখা সহিল না। ধীরে ধীরে তিনি বাংলার দিকে ফিরিতে লাগিলেন।

রতন এতক্ষণ অধোমুখেই বসিয়া ছিলেন। নাসিকা হইতে তখনও রক্ত ঝরিতেছিল। তিনি যথাসম্ভব সেই রক্তরোধের চেষ্টা করিতেছিলেন।

রক্ত পড়া কতক বন্ধ হইলে, পাগড়ীর খানিকটা খুলিয়া তাহারই প্রান্তভাগ দিয়া মুখ মুছিলেন। প্রান্তভাগ আবার মাথায় জড়াইলেন। কাছে দাঁড়াইয়া সিপাহীগুলা তাহার কার্য্যকলাপ দেখিতেছিল। ইত্যবসরে সাহেব ও মুকুন্দে আবার কথা চলিতেছিল।

মুকুন্দ সাহেবকে বুঝাইতেছিল যে, বৃদ্ধ তাহার পিতাকে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছিল। ইংরাজের হস্তে বীরচন্দ্রের জমীদারীর ভার আসিবার কারণ, একমাত্র তাহার পিতা। এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বুঝিয়াছিল, আনন্দদেবই রাজাকে পাগল করিয়াছে তার পর তাঁর হাত হইতে সমস্ত ক্ষমতা কাড়িয়া ইংরাজকে দিয়াছে। সেইজন্য ব্রাহ্মণ তার পিতাকে হত্যা করিবার জন্য প্রতিদিন ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রতিদিন সুযোগ সন্ধান করে।

মুকুন্দ বলিতেছিল, হারলি শুনিতেছিলেন। তিনি ভাবিলেন, এরূপ লোককে অনন্তপুর হইতে দূর করা হয় নাই কেন? রাজার সঙ্গে ব্রাহ্মণের কোনও সম্পর্ক নাই। এখানে তার ঘর নাই, পরিবার নাই। এরূপ লোকের অনন্তপুরে অবস্থানের উপযোগিতা তিনি কিছু দেখিতে পাইলেন না। তাই তিনি মুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এরূপ লোককে অনন্তপুর হইতে দূর করা হয় নাই কেন?"

মুকুন্দ কৌশলে বুঝাইল, শুধু বড় সাহেবের অসন্তুষ্টির ভয়ে কেহ বৃদ্ধকে কিছু বলিতে পারে না। সকলেই তাই নীরবে তাহার অত্যাচার সহ্য করে! রাজার অনুরোধে, বড় সাহেব বৃদ্ধকে অনন্তপুরে থাকিতে অনুমতি দিয়াছেন। এখন তাঁহার আশ্বাস পাইলেই পিতা ও পুত্রে নিশ্চিন্ত হয়।

হারলি আশ্বাস দিলেন। বলিলেন, প্রথম কিছুদিনত বৃদ্ধকে শ্রীঘরে রাখি। তারপর অন্য ব্যবস্থা।

আনন্দের আবেগ মুকুন্দ চাপিয়া রাখিতে পারিল না। সে সাহেবকে যত পারিল, ধন্যবাদ দিল। এবং এরূপ কার্য্যে যে একটা মহৎ ফল আছে, আর অনন্তপুরের রাজপ্রতিনিধিরূপী আনন্দদেবের কর্ম্মেই সে ফলের অস্তিত্ব, এটাও সে সাহেবকে বুঝাইতে ছাড়িল না।

সাহেব রতনকে উঠিতে আদেশ করিলেন। রতন আপনিই উঠিতে-

ছিলেন, সুতরাং সাহেবের আদেশের আর অপেক্ষা রহিল না। নবাগত সিপাহীগণের মধ্যে দুই চারিজন তাঁহাকে ধরিল। অপরে লাঠী ধরিয়া ঘেরিয়া রহিল। যে ব্যক্তি দড়ী আনিতে গিয়াছিল, সেও ফিরিয়া আসিল।

ব্রাহ্মণ মাথা তুলিয়া দেখিলেন সম্মুখে জয়োল্লসিত সাহেব। পার্শ্বে মুকুন্দ, চারিধারে সিপাহী।

একবার ঘাড় ফিরাইয়া, তিনি সিপাহীগুলাকে দেখিয়া লইলেন। দুই একজন পরিচিত সিপাহী মাথা হেঁট করিল। অপরিচিতের মধ্যে কেহ করিল, কেহ করিল না। যে করিল না, সে কেবল লাঠি কাঁধে করিয়া বুক ফুলাইয়া খাড়া হইতে জানে। লাঠি খেলিতে জানেনা। যাহারা খেলোয়াড় তাহারা মাথা তুলিয়া রাখিতে পারিল না। ব্রাহ্মণের প্রখর দৃষ্টিতে তাহারা আপনাদিগকে যথেষ্ট তিরস্কৃত বোধ করিল। দড়ী লইয়া যে বাঁধিতে আসিতেছিল, সে সহসা দাঁড়াইয়া গেল। যাহারা তাঁহাকে ধরিয়াছিল, তাহারা ব্রাহ্মণের চক্ষু দেখে নাই। দেখিলে কি করিত বলা যায় না।

মুকুন্দের কিন্তু বিলম্ব সহিতেছিল না। ব্রাহ্মণকে আবদ্ধ দেখিতে পাইলেই সে নিশ্চিন্ত হয়। দড়ী হাতে লোকটাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া, তাহাকে সত্বর কার্য্য নিষ্পন্ন করিবার আদেশ করিল। হার্লিও বৃথা বিলম্ব দেখিয়া বিরক্ত হইলেন। এবং বৃদ্ধকে বন্দী করিবার জন্য রুক্ষস্বরে আদেশ করিলেন। সকলেই ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বৃদ্ধের বন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত হইল।

ব্রাহ্মণ আর একবার সাহেবের মুখ পানে চাহিলেন। একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া হার্লি বলিলেন, বৃদ্ধ পাগল? মুখপানে কি দেখিতেছ? মনে মনে বড়ই রাগ হইতেছে, না?

রতন। যদিই হয়, তাহাতে কি আমার অপরাধ আছে, সাহেব?

হারলি। বড়ই ইচ্ছা হইতেছে, আমাকে কোনও রকমে শাস্তি দাও। কেমন ?

রতন। এক একবার হইতেছে, এক একবার হইতেছে না।

হার্লি। ইচ্ছা হইলে কি হইবে ? আমি ত আর দুর্ব্বল ছাতুখোর নিগার নই।

রতন। ইচ্ছা হইলে খুবই হয়। এক একবার মনে করিতেছি বিনাপরাধে প্রহার খাইয়া চুপ করিয়া থাকিব ? আবার ভাবিতেছি অদৃষ্ট।

একটা সিপাহী রতনের হাত টানিতে লাগিল, দড়ী দিয়া সে হাত বাঁধিবে। রতন বলিলেন "ক্ষণেক অপেক্ষা কর্!" তথাপি সে হাত টানিতে লাগিল, রতন তাহার হাত ধরিলেন। সিপাহী বুঝিল, অপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

রতন বলিতে লাগিলেন,—"ভাবিতেছি অদৃষ্ট। অদৃষ্টে আমার রক্তপাত ছিল। নতুবা চলিয়াছি আনন্দদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে; পথে তোমার মার খাইব কেন ?"

হার্লি। আনন্দদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে, না তাহাকে হত্যা করিতে ?

রতন। এই ছোকরা তোমাকে বুঝাইয়াছে বুঝি ?

রতন ও সাহেবের দৃষ্টি যুগপৎ মুকুন্দের উপর পড়িল। মুকুন্দের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সাহেব বুঝিলেন, মুকুন্দ ভীত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ হইতে অনিষ্টের আশঙ্কা করিতেছে। তাহাকে অভয় দিবার জন্য ব্রাহ্মণকে বলিলেন—"যে বুঝাক্, তোমাকে রাঁচি যাইতে হইবে।"

রতন। কেন ?

হার্লি। অনন্তপুরে তোমার আর থাকা চলিবেনা।

রতন। সে আমিও বুঝিয়াছি। অনন্তপুর ত্যাগ করিব বলিয়াই

াটীর বাহির হইয়াছি। যাইবার পূর্ব্বে রাজকুমারীর জন্য দুইটা কথা বলিতে আনন্দদেবের কাছে চলিয়াছিলাম। তার ফল পাইয়াছি। আর বলিতে ইচ্ছা নাই। সাহেব আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি অনন্তপুর ছাড়িয়া চলিয়া যাই।

হার্‌লি। অমনি ছাড়িতে ইচ্ছা নাই। রাঁচিতে লইয়া তোমার সহিত দিন কয়েক আমোদ করিব, তারপর ছাড়িয়া দিব।

রতন বুঝিলেন সাহেব রহস্য করিতেছে। রাঁচিতে লইয়া শাস্তি দিবে। হয় ত কারাগারে নিক্ষেপ করিবে। বুঝিয়া উত্তর করিলেন, "রাচিতে না লইয়া ছাড়িবে না ?"

হার্‌লি। এমন প্রিয় বস্তুটী পাইয়াছি, কেমন করিয়া ছাড়ি !

রতন। আমি রাঁচি যাইব না।

হার্‌লি। অবশ্যই যাইতে হইবে।

রতন। এমন ক্ষমতাবান ত দেখি নাই, যে রতনকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও স্থানে লইয়া যায়।

হার্‌লি। এখনি দেখাইতেছি।

রতন। তুমি ? যে বিনাপরাধে একজন বৃদ্ধের গায় চুরি করিয়া হস্তক্ষেপ করিতে পারে, আমাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কর্ম্ম করান সে বানরের কর্ম্ম নয়।

মুকুন্দের সম্মুখে, সিপাহীদের সম্মুখে অপমানিত হইয়া, হার্‌লি একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া গেলেন। কুটুম্বিতাজ্ঞাপক দুই চারিটা মধুর বাক্যে ব্রাহ্মণকে আপ্যায়িত করিয়া, তাঁহার অঙ্গে পদ প্রহার করিলেন।

বারম্বার অপমান রতনের সহ্য হইল না। মুহূর্ত্তে তাঁহার ক্রোধ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ভগ্ন-লাঙ্গুল সিংহের ন্যায় ব্রাহ্মণ এক ভীষণ হুঙ্কার প্রদান করিলেন। কাছারি বাড়ী ও রাজপ্রাসাদে প্রতিহত

হইয়া সে হুঙ্কার সহস্র প্রতিধ্বনিতে প্রান্তর সমীরণ আলোড়িত করিয়া ফেলিল। সকলেই স্তম্ভিত।

হারলিও চমকিত। মনুষ্যের কণ্ঠ হইতে এরূপ ভীম হুঙ্কার আর কখন তিনি শুনেন নাই। এতগুলা সিপাহীর মধ্যেও, তিনি আপনাকে নিঃসহায় বোধ করিলেন। মুকুন্দ একবারে সাহেবের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল।

হুঙ্কারের পরই, ব্রাহ্মণ একবার ভীমবেগে অঙ্গ সঞ্চালন করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রহরীগুলা ভারহীন তুলাসমষ্টিবৎ দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। ব্যাপার দেখিয়া সাহেব কতকটা হতভম্ব হইয়া গেলেন। বুঝিলেন, পলায়ন ভিন্ন জীবন রক্ষার অন্য উপায় নাই। কিন্তু এতগুলা লোকের সম্মুখে প্রাণ লইয়া পলায়ন, তাঁহার ন্যায় শক্তিমান পুরুষের অসম্ভব হইয়া উঠিল।

রতনও তাঁহাকে পুনঃ প্রহারের অবকাশ দিলেন না। সাহেব কর্ত্তব্যস্থির করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। বজ্রমুষ্টিধৃত হারলি ভূতলপ্রোথিত দণ্ডবৎ নিশ্চল। তাঁহার হস্তপদ সঞ্চালনেরও শক্তি রহিল না।

সাহেবকে ধৃত দেখিয়া, মুকুন্দ চক্ষের নিমেষে পলাইল। পলাইবার কালে একজন ভৃত্যকে দেখিয়া বলিল "আমার পিতাকে এইবেলা খবর দাও। তার প্রাণ বাঁচাও।"

সাহেবকে বিপন্ন বুঝিয়া, সিপাহীরা প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া রতনকে আক্রমণ করিল। তিনি উচ্চ চীৎকারে তাহাদিগকে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। তাহারা নিষেধ মানিল না। রতন এইবার লাঠীর অভাব অনুভব করিলেন। ভাবিলেন, লাঠী সঙ্গে না আনিয়া ভুল করিয়াছি। ইতিমধ্যে দুই চারি ঘা লাঠী তাঁহার পৃষ্ঠে পড়িয়াছে। তখন কাপুরুষ সিপাহীগুলাকে কিছু শিক্ষা দিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল।

রতন সাহেবকে অভয় দিলেন। বলিলেন, আমা হইতে জীবনের কোনও আশঙ্কা করিও না। আমি নরঘাতী নই। আমি তোমাকে কিছু বলিব। ক্ষণেক অপেক্ষা কর। আমি এই কাপুরুষগুলাকে একজন নিরস্ত্র বৃদ্ধের পৃষ্ঠে যষ্টি প্রহারের ফলটা দেখাইয়া দিই। যদি পুরুষত্বের অভিমান রাখ, স্থান ত্যাগ করিও না।"

এই বলিয়া রতন সাহেবকে পরিত্যাগ করিলেন। সাহেবের অঙ্গে আঘাত লাগিবার ভয়ে, সিপাহীরা তাঁহাকে মনোমত প্রহার করিবার সুবিধা পাইতেছিল না। এইবারে পাইল। প্রবলতর বেগে দুই চারি ঘা লাঠী রতনের পৃষ্ঠে পড়িল। ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধশ্বাসে বটবৃক্ষাভিমুখে ছুটিলেন।

সিপাহীরা ভাবিল, বৃদ্ধ প্রাণভয়ে পলাইতেছে। তখন জয়োল্লাসে কোলাহল করিতে করিতে, সকলে তাঁহার পশ্চাতে ছুটিল। সকলের আগে, লাঠীহাতে সিপাহী। তৎপশ্চাৎ অপর সিপাহী। সকলের পশ্চাৎ জনতা। দুই চারি জন করিয়া, গ্রামের চতুর্দ্দিক হইতে পুরুষ, স্ত্রী, বালক, বালিকা ঘটনাস্থলে সমবেত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে সকলেই কিন্তু রতনকে দেখিতে পাইতেছিল না। সকলে ব্যাপারটাও ভাল বুঝিতে পারিতেছিল না। এখন সিপাহীদিগকে ছুটিতে দেখিয়া তাহারাও হৈ হৈ করিতে করিতে ছুটিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

হুঙ্কার শব্দ ব্রাউনেরও কাণে পৌঁছিয়াছিল। তিনিও সম্বে চমকিত হইয়াছিলেন। এবং সহচরকে বিপন্ন বুঝিয়া তাঁহার উদ্ধারার্থে আসিতেছিলেন।

আসিতে আসিতে দেখিলেন বৃদ্ধ পলাইতেছে। শুধু তাই নয়। অসংখ্যলোকে তাহার অনুসরণ করিতেছে। তিনি অনুমান করিলেন,

বুঝি বৃদ্ধ হারলিকে হত্যা করিয়াছে। অথবা বিষম আহত করিয়াছে। নতুবা এত লোক বৃদ্ধকে ধরিতে ছুটিবে কেন? বৃদ্ধের বেনিয়ানটীও নাসিকারক্তে রঞ্জিত হইয়াছিল। সুতরাং ব্রাউনের সন্দেহের যথেষ্ট কারণ ছিল।

প্রথমেই তিনি হারলির কাছে ছুটিয়া চলিলেন।—দেখিলেন, অক্ষত দেহে হারলি দণ্ডায়মান। বৃদ্ধ কর্তৃক আঘাত সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। উত্তর পাইলেন না।

তখন ব্রাউনের অন্যরূপ ধারণা হইল। তিনি বুঝিলেন, আর কিছু নয়; বৃদ্ধ সুযোগ পাইয়া পলাইয়াছে। সিপাহীরা, হারলির আদেশে, তাহাকে বন্দী করিতে ছুটিয়াছে। ইহাও বুঝিলেন, অহঙ্কৃত হারলি তাঁহার কাছে অপমানিত হইয়াছে। তাই কথা কহিল না।

বৃদ্ধের পরিণাম দর্শনে কৌতুহলী ব্রাউন তন্মুহূর্ত্তেই স্থানত্যাগ করিলেন।

হারলি বৃদ্ধের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। বৃদ্ধের অমানুষিক বল তাঁহাকে বিস্মিত করিয়াছিল। শক্তিমান বলিয়া হারলির স্বদেশে একটা গৌরব আছে। ব্যায়াম কৌশল ও মুষ্টিচালন প্রদর্শনে, তিনি দেশে অনেকবার পুরস্কার পাইয়াছেন। আজ তাঁহার সেই বলগৌরবে আঘাত লাগিয়াছে।

হারলি ভাবিতেছিলেন, এরূপ বৃদ্ধ কি 'পাগল'? যেরূপ বলে বৃদ্ধ তাঁহার হাত ধরিয়াছিল, ইচ্ছা করিলে চক্ষের নিমেষে সে হাতখানি ভাঙ্গিয়া দিতে পারিত। কিন্তু বৃদ্ধ তাহার কোনও অনিষ্ট করে নাই। তাহার চক্ষে ক্রোধের সামান্য লক্ষণও দেখিতে পায় নাই। এরূপ বৃদ্ধকে পাগল ভাবিতে হারলির আর সাহস হইল না। কথোপকথনে বৃদ্ধের মুখে হারলি যে সব কথা শুনিলেন, তাহাও কি পাগলের কথা?

বিশেষতঃ, মুকুন্দের আচরণে তিনি বড়ই বিরক্ত হইয়াছেন।

মুকুন্দকে রক্ষা করিতেই তাঁহার সেখানে আগমন। মুকুন্দের উদ্ধারার্থেই তিনি বৃদ্ধকে প্রহার করিয়াছেন। বৃদ্ধের মুখের একটা কথা শুনিবারও অবকাশ গ্রহণ করেন নাই। সহচরের নিকট অপমান লাঞ্ছনা সমস্তই মুকুন্দের জন্য। সেই মুকুন্দ তাঁহাকে বিপন্ন দেখিয়া পলাইল!

লজ্জা আসিয়া, অহঙ্কারের স্থান অধিকার করিল। অনুতাপে হার্লির হৃদয় বিদ্ধ হইতে লাগিল। মুকুন্দের উপর ঘৃণা, তাহার পিতা আনন্দদেবের স্কন্ধেও পতিত হইল।

বৃদ্ধের সঙ্গে কথোপকথনে হার্লি বুঝিয়াছেন, রাজকুমারীর কোন অভাব মোচনের জন্য, বৃদ্ধ আনন্দদেবের কাছে আবেদন করিতে চলিয়াছিল। সেই জন্যই মুকুন্দের সহিত তাহার সাক্ষাৎ। কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে ফল বিপরীত হইয়াছে। বৃদ্ধ প্রতীকারের পরিবর্ত্তে প্রহার উপহার পাইয়াছে।

চিন্তার জ্বালায়, হার্লি ক্রমে অস্থির হইয়া পড়িলেন। বৃদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া—মুকুন্দ, আনন্দ, রাজকুমারী, রাজা, ইংরাজ, ইংরাজের শাসননীতি প্রভৃতি শত চিন্তার বিভিন্নমুখ প্রখরাবর্ত্তে পড়িয়া তাঁহার মস্তিষ্কটা যেন খণ্ডিত হইতে লাগিল।

তিনি অল্পদিন রাঁচি আসিয়াছেন। যদিও ইতিমধ্যে অনন্তপুরের সংবাদ তাঁহার শ্রুতিগোচর হইয়াছে, তথাপি তিনি সমস্ত বিষয়টা ভালরূপ বুঝিতে পারেন নাই। শুনিয়াছেন, রাজা বিকৃত মস্তিষ্ক। সেইজন্য রাজ্যশাসন ভার তাঁহাদেরই উপর। আনন্দদেব তাঁহাদেরই মনোনীত দেওয়ান।

দুই একবার ইহার পূর্ব্বে তাঁহার অনন্তপুরে আসাও হইয়াছে। আসিয়া আনন্দদেবকে দেখিয়াছেন, তাহার পুত্র মুকুন্দকে দেখিয়াছেন। রাজাকেও দেখেন নাই, তৎসম্পর্কীয় অন্য কাহাকেও দেখেন নাই। রাজবাটী দূর হইতে দেখিয়া চলিয়া গিয়াছেন। ভিতরে প্রবেশ করেন নাই।

রাজা, রাজকুমারী, এবং রাজ-সম্পর্কীয় সমস্ত ব্যাপারটা তাঁহার প্রহেলিকাময় বোধ হইল। তিনি চিন্তাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আপনাকে একটা স্বপ্নময় কূলের সমীপস্থ অনুভব করিলেন। বৃদ্ধকে দেখিয়াছেন; এক্ষণে বৃদ্ধ যাঁর সহচর, সেই রাজাকেও যেন তিনি দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, সেই কূলে দাঁড়াইয়া রাজা, রাণী, রাজকুমারী, রাজসহচর—সকলে হাত ধরাধরি করিয়া, তাঁহাদের ধর্ম্ম, জ্ঞান, সভ্যতা, প্রিয় চিকীর্ষা, সত্যপ্রিয়তা এক একটী ফুটন্ত সৌরভময় ফুল, নিষ্ঠীবনসক্ত করিয়া, আবর্জনাময় ঘনাবর্ত্তে নিক্ষেপ করিতেছে!

দূর হইতে আবার একটা ভীষণ শব্দ আসিয়া হার্লির চিন্তাস্রোতে বাধা দিল। তিনি মাথা তুলিয়া দেখিলেন, ব্রাউন একটা উচ্চভূমির উপর দাঁড়াইয়া কি যেন দেখিতে দেখিতে অতি আনন্দে করতালী দিতেছে।

তাঁহারও দেখিবার কৌতূহল হইল। তিনি সেই উচ্চ স্থান লক্ষ্যে ছুটিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কঠোর দুর্ভর, চিন্তামগ্ন হার্লিকে পরিত্যাগ করিয়া, ব্রাউন ব্রাহ্মণের পরিণাম দেখিতে ছুটিয়াছেন। কিছুদূর যাইয়াই তিনি বুঝিলেন, বৃদ্ধের সমীপস্থ হওয়া এখন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। হার্লির কাছে আসিতে, ও সেখান হইতে ফিরিতে, অনেক বিলম্ব হইয়াছে। তাই তিনি দূর হইতে দেখিবার সুযোগ খুঁজিলেন। কালাবাঁধের এক অংশে একটী উচ্চ অর্দ্ধভগ্ন ইটের পাঁজা ছিল। চাপা পড়িয়া, তৃণ গুল্মাদি জন্মিয়া সেটা একটী ছোট পাহাড়ের মত হইয়াছে। ব্রাউন থড়া বহিয়া তাহার উপরে উঠিলেন।

উঠিয়া তিনি দেখিলেন, বৃদ্ধ এখন পর্য্যন্ত ছুটিতেছে। সিপাহী-

গুলাও সমভাবে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে। এখন, যদিও ধরিতে পারে নাই, তথাপি ব্রাউনের বোধ হইল, বৃদ্ধের ধরা পড়িতে আর বড় বিলম্ব নাই। বৃদ্ধের বুদ্ধিহীনতায় তাঁহার মনে বিশেষ কষ্ট হইল। বৃদ্ধ বটবৃক্ষাভিমুখেই বা ছুটিতেছে কেন? সেখানে কে তাহাকে এত অধিক লোকের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে? কোন লোকালয় উদ্দেশে ছুটিলে, বৃদ্ধের রক্ষা পাইবার অনেক সম্ভাবনা ছিল। তাহা করিল না দেখিয়া, ব্রাউন তাহার নির্ব্বুদ্ধিতারই পরিচয় পাইলেন।

মুহূর্ত্তে তাঁহার মতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ব্রাউন ভাবিলেন, তবে বোধ হয়, মতিহীন বৃদ্ধ হার্লির কোন বিশেষ অমর্য্যাদা করিয়াছে! হার্লি বিশেষ ক্ষমাশীল নয় বলিয়াই বৃদ্ধকে প্রহার করিয়াছে। হার্লির উপর তাহার যতটা ক্রোধ হইয়াছিল, বৃদ্ধের এই এক নির্ব্বুদ্ধিতায় তাহার অর্দ্ধেক প্রশমিত হইয়া গেল।

তথাপি ব্রাউন দেখিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ ধরা পড়ে পড়ে এমন সময়, তিনি দেখিতে পাইলেন, ঘনোৎকীর্ণাবিদ্যুল্লতার ন্যায় যবনিকান্তরালের কোন অজ্ঞাত প্রদেশ হইতে একটী অপূর্ব্ব সুন্দরী বালিকা বৃদ্ধের কাছে ছুটিয়া আসিল। আসিয়াই তাহার হাতে একগাছি লাঠী দিল। বৃদ্ধ সাগ্রহে সেই যষ্টি গ্রহণ করিল। বালিকাও দেখিতে দেখিতে সেই অজ্ঞাতদেশে মিলাইল!

ব্রাউনের দৃষ্টি সেই নরপ্রাচীর ভেদ করিয়া, সেই অনিশ্চিতদেশ আলোড়িত করিয়া,—সেই অপূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুটির সন্ধান করিল। সন্ধান মিলিল না। চক্ষু একবার বটবৃক্ষের ফলস্বরূপ তাহাকে ভিক্ষা করিল। সে ফল আর ঝরিল না।

এইবারে ঘটনাস্থলের কথাটা বলিব। রতনের হাতে লাঠী আসিয়াছে। তাহার গতিরও নিবৃত্তি হইয়াছে। রতনকে দাঁড়াইতে

লাঠীয়ালগণ এতক্ষণে বুঝিতে পারিল ব্রাহ্মণ ছুটিতেছিল কেন। এ ছোটা পলায়ন নয়। এ ছোটা তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য। একটু দ্রুত অগ্রগমন! সুতরাং অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া, কে আর এমন সাক্ষাৎ কৃতান্তের মুখে অগ্রসর হইবে! কাজেই সকলেই অগ্র পশ্চাৎ ভাবিবার জন্য দাঁড়াইয়া গেল। বৃদ্ধকে বন্দি করিবার ফল যখন অতি সামান্য, তখন সকলের আগে গিয়া প্রাণটাকে বিপন্ন করা কেহই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিল না।

রতন উচ্চৈস্বরে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"এক একজনে লড়িতে চাও, না সকলে এক সঙ্গে লড়িতে চাও।"

এই বলিয়া রতন দীর্ঘদেহ উন্নত করিয়া, দীর্ঘতর যষ্টিতে ভর দিয়া দাঁড়াইলেন। সকলে সে বরবপু নিরীক্ষণ করিতে লাগিল—কেহ কোনও কথা কহিল না।

রতন তেমনি উচ্চকণ্ঠে আর একবার তাহাদিগকে আহ্বান করিলেন। এবারেও কেহ উত্তর দিলনা। সকলে এক সঙ্গে ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করিলেও অনেকে মরিবে না, এমন কথা কে বলিতে পারে? ঘড়বড়সিং ভাবিল, "ব্রাহ্মণ কট্‌মট্ করিয়া আমার পানে চাহিয়াছিল। কাজেই, আগে সে আমাকে মারিয়া ফেলিবে।" ফতুয়া খাঁ মনে করিল, "আমি দড়ীর গায়ে হাত দিয়াছিলাম, সুতরাং আমার প্রাণটাই আগে যাইবে।" এইরূপ আপন আপন বিপদ কল্পনা করিয়া সিপাহীরা চুপ করিয়া রহিল। তৃতীয় বার, রতন তাঁহাদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। সিপাহীদের মধ্যে একজন সাহস করিয়া অগ্রসর হইল। সে ব্যক্তি রতনের কাছে গিয়া, তাঁহার পাদমূলে লাঠী গাছটী রক্ষা করিল এবং তাঁহার পাদবন্দনা করিয়া ক্ষমা চাহিল। বলিল—"গুরুজী, চরণে অপরাধ করিয়াছি।"

রতন এতক্ষণ তাহাকে চিনিতে পারেন নাই। কথা শুনিয়া

টানিলেন। বলিলেন, "সদাশিব !" সদাশিব মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সদাশিব ক্ষত্রিয় সন্তান। দশ বৎসর পূর্ব্বে, সে রতনের কাছে কুস্তি ও লাঠী খেলা শিখিয়াছিল। শিখিয়া সরগুজা, পদ্মা, ধলভূম প্রভৃতি নানা রাজার অধীনে চাকুরি করিয়া অল্পদিন হইল অনন্তপুরে ফিরিয়াছে।

অনন্তপুরে আসিয়াই সদাশিব রাজ্য সম্বন্ধে সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়াছিল। আনন্দদেব তাহাকে জমাদারী পদ দিয়াছেন। রুটী মারা যাইবার ভয়ে, সদাশিব গুরুজীর সহিত দেখা করিতে পারে নাই। রুটীর খাতিরে অন্য সিপাহীদের সঙ্গে তাহাকেও গুরুজীর পশ্চাৎ ছুটিতে হইয়াছে। কিন্তু লজ্জায় সে দলের সম্মুখে আসিতে পারে নাই। বরাবর পিছনেই ছিল। ব্রাহ্মণের বারম্বার আহ্বানে অনুতপ্ত গুরুজীর পদে প্রণত হইল। অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিল।

গুরুজী কাহারও অপরাধ গ্রহণের লোক নহেন, বিশেষতঃ শিষ্যের। অকৃতদার ব্রাহ্মণ এক একটী শিষ্যকেই পুত্র জ্ঞান করিতেন। তিনি সদাশিবকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং তাহার সঙ্গীদের অভিপ্রায় জানিতে চাহিলেন।

সদাশিব বলিল, "গুরুজীর সম্মুখে লাঠী ধরে এমন শক্তিমান তাহাদের মধ্যে কেহ নাই। তবে গুরুজীর অভয় পাইলে তাহারা সকলে মিলিয়া তাঁহার সঙ্গে একবার লাঠী খেলে।"

ঈষৎ হাসিয়া রতন অভয় দিলেন। সদাশিব ফিরিয়া সঙ্গীদের সংবাদ দিল। প্রাণের আশঙ্কা নাই শুনিয়া, সকলেই লাঠী খেলিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। মহোল্লাসে সকলে একটা চীৎকার করিয়া উঠিল। জনসাধারণ বুঝিল,—এইবারে লড়াই বাধিয়াছে। সকলেই পলাইবার পথটা ঠিক্ করিয়া রাখিল। তেমন তেমন দেখিলে, সেই পথে পলাইবে।

এদিকে সিপাহীগণ রতনের আক্রমণ নিবারণের জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। রতন আক্রমণের প্রারম্ভে, একটী ভীষণ হুঙ্কার করিলেন। তা'পর প্রতিদ্বন্দ্বী সিপাহীদিগের বিপরীত দিকে কিছুদূর ছুটিয়া গেলেন। আবার বিদ্যুৎবেগে ফিরিলেন। আবার এক ভীষণ হুঙ্কার করিয়া 'হর-হর' শব্দে ভীষণলম্ফে জনতার মধ্যে পড়িলেন। লাঠীর ঠকাঠক্ শব্দে প্রান্তরসমীরণ ভরিয়া গেল।

ব্রাউন ইষ্টকস্তূপ হইতে এই অদ্ভুতদৃশ্য দেখিতেছিলেন। এবং অতি আনন্দে হাততালি দিতেছিলেন।

হার্লিও ব্যাপারটী দেখিবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। অল্পক্ষণ পরে তিনিও সেই পাঁজার উপর উঠিলেন। উঠিয়া যাহা দেখিলেন তাহা জীবনে ভুলিবার নয়। হার্লি দেখিলেন, একদিকে একা বৃদ্ধ,—অন্যদিকে শতাধিক প্রহরী লাঠী লইয়া যুদ্ধ করিতেছে! আর দেখিলেন, ক্ষিপ্রকারিতায় ও প্রহেলিকাময় রণকৌশলে সেই বৃদ্ধ যেন দৈব-যৌবনবলে শতস্থানে যুগপৎ আবির্ভূত হইতেছে।

দেখিতে দেখিতে সেই শতাধিক প্রহরী পরাস্ত হইয়া রণে ক্ষান্ত দিল। এবং সকলে নতজানু হইয়া বৃদ্ধকে অভিবাদন করিল। জনসাধারণ ব্যাপারটা কি ভাল বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহারা লাঠালাঠীর ব্যাপার দেখিয়া, আগে হইতেই পলায়ন আরম্ভ করিয়াছিল। এক্ষণে প্রহরীরাও ফিরিতে আরম্ভ করিল।

যুদ্ধে কেহই আহত হয় নাই। যে দু'একজন ভাল খেলোয়াড় প্রাণপণে ব্রাহ্মণের সঙ্গে লড়িয়াছিল, তাহারাই স্থানে স্থানে সামান্য আঘাত পাইয়াছিল। আঘাত পাইয়াই তারা বুঝিয়াছিল, ব্রাহ্মণ দয়া করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করেন নাই। ব্রাহ্মণের অঙ্গে কেহই কিন্তু যষ্টিস্পর্শ করিতে পারে নাই!

অল্পক্ষণ মধ্যেই, প্রান্তর জনশূন্য! ব্রাউন ব্রাহ্মণকেও আর দেখিতে

চিনিলেন। বলিলেন, "সদাশিব!" সদাশিব মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সদাশিব ক্ষত্রিয় সন্তান। দশ বৎসর পূর্ব্বে, সে রতনের কাছে কুস্তি ও লাঠী খেলা শিখিয়াছিল। শিখিয়া সরগুজা, পদ্মা, ধলভূম প্রভৃতি নানা রাজার অধীনে চাকুরি করিয়া অল্পদিন হইল অনন্তপুরে ফিরিয়াছে।

অনন্তপুরে আসিয়াই সদাশিব রাজ্য সম্বন্ধে সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়াছিল। আনন্দদেব তাহাকে জমাদারী পদ দিয়াছেন। রুটী মারা যাইবার ভয়ে, সদাশিব গুরুজীর সহিত দেখা করিতে পারে নাই। রুটীর খাতিরে অন্য সিপাহীদের সঙ্গে তাহাকেও গুরুজীর পশ্চাৎ ছুটিতে হইয়াছে। কিন্তু লজ্জায় সে দলের সম্মুখে আসিতে পারে নাই। বরাবর পিছনেই ছিল। ব্রাহ্মণের বারম্বার আহ্বানে অনুতপ্ত গুরুজীর পদে প্রণত হইল। অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিল।

গুরুজী কাহারও অপরাধ গ্রহণের লোক নহেন, বিশেষতঃ শিষ্যের। অকৃতদার ব্রাহ্মণ এক একটী শিষ্যকেই পুত্র জ্ঞান করিতেন। তিনি সদাশিবকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং তাহার সঙ্গীদের অভিপ্রায় জানিতে চাহিলেন।

সদাশিব বলিল, "গুরুজীর সম্মুখে লাঠী ধরে এমন শক্তিমান তাহাদের মধ্যে কেহ নাই। তবে গুরুজীর অভয় পাইলে তাহারা সকলে মিলিয়া তাঁহার সঙ্গে একবার লাঠী খেলে।"

ঈষৎ হাসিয়া রতন অভয় দিলেন। সদাশিব ফিরিয়া সঙ্গীদের সংবাদ দিল। প্রাণের আশঙ্কা নাই শুনিয়া, সকলেই লাঠী খেলিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। মহোল্লাসে সকলে একটা চীৎকার করিয়া উঠিল। জনসাধারণ বুঝিল,—এইবারে লড়াই বাধিয়াছে। সকলেই পলাইবার পথটা ঠিক্ করিয়া রাখিল। তেমন তেমন দেখিলে, সেই পথে পলাইবে।

এদিকে সিপাহীগণ রতনের আক্রমণ নিবারণের জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। রতন আক্রমণের প্রারম্ভে, একটী ভীষণ হুঙ্কার করিলেন। তারপর প্রতিদ্বন্দ্বী সিপাহীদিগের বিপরীত দিকে কিছুদূর ছুটিয়া গেলেন। আবার বিদ্যুৎবেগে ফিরিলেন। আবার এক ভীষণ হুঙ্কার করিয়া 'হর-হর' শব্দে ভীষণলম্ফে জনতার মধ্যে পড়িলেন। লাঠীর ঠকাঠক্ শব্দে প্রান্তরসমীরণ ভরিয়া গেল।

ব্রাউন ইষ্টকস্তূপ হইতে এই অদ্ভুতদৃশ্য দেখিতেছিলেন। এবং অতি আনন্দে হাততালি দিতেছিলেন।

হার্লিও ব্যাপারটী দেখিবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। অল্পক্ষণ পরে তিনিও সেই পাঁজার উপর উঠিলেন। উঠিয়া যাহা দেখিলেন তাহা জীবনে ভুলিবার নয়। হার্লি দেখিলেন, একদিকে একা বৃদ্ধ,—অন্যদিকে শতাধিক প্রহরী লাঠী লইয়া যুদ্ধ করিতেছে! আর দেখিলেন, ক্ষিপ্রকারিতায় ও প্রহেলিকাময় রণকৌশলে সেই বৃদ্ধ যেন দৈব-যৌবনবলে শতস্থানে যুগপৎ আবির্ভূত হইতেছে।

দেখিতে দেখিতে সেই শতাধিক প্রহরী পরাস্ত হইয়া রণে ক্ষান্ত দিল। এবং সকলে নতজানু হইয়া বৃদ্ধকে অভিবাদন করিল। জন-সাধারণ ব্যাপারটা কি ভাল বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহারা লাঠালাঠীর ব্যাপার দেখিয়া, আগে হইতেই পলায়ন আরম্ভ করিয়াছিল। এক্ষণে প্রহরীরাও ফিরিতে আরম্ভ করিল।

যুদ্ধে কেহই আহত হয় নাই। যে দু'একজন ভাল খেলোয়াড় প্রাণপণে ব্রাহ্মণের সঙ্গে লড়িয়াছিল, তাহারাই স্থানে স্থানে সামান্য আঘাত পাইয়াছিল। আঘাত পাইয়াই তারা বুঝিয়াছিল, ব্রাহ্মণ দয়া করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করেন নাই। ব্রাহ্মণের অঙ্গে কেহই কিন্তু যষ্টিস্পর্শ করিতে পারে নাই।

অল্পক্ষণ মধ্যেই, প্রান্তর জনশূন্য! ব্রাউন ব্রাহ্মণকেও আর দেখিতে

পাইলেন না। তখন ধীরে ধীরে পাঁজা হইতে নামিতে লাগিলেন। নামিবার সময় হার্‌লিকে দেখিলেন,—এতক্ষণ দেখিতে পান নাই। দেখিয়াও, ব্রাউন কোনও কথা কহিলেন না। পরন্তু মুখ ফিরাইয়া নামিয়া গেলেন। যেদিকে সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব বালিকামূর্ত্তিটী প্রথম বিকশিত হইয়াছিল, মুগ্ধযুবক সেইদিকে চলিলেন।

আবার তাঁহার চক্ষে ব্রাহ্মণের দেবমূর্ত্তিটী ফুটিয়া উঠিয়াছে! এবারে তাঁহার স্থির বিশ্বাস হইয়াছে, যে সেরূপ বিজয়শ্রীসেবিত মহাকায় পুরুষ, সেরূপ অনৈসর্গিকশক্তির অধিকারী বৃদ্ধ, কখন 'মানুষ' হইতে পারে না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সহচরের অবজ্ঞায় হার্‌লি মর্ম্মাহত হইলেন। তথাপি তিনি তাঁহার উপর বিরক্ত হইতে পারিলেন না। ব্রাউনের ঘৃণা প্রকাশের অধিকার আছে। কিন্তু ব্রাউনের উপর ক্রোধ-প্রকাশে তাঁহার অধিকার কই?

হার্‌লি অনেকক্ষণ পাঁজার উপর দাঁড়াইয়া রহিলেন। বৃদ্ধ ফিরিয়া তাঁহাকে কি জিজ্ঞাসা করিবে বলিয়া গিয়াছে। তিনি বৃদ্ধের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ব্রাউনের উপর তাঁর দৃষ্টি পড়িল।

ব্রাউন বাংলায় না ফিরিয়া, বটবৃক্ষের দিকে চলিয়াছেন।

হার্‌লি দেখিলেন, ব্রাউন বটবৃক্ষের তলদেশে উপস্থিত হইয়া, বৃক্ষের উপরে, নীচে, চারিদিকে কি যেন সন্ধান করিল। তারপর সেস্থান ত্যাগ করিয়া, সুবর্ণরেখার তীরে উপস্থিত হইল। তিনি বুঝিলেন—ব্রাউন অন্বেষণের বস্তুটী খুঁজিয়া পাইতেছে না।

হার্‌লি ভাবিলেন, সে বস্তুটী কি?—সে কি বৃদ্ধ? তাঁহার আচরণে ব্যথিত হইয়া, ব্রাউন কি তাঁহারই জন্য বৃদ্ধের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে চলিয়াছে?

দেখিতে দেখিতে ব্রাউন অদৃশ্য হইলেন। অভুতপ্ত হার্‌লি ভাবি-

লেন, "কি করিলাম? অকারণ ঔদ্ধত্য দেখাইতে গিয়া সহচরের কাছে মাথা হেঁট করিলাম!" তাঁহার আচরণের জন্য, ব্রাউন হয়ত বৃদ্ধের কাছে ক্ষমা চাহিবে। বলিবে—সকল ইংরাজ 'হার্‌লি' নয়। ইংরাজ-যুবক বৃদ্ধকে দেখিলে শ্রদ্ধা করে। অসহায় দেখিলে, প্রাণপণে সেবার জন্য অগ্রসর হয়। 'বর্ণে'র প্রশ্ন তখন তার মনে উঠে না। লোলঅঙ্গে বজ্রপাদুকার স্পর্শসুখ অনুভব করাইয়া, প্রীতি সম্ভাষণ করে না।

হার্‌লি মনে মনে স্থির করিলেন, বৃদ্ধ ফিরিলে, সর্ব্বাগ্রে তাঁহার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিবেন। তারপর, তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া—যদি কিছু করিতে হয়—সে কার্য্য নিষ্পন্ন করিবেন। বৃদ্ধ যদি অর্থের প্রত্যাশী হয়, ত যথেষ্ট অর্থ দিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না।

বৃদ্ধ কিন্তু ফিরিল না। হার্‌লি চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন—কোথাও বৃদ্ধের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। নীচে আসিলেন। যেখানে বৃদ্ধ দাঁড়াইতে বলিয়াছিল, সেইখানে ফিরিলেন। তাহার প্রত্যাগমন প্রত্যাশায়, বহুক্ষণ ধরিয়া, ইতস্ততঃ পাদচারণ করিলেন। বৃদ্ধের ফিরিবার লক্ষণ দেখা গেল না।

হতাশ হইয়া হার্‌লি বাংলায় ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, একজন যুবক তাঁহার দিকে আসিতেছে।

যুবক—সদাশিব। সদাশিব সাহেবের নিকট আসিয়া, সেলাম করিয়া বলিল, "সাহেব! তুমিই কি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অপেক্ষা করিতেছ?"

হার্‌লি উত্তর করিল, "হাঁ।"

সদাশিব। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না।

হার্‌লি। তিনি যে আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন!

সদা। বলিয়াছিলেন। কিন্তু যে প্রয়োজনে তিনি আপনার কাছে আসিতেন, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে।

হার্‌লি। আমি যে একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই।

সদা। তিনি অনন্তপুর ত্যাগ করিয়াছেন।

হার্‌লি কথাটা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, বৃদ্ধ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবার ভয়ে তাঁহার সহিত দেখা করিতে সাহস করিতেছে না। তাই, সদাশিবকে অভয় দিয়া বলিলেন,—"বৃদ্ধকে আমার কাছে আসিতে বল। আমি প্রতিশ্রুত হইতেছি,—তাহার কোনও অনিষ্ট করিব না।

সদাশিব বলিল, "সাহেব, আমি মিথ্যা বলি নাই। সত্য সত্যই ব্রাহ্মণ অনন্তপুর ত্যাগ করিয়াছেন।"

হার্‌লি। কবে ফিরিবেন ?

সদা। ফিরিবার সম্ভাবনা অতি অল্প। তোমাকে জানাইবার জন্য, তিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন।

হার্‌লি। প্রয়োজনটা কি ছিল, জানিতে পারি কি ?

সদা। বলিতে পারি। কিন্তু তাহাতে আমার অনিষ্ট হইবে।

হার্‌লি। অনিষ্ট ?—কে করিবে ? তুমি আমা হইতে অনিষ্টের কোনও আশঙ্কা করিও না।

সদা। তোমা হইতে অনিষ্ট না হইতে পারে,—কিন্তু আনন্দদেব জানিতে পারিলে অনিষ্ট হইবে,—আমার চাকরী যাইবে।

সাহেব অভয় দিলেন। সদাশিব বলিতে লাগিল। রাজকুমারী সঙ্গিনীর অভাবে কষ্ট পাইতেছেন। তাহার অভাব দূর করিবার ইচ্ছায়, ব্রাহ্মণ আনন্দদেবের কাছে আবেদন করিতে যাইতেছিলেন। অবশ্য-আবেদনের উদ্যোগেই ব্রাহ্মণ যে ফল পাইয়াছেন, তাহা ত সাহেবেরও অবিদিত নাই! যাই হ'ক সে কথা সাহেবকে জানাইতেও তাঁর ইচ্ছা ছিল; কিন্তু একটী সঙ্গিনী মিলিয়াছে বলিয়া, তাঁহার আর আসিবার প্রয়োজন হইল না।

হার্‌লি। আগে কি সঙ্গিনী ছিল ?

সদা। আগে সবই ত ছিল সাহের! শুধু কি সঙ্গিনী!—কত দরিদ্র রমণী রাজঅন্নে প্রতিপালিত হইয়াছে!

হার্‌লি। এখন্?

সদা। আনন্দদেব সব দূর করিয়া দিয়াছে। যে দুই এক জন আছে, তাহাতে রাজা ও রাণীর সম্যক্ পরিচর্য্যা হয় না।

হার্‌লি। সঙ্গিনী রাখিবে,—তার খরচ যোগাইবে কে?

সদা। সঙ্গিনী আমার স্ত্রী। তাহার অন্য খরচ লাগিবে না। তাহার পিতার যথেষ্ট অর্থ আছে। তবে আমি আনন্দদেবের অধীনে চাকরী করি। যদি কেহ একথা জানিতে পারে, আমার চাকরিটী যাইবে।

হার্‌লি। ভয় নাই। আমা হইতে একথা প্রকাশ পাইবে না। তবে স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ;—তোমরা কেমন করিয়া এ সম্বন্ধ গোপন রাখিবে?

সদা। অনন্তপুরে থাকিতে আমাদের পরস্পরে সাক্ষাৎ হইবে না।

বিস্মিত হইয়া, হার্‌লি সদাশিবের মুখের পানে চাহিলেন। দেখিলেন, সুন্দর যুবক স্থিরনেত্রে তাঁহার পানে চাহিয়া আছে। তাহার কথায় তিনি অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। বুঝিলেন, বৃদ্ধ সম্বন্ধে সকলি প্রহেলিকাময়।

সদাশিব সাহেবকে সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল। হার্‌লি আনন্দদেবের কাছে চলিলেন।

[ক্রমশঃ।]

থিয়েটার-লহরী।

(অনুকৃতি-কৌতুক।)*

ঐ মহা নগরী মাঝে বিরাজিছ সদা
সৌধ অট্টালিকা থিয়েটার ও। ধ্রু।
কত দিন ধরি' এ নগরী মাঝে
অভ্রভেদী চূড়া তুলি ও॥
স্থাণুর মতন ধবলাচলে
বসিয়া স্তিমিত লোচনে ও।
বহুদিন হ'তে ও দেহ তোমারি
হেরিল কত শত ঘটনা ও॥
নীরব ভাষায় কহিছ কি কথা
তোমার পুরাতন কাহিনী ও।
স্মরণে জাগিছে মরমে পরশি'
সরমে ভাবি সে কথা ও॥
যেই হেতু হায় তব প্রতিষ্ঠা
কলা, শুদ্ধামোদ কোথায় ও।
নাগরিক মনে সাধু ভাব দান,
দেশ-হিতৈষণা স্বপন ও॥
তব রঙ্গ মাঝে কত লক্ষ্মীমন্ত
কত লীলা খেলা খেলিল ও।
কত কলকণ্ঠী কোকিল ঝঙ্কারে
আমিরে ফকির করিল ও॥
যেই ক্ষণে হায় তোমার প্রতিষ্ঠা
মহা নগরীর মাঝে ও।
সেই ক্ষণ হ'তে ধনী পুত্র-বধূ
স্বামী-সহবাসে বঞ্চিত ও॥
সেইক্ষণ হ'তে [illegible] বালক
আক্ষেপে হতাশ প্রাণে ও।
সেইক্ষণ হ'তে কিশোর মস্তক
চর্ব্বণ কর সদা ও॥
সেইক্ষণ হ'তে কত পিতা মাতা
দীরঘ নিশ্বাস ফেলি'ও
তোমা পানে চাহি সজল নয়নে
শাপিছে তাপিছে তোমারে ও॥
আলোকে পুলকে মদিরা মাদকে
সদা পরিপূর্ণ ছিলে ও।
এবে সব নীরব ওরে রঙ্গমঞ্চ
গত যত বৈভব কালে ও॥

শ্রীরমেশচন্দ্র বসু।

* "নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা
তটশালিনী সুন্দর যমুনে ও।" সঙ্গীতের Parody.

আগরতলায় শ্রীপঞ্চমী।

অদ্য মাঘ-পঞ্চমীর পুনরাবির্ভাবে আমার বাল্য-স্মৃতি যুবকহৃদয়ে প্রতিঘাত করিতেছে, এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে কত কাহিনী—কতক মানসমোহিনী বেশে, কতক সুকোমল ঈষদবলোকনে, কতক তড়িৎ-চঞ্চল ইঙ্গিতে মানস-ক্ষেত্রে ভাব-বিভোর করিয়া তুলিতেছে, তার ইয়ত্তা নাই!

আমার বেশ স্মরণ আছে, যখন আমাদের মাষ্টার মহাশয় বৈকালিক স্কুলের ছুটি দিবার সময়, সরস্বতী পূজোপলক্ষে আগামী কল্যের বন্ধের সুমধুর কথা আমাদিগকে শুনাইয়াছিলেন, তৎশ্রবণে আমরা, মাষ্টার মহাশয় কর্ত্তৃক অনতিপূর্ব্ব লাঞ্ছিত ভাইভাগনীতে মিলিয়া, আহ্লাদ-বিকম্পিত স্বরে আমাদের ক্ষুদ্র পাণিপুট ললাটে স্থাপন করিয়া, অভ্যস্ত "প্রণাম" এই শব্দোচ্চারণ করিতে করিতে স্কুল-গৃহ বিদীর্ণ করিয়াছিলাম এবং সবেগে অন্তঃপুরাভিমুখে দৌড়িতে ছিলাম। তিনি আমাদের পশ্চাৎ হইতে গণ্ডগোল থামাইবার নিমিত্ত নাতিউচ্চ "চুপ, চুপ" শব্দ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁহার অসম্মাননা করিয়াছিলাম—আমাদের এইরূপ অবাধ্যতার দরুণ, পরদিনে তাঁহার কাছে উপস্থিত হইয়া প্রায়শ-প্রাপ্ত দণ্ডের কথা সে'দিনও ভুলিয়াছিলাম! এই একটি দিনের ছুটিতে, তৎমুহূর্ত্তে, তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ চিরজীবনের জন্য বিচ্যুত হইয়াছিল, মনে করিয়াছিলাম!

যাহা হউক, মাষ্টার মহাশয়ের অধিকার বহির্ভূত হইয়াও আমাদের রক্ষা ছিল না—আমাদিগকে তখনই অভিভাবিকাদের দখলে প্রবেশ করিতে হইল। তাঁহাদের উৎপীড়ন অন্তে নিতান্ত কষ্টদায়ক হইলেও পরিণামে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইত। কিন্তু আমাদের কেবল এক তৃতীয়াংশ দিবসের অধীনতায়, মাষ্টার বাবুর প্রতি অনির্দ্ধারিত সময়ের

নাতি কঠোর শাসন আমাদিগকে সর্ব্বদা সন্ত্রাসিত করিত। তাঁহার নিকট আমাদের অভিলাষ পূর্ণ হইত না।

সেই দিনও (মাষ্টার বাবুর নিকট বিদায় প্রাপ্ত হইয়া) কিছুক্ষণ খেলার পর সন্ধ্যা আসিল। অভিভাবিকাগণ আমাদিগকে টানিয়া লইয়া গেলেন—আমাদের যৎকিঞ্চিৎ স্বাধীনতা সম্যক রাত্রির জন্য বিলুপ্ত হইল। তাঁহারা আমাদের ধূলি ধূসরিত হস্তপদমুখ ধৌত করিয়া, নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাত্রিকালীন পাঠাভ্যাসে আমাদিগকে নিয়োজিত করিলেন। সেই ঘরে আমরা দুই ভাই ও তিন ভগিনী ছিলাম। কিন্তু আমরা বিভিন্ন কুঠরীতে নিবদ্ধ থাকিতাম। অভিভাবিকা মহোদয়াদের নিকট আবার অনুগ্রহ বিদায় না পাওয়া পর্য্যন্ত আমাদের কাহারও সহিত কাহারও দেখা সাক্ষাৎ করিবার যো ছিল না। তখন আমাদের কাছে থাকিত—প্রদীপ, পাখা অথবা চিক্কণ শাসনদণ্ড-হস্তে অভিভাবিকা ও ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের "শিশুশিক্ষা তৃতীয়ভাগ," শ্লেট পেন্সিল ইত্যাদি আরও কতকগুলি পদার্থ। কিন্তু প্রায়ই পাঠাভ্যাসে অমনোযোগিতার দরুণ অভিভাবিকাদের কঠিন চপেটাঘাত ও চিক্কণ বংশদণ্ড আমাদের পৃষ্ঠদেশে আস্ফালন করিত। বলা বাহুল্য এই সংঘর্ষনের অবশ্যম্ভাবিতা তৎক্ষণাৎ আমাদের মুখে প্রকাশ পাইত। কিন্তু অভিভাবিকাদের সুকোমল স্নেহার্দ্র হৃদয় ইহাতে ব্যথিত হইত—অবশেষে তাঁহারা খেলনা বা কিঞ্চিৎ মিষ্ট দ্রব্য প্রদানে আমাদিগকে শান্ত করিতেন! এবং সেই দিনের জন্য পড়া বন্ধ রাখিতেন!

অভিভাবিকা মহোদয়াগণ সকলেই আমার পূজনীয়া; সুতরাং তাঁহাদের যৎসামান্য অভিভাবকতা দোষের কথা এখানে উল্লেখ করিয়াছি বলিয়া আমি তাঁহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহাদের চির-ঔদার্য্যগুণ আমাকে মার্জ্জনা করিবে।

তবে এস্থলে ইহাও স্বীকার্য্য যে, কোন কোন দিন অভিভাবিকা মহোদয়াগণ শাসনান্তে আমাদিগকে সান্ত্বনা দিতেন না—সে'দিন কেবলই শাসন করিতেন। অবশ্য যদিও তাঁহাদের এরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার আমরা দুই একবারের অধিক ভোগ করি নাই।

কিন্তু সেই উপপঞ্চমী রাত্রে, অভিভাবিকাগণ আমাদিগকে শাসন করিয়াছিলেন কি না, অথবা শাসনান্তে, তাঁহাদের স্বভাবিক ঔদারতা বশতঃ আমাদের অন্ততঃ আমার মনোরথপূর্ণ করিয়াছিলেন কি না, এ সকল বিষয় আমার মনে নাই। তবে উল্লিখিত ভীষণ দুর্ঘটনায় সে'দিন আমাকে পড়িতে হয় নাই, ইহা আমার বেশ স্মরণ আছে।

যাহা হউক, রজনী প্রভাত হইলে সরস্বতীপূজার কথা স্মরণ করাইয়া অভিভাবিকাগণ আমাদিগকে পড়িতে নিষেধ করিলেন। বলা বাহুল্য আমরা নিরাপত্তিতে তাহা মানিয়া আমোদ করিতে লাগিলাম। খুল্লতাতপুত্রীগণও এখন আমাদের সহিত একত্রিত হইল। তাহারা প্রায় সমস্ত দিবাভাগ আমাদের সহিত অতিবাহিত করিত। কিন্তু সন্ধ্যাসমাগমে অভিভাবিকাগণ আমাদের সহিত তাহাদের বিচ্ছেদ ঘটাইতেন। কারণ, অন্তঃপুরের অপর প্রান্তে অন্য একটি ঘরে তাহাদিগকেও বন্ধ থাকিতে হইত। সুতরাং অভিভাবিকাদের নিকট ছুটি পাইয়াও রাত্রে আমরা তাহাদের কাছে যাইতে পারিতাম না। সমগ্র রাত্রির জন্য তাহাদের সহিত আমাদের মিলনের আশা ছিল না।

বাস্তবিক এ বিরহটি আমাদের শিশু-হৃদয়ে বড়ই অসহ্য ছিল। কোন পর্ব্বোপলক্ষ ব্যতীত নিরাপদে আমাদের মিলনের কোন সম্ভাবনা থাকিত না। কোন কোন রাত্রে আমাদের—এবং তাহাদের—ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিত; আমরা অভিভাবিকাদের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া একে অন্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে গৃহ হইতে বহির্গত হইতাম। কিন্তু সতর্ক অভিভাবিকাগণ আমাদিগকে প্রায়ই পথিমধ্যে অথবা

আমাদের মিলনের অব্যবহিত মুহূর্ত্তেই রস-ভঙ্গ করিয়া দিতেন। আমরা তৎক্ষণাৎ গ্রেফ্তার হইয়া যথাস্থানে নীত হইতাম। পথিমধ্যে অবশ্য দুই একটা ঘুসি আমাদের মস্তক চুম্বন করিত।

রাত্রিকালে আমাদিগকে গৃহ-বহির্গত না করিবার কারণ, পাছে দেবতা বা ভূতের কুদৃষ্টিতে আমাদের অমঙ্গল হয়। আমরা কৈশোর শেষ পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক এই নিয়মের অধীন ছিলাম। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর আমাদের অন্দরমহল অনেক খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল।

এখানে আমার একটি কথা বলিবার নিতান্ত অভিলাষ—খুল্লতাত পুত্রীগণও বড় সুশীলা ছিলেন না। আমাদের ন্যায় তাঁহারাও ন্যূনাধিক চঞ্চলা ছিলেন; সুতরাং অভিভাবিকাগণ তাঁহাদিগকেও আমাদের ন্যায়ই শাসন করিতেন।

যাহা হউক সেই পঞ্চমী প্রভাতের আমোদে কিছু বিশেষত্ব ছিল। আর আর দিন আমরা লাফাইতাম, দৌড়াইতাম, লুকাচুরি খেলা করিতাম; কিন্তু সে'দিন আমরা কতকটা শান্ত-শিষ্ট। সরস্বতীর অর্চ্চনা গৃহে সমবেত হইয়া পূজাসম্পর্কীয় অভিভাবিকাদের নানা আদেশ আমরা সানন্দে প্রতিপালন করিতে লাগিলাম। আমাদের কোন কোন ভগিনী স্বেচ্ছায় গৃহ-প্রলেপন কার্য্যে নিযুক্ত হইল। আমি বোধ হয় মিশ্রিত বিল্বপত্র ও আম্রমুকুলের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলাম।

অভিভাবিকাগণ আমাদিগকে আজ কিছু শীঘ্র শীঘ্র স্নান করাইলেন। স্নানের পর আমরা স্ব স্ব অভিভাবিকা মহোদয়াদের প্রদত্ত রঙ্গিন কাপড় পরিধান করিলাম। আমার ধুতির রঙ্ বসন্তী ও চাদরের রঙ্ কুসুম ফুলের। বোধ হয়, ভগ্নীদের পরিধান বস্ত্রের বর্ণ আমার বস্ত্রের বিপরীত ছিল অর্থাৎ কুসুম রঙের শাড়ী ও বসন্তী রঙের চাদর। আমরা স্নান-পবিত্র হইয়া কেহ মাল্য রচনা, কেহ চন্দন ঘর্ষণ ও কেহ নৈবেদ্য প্রস্তুত করিতে লাগিলাম। অভিভাবিকাগণ আমাদের পাঠ্য

পুস্তক, শ্লেট ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন "বস্তানী" আবৃত করিয়া ভারতী সমীপে স্থাপন করিলেন। পুস্তকাদি ছাড়া সরস্বতীর বামে ও দক্ষিণে ঢাল, তরবারি, বন্দুক, সেতার, এস্রাজ, সারঙ্গ, তানপুরা, করতাল, মৃদঙ্গ, মন্দিরা, বেহালা, বাঁশী ইত্যাদি বাদ্য যন্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জাম সজ্জিত ছিল। অভিভাবিকাগণ ঐ সমস্ত জিনিসের উপর কিঞ্চিৎ চন্দন সিঞ্চন করিলেন।

অতঃপর যথাসময়ে যথানিয়মে পুরোহিত ঠাকুর পূজা আরম্ভ করিয়া সমাপ্ত করিলেন। এবং তিনি অঞ্জলি প্রদানের নিমিত্ত আমাদিগকে আহ্বান করিলেন। অভিভাবিকাদের আদেশ অনুসারে প্রথমতঃ আমরা সরস্বতীকে প্রণাম করিলাম। তৎপর একে একে আমরা সরস্বতীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলাম। পুরোহিত ঠাকুর আমাদের ক্ষুদ্র অঞ্জলিতে পুষ্প ও বিল্বপত্র পূর্ণ করিতেছিলেন। আমরা প্রত্যেকে সাত বার করিয়া বাণীচরণে অঞ্জলি প্রদান করিলাম। অঞ্জলি প্রদানান্তে আবার ইঁহাকে প্রণাম করিলাম। এবার বিশেষরূপে ইঁহার সহিত আমাদের পরিচয় হইল। অভিভাবিকাগণ কেহ সংক্ষেপে কেহ বা দীর্ঘতর বক্তৃতায় ইঁহার গুণ গরিমার কথা ব্যক্ত করিলেন—ইনি বিদ্যাদাত্রী, বিদ্যালাভার্থ ইঁহাকে সানুনয় প্রার্থনা কর। অন্য ভাইভগিনীর কথা বলিতে পারি না, আমার সরল হৃদয় অভিভাবিকাদের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল,—আমি মনে মনে সরস্বতী সমীপে বিদ্যার জন্য কত প্রার্থনা করিয়াছিলাম।

ইহাই আমার শ্রীপঞ্চমীর সহিত প্রথম পরিচয়। ইহার পূর্ব্বে কোন শ্রীপঞ্চমী আসিয়াছিল কি না, আমার জানা নাই।

তৎপর আর এক শ্রীপঞ্চমীর অভ্যুদয় হইয়াছিল, যাহার মধুর স্মৃতি আমার হৃদয়ের অন্তস্তলে জাগরিত হইয়া আজ কত ক্ষুদ্র-বৃহৎ পুরাতন কাহিনীকে একে একে আকর্ষণ করিতেছে।

সে দিন বিকাল বেলায় বড় কাকীমা দালান সংলগ্ন বারান্দায় বসিয়া আছেন ; আমরা কয়জন তাঁহার নিকট সমবেত আছি। তিনি সাত-আটজন পরিচারিকাকে ডাকিয়া আগামী-কল্য বন-পরিক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকিতে অনুমতি করিলেন। আরও কয়েকজন ভ্রমণেচ্ছু দাসী তথায় উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব অভিলাষ কাকীমার কাছে ব্যক্ত করিল; কিন্তু তাহাদের দুই তিনজন ব্যতাত আর আর আবেদন-কারিণীকে নিরাশ হইতে হইল। তন্মধ্যে একজন কিশোরী অধিকার-বহির্ভূতা দাসীর তখনকার দুঃখব্যঞ্জক মুখখানি বড়ই করুণার যোগ্য ছিল। চিরআশা-শূন্যা অন্তঃপুর-বন্দিনীর এই চঞ্চল বয়সে, এই সুযোগে মনোহর মুক্তদৃশ্যের অবলোকন-আকাঙ্ক্ষা নিতান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু ইহাতে সে বাধা প্রাপ্ত হইয়া পরমুখপ্রেক্ষিতার দুঃখ বিশেষরূপে অনুভব করিল। তার আশার প্রথমাবস্থার প্রফুল্লতা কোথায় চলিয়া গেল। সে আর এক মুহূর্ত্তের জন্য কাহারও পানে চাহিতে পারিল না—তার অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নযুগল পৃথিবীর উপরে নিপতিত হইল। যেন সে তখন শান্তিময় ধরণীর ক্রোড়গত হইতে বাসনা করিয়াছিল।

কিয়ৎকাল পরে তার পূর্ব্বরক্ষিত কাংস্য থালাটি লইয়া সে ধীরে ধীরে সেই স্থান ত্যাগ করিল। অনতিদূরে যাইয়াই সে অতি মৃদুস্বরে, গভীর নৈরাশ্যের সহিত গাহিল—

"আমার মনের আশা পুরাও যদি ওহে গৌর হরি।"

কিন্তু হায় অদৃষ্টে যাহার দুর্গতি আছে, সে তাহার ফলভোগ করিতে নিতান্তই বাধ্য। এস্থলে তাহার শত কাকুতি মিনতি সম্পূর্ণ নিরর্থক। তবে দয়াময় ঈশ্বরে আত্মসমর্পণে কথঞ্চিৎ বল ও শান্তি পাওয়া যায়, ইহাই আমাদের পরম লাভ ও তাঁহার করুণা।•

"গাতি ঘরের" (রন্ধনশালার) সম্মুখে স্তূপীকৃত ইন্ধন ছিল। সে

উন্মনস্কাবস্থায় তাহাতে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেল। তাহার হস্তস্থিত কাংস্য থালাটি সম্মুখে কিছু দূরে ইটের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু সে, পতনজনিত নিজ শরীরের আঘাতের প্রতি লক্ষ্য করিতে যেন কিছু সময়েরও অবসর পাইল না, খুব শীঘ্র শীঘ্র উঠিয়া ভগ্ন থালাটি ধরিয়া নূতন আর-এক বিপদের ত্রাসে কাঁদিয়া ফেলিল। এই করুণ দৃশ্যটি তখন সম্যক্ অনুভব করিতে না পারিলেও আমাদের মনে সহানুভূতির একটী ক্ষীণ আভাস জাগিয়াছিল। আমরা কয়জন তাহার কাছে যাইয়া দাঁড়াইলাম। ঐ স্থানে ক্ষুদ্র একটী ঘর ছিল। তথা হইতে তৎক্ষণাৎ একচক্ষুহীনা একজন বৃদ্ধা ক্ষিপ্রগতিতে আসিয়া এই উপায়বিহীনার এই অসতর্কতার জন্য যথেচ্ছা উপর্য্যুপরি আঘাত করিতে লাগিল। এইরূপে কিছুক্ষণ শাসন করিয়া, বোধ হয় ক্লান্তি আসিলে বৃদ্ধা তাহাকে ছাড়িয়া বকিতে বকিতে তথায় দাঁড়াইয়া রহিল, এবং মাঝে মাঝে তাহাকে পুনরাক্রমণের ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিল। তাহার সকরুণ বিলাপধ্বনি বৃদ্ধার মর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারিলনা!

*   *   *   *

পর দিন অতি প্রত্যূষে গাড়ীতে কাকীমাকে ও কয়জন ভগ্নীকে লইয়া খুল্লতাত মহোদয় অনতিদূরবর্ত্তী এক পুরাতন ভগ্নোন্মুখ বাগান-বাড়ীতে নামিলেন। অবশিষ্ট কয়জন ভগ্নীকে গাড়ী আবার আসিয়া তথায় লইয়া গেল। পরিচারিকাগণ সকলেই পাল্কীতে গিয়াছিল।

এই বাগান-বাড়ী হইতে আমাদের বনভোজনের স্থানটি প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত। তথায় তাঁহারা সকলেই বন্য রাস্তার দ্বারা পদব্রজে গিয়াছিলেন। আমি প্রায় ৮॥০টার সময় ঐ স্থানে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া দেখিলাম এখানে রন্ধন কার্য্যের নিমিত্ত একটি নাতিবৃহৎ ঘর প্রস্তুত রহিয়াছে। কাকীমা ও কয়েকজন পরিচারিকা নিবিষ্টমনে তরকারী কুটিতেছিলেন। সম্মুখে উত্তর দিকে একটি পুরাতন

পুষ্করিণী। এই পুষ্করিণীর ঠিক পাড়েই আমাদের উপনিবেশ স্থাপিত। দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত সমতল ভূমি, তৎপর গভীর জঙ্গল ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় দৃষ্টি গোচর হয়। পুষ্করিণীর দক্ষিণ পাড়ে অবস্থিত একটি সুবৃহৎ বটবৃক্ষ হইতে রন্ধনশালা পর্য্যন্ত একটি পরদা লম্বমান ছিল। অতি প্রত্যূষে "পানি-বেহারা"গণ রাঁধিবার ও পান করিবার জল এখানে রাখিয়া গিয়াছিল।

স্থানটি বেশ নীরব ও নির্জ্জন। খুল্লতাত মহোদয় একটী বন্দুক লইয়া এদিক ওদিক বেড়াইতেছিলেন। বন্দুকের আওয়াজ-শ্রবণ-লোভে আমি তাঁহার নিকট দৌড়িয়া গেলাম। কিন্তু কিছুকাল অপেক্ষা করিয়াও বন্দকের আওয়াজ শুনিতে পাইলাম না। সুতরাং আমাকে নিরাশ হইয়া তথা হইতে ভগ্নাদের দলে যোগদান করিবার নিমিত্ত রওয়ানা হইতে হইল। ভগ্নীরা সেই পুষ্করিণীর পাড়ে পাড়ে নীল কুমুদ ও বন্য পুষ্পের লোভে ঘুরিতেছিল। কিন্তু যে দুটি মাত্র নীল সালুক পুষ্করিণীতে ছিল তাহা দুইজন উদ্যমশীলা ভগ্নী হস্তগত করিল। বনফুল আহরণ অদৃশ্য সকলের অদৃষ্টেই ঘটিয়াছিল।

এইরূপে আমরা কিছুক্ষণ এদিক ওদিক বেড়াইয়া, কখন বা বসিয়া নানা রকম গল্প করিতে করিতে অনেক সময় অতিবাহিত করিলাম।

পরিচারিকাগণ সকলেই সেই পুরাতন পুকুরে স্নান করিয়াছিল। বোধ হয়, কাকীমাও সেই পুষ্করিণীতে স্নান করিয়াছিলেন। আমরা কিন্তু আমাদের উপনিবেশের দক্ষিণ দিকস্থিত একটী "সরা"র (ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী) উদ্দেশে ধাবিত হইলাম। "সরা"টির পরিসর কচিৎ কোন স্থানে সাড়ে-তিন হস্ত নতুবা প্রায় সমুদায় স্থলেই এক হস্ত হইবে, গভীরতাও তদনুযায়ী। এই প্রথম আমরা স্রোতজলে স্নান করিয়াছিলাম। স্নানের পর যথারীতি প্রসাধিত হইয়া আমরা রন্ধন-গৃহের এক অংশে আহারে বসিলাম।

আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, বোধ হয় আড়াইটার সময় খুল্লতাত মহোদয় প্রভৃতি আমরা সমুদয় বনভ্রমণে বহির্গত হইলাম। সর্ব্বাগ্রে পাঁচজন চাকর তৎপর আমি এবং মৎতুল্য স্ফূর্ত্তিবাজ দুইজন খুল্লতাত-পুত্রী ও আমার একজন ভগ্নী। তারপর খুল্লতাত মহোদয়, কাকীমা ও পরিচারিকাবর্গ, এইরূপ পর্য্যায়ে আমরা জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম। আমার জ্যেষ্ঠ খুল্লতাত-পুত্র কখন বা সর্ব্বাগ্রে, কখন বা সর্ব্বপশ্চাতে একটি বন্দুক লইয়া ঘুঘু শিকার করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। এইরূপে ছোট একটি পাহাড় অতিক্রম করিয়াই আমাদের স্ফূর্ত্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া আমাদিগকে চাকরদের অগ্রবর্ত্তী করিয়া দিল। আমরা উৎসাহী চতুষ্টয় ধীরে ধীরে দৌড়িয়া চলিলাম। শ্রান্ত হইলে অথবা একাধিক রাস্তায় উপনীত হইলে আমরা তথায় তাঁহাদের অপেক্ষা করিতাম এবং এই অবসরে আমলকী, বহেড়া প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া চর্ব্বন করিতাম। কাটারী ব্যতীত বহেড়া কর্ত্তন কষ্টসাধ্য বুঝিয়া আমি উহা পকেটজাত করিলাম, ভগ্নীরা তাহা চাদরে বাঁধিয়া লইল।

কাকীমা প্রভৃতি অন্তঃপুরিকাদের হাঁটিবার অভ্যাস একেবারেই নাই। তদুপরি উচু নাচু পাহাড় সকল অতিক্রম করিয়া তাঁহারা বড়ই ক্লান্ত হইয়া পাড়লেন। অতি ধীর পদবিক্ষেপে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই তাঁহারা বিশ্রামের নিমিত্ত দাঁড়াইয়া থাকিতেন। আমার একজন শান্ত দুর্ব্বলা ভগ্নী আমাদের শ্রেণীভুক্ত না হইয়া পূর্ব্বেই কাকীমাদের সহিত ধীরে ধীরে হাঁটিতেছিল। সে এক্ষণে এতদূর পরিশ্রান্ত হইয়াছে যে, কাকার হস্ত নির্ভর করিয়া হাঁটিতে লাগিল। এইরূপে প্রায় পাঁচটার সময়, ইতিপূর্ব্বে আমরা যে ক্ষীণ সলিলা 'সরা' পার হইয়া আসিয়াছিলাম সেই "সরা"র তিন হস্ত প্রশস্ত আর এক অংশে উপস্থিত হইলাম। কাকা একজন চাকরের পিঠে চড়িয়া ইহার পর পারে উত্তীর্ণ হইলেন; আমরা হাঁটিয়া পার হইলাম। জল

আমাদের হাঁটুর উপর ছিল। এখানে আসিয়া কাকীমা প্রভৃতি আরও অধিক ক্লান্ত হইলেন

"তৎপর সন্ধ্যা চলিয়া গেলে আমরা পূর্ব্বোক্ত বাগানবাড়ীতে পদার্পণ করিলাম। যাহারা পাল্‌কীতে এখানে আসিয়াছিল তাহারা পাল্‌কীতে অন্দরে চলিয়া গেল। গাঁড়ী দুইবারে আমাদিগকে অন্তঃপুরে পৌঁছাইয়া দিল।

মানব সর্ব্বদা নূতনত্বের প্রত্যাশী। সরস্বতী পূজার আমোদ আমাদের নিকট পুরাতন হইয়া গিয়াছিল। তাই নবাগত বন-পরিক্রমণ-পর্ব্বের মোহে আমরা সে'বার সরস্বতীকে ভুলিয়াছিলাম।

যাহা হউক, হস্ত-মুখাদি প্রক্ষালনান্তে আমি দাঁড়াইয়া আছি; আমার অভিভাবিকা মহোদয়া একটি "রেকাবী"তে করিয়া সরস্বতীর প্রসাদ আমার সম্মুখে ধরিলেন। এবং অভিভাবিকার অনুরোধে আমি উহা হইতে সর্ব্বাগ্রে কিঞ্চিৎ আম্রমুকুল লইয়া চর্ব্বণ করিতে লাগিলাম। এমন সময় ছোট কাকীমার ঘরে হাসির একটা গণ্ডগোল আমার শ্রুতিগোচর হইল। আমি তৎক্ষণাৎ এই কোলাহলের রহস্যভেদ করিবার নিমিত্ত তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। কাকীমা প্রভৃতি অনেক লোক বারান্দায় বসিয়া আছেন—বাহিরে প্রাঙ্গনেও অনেক লোক। ছোট কাকীমা তাঁহার সম্মুখস্থিত এক থালা মাজমের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া একজন মুখরা পরিচারিকাকে তাহা উদরসাৎ করিবার নিমিত্ত পীড়াপীড়ি করিতেছেন। মাজম ভক্ষণজনিত তাহার পাগলামী দেখিবার জন্য এত লোকের সমাগম। সেও নিজকে ইহা হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে অসম্মতিজ্ঞাপনছলে বিবিধ রসিকতা করিয়া লোককে হাসাইতেছিল। আমিও এই আমোদ উপভোগ করিবার নিমিত্ত ভগ্নীদের সহিত এক সঙ্গে এক প্রান্তে বসিয়া পড়িলাম। ছোট কাকীমা এবার তাহাকে লোভ দেখাইয়া বলিলেন যে, মাজমগুলি

খাইলে তাহাকে একখানি ভাল ঢাকার শাড়ী দেওয়া হইবে। পরিচারিকা বোধ হয় মনে করিল, এখন যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই তাহার লাভ। সে কাকীমা প্রভৃতিকে প্রণাম করিয়া মাজম খাইতে আরম্ভ করিল। একখণ্ড মাজম উদরস্থ হইবা মাত্র সে ক্ষিপ্তের ন্যায় নানা কথা কহিতে লাগিল। কাকীমা প্রভৃতি খুব হাসিতে লাগিলেন। এইরূপে পাঁচ ছয় টুকরা মাজম নিঃশেষিত করিতেই দেখা গেল যে, তাহাকে বিলক্ষণ নেশায় ধরিয়াছে। তখন কাকীমা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি?—সে উত্তর করিল, আমি ছোট রাণী। আবার চতুর্দ্দিকে হাসির কলরব উঠিল। এইরূপে কিছুক্ষণ তাহাকে লইয়া কাকীমা প্রভৃতির হাসি ঠাট্টার পর সে আপনি গাহিয়া উঠিল—

হেমন্ত অন্তহি বসন্ত আওল
মনোহর ভূষিত রূপে;
ভেল কুতূহলী সব ব্রজ মণ্ডলী
ভাসল সুখ রস কূপে!

সে এইরূপ আরো কতকগুলি রাসের ব্রজবুলী গান মনিপুরী রাগিণীতে গাহিল। তৎপর কাকীমা প্রভৃতি তাহাকে বাঙ্গালা গান গাহিতে অনুরোধ করিলেন। সে তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া অঙ্গ-ভঙ্গি-সহকারে গাহিয়া উঠিল—

শ্যামের সরল বাঁশের বাঁশী কি গুণ জানে।
যে শুনেছে বাঁশীর তান, হারায়েছে কুলমান,
যমুনা বহে উজানে মোহন মুরলী তানে।

শ্রীনরেন্দ্র কিশোর বর্ম্মা।

বাঙ্গালা পুস্তকের বিবরণী।

সাহিত্য (৫) কাব্য-শাখা।

৮। অমৃত-মদিরা। ষ্টার থিয়েটারের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু প্রণীত। কলিকাতা, ১৭, নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন, 'কালিকা যন্ত্রে' মুদ্রিত এবং ২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকাল লাইব্রেরী হইতে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সন ১৩১০। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি ফর্ম্মার ২৯০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য ১৷৹ টাকা। ছাপা, বাঁধাই, কাগজ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট। একটি সুন্দর রেসমী ফিতা পঠিত স্থান নির্দ্দেশ করিবার জন্য পুস্তকের সঙ্গে সংলগ্ন আছে। গ্রন্থের ভূমিকাটি বেশ সরল, কৌতুহলোদ্দীপক সুন্দর ভাষায় লিখিত হইয়াছে। পুস্তকে যে সকল ব্যক্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, গ্রন্থশেষে তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থখানি হাতে লইলে বেশ একটা আমোদ ও কৌতুহল জাগিয়া উঠে, এরূপ চক্‌চকে মোড়কের ভিতর কি আছে, তাহা জানিবার ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক; বিষয়ের সূচীও বিলক্ষণ লোভ-জনক।

বিশেষ, অমৃত বাবু বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের অন্যতম নেতা, তাঁহার প্রহসনগুলি বঙ্গের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। হঠাৎ সরস্বতীর কুঞ্জে আসিয়া তিনি কি প্রহসনের সৃষ্টি করিবেন, সে বিষয়েও আশঙ্কার সহিত একটা কৌতুহলের ভাব জাগিয়া উঠা স্বাভাবিক। তবে আশ্বাসের বিষয়ও ছিল, ভূমিকা পাঠ করিয়া মনে হইয়াছিল, কবির এই গীতি দারুণ দুঃখের সময়ের লেখা—যাঁহারা দৃষ্টি শক্তিহীন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাণীর শ্রেষ্ঠতম কৃপা পাইয়াছেন; অমৃতবাবুর কাছে আমরা বাণীর সেই পরম প্রসাদের কণা পাইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলাম। তাঁহার শুভ্র কেশমণ্ডিত ললাট ভারতীর কোন উজ্জ্বল মহিমায় দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে কিনা, তাহাই দেখিতে আশাতুর হইয়াছিলাম। আশা ছিল, দেখিতে পাইব তিনি রঙ্গালয়ের বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া অমৃত মদিরায় শুধু অমৃত লইয়া উপস্থিত হইবেন।

অমৃত মদিরায় 'কালিকা' শীর্ষক একটি কবিতা আছে। এই কবিতাটির মধ্যে একটি সৌম্যরস, একটি সুগম্ভীর স্তব্ধতার আভাস আছে, তাহা কালিকার মূর্ত্তি আমাদের মনশ্চক্ষে নূতন করিয়া আঁকিয়া দিল। যখন বিপদ সমূহ নিবিড় ভাবে

ঘিরিয়া আসে, যখন প্রকৃতির করে নির্ম্মম খড়্গ ঝলসিত হইয়া উঠে, আমরা মায়ের দ্বারে বলির মত হইয়া পড়ি, যখন পৃথিবীর বিচিত্র সংগীত ও কল কোলাহল কর্ণে মহাষ্টমীর বাদ্যের ন্যায় বাজিয়া মায়ের দ্বারে আমাদের মৃত্যুর সূচনা করে, তখন সেই ঘোর বিপৎকালে আর্ত্তের প্রাণে ভক্তি জাগিয়া উঠে, যাঁহার বিনাশমূর্ত্তি ভয় দিয়াছে, তাঁহারই ক্রোড়ে 'মা' 'মা' বলিয়া লুকাইতে চাই—তখন খড়্গ উত্থিত হইয়া থাকিয়া যায়, নির্ম্মম নর্ত্তকীর তাণ্ডব নর্ত্তন সহসা স্থগিত হয়, অসুর দলিত হইয়াছে—এখন তাঁহার ভীষণরূপ দেখিয়া সন্তান ভয় পাইতেছে, এই জন্য সলজ্জভাবে দাঁড়াইয়া তিনি বরাভয়-প্রদ হস্ত প্রসারণ করেন—পৃথিবী আশ্বস্ত হয়। কবিতাটিতে এতগুলি কথা নাই, কিন্তু এইরূপ নানা কথার সুস্পষ্ট আভাস আছে, ইহা পড়িয়া মনে হইয়াছিল অমৃতবাবুর হৃদয়ে বিষাদজাত কল্যাণময়ী কবিতা কঠোরভাবে তুফিস্তাবে ক্ষণে ক্ষণে জাগিয়া উঠিয়াছে। তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার কাব্যে ভৈরব গম্ভীর রস ঢালিয়া দিতে পারিতেন। আমরা কবিতার পদ নীতি ও ধর্ম্মের সূত্রে বাঁধিতে চাহি না, তাহা হইলে কালিদাসের মত কবিকেও খোঁড়া হইয়া থাকিতে হইত। কাব্য সাহিত্যকে আমরা অধ্যাত্ম সাহিত্যের শ্রেণীভুক্ত করিতে প্রয়াসী নহি। অমৃতবাবু যখন নায়িকাগণের নানারূপ মূর্ত্তি কাব্যকলায় পরিশোভিত করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, তখন আমরা একথা কখনই বলিব না, আপনি মস্তকে তুহিনশুভ্র কেশকলাপ লইয়া এরূপ রঙ্গরসের চপলতা কেন প্রদর্শন করিলেন? যখন তাঁহার শ্লেষমধুর দ্রুত পয়ারছন্দ নানারূপ খরবাক্যবাণে সমাজের স্তরে স্তরে আঘাত করিতেছে, তখন কবিকে আমরা গঞ্জনা করিয়া কখনই বলিব না, আপনি এ বয়সে এ সকল বিদ্রুপের কথা ত্যাগ করিয়া একটু সৌম্য মূর্ত্তিতে উপস্থিত হউন; ব্যঙ্গরসের রসিক কবিকে যদি ব্যঙ্গের ক্ষেত্রের গণ্ডী অতিক্রম করিতে বলা হয়, তাহা হইলে তিনি স্বগৃহ-তাড়িত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবেন; কবি নিজেই বলিয়াছেন সমালোচকগণ ডাব নারিকেলে কেন এলাচির গন্ধ নাই এবং গোলাপ গাছে কেন ফল হয় না এজন্য রুষ্ট হন; প্রাপ্তবস্তু উৎকৃষ্ট হইলেও তাহাতে তৃপ্তিলাভ করিবার লোক তাঁহারা নহেন, আসমান্ হইতে অভাবের সৃজন করিয়া তাঁহারা নিন্দাবাদ করিবেন।

আমরা তদ্রূপ নিন্দাপ্রিয় নহি। তাঁহার দৃষ্টিশক্তিহীনতার দুঃখ-ঘোষক ভূমিকা পড়িয়া আমাদের মনে হইয়াছিল তিনি বোধ হয় এবার রঙ্গালয়ের বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আসিবেন, এবার বুঝি কবিতা শুভ্র, নির্ম্মলভাবে তাঁহাকে অভিনন্দন

করিবেন—আমাদের সে আশা ব্যর্থ হইয়াছে, কিন্তু তজ্জন্য আমরা দুঃখিত নহি। ব্যঙ্গের চাটনিই মন্দ কি? আমাদের সাহিত্যে নানারূপ উপকরণ লইয়া ভূরি-ভোজনের আয়োজন চলিতেছে, এ সময় আমরা চাট্‌নি বাদ দিতে পারি না; সাহিত্যের পরিবেশনকারী সরস্বতী অবশ্যই অমৃতবাবুকে ক্ষণকালের জন্যও তড়কিয়া লইবেন। মিষ্টাধিক্যেই হউক বা তিক্তেই হউক মুখ ফিরাইবার কালে চাট্‌নির প্রয়োজন অবশ্যই হইবে। কবি দুর্দ্দিনে তাঁহার ব্যঙ্গশক্তি বজায় রাখিয়াছিলেন, যে সময়ে অন্য লোক তাঁহার অবস্থা দেখিয়া চক্ষের জল ফেলিত, সেই সময়েও তিনি হাস্যরস-পটুতা দেখাইয়াছেন, ইহাতে তাঁহার বাহাদুরী আছে। দুঃখ তাঁহাকে বারংবার ঘা দিয়া দেখিয়াছে, তাঁহার হাসির উৎস শুকাইয়া যায় কিনা, তাঁহার প্রতিভাকে পাথরে আছড়াইয়া পরীক্ষা করিয়া লইয়াছে—তাঁহার ব্যঙ্গরস খাঁটি কি না। এই বিষম পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অমৃত-মদিরায় যে রসিকতার খর বিদ্যুৎ-দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইতেছে, তাহা দুর্দ্দিনের কৃষ্ণমেঘ সংঘর্ষে উৎপন্ন—কিন্তু আমরা রঙ্গালয়ে বসিয়া ইতিপূর্ব্বেও যখন উচ্চ হাস্যধ্বনির সহিত অমৃতবাবুর পরিহাস-শক্তির অভিনন্দন করিয়াছি, তখন আমাদের মনে হয় নাই—সেই সকল হাস্য সুখের দান নহে, নিবিড় দুঃখকে দোহন করিয়া কবি হাস্যরসের সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজে না বলিলে আমরা জানিতাম না—

"আমিও লিখেছি ব'সে ভ্রাতার শ্মশানে।
'কালাপাণি'—হিন্দুয়ানি শ্লেষব্যঙ্গগানে॥
শেষ দৃশ্যে হাসি লিখি বাড়াতে উল্লাস।
সাধের কন্যার গণি শেষ কণ্ঠশ্বাস॥
এক মাত্র সহোদরা রাখিয়া চিতায়;
'বাবু' খানি পরদিন করিয়াছি সায়॥
অনুজার দেহোপরে কাঁদে পড়ি জায়া।
"যাদুকরী" ধরে' গড়ি মায়াবিনী মায়া॥
গুরুপত্নী গিরিশের জায়া ল'য়ে ঘাটে।
"তাজ্জব ব্যাপার" খানি খাটায়েছি নাটে॥"

বাস্তবিক তাঁহার কবিতায় কতটুকু ব্যঙ্গ ও কতটুকু কান্না তাহা অনেক সময় বুঝিয়া উঠা শক্ত।

"তাঁতিরে ডিপুটি ক'রে, বস্ত্র বুনে ম্যাঞ্চেষ্টারে" পড়িয়া পাঠক হাস্যের প্রথম চোট সামলাইয়া লইলে শেষে হয়ত মনে একটা বিষাদের ভাব জাগিতে পারে। বস্তুতঃ তাঁহার ব্যঙ্গ অনেক সময় সমাজের প্রতি গাঢ় প্রীতির ছদ্মবেশ, তাঁহার কষাঘাত পীড়ক নহে, উহা পরিশোধক, তাহা বিদ্বেষের শেল নহে, প্রীতির শিক্ষা, অনেকগুলি রচনা চাটনির মত আপাত তরল বোধ হইলেও তাহাতে পুষ্টিকর খাদ্যের উপাদান আছে, এজন্য কবির প্রতি আমরা মনে মনে অনুরাগী; কিন্তু সাহিত্যের আগারে আমরা মদের বোতলের আমদানী কখনই সহ্য করিব না। ভারতচন্দ্র ও দাশরথীর দিন এখন নাই; সে সময় ভাল ছিল কি মন্দ ছিল তাহা আমরা বলিতে চাই না, কিন্তু অমৃত বাবু নিজে তাঁহাদের দোহাই দিয়া লেখনী ধারণ করিলেও এই সভ্যসমাজে বসিয়া তোটক ছন্দে আদিরসের বর্ণনা করিতে সাহসী হইবেন না। যে যুগ গিয়াছে, তাহার পটোত্তলন পূর্ব্বক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে যাওয়া বৃথা; ঈশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের সময় রুচি যেরূপ ছিল, এখন তাহাও নাই, বৃদ্ধ বয়সে সেই প্রাচীন রুচির উপসনা করিতে যাওয়া তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে যাহা ভাল ছিল, তাহা নূতন ভাবে গড়িয়া আনা যাইতে পারে কিন্তু প্রাচীন রুচি এখন আর চলে না, আদালত হইতে তদ্বিরুদ্ধে এখন আইন হইয়া গিয়াছে।

অমৃত বাবুর পুস্তক প্রাচীন কবিগণের ধরণে লিখিত, বলিয়াই যে আদিরস বর্ণনায় তিনি পূর্ব্ব সূরিগণের ন্যায় সত্য সত্যই শীলতার ব্যত্যয় করিয়াছেন—আমরা তাহা বলি না; কিন্তু পূর্ব্বকবিগণ যাহা করেন নাই, তিনি তাহা করিয়াছেন—তাঁহারা নিজের কুৎসা নিজেরা প্রচার করেন নাই, তাঁহাদের অশ্লীলতা কোন উপাখ্যান বিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল, তাঁহারা নিজের মুখে নিজে কালী মাখিয়া উপস্থিত হন নাই। নিজের অপরাধ প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিতে পারে দুই প্রকারের লোক; যিনি পরমহংস, তিনি সম্পূর্ণরূপে নিজে নগ্ন হইতে পারেন, আর যিনি ইহা পারেন তাহাকে কোন্ অভিধানে অভিহিত করা যায়!

"আমি আর গুরুদেব যুগল ইয়ার।
বিবির বাড়ীতে যাই খাইতে বিয়ার॥"

ইত্যাদি কথা যিনি লিখিতে পারেন, তাঁহাকে আমরা ঘোর সত্যবাদী বলিয়া পূজা করিব না, তাঁহাকে নৈতিক চক্ষুলজ্জাশূন্য বলিয়া মনে করিব। তাঁহার দুর কি

নিকট বংশধরগণের সমক্ষে অপরে যদি কেহ এই কবিতাগুলি পাঠ করে তবে হয়ত তাহাদের মধ্যে কোন সাধু বালকের গণ্ড লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিতে পারে, স্বগৃহের প্রতি এতটুকু সম্মানবোধ আমরা তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির নিকট অবশ্যই প্রত্যাশা করিতে পারি, ভদ্র-সাহিত্যের মর্য্যাদা লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকগণেরই বিশেষ ভাবে রক্ষণীয়। অমৃতবাবু রঙ্গালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলিয়া তিনি নিজ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা অনুমান করা অপরিহার্য্য নহে, এই পরিচয়ের কি প্রয়োজন ছিল? দুর্নীতি নিলর্জ্জ ও পর্দ্দাশূন্য হইলে তাহা বীভৎস হইয়া উঠে, এই আত্মঘোষনা তাঁহার নিকট কেহ চাহে নাই। বাইরণ চাইল্ড হেরল্ড কি ডনজুয়ানে নিজ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার প্রতি সমাজ খড়্গ হস্ত হইয়াছিল। আমাদের মধ্যে যাহারা বড় বেশী অশ্লীল গাহিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ নিজের কথা এরূপ ভাবে কহিতে সাহসী হয় নাই। আমাদের রঙ্গালয়গুলি তরুণবয়স্ক যুবকদের অপকার করিতেছে, এই অভিযোগ সর্ব্বত্র শোনা যায়। রঙ্গালয়ের কবি দুহাতে মসী লিপ্ত করিয়া পাপপুণ্যের ব্যবচ্ছেদ রেখাটি মুছিয়া ফেলিবেন, এই আবদার সহনীয় নহে। এই দৃষ্টান্তে তাঁহার মত সত্যভাষীগণ বঙ্গ-সাহিত্যের একাঙ্গ পুতিগন্ধময় কেচ্ছায় পূর্ণ করিতে প্রয়াসী হইতে পারেন। অমৃতবাবুর রচনার অনেক স্থল চিত্তাকর্ষক ও কোন কোন বিষয়ে তাহার বিশেষ কৃতিত্ব না থাকিলে আমরা এতগুলি কথা বলিতাম না। বটতলা খুঁজিলে আজও এমন সকল রসিকতাপূর্ণ পুস্তক পাওয়া যায়, যাহা শুনিলে কাণে হাত দিয়া উঠিয়া যাইতে হয়,—সে সকল পুস্তক উপেক্ষা করা যায়, কিন্তু সমালোচ্য পুস্তকখানি উপেক্ষণীয় নহে।

বিদেশে যাঁহারা নিজের কুৎসিৎ কাহিনী সাধারণের নিকট প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত এদেশে অনুসরণীয় নহে। আমাদের সুবৃহৎ একান্নভুক্ত পরিবারের সামাজিক একটা সম্ভ্রম ও মর্য্যাদা সাধারণের চক্ষে সর্ব্বদা রক্ষণীয়, এ বিষয়ে তাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আমাদের নাই, বাক্য সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণের অনুশাসনও সেইরূপ। কিন্তু বিদেশেও যাঁহারা স্বীয় পাপের কাহিনী রটনা করিয়াছেন, তাঁহারা পাপের স্রোত হইতে অনুসন্ধান করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে সেই সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—এজন্য তাঁহারা মার্জনীয়—ইহাতে বাহাদুরী কিছুই নাই। অমৃতবাবু অনেকগুলি অতীত পাপ

চিত্রের প্রতি যেন লালসার চক্ষু নিপতিত করিয়া কবিতা লিখিয়াছেন, তাহাতে অনুশোচনার ভাব নাই, এইজন্য উহা আমাদের নীতিবুদ্ধিকে দ্বিগুণতর আঘাত প্রদান করে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে অমৃত-মদিরার অনেকগুলি কবিতা সুন্দর, উজ্জ্বল ও কৌতুকাবহ। পুস্তকের নাম "অমৃত-মদিরা"—কবি সত্য সত্যই যেন মদিরা পানে টলিতে টলিতে অনেকগুলি কবিতা লিখিয়াছেন—তাহাতে তাঁহার পাদস্খলনের অভাব নাই, মুখনিঃসৃত রুচির গন্ধ কতকটা তীব্র, কখনও তিনি ভক্তিতে গদ গদ কণ্ঠ, কখন বা তিনি বৈষ্ণবের ন্যায় বিনীত, পবিত্র ও জঘন্য স্থানে নির্ব্বিকারে প্রবেশ করিতেছেন—তাঁহার রচনাবলীর স্থানে স্থানে একটা ঘোর মত্ততার ভাব আছে, তাহা কোন সময় আমাদের প্রীতির উদ্রেক করে, কখনও বিরক্তির ভাব আনয়ন করে। তাঁহার "অমৃত-মদিরা" শীর্ষক কবিতাটিই সর্ব্বাপেক্ষা কৌতুকাবহ, উহাতে পূর্ব্বোক্ত দোষ গুণ উভয়েরই প্রাচুর্য্য আছে। উহার কোন স্থান পড়িয়া আমরা কবির লজ্জাহীনতা দেখিয়া লজ্জিত হইয়াছি, আবার কোন স্থানে উহাতে শিশুর সৌকমার্য্য আছে—মদিরাসেবির কথার ন্যায় একটা সারল্যের ভাব উহার সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে। বিনোদিনী নাম্নী অভিনেত্রী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ছত্রগুলি পর্য্যন্ত আমরা কবিতার অনুরোধে পাঠ করিতে পারি, কিন্তু তদপেক্ষা অধিক অসহনীয়—

> কল্পনায় আপনারে গড়ে তিলোত্তমা।
> আয়েসা কি সূর্য্যমুখী কুন্দ মনোরমা॥
> কখন ছাদেতে বসি একাকী বিরলে।
> মালা তুলি' দেয় জুলি'— 'রোমিও'র গলে॥
> কভু নেবু তরুতলে যায় এলোচুলে।
> ওফেলিয়া পাগলিনী সাজে বনফুলে॥
> প্রমীলা—লীলায় ছোঁড়ে তীর ধনু ধরে'।"

এই দীর্ঘ কবিতাটিতে অমৃতবাবু যেখানে যৌবনের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব ও বার্দ্ধক্যের হৃদয়হীনতার চিত্রটি আঁকিয়াছেন, তাহার মধ্যে ব্যঙ্গের ছিটাফোঁটা আছে কিন্তু উহাতে কবির সকরুণ অশ্রুই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তিনি ব্যথিত হিয়ায় যাহা অনুভব করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া আমরা ব্যথিত হইয়াছি। বাল্যের দারিদ্র্য বর্ণনাটিও মাঝখানে বেশ জীবন্ত হইয়াছে।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য, যে কোন ব্যাপারই হউক না কেন, সংযম তাহাকে উন্নত ও মহিমান্বিত করিয়া তোলে। কবি নিজেই লিখিয়াছেন, "সুনট মর্কট নয়"—চাঞ্চল্য ও দ্রুতগতিই নর্ত্তনের প্রাণ, কিন্তু তাহার মধ্যে যে নট সংযমী, গতি-প্রক্রিয়া যাহার আয়ত্ত, সেই শ্রেষ্ঠ নট। কবি অপর এক স্থলে লিখিয়াছেন—"বাগ্মীতার পরিচয়, জীবন নিনাদ নয়।" যে বাগ্মীর সংযম আছে, তিনিই শ্রেষ্ঠ বাগ্মী। ব্যঙ্গ ও চাপল্যের মধ্যে যাঁহার একটু সংযমের আভাস থাকে, তিনি শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গকবি হইতে

পারেন। এই কবিতাগুলির অনেক স্থলে সেই সংযমের অভাব বিশেষ ভাবে লক্ষিত হইল ; মনে যে তরঙ্গ আসিয়া আঘাত করিল, তাহাতেই ভাসিয়া চলিলে কবিতা দেবী অকূলে হারা হইয়া পড়েন। এই গ্রন্থখানির অনেক সুন্দর ভাব ও বিচিত্র কল্পনা আমাদের মনোরঞ্জন করিয়াছে কিন্তু কবি তাঁহার উদ্দাম প্রবৃত্তির মুখের রাশ ছাড়িয়া দিয়াছেন। এই বিচিত্র যানারোহন এজন্য আমরা নিরাপদ মনে করি না। ইহা আমাদের স্বাভাবিক লজ্জাশীলতা ও সম্ভ্রমের ভাব দলন করিয়া কলুষিত রাজ্যে লইয়া যায়, আমরা তাহা কবিতার স্বস্থান বলিয়া কখনই বরণ করিয়া লইব না ; বাণী যদি তাঁহার কোন আদুরে ছেলের স্নেহে তাঁহাকে ততদূর পর্য্যন্তও অনুসরণ করেন তথাপি আমরা অনুগমন করিতে সাহসী হইব না। অমৃতবাবু এবার আমাদিগকে সমধিক পরিমাণে মদিরাই উপহার দিয়াছেন। আশা করি তিনি বারান্তরে অমৃত উপহার দিয়া স্বনামের সার্থকতা করিবেন।

"অমৃত-মদিরায় নিম্নলিখিত কবিতাগুলি আছে:—সরস্বতী, অঞ্জলি, নিবেদন, বিশ্বনাথ, নান্দী, ক্ষুধাতুরের খেদ, দিল্লীর বাসরসজ্জা, সঙ্গীত সমাজের নিমন্ত্রণে, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, স্মৃতির আদর, গ্রাম্য বীরাঙ্গনা, কালিকা, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, রবীন্দ্রনাথঠাকুর, অভিষেক দরবার, সোহাগিনী, শনিবারের বারবেলা, কাক, নবীনচন্দ্র সেন, লোকনাথ মৈত্র, মল, হারাণ রক্ষিত, তালের তত্ত্ব, বৈষ্ণবকবি, শ্রীশ্রীমদনমোহন, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ, বালবিধবা, কাশী স্তোত্র, নটনাথ, হরিদাস, যুগলমন্ত্র, দানবীর কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, হেমচন্দ্রের মুক্তি, সৎকার, বঙ্গের আর এক রঙ্গ, কোথা গেলে বিনোদিনী, নগরের বিবাহ, নদী, ঝড়, ছাত্রগণের কর্ত্তব্য, বিড়াল ও বাঙ্গালী, মান, কিসে মন পাই, ব্যাঘ্র এক মহাকাব্য, রোষ-বিহ্বলা, বিরহ, শ্রীমতীর অভিসার, উন্মত্ত, রূপবর্ণনা, রোগশয্যায়, মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ, অবসাদ, সমুদ্রবক্ষে, "পতি, স্নানান্তে, ঋতু বর্ত্তন, দরবারে, প্রভাতবর্ণন, অন্তঃপুর উদ্দীপনা, নববর্ষ, ইন্দ্রজাল, নটনীতি, অমৃত-মদিরা, নূতন জীবন।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

আমার লাগিয়া।

তোমরা বাছিয়া নাও,
যাহা কিছু ভাল পাও,
পরস্পর বিভাগ করিয়া;
যাহা কিছু পরিতাপ,
যাহা কিছু অভিশাপ,
রেখে যাও আমার লাগিয়া।

দক্ষিণা মলয় বায়ু,
বাড়ে যাহে পরমায়ু,
লও বুকে তোমরা পাতিয়া;
দগ্ধ বায়ু সাহারায়
পরাণ জ্বলিয়া যায়
তাই রে'খ আমার লাগিয়া!

নক্ষত্র-খচিতাকাশে,
সুবিমল চাঁদ হাসে,
দে'খ তাহা তোমরা চাহিয়া;
অমানিশা অন্ধকার,
মেঘাবৃত চারি ধার,
থাক্ তাহা আমার লাগিয়া!

চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়,
তোমরা সকলে খেও,
স্বর্ণ খাটে থাকিও শুইয়া,
পরিত্যক্ত ভস্ম ছাই,
যাহে কিছু কাজ নাই,
তাই রেখ' আমার লাগিয়া!

সুখ শান্তি ভালবাসা,
নিতি নব নব আশা,
থাক সব তোমরা লইয়া,
ঘৃণা কষ্ট অনাদর,
যাহে দুঃখ বহুতর,
রেখো তাই আমার লাগিয়া!

প্রশংসা তোমরা লও,
যেই খানে যাহা পাও,
সদা অতি যতন করিয়া;
লোক নিন্দা অপবাদ,
নাহি যায় কারো সাধ,
থাক্ তাই আমার লাগিয়া!

অনাঘ্রাত সুকুমার,
সুবাস কুসুমহার,
পর সবে জীবন ভরিয়া ;
অপবিত্র অপকৃষ্ট,
যাহে প্রাণ হয় নষ্ট,
রেখো তাই আমার লাগিয়া।

না লাগে আঁচড় ঘা,
কণ্টকে না ফুটে পা,
থাক সুখে সকলে বাঁচিয়া ;
পড়ুক অশনি মাথে,
ক্ষতি নাহি কা'রো তা'তে,
আমি যদি যাই গো মরিয়া!

স্বর্গ-প্রয়াণ রচয়িতা—

শ্রীভুবনমোহন দাস গুপ্ত।

———

মোস্‌লেম জগতে বিজ্ঞান চর্চ্চা।

বিগত মাসে আমরা দেখাইয়াছি জ্যোতির্বিজ্ঞানে মোস্‌লেমগণ কতদূর উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন। এক্ষণে আমরা দেখাইব, তাঁহারা অন্যান্য বহুশাস্ত্রেও বহু সভ্যজাতির কতদূর অগ্রণী ছিলেন।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা প্রণালী।

মোস্লেম পণ্ডিতগণই পদার্থবিদ্যাকে একটী ধারাবাহিক শাস্ত্রে গঠিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, ইহার যৎকিঞ্চিত আভাস পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা প্রণালীর (Experimentation) উদ্ভাবন করিয়া মোস্লেমগণই আধুনিক বৈজ্ঞানিক উন্নতির পথ সরল করিয়া রাখিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, ভূবিদ্যা, রসায়ন, চিকিৎসাশাস্ত্র, প্রাণিবিদ্যা, ইতিহাস প্রভৃতি জনসাধারণের ঐকান্তিক যত্নে ও অনুশীলনে অসাধারণ উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল।

বীজ গণিত।

প্রাচীন গ্রীকেরা বীজগণিতের যে দুই একটী প্রাথমিক সূত্র অবগত ছিলেন, তাহা কখনও উচ্চগণিতের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। কিন্তু ইস্‌লামের শিষ্যগণ বীজগণিতের উচ্চাঙ্গীয় সূত্র রাশি রাশি আবিষ্কার করিয়া উক্ত শাস্ত্রের এত উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগকেই উহার আবিষ্কার-প্রশংসা প্রদান করা যাইতে পারে।* খলিফা মামুনের শাসন সময়ে (৮১৩-৩৩) মোস্লেম পণ্ডিতগণ দ্বিঘাতি সমীকরণের (Equations of the second

* কায়রোর সাধারণ পাঠাগারে ২০ লক্ষের অধিক গ্রন্থ সংগৃহীত ছিল। তন্মধ্যে ৬০০০ গ্রন্থ কেবলমাত্র জ্যোতিষ ও গণিত শাস্ত্র বিষয়ক।

degree) আবিষ্কার করেন। ইহার কিছুকাল পরে তাঁহারাই আবার চাতুরাস্ত্রিকসমীকরণ (Quadratic Equation) ও দ্বিসাংজ্ঞিক সূত্র (Binomial Theorem) আবিষ্কার করিয়া উক্তশাস্ত্র উচ্চগণিতভুক্ত করিয়া তুলেন। আধুনিক পাশ্চাত্য বীজগণিতের উৎপত্তি যে আরবজাতির অভ্যন্তরে, উহার আরবীয় নামই তাহার প্রমাণ (Algebra)। জ্যামিতি, পাটীগণিত, চক্ষুর্বিজ্ঞান (Optics), যন্ত্রবিদ্যা, Mechanies) প্রভৃতি মোস্লেম-হস্তেই প্রভূত উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। বার্ত্তুলিক ত্রিকোণমিতিতে (Spherical Trigonometry) মোস্লেমজাতি ভিন্ন অপর কাহারও আবিষ্কার-স্বত্বাধিকার নাই। ত্রিকোণমিতির সাইন, কোসাইন প্রভৃতি সংজ্ঞার জন্মদাতা যে একমাত্র মোস্লেম পণ্ডিতগণই, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। ভূগোলশাস্ত্রেও তাঁহারা বড় কম উৎকর্ষের পরিচয় প্রদান করেন নাই। কাহারও কাহারও মতে উক্তবিদ্যা প্রথম মোস্লেমগণেরই আবিষ্কার। ইব্নে হওকাল, মাকরিজি, ইস্তাথরী, মস্উদী, বেরুণী, কুমী, ইদ্রিসী, আবুলফেজা প্রভৃতি শত শত পণ্ডিতের গ্রন্থাবলী হইতে আমরা মোস্লেমজাতির ভৌগলিক জ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্ত হই। ইউরোপে যখন "পৃথিবী সমতল" এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল, এবং জীবন্ত দগ্ধ হইবার ভয়ে কোন বিজ্ঞ এই বিশ্বাসের বিপরীত কোন অভিমত প্রচারে সাহসী হইত না, তখন মোস্লেমরাজ্যের বিদ্যালয় সমূহে ভৌগলিক অধ্যাপকগণ ভূগোলক (Globes) লইয়া ছাত্রবৃন্দকে ভূগোলের পাঠ প্রদান করিতেন।

দ্বিঘাতি ও চাতুরাস্ত্রিক সমীকরণ, দ্বিসাংজ্ঞিক সূত্র।

বার্ত্তুলিক ত্রিকোণমিতি।

ভূগোল।

রসায়ন শাস্ত্রের আবিষ্কার ও উচ্চবিজ্ঞানে পরিণতি যে মোস্লেম

পণ্ডিতগণের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছিল, এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত। আধুনিক রসায়নশাস্ত্রের একমাত্র স্থাপয়িতা যে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত আবুমুসা জাবর, একথাও কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

রসায়ণ।

তাহার পর চিকিৎসাবিজ্ঞান। ভৈষজ্যশাস্ত্র ও অস্ত্রচিকিৎসা প্রণালী যে মোস্লেমগণের হস্তে কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। যদিও ইউনাণী চিকিৎসকগণ ভেষজশাস্ত্রে যথেষ্ট ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তথাপি মোস্লেমগণ উহাতে যেরূপ উৎকর্ষলাভ করিয়াছিলেন, তাহার সহিত প্রাচীন শাস্ত্রের তুলনাই হইতে পারে না। অস্থিবিদ্যা-সম্বলিত দেহতত্ত্ববিজ্ঞানের (Anatomy and Anatomical Physiology) অভাবে হিন্দুর অঙ্গহীন আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র ত তাহার সম্মুখে তিষ্ঠিতেই পারে না। আধুনিক সভ্যজগতের ঔষধাগার স্থাপন প্রথা (Dispensary) মোস্লেমগণই প্রথম উদ্ভাবন করেন। রাজ্যের যাবতীয় সাধারণ ঔষধাগারের উপর রাজপুরুষেরা স্বয়ং কর্ত্তৃত্ব করিতেন। প্রচলিত ঔষধাদির মূল্যাদিও রাজকীয় নিয়মে নিরূপিত হইত। সাধারণ পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে চিকিৎসাব্যবসায়াবলম্বনের অনুমতিপত্র প্রদত্ত হইত। এমন কি ঐরূপ অনুমতিপত্র ব্যতিরেকে কেহ কম্পাউণ্ডারিও করিতে পাইতেন না। মোস্লেম চিকিৎসালয় ও ঔষধালয়গুলি "বিমারিস্তান" বা "দার-উশ-শাকা" নামে অভিহিত হইত। অস্থিবিদ্যার দুই একটী মৌলিক তত্ত্ব গ্রীকেরা অবগত ছিল। কিন্তু মোস্লেম চিকিৎসকগণ ভৈষজ্যের সঙ্গে সঙ্গে অস্থি-বিদ্যাও একটী সুসম্বদ্ধ বিস্তৃত বিজ্ঞানে উন্নীত করিয়াছিলেন। মোস্লেম চিকিৎসকগণ যে সকল ভৈষজ্যচিকিৎসা, অস্ত্রচিকিৎসা ও অস্থিবিদ্যা বিষয়ক অসংখ্য বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন

চিকিৎসা-বিজ্ঞান।

ঔষধাগার।

অস্থিবিদ্যা।

করিয়াগিয়াছেন, এবং যে সকল গ্রন্থ উত্তরকালে ভিন্ন ভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়া আধুনিক ইউরোপীয় চিকিৎসা প্রণালীর ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিতে গেলে একটী প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া পড়ে।

উদ্ভিদ্বিদ্যা।

গ্রীকদিগের অসম্পূর্ণ উদ্ভিদবিজ্ঞান মুসলমানেরাই সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। রাশি রাশি নূতন উদ্ভিদের নূতন ধর্ম্ম পরীক্ষাদির দ্বারা আবিষ্কার করিয়া উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানে তাঁহারা নবযুগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। ছাত্রগণকে প্রমাণ পরীক্ষাদির

ঔদ্ভিজ্জ কানন।

দ্বারা উদ্ভিদ্বিদ্যা শিক্ষা প্রদানার্থ বোগদাদ, ফেজ, কায়রো, কর্দ্দভা প্রভৃতি বিজ্ঞান-কেন্দ্রে যে সকল বহুবিস্তৃত ঔদ্ভিজ্জ কানন (Botanical Gardens) স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা হইতেই যে উত্তরকালে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং আধুনিক Botanical Garden Systemএর আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

প্রাণিতত্ত্ব।

পাশ্চাত্য প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত Buffonএর ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে ইস্‌লাম-জগতে মহাত্মা অল্‌দেমরি আবির্ভূত হয়েন। প্রাণিজগতের এক প্রকাণ্ড ইতিহাস (Zoology) লিখিয়া ইনি অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ভূবিদ্যায়

ভূবিদ্যা।

(Geology) মোস্লেমগণ বিশেষ বুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। "ইল্‌মে তশ্‌রিহ্‌-উল্‌-আরজ" অর্থাৎ "ভূগর্ভের তত্ত্ব" অথবা "পৃথিবীর দেহ-বিজ্ঞান" এই নামে ভূবিদ্যার অনুশীলন হইত।

শিল্প ও স্থপতি।

মোস্লেমগণের স্থাপত্য-শিল্প ও প্রস্তর-গৃহ-নির্ম্মাণ-কুশলতাসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় জগতে তাঁহার অননুকরণীয় নিদর্শনসমূহ

অদ্যাপি অভ্রভেদী শিরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, এবং মানবসমাজকে স্তম্ভিত ও চমৎকৃত করিতেছে।

চিত্রবিদ্যার নিষেধ।

চিত্রবিদ্যা ও ভাস্করবিদ্যার আলোচনা কোরাণে নিষিদ্ধ থাকায় ঐস্লামিক জগতের প্রথমোন্নতিকালে তাহাতে বিশেষ কিছু উৎকর্ষলাভের কথা শ্রুত হওয়া যায় না। তদানীন্তন মানবসমাজে অন্ধ পৌত্তলিকতা এতাদৃশ স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিয়াছিল যে, ইহুদীয় ও খ্রীষ্টধর্ম্মের কঠোর অনুশাসনে তাহার চিরনির্ব্বাসন ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সে অনায়াসে উক্ত ধর্ম্মাবলম্বীগণের মধ্যেই আপন স্বত্ব ভোগ দখল করিয়া আসিতেছিল। তাই পৌত্তলিকতার মূলচ্ছেদ মানসে তৎসংশ্লিষ্ট চিত্র ও ভাস্করবিদ্যার অনুশীলনও ইস্লাম একপ্রকার নিষিদ্ধই করিয়া দিয়াছিল।

চিত্রবিদ্যার উৎকর্ষ।

কিন্তু জ্ঞান ও সভ্যতাবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত নিষেধাজ্ঞার উদারার্থ সম্যক্ উপলব্ধ হওয়া মাত্র মোস্লেমগণ চিত্র ও স্থপতি বিদ্যার উৎকর্ষসাধনে যত্নবান হইয়াছিলেন। ক্রমে খলিফাগণের প্রাসাদ, ওমরাহগণের বাসভবন প্রভৃতি সুনিপুণ শিল্পীগণ কর্ত্তৃক চিত্রশোভায় সুচিত্রিত হইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই ভাস্করবিদ্যার অনুশীলন নিষিদ্ধ থাকায় মোস্লেমগণ প্রাকৃতিক লতাপত্র-চিত্রাঙ্কন বিদ্যায় মনোযোগী হইয়া ক্রমে যে অসাধারণ স্বভাব-সুন্দর অভিনব আদর্শে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা পৃথিবীর নিকট এতদিন সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ তাহাকে Arabesque নামে অভিহিত করিয়া, তাহার অতুলনীয়তার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। মোস্লেম-নির্ম্মিত দুর্গ, প্রাসাদ, গৃহ, মস্জিদ্ প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ হইতেও অদ্যাপি যে সকল অদ্ভুত কারু-কার্য্যের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইতেই সে কালের মোস্লেম-গণের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যবুদ্ধির বিশেষত্ব কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি হয়।

সঙ্গীতশাস্ত্রও মুসলমান জগতে কোন ক্রমে উপেক্ষিত হয় নাই। বিখ্যাত মুসলমান গায়ক ও বাদকবৃন্দ সঙ্গীত বিষয়ক বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র সমূহের প্রভূত উন্নতিসাধন ও নূতন নূতন বহুবিধ বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়া সঙ্গীতশাস্ত্রের অশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল।

সঙ্গীত।

আরবীয় পণ্ডিতেরা দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়া* জ্ঞানান্বেষণ এবং বাণিজ্যব্যপদেশে জলপথে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরে প্রবেশ করিয়া সুদূরবর্তী আজোর্স দ্বীপপুঞ্জের আবিষ্কার করেন; এবং নব-পৃথিবী আমেরিকাও তাঁহাদিগের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল না।† দিগ্‌দিগন্ত ভ্রমণ করিয়া আরবীয় পরিব্রাজকবৃন্দ অসংখ্য ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। নানা দেশীয় ইতিহাসও আরবীয়েরা প্রণয়ণ করেন; তাঁহাদিগের ভিতর পৃথিবীর ইতিহাসেরও অভাব ছিলনা। ইতিহাস চর্চ্চায় আরবীয়েরা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন।

দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্র।

পরিশেষে শিল্প ও বাণিজ্যের কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।‡ মোস্লেমগণ সমগ্র রাজ্য সুদীর্ঘ প্রণালী-জালে আচ্ছন্ন করিয়া বাণিজ্য ব্যবসায় এবং কৃষি-

শিল্প ও বাণিজ্য।

---

* চীন দেশেই বোধ হয় প্রথম আবিষ্কার হয়। See C. R. Markham's History of Persia. ভা. স.

† মোস্লেম নাবিকেরা দশম শতাব্দীতে আমেরিকা আবিষ্কার করেন। কিন্তু তখন স্বরাজ্যে নানারূপ গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায়, তথায় উপনিবেশ স্থাপনে কেহ মনোযোগী হয়েন নাই।

কিন্তু বৌদ্ধ পরিব্রাজকগণ ৫ম শতাব্দীতে আমেরিকা আবিষ্কার করেন। ভা, সা,

‡ পাঠকবর্গ স্মরণ রাখিবেন যে, মোস্লেম জগতে যতগুলি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং যতগুলি গ্রন্থ তাঁহাদিগের দ্বারা রচিত হইয়াছিল, তাহার

কার্য্যের অপরিসীম উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। অধঃপাতিত স্পেনের স্থানে স্থানে অদ্যাপি যে সকল বহুবিস্তৃত প্রান্তর অনুর্ব্বর মরুভূমির দশা প্রাপ্ত হইয়াছে, মোস্লেম শাসনাধীনে তত্তৎস্থান অসংখ্য কুসুমকুঞ্জে, দ্রাক্ষানারঙ্গ-কাননে, ধান্য, চিনি, তুলা প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় ফসলে এবং সহস্র সহস্র বিস্তৃত শিল্পাগারে পরিপূর্ণ ছিল। ভূগর্ভ উদ্ঘাটিত করিয়া মোস্লেমগণ তাম্র, লৌহ, পারদ, গন্ধক প্রভৃতি ধাতু দ্রব্যের বিশাল বিশাল খনির আবিষ্কার করিয়া লাভবান হইতেন। কর্দ্দভার নিপুণ শিল্পী নির্ম্মিত সুচিত্রিত বস্ত্র, মার্সিয়ার পশমী শীতবস্ত্র, গ্রাণাডা, অল্‌মেরিয়া, সেভিলা প্রভৃতি বিখ্যাত নগরোৎপন্ন বহুমূল্য রেশম, টলেডোর ঐস্পাতিক ও হৈম পদার্থ, সলিবা-উৎপন্ন সুন্দর কাগজ, এতদ্ভিন্ন চৈনমৃৎপাত্রাদি, লৌহ, চর্ম্ম প্রভৃতি মোস্লেম শিল্পকলার অতুলনীয় নিদর্শন পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে বিশেষরূপে সমাদৃত হইত। মালাগা, কার্থাজেনা, বার্সিলোনা, কাদিজ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বন্দর পৃথিবীর বাণিজ্য ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। "পরিশ্রমই সংসারের প্রধানতম কর্ত্তব্য," ইস্‌লাম প্রচারক মহাপুরুষের এই উপদেশ বাণী জ্বলন্ত অক্ষরে হৃদয়ের স্তরে স্তরে অঙ্কিত করিয়া মোস্লেমগণ তাঁহাদিগের কর্ম্মবহুল জীবন অতিবাহিত করিতেন। তাঁহাদিগের সহস্রাধিক বাণিজ্যপোত পত পত নিনাদে অর্দ্ধচন্দ্রবিখচিত পতাকাশ্রেণী উড়াইয়া আট্‌লাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষবিদারণ পূর্ব্বক বাণিজ্যব্যপদেশে অর্দ্ধভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইত। এই সকল বাণিজ্যপোতে আরোহণ করিয়া ইব্‌নে বাতুতা প্রমুখ পরিব্রাজকগণ দূর দূর দেশ ভ্রমণ করিয়া

সহস্রাংশের একাংশও আমরা এ প্রবন্ধে উপস্থিত করিতে সক্ষম হই নাই। তদানীন্তন উন্নতি ও সভ্যতার একটী ক্ষীণ অভাস মাত্র প্রদান করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য।

কায়রোর সাধারণ পাঠাগারে ২০ লক্ষেরও অধিক গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৬০০ গ্রন্থ কেবলমাত্র জ্যোতিষ ও গণিতশাস্ত্র বিষয়ক।

নব নব দেশের নূতনতর আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, শাসন, বাণিজ্য, শিল্পজ-খনিজ-পদার্থ, জলবায়ু, প্রাকৃতিক বিবরণ প্রভৃতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বাণিজ্যে এবং দেশভ্রমণে প্রোৎসাহিত করণার্থ নানাদেশীয় ভৌগলিকতত্ব, সামুদ্রিক বিবরণ, নিরাপদ গন্তব্য পথ, প্রভৃতি বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা রাজকীয় কর্ত্তৃত্বাধীনে প্রচারিত সাময়িক পত্রসমূহে প্রকাশিত হইত। তদানীন্তন মোস্লেম সভ্যতা ও উন্নতির এতদপেক্ষা অধিকতর সুস্পষ্ট পরিচায়ক আর কি হইতে পারে?

বাণিজ্য বিষয়ক সাময়িক পত্র।

মোস্লেমজগতের এহেন মহোন্নতির সময়ে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে দুই একটী কথা এস্থানে না বলিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। সভ্যতা-গৌরবস্ফীতা আধুনিক ইউরোপীয়া অথবা মার্কিন মহিলা-বৃন্দের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, জগতে বুঝি এরূপ উন্নতি এই প্রথম। আজ সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে মোস্লেমরমণীগণ ইহাদিগের অপেক্ষা কোন বিষয়েই হীন ছিলেন না, বেশীর ভাগ তাঁহাদিগের (Legal Status) অনেক উন্নত ছিল। পুরুষদিগের সহিত সমভাগে তাঁহারা জ্ঞানানুশীলন করিতেন, এবং পুরুষদিগের সহিত সমান উৎসাহে তাঁহারা উৎসাহিতা হইতেন। তাঁহাদিগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয় ও পুস্তকাগার স্থাপিত হইত; সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, স্মৃতি, গণিত,—সর্ব্ববিধশাস্ত্রে তাঁহারা যথেচ্ছ পাণ্ডিত্য লাভ করিতেন; এবং প্রকাশ্য বক্তৃতাদিও প্রদান করিয়া পুরুষের সহিত একযোগে তাঁহারা তদানীন্তন অভ্রচুম্বিত মোস্লেম সভ্যতাশৈলে বিহার করিতেন। মহিষীরা, রাজকুমারীরা, ওমরাহগণের ধনশালিনী স্ত্রীপরিজনেরা—সকলেই আপনাপন সঞ্চিত অর্থ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিদ্যালয়, পুস্তকালয়, চিকিৎসালয়, ঔষধালয়,

স্ত্রীশিক্ষা।

অনাথাতুরাশ্রম প্রভৃতি স্থাপনে উৎসর্গ করিয়া যাইতেন। মোস্লেম-রমণীবৃন্দের বিদ্যোৎসাহের সহিত পৃথিবীর অন্য কোন জাতীয় রমণীর বিদ্যোৎসাহের তুলনা হইতে পারে না।—মোস্লেমসভ্যতা এতই উচ্চে উত্থিত হইয়াছিল!

বাধা বিঘ্ন ও তাহার পরিণাম।

এহেন আধুনিক সভ্যতার জন্মদাতা মোস্লেমগণ যদি পূর্ব্বে কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল, এবং পশ্চিমে ফ্রান্স, এই দুই স্থানে প্রথম উদ্যমে বিফল মনোরথ হইয়া ভগ্নোৎসাহ না হইতেন, তাহা হইলে সমগ্র ইউরোপ তাহাদিগের একছত্র শাসনাধীনে আসিতে পারিত; এবং যে অপ্রতিহত-বেগ-উন্নতিস্রোত স্পেনের মধ্যযুগকে পৃথিবীর ইতিহাসে অদ্বিতীয় বলিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে, সমগ্র ইউরোপ সেই স্রোতে বহু শতাব্দী পূর্ব্বেই পতিত হইয়া জগতের ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে সক্ষম হইত। তথাপি, উপর্য্যুপরি এতগুলি শত্রু কর্তৃক নিষ্পোষিত, পর্য্যুদস্ত ও হীনাঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও, যথাবশিষ্ট মোস্লেম সভ্যতার ভগ্নাবশেষ জগতের সম্মুখে যে সুমহান আদর্শ সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছে, সেই টুকু লইয়াই আজ পাশ্চাত্য জগতের এত গৌরব ও এত অহঙ্কার!—আর বিধাতা যদি তাঁহার এই সকল কৌতুক নিক্ষেপিত ধ্বংসকুশল মহাবজ্র সম্বরণ করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে পৃথিবী এতদিনে জ্ঞান ও সভ্যতায় যে কত দূর অগ্রসর হইতে পারিত, কে তাহা কল্পনা বলে স্থির করিতে পারে?

আজ যদিও কালপ্রভাবে মোস্লেমজাতির অবস্থা শোচনীয়, আজ যদিও মোস্লেমগণ আপনাদের উন্নতি পরের হস্তে দিয়া, পরের অবনতি স্বয়ং গ্রহণ করিয়া স্বহস্তগঠিত শিষ্যজাতির চরণতলে আপনি দলিত হইয়াও নিশ্চিন্তমনে কালযাপন করিতেছেন, আজ যদিও ইস্‌লামলব্ধ সভ্যতা-গৌরবে অন্ধ হইয়া খ্রীষ্টানগণ আপনাদের জ্ঞানগুরু ও উন্নতি

পথ-প্রদর্শক মোস্লেমজাতিকে লাঞ্ছিত ও সেই ইস্‌লামকে তীব্র উপহাস-বাণে বিদ্ধ করিয়া রঙ্গ করিবার অবসর পাইয়াছেন, তথাপি, সুপ্ত সিংহ যে আবার এক দিন জাগরিত হইয়া তাহার পূর্ব্বপুরুষ-সংস্থাপিত বিশাল জ্ঞানরাজ্যের সিংহাসন চরিত্রবলে পুনরধিকার করিতে সক্ষম হইবে না, এমন কথা কে বলিতে পারে!*

শ্রীইম্‌দাদুল হক্।

উত্তরায়ণে গঙ্গাস্নান।

বর্দ্ধমান সহরের পদতল ধৌত করিয়া বাঁকা নদী ক্ষীণকলেবরে নাচিতে নাচিতে যেখানে গঙ্গা সলিলে আত্মসমর্পণ করিয়াছে সেই সঙ্গমস্থলের অনতিদূরে নাদাই নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। গঙ্গাতীরের এই শান্ত ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামটি প্রায় বার মাসই নীরবতার মধ্যে থাকিয়া সময়ে সময়ে অকস্মাৎ যেন জাগিয়া ওঠে। বারুণী, যোগ, দশহরা, উত্তরায়ণ প্রভৃতি উপলক্ষে অসংখ্য যাত্রী এই নাদাইয়ে সমবেত হইয়া গ্রামটিকে এক দিনের জন্য ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে।

আজ উত্তরায়ণে নাদাইয়ে বড় ভাঁক। শত শত যাত্রী শত শত দোকানে কলরব করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। স্থানে স্থানে কপি, কমলালেবু, মরটসুটির স্তূপ সাজাইয়া বিক্রেতা যাত্রীদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে। কত মনোহারীর দোকান, কাপড়ের দোকান, খাবারের দোকান, হাঁড়ির দোকান! সমস্ত-দিন-ব্যাপী একটা

* প্রবন্ধটী মাননীয় জষ্টিস্ সৈয়দ আমীর আলী কৃত The Spirit of Islam অবলম্বনে লিখিত।

উত্তেজনা, কলরব, চাৎকার ও বিবাদের মধ্যে আপনাদিগকে স্থাপিত দেখিয়া পল্লীবাসীরা বড়ই আনন্দ অনুভব করেন। আমাদের যাত্রীগণ মধ্যরাত্রা হইতে চলিতে আরম্ভ করিয়া রাত্রে ৬।৭ ক্রোশ পথ অতি-বাহন করিয়া প্রাতে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইল ও সকলে প্রথমে "গঙ্গা গঙ্গা" বলিয়া ধুলাপায়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া চড়ার উপর একটা পরিষ্কৃত স্থানে সকলের মোট এক জায়গায় রাখিয়া হাট করিতে গেল। অনন্ত ও জয়রাম সেই মোট আগলাইয়া বসিয়া রহিল। স্ত্রীগণ প্রস্থান করিলে জয়রাম বড় রাগিয়া উঠিল। অনন্তকে বলিল "দাদা, দেখ দেখি আস্পদ্দা! আমরা মেয়ে মানুষের মতন বসিয়া রহিলাম আর মেয়ে গুলা পুরুষের মত হাট করিতে গেল।"

অনন্ত হাসিয়া বলিল "ভাই রাগিস কেন? এই রাত্রে ছয় সাত ক্রোশ পথ হাঁটিয়া আসিলাম পা ব্যথা করিতেছে, কে এখন হাট করিতে গিয়া ঘুরিয়া মরিবে? আবার হাট করিলেও ওদের পছন্দ হইবে না। মরুগ্‌গে ওরা ঘুরে ঘুরে, আমরা বসিয়া খানিক জিরুই আয়।"

জয়রাম হাসিয়া বলিল "দাদা, তোমার আচ্ছা বুদ্ধি।" এই বলিয়া "আঃ" বলিয়া একটা মোট মাথায় দিয়া শুইয়া পড়িল। অনন্ত অন্যমনস্কে বসিয়া গঙ্গা দর্শন করিতে লাগিল। এমন সময় রমণীলোক হায় হায় করিতে করিতে ও রঙ্কা কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া [illegible], জীবনের অনন্ত চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে? ব্যাপার দুঃখ দেখিয়া রঙ্কা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "পার্ব্বতী হারিয়ে [illegible]কালয়ে যাইলে হবে গো? কি করে পাবো গো? সে যে সোমরোগের ঔষধ নাই। অনন্ত বলিল "বিলক্ষণ, তিন পয়সার হাট করি অন্ত গিয়াছ কেন? যাইলে, তার মধ্যে একজনকে হারাইয়া [illegible] হয়! আমাকে দেখা লোক যাহোক!" এই বলিয়া উঠিয়া দাঁড়া[illegible]য়া—" এমন সময় চড়ার উঠিয়া বলিল "দেখলে দাদা, আমি [illegible] বাষ্পগদগদ কণ্ঠে বলিল

যদি যব মাড়া হত, তা হলে আর ভাবনা থাকতনা।" এই বলিয়া হাবুর মার মুখের কাছে গিয়া কহিল "তুই পয়সার হাট করে খাবার ক্ষ্যামতা নেই তবে কি কত্তে আছ? কেবল কোমর বেঁধে ঝকড়া করতে আর বয়ের মাথায় ঝাঁটা মারতে ?"

"হ্যাদে দেখ! আমি কি কল্লাম? বামুনঠাকুর আমার সাতে নাগতে এলে কেনে? বাড়ি হ'তে বেরিয়ে আর এই ঘাট হতে কেবল আমাকে 'মাগি' 'মাগি' 'মাগি'; আর আমি যদি মিন্সে বলি তখন তোর মানটা কোথায় থাকেরে বামনা ?"

অনন্ত বাধা দিয়া রক্ষাকে কহিল "অত কাঁদছ কেন? ভয়কি? এই খানেই কোথাও আছে।"

রক্ষা সরোদনে বলিল "নাগো, সেবার আমি মানকুণ্ডর রাস দেখতে গিয়াছিলেম সেখানে অমনি কতকগুলো ডানপিটে ছোঁড়া জুটে কাদের একটা সোমত্ত মেয়েকে তুলে নিয়ে গেল। আর সেবার অমনি মাহেশে রথ দেখতে গিয়ে, হেমা তুই তো জানিস—একটা মে—" হেমা আর রক্ষাকে কথা কহিতে দিল না ধমক দিয়া কহিল "আমরণ জ্ঞানশূন্য হইছিস না কি? কার সাক্ষাতে কি বলিস?"

দশ অনন্ত সক্রোধে কহিল "যদি জানতে তবে এসেছিলে কেন? হইয়া কাট বাজার গঙ্গাজলে ফেলে দাও, দিয়ে চল এক এক জন এক আজ [illegible]তে যাই—।"

"সেই ভাল তাই যাই চল, তা হইলে মোট আগলে। মা বসে থাক।" জয়রাম বলিল "এই বার। চারটের মধ্যে তিনটে ফিরিবে, আর শেষে যাও আমি যাবনা কিন্তু।"

' বলিয়া জয়রামের হাত ধরিয়া অনন্ত চলিয়া '—হায়—করিতে করিতে জনতা মধ্যে

প্রবেশ করিল। কেবল হাবুর মা একাকিনী সেই সকল মোট ও বাজার-হাট অগলাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

যেখানে স্নানের জন্য লোক জন সমবেত হইয়াছে তাহার কিছু উত্তরে গঙ্গার ধারে শ্মশান। গঙ্গার ধারে প্রায় এক মাইল স্থানব্যাপী এই শ্মশান। এখানে লোক জন নাই, আনন্দ কোলাহল নাই, বাজার-হাট নাই; ইতস্ততঃ নির্ব্বাপিত চিতা রক্ত বর্ণ মুখ ব্যাদান করিয়া যেন আহার্য্যের অপেক্ষা করিতেছে। অঙ্গার দগ্ধ ও অর্দ্ধ দগ্ধ কাষ্ঠ, ছিন্ন বস্ত্র, ভগ্ন বংশদণ্ড ইত্যাদি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; অদূরে কয়েকটা পত্র-বিরল অশ্বত্থ বৃক্ষে এক পাল শকুনি বসিয়া আছে কোনটা বা এক একবার উড়িয়া এ গাছ হইতে ওগাছে গিয়া বসিতেছে। শ্মশান সকল দেশেই সমান।

সেই ভীষণ শ্মশানে, গঙ্গার তীরে একটা আড়ুলির নীচে নরচক্ষুর অগোচরে একজন যুবতী একটা চিতার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া অস্ফুট চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতেছে। অভাগিনীর বিধবার বেশ। আলুলায়িত রুক্ষ কেশ, বস্ত্র, মুখমণ্ডল ও সর্ব্বাঙ্গ চিতাভস্মে আবৃত। অভাগিনী যোড় করে বলিল "কোথায় তুমি? আমার আরাধ্য দেবতা কোথায় তুমি? আমার অন্ধকারময় জীবনের একমাত্র আলোক, দুঃখের শান্তি, যৌবনের সুখ, কোথায় তুমি? নিরাশার আশা, জীবনের উদ্দেশ্য কোথায় তুমি? একবার এস, বুকচিরিয়া আমার দুঃখ দেখিয়া যাও। এ দুঃখ কাঁদিলে যায় না, ঘুমাইলে ভুলিনা, দেবালয়ে যাইলে দ্বিগুন জ্বলিয়া ওঠে। উপাস্য দেব! তুমি ভিন্ন এ রোগের ঔষধ নাই। আমার জীবনের সুখ-সূর্য্য চিরকালের জন্য অস্ত গিয়াছ কেন? আমার কি দোষ দেখিয়া আমাকে ত্যাগ করিলে? হয়! আমাকে দেখা দাও, নচেৎ আমাকে তোমার নিকট ডাকিয়া—" এমন সময় চড়ার উপর হইতে একজন যুবক চক্ষু মুছিয়া বাষ্পগদগদ কণ্ঠে বলিল

"পার্ব্বতি! আর কেঁদনা, উঠে এস—তোমার জন্য সকলে বড় ব্যস্ত হয়েছে—"

পার্ব্বতী শশব্যস্তে উঠিয়া মাথায় কাপড় দিল। অনন্ত আবার সরোদনে বলিল "তুমি কি করিতে আসিয়াছ, আর কি করিতে-ছিলে?"

পার্ব্বতী কহিল "আমি যা, কর্ত্তে আসিনা কেন তোমার কি? তুমি কেন আমাকে বিরক্ত করিতে আসিলে?"

অনন্ত অপ্রতিভ হইয়া বলিল "ভগ্নি, আমি তোমাকে খুঁজিতে আসিয়াছি, তোমার জন্য সকলে কাঁদিতেছে ও ভাবিতেছে। সকলেই তোমাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, কাহারও আহারাদি হয় নাই।" এই বলিয়া আবার স্নেহ গদগদ স্বরে কহিল "পার্ব্বতি! আজ আট মাস হইল তোমার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, তার পর এই আট মাসের মধ্যে কত লোকের মৃত্যু হইয়াছে, কত চিতার উপর চিতা জ্বলিয়াছে, তুমি কোন চিতার উপর পড়িয়া কাঁদিতেছিলে?"

পার্ব্বতী এইবারে লজ্জিত হইল, মনে করিল অনন্ত তাহা হইলে ...ল কথাই শুনিয়াছে—হয়ত গ্রামে গিয়া গল্প করিবে।

...র্ব্বতীকে অধোবদন দেখিয়া অনন্ত বলিল "শীঘ্র এস, আর বিলম্ব

ধীরে ধীরে কহিল "আমি তোমার সহিত যাইবনা, তুমি ...তছি।"

...' কেমন করিয়া যাবে, হাট তলায় অনেক কাবুলী

...কেরা কাবুলী দেখিয়া বড় ভয় পায়। কারণ কাবুলীরা বড় অত্যাচার করে। সেইজন্য ভাবিতে লাগিল। অনন্ত তাহার মনে

ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল "কি করিবে বল ? না হয় আমি যাই, তুমি এর পরে এস।"

"না-আমিও যাচ্ছি চল।"

পার্ব্বতী উঠিয়া গঙ্গা জলে মুখ ধুইয়া অঞ্চলে মাথা ও মুখ মুছিয়া অনন্তর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

একগাছা অনতিস্থূল তৈলপক্ক বংশযষ্টি হাতে করিয়া অনন্ত আগে আগে এবং দুর্গানাম করিতে করিতে পার্ব্বতী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া ক্রমে ক্রমে মেলার জনতার মধ্যে প্রবেশ করিল।

মেলা পার হইয়া তাহারা আবার গঙ্গার চড়ায় আসিয়া পড়িল। এইবার পার্ব্বতির বিষম বিপদ উপস্থিত। সম্মুখে পথের দুই ধারে দুইজন কাবুলী দাঁড়াইয়া আছে। পার্ব্বতী সভয়ে কহিল "দাদা এইবার কি হবে ?"

"কি হবে ?"

"দেখনা কে দাঁড়াইয়া আছে।"

"থাকলেই বা তোমার ভয় কি ?"

"যদি কিছু বলে ?"

"বলা অমনি পড়ে রয়েছে কিনা ? বলুক্না দেখি, লাঠির চোটে ভূত ছাড়ে, এ ত মানুষ।"

অনন্ত পথে যাইতে যাইতে হঠাৎ মনে করিল—পার্ব্বতী আসিবার সময় কোনও প্রকার হাস্য পরিহাসে যোগ দেয় নাই কেন, এতক্ষণে তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারা গেল। পার্ব্বতী গঙ্গাস্নান করিতে আইসে নাই, সে মৃতপতির চিতার উপর পড়িয়া, শোকতাপনাশিনী মা জাহ্নবীর নিকট আপনার শোকের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে আসিয়াছিল। অনন্ত পার্ব্বতীকে বড় স্নেহ করিত। কারণ তাহার পত্নী সুলক্ষণার সহিত পার্ব্বতীর বড় ভাব। বিশেষতঃ তাহাদের গ্রামে পার্ব্বতীর ন্যায়

শান্ত, লজ্জাশীলা মেয়ে কেহ ছিল না। তার উপর আবার পার্ব্বতী এই বালিকা বয়সে বিধবা হইয়াছিল বলিয়া গ্রামের সকলেই তাহার জন্য বড় দুঃখিত ছিল। অনন্তর স্ত্রী সুলক্ষণা পার্ব্বতীকে প্রাণাপেক্ষাও ভাল বাসিত। পার্ব্বতী নিজের গৃহকার্য্য শেষ করিয়া গিয়া সুলক্ষণার গৃহ-কার্য্যে কত সাহায্য করিত।

খানিক দূর গিয়া অনন্ত কহিল "পার্ব্বতি, তুমি এই বট গাছটার তলায় বস।"

পার্ব্বতী সভয়ে বলিল "কেন?" আমি একেলা গাছতলায় বসে থাকিব কেন? দাদা তুমি কোথায় যাবে?"

"আমি যাব আর কোথায়? গিয়ে আমাদের দলের লোকেদের সম্বাদ দি, তাহারা আসিয়া তোমাকে লইয়া যাক।"

"কেন? বেশত তোমার সঙ্গে যাইতেছিলাম, তেমনি যাইনা কেন?"

"না, আমার সঙ্গে যাওয়ার অনেক দোষ আছে।"

"দোষ আবার কি?"

"দোষ কি তা তোমাকে কি বলব? যদি ভাল চাও তাহলে এই খানে বস, নচেৎ তোমার যা ইচ্ছা কর।"

অগত্যা পার্ব্বতী সভয়ে একাকী সেই বটবৃক্ষতলে বসিয়া রহিল।

গঙ্গাতীরে কেবল আমাদের পরিচিত যাত্রীগণ ভিন্ন আর সকলেই মহাভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে অবগাহন করিতেছে। রক্ষা, হেমা প্রভৃতি সকলে মেলাতলা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া পার্ব্বতীর সন্ধান না পাইয়া অতিশয় দুঃখিত মনে বসিয়া আছে। সকলেই বিশেষ উৎসুক চিত্তে অনন্তর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। রাইপুরের গৃহিণী অর্দ্ধ-নিদ্রিত অর্দ্ধ-জাগরিত অবস্থায় বলিতেছেন "হে মা গঙ্গে! আমাদের পাচুকে মিলয়ে দাও, তোমাকে ডাব দিব, চিনির শাড়ি দিব, চেলির নৈবিদ্য দিব, পাচুকে এনে দাও মা, কি করে বাছাকে পাব গা!" গৃহিণীর

চিনির শাড়ী ও চেলির নৈবেদ্য শুনিয়া ইটের বউ হাসিয়া বলিল "এত দুঃখেও হাসি আসে; আদ্দেইনি জেঠাই মা তুমি চুপ কর—আর কথায় কাজ নাই।"

কেঁদোর বউ বলিল "তাইত সই, এত খুঁজে হালাক পালাক হলাম তবু তার সন্ধান পেলাম না!"

তাহার সই বলিল "একটা আশ্বাস এখনও আছে যখন তুজনা মরদ এখনও ফিরে এলনা। তাবা না এলে আর রান্না বান্না হচ্চে না।"

ক্ষেমা বলিল "অনন্ত যখন ফেরেনি তখন সে নিশ্চয়ই সঙ্গে করে আনবে। ভাবলে আর কি হবে? রক্ষে দিদি ওঠ, নাওয়া ধোয়া কর, সকালে সকালে বাড়ী ফিরতে'ত হবে।"

রক্ষা রাগিয়া কহিল "কেনেলা? কার লেগে বাড়ী যাব? কটা বেটা বিটি ঘরে থুয়ে এসেছি লা, তা সকাল করে বাড়ী যাব? পাচুকে না পাই'ত বাড়ী যাবনা; তোরা যাস আমি ত যাবনা।"

এমন সময় অনন্ত আসিলে সকলে এক বাক্যে পার্ব্বতীর খবর জিজ্ঞাসা করিল; অনন্ত চতুরতা করিয়া কহিল "পার্ব্বতী পথ হারাইয়া অনেক কষ্টে বটতলায় গিয়াছে। সেখানে আমার সহিত দেখা হইল, আমি এত ডাকাডাকি করিলাম সে আমার সহিত আসিল না কেবল কাঁদিতেছে—রক্ষা দিদি তুমি যাও, ডাকিয়া আন।"

রক্ষা সস্নেহে কহিল "বাছারে আমার কোথা গিয়ে কান্‌চে গো, আমি ত পথ চিনিনা, অনন্ত তুমিও চল দেখাইয়া দিবে।"

অনন্ত ও রক্ষা উভয়ে গমন করিলে আর সকলে গা আড়া দিয়া উঠিল। অনেকেই স্নানে গেল। একজন তুই পয়সার এক গাছা ঝাঁটা কিনিয়া আনিয়া গঙ্গার চড়ায় খানিকটা স্থান পরিষ্কার করিল। কেহ এক পয়সার ছোট একখানি বঁটি কিনিয়া আনিল, যাহা হাট বাজার হইয়াছিল তাহা কুটিতে লাগিল। এমন সময় রক্ষা ও পার্ব্বতী ফিরিয়া

আসিল। কুট্‌না দেখিয়া রক্ষা কহিল "আমি ত বুন আজ আর রাঁধিতে পারিব না।"

ইঁটের বউ বলিল "আমি রাঁধিব এখন কিন্তু তুমি খাবেত আমার হাতে?"

রক্ষা এক হাত জিব বাহির করিয়া বলিল "বাপরে অমন কথা বলতে নাই—শাস্ত্রে বলে—

'তব জলে করি পাক, অন্ন আদি কিবা শাক,

দেবতা দুর্লভ করি খায়।

সেই অন্ন সুধাময়। বেদ ভাষা—"

হেমা বাঁধা দিয়া কহিল "মা মরণ, তোমার সমগ্ কিড়িমিড়ি ঝাড়তে হবেনা, থাম।"

"তা বল্লাম তার দোষ কি ঠাকুর দেবতার কথাইত।" তারপর ইটের বয়ের প্রতি কহিল "এস্তিরি মেয়ে তুমি, গঙ্গাজলে রেঁধে দেবে, তাতে কি দোষ আছে বউ, তুমি রাঁধ।

পার্ব্বতী হেমাকে কহিল "ভাই আমি যে ভয় পেয়েছিলাম।"

"কেন দিনের বেলায় ভয় কি?"

"গোটা পাঁচ ছয় কাবেল রয়েছে। সেই গুলকে দেখে আমার বড় ভয় করে।"

"কেন ওরা মনিষ্যি ত, আর ত কিছু নয়, তা অত ভয় কেন? আমি উদিকে অত ভয় করিনা।"

এমন সময় পশ্চাৎ হইতে অনন্ত কহিল "আচ্ছা দেখা যাবে।" হেমা কহিল "কি দেখবে?"

"তোমার সাহস।"

"আমার সাহস তুমি কি দেখবে? না হয় আমাকে ভয়ই দেখাবে, আর কি করবে?

"ভয় যদি দেখালাম, তবে না করলাম কি? যাও, স্নান কর গিয়ে, আর বক্‌তে হবে না।"

হেমা ও পার্ব্বতী স্নান করতে গেল। এমন সময় জয়রাম দেখা দিল। অনন্ত কহিল "কিরে, তোকে খুঁজতে আবার কে যাবে? সকলে এল, তোর যে আর দেখা নাই? রকম কি?"

"রকম ভাল। সব এসে জুটেছে।"

"সত্য নাকি তোর সঙ্গে দেখা হল?"

"দেখা না হলে দেখলাম কি করে?"

"কে কি বল্লে?"

"তোমার শাশুড়ি কত কাঁদলে, তুথ্‌খু করলে।"

"তা আমি জানি। গোবিন্দ এয়েছে? সে কি বল্লে?"

"গোবিন্দ বল্লে 'শালা রাত্রে উঠে চোরের মত পালিয়ে এসেছে তারপর আর দেখা নাই কেন বল্‌তে পার'?"

"তুই কি বল্লি?"

"আমি—"বলিয়া জয়রাম হাসিয়া উঠিল, বলিল "আমি বল্লাম, দাদা একটা নিকে করেছে।"

অনন্ত জয়রামের কান ধরিয়া একপ্রকাণ্ড কিল উঠাইবামাত্র জয় রাম তাহার কান ছাড়াইয়া লইয়া একটু দূরে সরিয়া গিয়া কহিল "নিকে নয় নিকে নয়—সেঙ্গা।" এমন সময় ইটের বউ কহিল "তোমরা মারামারি করো এখন। এখন সবাই মিলে রান্নার জোগাড় কর, তা না হলে ত রান্না হয় না। গঙ্গার চড়ার এঁতো মাটি, ভিজে কাট, ঢেলার আকা।" ইটের বয়ের কথায় বাধা দিয়া অনন্ত কহিল "আর হাঁড়িটায় জল পড়েনি?"

"তুমি থাম্।"

জয় রাম বলিল "তবে কি কর্ত্তে বল?"

"যাতে রান্না হয় তাই কর্ত্তে বলচি।"

জয়রাম চীৎকার করিয়া কহিল "ও কনের মা, ও হাবুর মা, তোমরা সকলে ঝপ করে এসে আক্বায় ফুঁ দাও।' অনন্ত দাদা তুমি বউ ঠাকরাণকে বাতাস কর তা না হলে রান্তে পার্ব্বেনা—"

ইটের বউ কহিল "তবে এই রইল, যা হয় তোমরা কর, আমি রান্তে পার্ব্বনা—আমি ঠাট্টা তামাসা বুঝিনা।"

অনন্ত কহিল "না না তুমি রাঁদ, আমি শুক্‌নো কাট এনে দিচ্ছি।"

হাট তলায় সকল দ্রব্যই পাওয়া যায়। অনন্ত ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিতে পাইল এক স্থানে কতকগুলা কাবুলী দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে। হঠাৎ তাহার মাথায় একটা মতলব আসিল আপনা আপনি একটু হাসিয়া কহিল "বেশ হবে যতক্ষণ যাত্রী থাকিবে ততক্ষণ এই কাবুলী গুলাও থাকিবে।"

হাটের একধারে গিয়া দেখিল একজন বৃদ্ধ স্ত্রীলোক কাঠ বিক্রয় করিতেছে। অনন্ত তাহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল "হাঁগা বাছা, কাট কয় আঁটি পয়সায়?"

বৃদ্ধা অকস্মাৎ রাগিয়া উঠিয়া কহিল "থাট- বক্রি কি এখানে হয়? যা ওই মড়া পোড়া ঘাটে যা, ছোঁড়া কি কানা নাকি?"

অনন্ত বুঝিল বৃদ্ধা কালা। তাই চীৎকার করিয়া কহিল "আমি ঘাটের খোঁজে আসি নাই কাঠের খোঁজে আসিয়াছি; কাঠ কয় আঁটি পয়সায়?"

"অ্যাঁ কাট ক আঁটি পয়সায়? ক পয়সায় আঁটি বল্‌না কেনে; বনের কাট কেটে শুকিয়ে মাথায় করে বিচ্‌তে এসেছি ক আঁটি পয়সায়? আমি যেন বেগার দিতে এসেছি। এক পয়সায় এক আঁটি, নিতে হয় লে, নইলে চলে যা। আমি অমন ফিরিঙ্গকে কাট বিচব না।"

অনন্ত অবাক হইয়া বৃদ্ধার মুখপানে চাহিয়া রহিল, মনে মনে কহিল

"মাগি কি ঝকড়াটে? একে যেন কোথায় দেখেছি। কে জানে, চেনা চেনা মনে হচ্চে, কিন্তু ঠাওরাতে পার্লাম না মাগী কে?

অনন্তকে এক দৃষ্টে চাহিতে দেখিয়া মাগী কহিল "কি দেখছিস আমার পানে তাকিয়ে? চেঙ্গড়া বয়স ত' নয়।" অনন্তর বড় রাগ হইল, ইচ্ছা হইল মাগীর গালে একটা চড় মারে, কেবল স্ত্রীলোক বলিয়া সামলাইয়া গেল। প্রকাশ্যে কহিল "কাটত আকন্দ আর ভেরেন্দ', তায় এত গরম কেন মা লক্ষ্মী? যা দেবে তাই দাও' বলিয়া দুইটি পয়সা ফেলিয়া দিল। বৃদ্ধা দুই আঁটি কাঠ ফেলিয়া দিয়া পয়সা তুলিয়া লইয়া আপন মনে কাঠ সাজাইতে লাগিল। অনন্ত কাঠ লইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল রক্ষা, পার্ব্বতি, হেমা, রাই পুরের গিন্নি, হাবুর মা, ফনের মা, স্নান করিয়া আসিয়া মুড়ি খাইতেছে; ইটের বউ রাঁধিতেছে, আর সাশ্রু নয়নে উনানে ফুঁ দিতেছে; বোঁদার বউ কুটন কুটিতেছে, ও জয়রাম দুইটা দাঁতন লইয়া অনন্তর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। কাঠ রাখিয়া দাঁড়াইবা মাত্র রাই পুরের গিন্নি বলিলেন "এয়েচ বাঁচলাম, বউগুণ তোমাকে খরচের খাতায় নেকেচে।"

অনন্ত কহিল "এইবার আবার জমা করে নাও। এখন দাও আমাকে একটু তেল দাও মেখে নেয়ে আসি।"

রক্ষা মুখে এক মুখ মুড়ি পুরিয়া বলিল

"তেই বুই আইকে মাইতে আয়ে? আইকে উউ নাইতে হয়।" (তেল বুঝি আজকে মাখতে আছে? আজকে রুক্ষু নাইতে হয়)। রক্ষার কথা শুনিয়া অনন্ত হাসিয়া বলিল "কত মটর সুঁটি খেয়েছ ঠাকুরান?"

রাইপুরের গিন্নি বলিল "ওরে আজ মুড়ি দে মটর সুঁটি খেতে হয়। তোদের শাস্তরে আছে আর তোরা জানিসনা?"

"ঠান দিদির বুঝি মালমসলার হাঁড়ির মত শাস্তরটাও দুই বেলা নাড়া চাড়া আছে?"

"মা বকিসনেক্ নাগা বেলা হয়েচে।"

অনন্ত ও জয়রাম দাঁতন লইয়া দন্তধাবন করিতে করিতে গঙ্গা গর্ভে নামিল।

হাবুর মা অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল "হেই মা, আমি যে দাঁত কটা মাজতে ভুলে গিইছি গা, কি হবে?"

হেমা বলিল "আমর আবাগী, দাঁত মাজতে আবার মানুষে ভোলে? যা দাঁত মেজে আয়গা। তুই আমাদের কিছু ছুঁস্‌নে, মাগীকে দেখে ঘেন্না করে।"

"ঠাক্‌রোণ, তুমি বড় ভাল? আজ দাদাঠাকুরের দেখে দাঁত মাজলে তা নইলে রোজ রোজ দাঁত ঘস নাকি?"

পাৰ্ব্বতী শান্তভাবে কহিল "যাও হাবুর মা, আর কোন্দলে কায নাই, দাঁতকটা মেজে এস।"

"আমি যে মুড়ি খেলাম গা।"

"খেয়েছিস খেয়েছিস যা। মুড়িইত, ভাত ত আর নয়, তাতে দোষ নেই।"

জয়রাম গঙ্গার জলে পড়িয়া সাঁতার দিতেছে। অনন্ত স্নান, আহ্নিক শেষ করিয়া মাথা মুছিতে মুছিতে কহিল "জয়রাম উঠে আয় ঠাণ্ডাজলে বেশী পড়ে থাকিস না, অসুখ করবে। উঠে আয়। জয়-রাম কহিল "দাদা ওই একখানা জাহাজ আসছে ওর ঢেউ খেয়ে তবে উঠব"

"দেখিস যেন ঢেউ খেতে গিয়ে তল গাঁধি খাসনে" এই বলিয়া অনন্ত তীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। হোরমিলার কোম্পানির কাটোয়া-গামী ষ্টীমার ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে নাচিতে নাচিতে আপন মনে উত্তর মুখে ছুটিয়াছে। নূতন কাপড়ের জোড়া কাটিবার সময় যেমন ছুরির ফলার পশ্চাতের বস্ত্র দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায়, ষ্টীমারের পশ্চাতেও

সেইপ্রকার জলরাশি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দুইটা প্রকাণ্ড জলোচ্ছ্বাসে পরিণত হইয়া উভয় তীরে আঘাত করিতে করিতে ছুটিতে লাগিল।

রাইপুরেরর ঠাকুরাণী বলিয়া উঠিল "হ্যাদে দেখ্‌লো পাবু, একখানা দাহাজে কত নোক দেখ্‌, হেইমা কি হবে?" পার্ব্বতি কহিল "বউ-ঠাকরাণ ঐ রত্তিন দাহাজে অত নোক উঠেছে তা প'ড়ে যাচ্ছেনা! ওদের কি ভয় নাগবেনা?"

জয়রাম কহিল "ভয় কিসের?"

"যদি পড়ে যায়!"

রক্ষা গম্ভীরভাবে কহিল "ওকি পড়বার যো আছে? ওযে বিশ-কম্মার নিম্মান। ইষ্টিমবোট, কলের গাড়ি ওসব যে বিশ্বকম্মা নিম্মান করেচে।"

রক্ষার কথা শুনিয়া জয়রাম সক্রোধে বলিল "হাঁ তুমি সব জান, বিশ্বকম্মা নিম্মান কর্ত্তে গেছে।"

"না করে নাই? গরু নাই, ঘোড়া নাই ত নিজে হেতে চলছে কেনে? বিশ্বকম্মার নিম্মান ভিন্ন নিজে হেতে চলবার যো নাই।"

রক্ষা সামান্য একটু লেখাপড়া জানিত; একবার শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছিল। শ্রীক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া অবধি আপনাকে একজন বহু-দর্শিনী সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া মনে করিত।

সেইজন্য সে একটু মুরব্বিয়ানা চালে বলিল "এই দেখনা কেনে ছিক্ষেত্তরেও রতের সময় জগন্নাতের রত আপনি চলে বেড়ায়। রাবনের পুস্পুক রত আপনি চলত। তা বিশ্বকম্মার নিম্মান ভিন্ন কি মনিষ্যির সাদ্দি নিম্মান করা?"

জয়রাম। "রাবনের রত তুমি দেখতে গিয়েছিলে নাকি?"

"না, রামায়ণের পুঁতিখানা খুলে দেখিস্‌ দেখি। সব কথা খুলে ন্যাকা আছে।"

রাইপুরের গিন্নি ঢুলিতে ঢুলিতে বলিল "আহা তাই বটে, বাবা কি মাহিত্তির।"

রক্ষা কহিল "বাবার মন্দির বাগে তাকিয়ে দেখিস বাবার মন্দি কি শিপ্পি। দেখলে চোখের পাপ যায়।"

অনন্ত এতক্ষণ নীরবে বসিয়াছিল। রক্ষার কথা শুনিয়া মনে মনে কহিল "দেখলে পাপ যায়, না হয়?"

জয়রাম বলিল "মন্দির বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ,চলে বেড়ায় নাকি?"

রক্ষা চটিয়া কহিল "দেখ ছোঁড়া, তুই বিশ্বকম্মার নিন্দে করিস না বলছি। ঠাকুর দেবতার কথায় তামাসা?"

কেঁদার বউ হাসিয়া কহিল "কেনে ঠাকুর্ঝি তোমার রাগ কেনে বিশ্বকম্মাত আর ঠাকুর জামাই নয়।"

ইটের বউ কহিল "এইবার কাট ফুরলো আর কাট নইলে রান্না হবেনা।"

কাঠ নাই শুনিয়া সকলে আবার অনন্তকে কাঠ কিনিতে যাইতে বলিল। অনন্ত বলিল "আমি আর যাবনা, মাগীর মুখ দেখতে ইচ্ছা করেনা।" জয়রাম বলিল "আমি যাই।" অনন্ত তাহার হাত ধরিয়া কহিল "নারে না, তুই বোস্—তুই গেলে মারামারি করে বসবি।"

হেমা স-রহস্যে বলিল "যে যত সাহসী তা বোঝা গেছে। মাগীত বটে, মিন্সেত নয়? দাও আমাকে পয়সা দাও, আমি যাচ্চি।"

অনন্ত কহিল "আমার কোটের পকেটে পয়সা আছে, নিয়ে যাও"

হেমা কোটটা হাতে লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বিরক্ত হইয়া কহিল "ভাল জ্বালা, পাকিট রয়েছে পাকিটে পয়সা রয়েছে—কিন্তু পাকিটের মুখটা কোন দিকে?"

অনন্ত হাসিয়া বলিল "কেবল বচনে আছ? খুব বাহাদুরী করেছ, দাও আমায় দাও। দর্জ্জিটে পাকিটের মুখ রাখতে ভুলে গেছে।"

এই বলিয়া পকেট হইতে দুইটি পয়সা বাহির করিয়া লইয়া হেমার হাতে দিল, হেমাও পয়সা লইয়া সদর্পে প্রস্থান করিল। হেমা প্রস্থান করিবার কিছু পরে অনন্ত অন্যের অলক্ষ্যে তাহাকে অনুসরণ করিল এবং অচির কালমধ্যে জনস্রোতে মিশাইয়া গেল।

হেমা সেই কাষ্ঠ বিক্রেত্রী বৃদ্ধার নিকট গিয়া উচ্চস্বরে কহিল "কি বেহান ভাল আছ?"

"কেগা তুমি? আমি যে চিন্তে নারচি।"

"তা নারবে বই কি! এখন আমি যে তোমাদের দেশে এসেছি তাই চিন্তে নারছ।"

বৃদ্ধা অনেকক্ষণ ঠাহর করিয়া দেখিয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া কহিল "হাঁ হাঁ, এইবার চিনেছি, তুমিত মেঁগার পিশি ঠাকরোণ?"

"বেহান তুমি অনেক দিন আমাদের গাঁয়ে যাও নাই কেন?"

"যাব কি দিদি ঠাকরোণ, জামাই আর আমাকে ন্যায়না।"

"আহা তাইত। পরশু তোমার নাতনির বিয়ে তা তোমাকে খপর দেয় নি? মেগার কাজ ভাল হয় নি। তা তুমি আমাদের সঙ্গে চল।"

বৃদ্ধা প্রথমে কিছুতেই সম্মত হইল না; অবশেষে হেমার নির্ব্বন্ধ দেখিয়া অগত্যা যাইতে সম্মত হইল। হেমাদের বাটীর কৃষাণ মেগা ওরফে মেঘনাদ বৃদ্ধার জামাতা। হেমা তাহার নিকট হইতে কাঠ লইয়া ফিরিবার সময় দেখিল পথের ধারে একজন কাবুলি অনেকগুলা পুঁটুলি খুলিয়া দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে। নানাবিধ গাত্রবস্ত্র, গরম কাপড়ের জামা, কম্ফটার ইত্যাদি দর্শকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

অনেকগুলি পল্লীগ্রামবাসী কাবুলীকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কেহ একখানা র‍্যাপার দর করিতেছে; কেহবা হাতে বহু

গয়রাম

আছে মাপিয়া দেখিতেছে; কেহ বা একটা কোট গায়ে দিয়া তাহার বোতাম আঁটিবার চেষ্টা করিতেছে। হেমা সেই স্থলে আসিয়া যেমন উঁকি মারিয়া ব্যাপার কি দেখিতে গিয়াছে অমনি সেই কাবুল একটা গরম কাপড়ের জ্যাকেট লইয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "কেয়া দেখ্তা বিবি? একঠো কোর্ত্তা লেওঁ।"

যেমন বলা হেমাঙ্গিনী অমনি সেইখানে কাঠের বোঝা ফেলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়। অনন্ত পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিল, সে হেমার সাহস দেখিয়া হাসিতে হাসিতে কাঠ লইয়া চলিয়া গেল।

এদিকে সকলে কাঠের অপেক্ষায় বসিয়া আছে। জয়রাম ক্ষুধায় ছটফট করিতেছে ও হেমাকে গালি দিতেছে এমন সময় "ওলাওঠা, বাঁশ বুকো, গাড় ভোগা, জ্বোমরা ভোগা—বাঁকায় যা বাঁকায় যা—" বলিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে হেমা দৌড়িয়া আসিল। হেমার মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে অবাক। সকলে নানা প্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিল, কিন্তু হেমা তখনও হাঁফাইতেছে, কথার জবাব দিবে কি? তখন অনন্ত হাসিতে হাসিতে কাঠ রাখিয়া পার্ব্বতিকে সম্বোধন করিয়া কহিল "পার্ব্বতি, তুমি বড় ভীতু, কাবুলি দেখে ভয় পাও ছিঃ! যাই হোক, হেমা সাহসী বটে।"

হেমার তখন কথা ফুটিল; বলিল "আমার যদি অকুতো সাহস থাকিত—"

অনন্ত কহিল "সবই আছে কেবল ঐটে নাই।"

জয়রাম চীৎকার করিয়া কহিল "তোমরা হাসি তামাসা কোরো এখন, আগে আমায় ভাত দাও।"

রাইপুরের গিন্নি বসিয়া বসিয়া ঘুমাইতে ছিল জয়রামের চীৎকারে ক্ষিত হইয়া কহিল "তাই বটে ত্যাদেকি মা, দিনমানটা গ্যালগা, ভাত দাও এখন?"

তখন পার্ব্বতি ও হেমা উঠিল। পার্ব্বতি ঝাঁট দিল, হেমা এক কলসী জল আনিল। স্থান পরিষ্কার হইলে পার্ব্বতি বলিল "পাতা পাওয়া যাবে না যে যার গামছা পেতে বস। জয়রাম, অনন্ত দাদার গামছা গঙ্গায় কেচে এনে তাইতে দুজনে বস।"

হেমা বলিল "দুজন কে? জয়রাম আর হাবুর মা নাকি?" রক্ষা কহিল "তাই বটে। ফনের মা আর হাবুর মা একখানা গামছায় বস। ইটের বউ আর কোঁদার বউ একখানায়, আমাতে আর হেমাতে এক খানা গামছায় বসব, বউ ঠাকরোন তিজেল খানায় বস, আর পাবুকে ঐ সরাখানায় দাও।

জয়রামের সহিত হাবুর মা বসিবে শুনিয়া জয়রাম চটিয়া লাল হইল কিন্তু রাগ প্রকাশ না করিয়া মনে মনে ফুলিতে লাগিল। সকলকার ভাত বাড়া হইলে রাইপুরের গৃহিণী সকলের আগে বসিয়া মুখে এক-গ্রাস ভাত দিয়া ডাকিল "অনন্ত ভাত খাবি আয়।'

অনন্ত খাইতে বসিয়া বলিল "আয়রে জয়রাম।"

জয়রাম বলিল "আমি খাবনা।"

গৃহিণী "আয় আয় খাবি আয়" বলিয়া দ্বিতীয় গ্রাস মুখে তুলিলেন।

অনন্ত আবার ডাকিল "আয় আয় খেতে বস।"

"আমি খাবনা, তোমরা কেন খাওনা।"

গৃহিণী পুনরায় "আয়, আয়, তোরা না খেলে কি আমি খেতে পারি?" বলিয়া তৃতীয় গ্রাস মুখে তুলিলেন।

গৃহিণীর কাণ্ড দেখিয়া অনন্ত হাসিতে হাসিতে কহিল "জয়া আর অলাসনে ভাই, তুই না খেলে ঠানদিদি বুড় মানুষ খেতে পাবেন না।"

"না খেতে পাবেন না? ওঁর ত অদ্ধেক হ'য়ে গেল।"

অনন্ত জয়রামকে চোক টিপিয়া বারণ করিল। অনন্তর, জয়রাম আসিয়া অনন্তর সহিত আহারে উপবেশন করিল। অনন্ত ও জয়রাম

উপবেশন করিলে রক্ষা সকলকে বসিতে বলিয়া স্বয়ং উপবেশন করিল। ফনের মা ও হাবুর মা একত্রে উপবেশন করিবে। তাহাদের গামছায় ভাত দেওয়া হইলে ফনের মা বলিল "ঠাকরোন এস গো।"

এবার আবার হাবুর মার পালা। সে জয়রামের ব্যবহারে বড়ই বিরক্ত হইয়াছিল। তাই সে রাগিয়া কহিল—

"আমি খাবুনি।"

ফনের মা বলিল "খাবেনি কেনে? খাউসে।"

"আমি খাবুনি রে বাবু খাবুনি।"

"কার উব্‌রোয় রাগ করে খাবেনি?"

"আমি খাবুনি রে বাবু খাবুনি।"

"তুমি যেমন পাগল হয়েছ উওর কথায়—আবার মান্‌ষে রাগ করে? এস খাউসে, না খেলে তোমারই আঁত কাদবে।" অগত্যা হাবুর মা আসিয়া খাইতে বসিল। খাইতে খাইতে জয়রাম বলিল "সারাদিন ধরে রান্নাত হল, কি রাঁদলে ছাই ভষ্ম? ই দিয়ে কি খাওয়া যায়?"

ফনের মা কহিল "তাই বটে, মাগো। চচ্চড়িটে বড্ডা ঝাল।" হাবুর মা বলিল—"ও যেমন বেঁতে ভরিচি—ওঃ" বলিয়া যেমন নাকে হাত দিয়াছে অমনি অনন্ত কহিল "দোহাই হাবুর মা আর বামুনের খাওয়ার সময় ব্যাঘাত দিয়োনা—" অগত্যা হাবুর মা অঞ্চলে নাসিকা মুছিয়া খাইতে লাগিল।

আহার শেষ করিয়া জয়রাম ও অনন্ত হাতমুখ ধুইয়া আসিলে অনন্ত কোটের পকেট হইতে সুপারি বাহির করিয়া নিজে দুইখানা মুখে দিয়া জয়রামকে দুইখানা দিল এবং কহিল "জয়রাম একবার এদিকে আয়; তোর সঙ্গে দুটা কথা আছে।"

"কি কথা?"

"বেঙের মাথা।"

অনন্ত জয়রামকে লইয়া একান্তে উপবেশন করিয়া বলিল, "সত্য করিয়া বল দেখি, কে কে এসেছে?"

"কোথায়?"

"এই গঙ্গাস্নানে আবার কোথায়?"

"আমি এসেছি, তুমি এসেছ, পার্ব্বতী এসেছে, রক্ষাদিদি—"

"দূর জানোয়ার, তাদের বাড়ী হোতে।"

"কাদের বাড়ী?"

"তোর মাথা—আমার শ্বশুরবাড়ী হোতে—"

"ওঃ তাই—তোমার শাশুড়ী, শালা, ঠাকুর জামাই—"

"ঠাকুর জামাই কেরে?"

"না না, তুমি যার ঠাকুর জামাই হও সে তোমার কে হয়? তোমার শালা গোবিন্দর স্ত্রী? তোমার শালাজ হয় বুঝি, সেই সে। আর কে এয়েছে আমি সকলকে চিনি না।"

"না তুই চিনিস, বল তা না হলে মার খাবি।"

"তোমাকে বল্‌তে নিষেধ করেছে—সত্যি অনন্তদাদা আমি বৌ-ঠাকুরোন্‌কে দেখিনি তবে শুন্‌লেম এসেছে।" অনন্ত অনেকক্ষণ চুপ করিয়া অবশেষে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল "আমাকে বল্‌তে নিষেধ কেন? আমি কে? নিজের ইচ্ছায় গঙ্গা স্নান করতে এসেছে আবার ভয় কাকে?" বুদ্ধিমতী হেমাঙ্গিনী অনন্ত ও জয়রামকে একান্তে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে দেখিয়া বুঝিতে পারিল যে অনন্ত জয়রামের নিকট পত্নীর সন্ধান লইতেছে। অনন্তর শ্বশুর বাটীর স্ত্রীলোকেরা গঙ্গাস্নানে আসিয়াছিল তাহা হেমা জানিত। সেইজন্য উৎকর্ণ হইয়া উভয়ের কথাবার্ত্তা শুনিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুই শুনিতে পাইল না।

স্ত্রীলোকদের আহার হইলে হেমাঙ্গিনী অনন্তর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল "জয়রামের সঙ্গে কি কথা হইতেছিল?"

"কেন, সে কথায় তোমার দরকার কি ?"

"দরকার আছে বলিয়াই বলিতেছি। আমি সব শুনেছি।"

"শুনেছ বেশ করেছ। কি কর্ব্বে ?"

"যা নয় তাই কর্ব্ব।"

"তবে আর কি আমি ভয়ে পালাই—আয় রে জয়া আয় আমরা যাই।"

উভয়কে যাইতে দেখিয়া পার্ব্বতী বলিল "দাদা তোমরা ছ'জনে যাবে এখানে এত কাবেলী রয়েছে—"

অনন্ত বলিল "ভয় কি, সঙ্গে হেমা আছে ও কাবেলিকে ভয় খায়না। আমরা একটু এগিয়ে যাই, মাঠে গিয়া আবার দেখা হবে।" এই বলিয়া জয়রামের হাত ধরিয়া প্রস্থান করিল।

উহারা প্রস্থান করিলে হেমা সেই কাট্‌ওয়ালী বুড়ী মেঘার শাশুড়ীকে ডাকিয়া আনিয়া ভাত খাইতে দিল সেও উহাদের সহিত জামাতা বাড়ীতে দৌহিত্রীর বিবাহে যাইবে।

আহারাদি ও গামছা কাচা শেষ হইলে সকলে দল বাঁধিয়া হাট করিতে গেল। কেহ কপি, কেহ মটরসুঁটি, কেহ কমলা লেবু, নারিকেলি কুল, কলাই ভাজা, মুড়কি, তেলেভাজা কচুরি, গুড়ে জিলাপী এবং কেহবা ভাল সন্দেশ রসগোল্লা কিনিল। যাহাদের বাটীতে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে আছে তাহারা ছোট ছোট মাটির শিল নোড়া, জাঁতা, হাঁড়ি, পুতুল, কাঠের ছোট ঢেঁকি ইত্যাদি ক্রয় করিল। গৃহিণীর দল ছোট ছোট কলসী কিনিল, তাহাতে গঙ্গাজল ভরিয়া লইল এবং এক এক তাল গঙ্গা মৃত্তিকা লইতেও ভুলিল না। সকলের কেনা বেচা শেষ হইলে আর একবার গঙ্গাকে প্রণাম করিয়া সকলে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

শরৎ কুমারী দেবী।

শঙ্কর দর্শন ও সাধনতত্ত্ব।

(প্রথম প্রস্তাব।)

১। শঙ্করের গ্রন্থাবলী।

শঙ্করের পাঠক অল্প, ভক্ত অনেক; অভক্তের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। অনেক স্থলে ভক্ত অভক্ত উভয়েই আচার্য্যের নামে প্রচলিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা পাঠ করিয়াই সন্তুষ্ট। তদীয় মতামত সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা এরূপ পাঠের উপরই প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার যে সকল গ্রন্থে তদীয় দর্শন ও সাধনতন্ত্রের সকল দিক্ সম্যক্‌রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এক স্থানের অস্পষ্ট কথা অন্যত্র স্পষ্টীকৃত হইয়াছে, এক স্থানের দোষ অন্যত্র সংশোধিত হইয়াছে, এই সকল গ্রন্থ উক্ত শ্রেণীর লোক পাঠ করেন না; সুতরাং তাঁহাদের ভক্তি ও অভক্তি উভয়ই মূলবিহীন ও অস্থির। যেরূপ ধারণা হইতে উক্ত ভক্তি বা অভক্তি উৎপন্ন হয় তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধে কিয়ৎ পরিমাণে সংশোধন করিবার ইচ্ছা আছে। প্রথমতঃ আচার্য্যের গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে আধুনিক পুরাতত্ত্ববিৎদিগের মতে তাঁহার নামে প্রচলিত অধিকাংশ গ্রন্থই প্রকৃত পক্ষে তাঁহার প্রণীত নহে; অন্ততঃ তাঁহার প্রণীত কি না এই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র ও ভগবদ্গীতা, এই তিন গ্রন্থের ভাষ্য ব্যতীত আর কোন গ্রন্থকেই নিঃসন্দিগ্ধরূপে তাঁহার প্রণীত বলা যায় না। উপনিষদের মধ্যে ঈশা, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক, এই দশ খানির ভাষ্যই নিঃসন্দিগ্ধরূপে তাঁহার রচিত। শ্বেতাশ্বতরের ভাষ্য তাঁহার নামে পরিচিত হইলেও ইহার রচনা প্রণালী

অন্যান্য ভাষ্যের রচনা প্রণালী হইতে এত ভিন্ন যে ইহা তাঁহার রচিত কি না এই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সুতরাং আমরা ঐ দশখানি উপনিষদের ভাষ্য, সূত্র-ভাষ্য এবং গীতা-ভাষ্য, এই ভাষ্যত্রয় অবলম্বন করিয়াই শঙ্কর দর্শনের আলোচনা করিব। উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র ও ভগবদ্গীতা, এই তিন গ্রন্থ বেদান্তের প্রস্থানত্রয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। উপনিষদ্ 'শ্রুতি-প্রস্থান;' ইহাই মূল বেদান্ত। ব্রহ্মসূত্র 'ন্যায়-প্রস্থান,' ইহাতে উপনিষদুক্ত দর্শন ন্যায় বা যুক্তির সহিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভগবদ্গীতা 'স্মৃতি প্রস্থান;' ইহাতে বৈদান্তিক্ সাধন বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থত্রয়ের একখানিকে ছাড়িলেও বেদান্তমত সম্বন্ধে মহাভ্রমে পতিত হইতে হয়। বেদান্ত মত সম্বন্ধে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা সমূহের একটী বিশেষ কারণ এই গ্রন্থত্রয়ের এক বা একাধিক গ্রন্থকে ছাড়িয়া বেদান্তমতের বিচার। শঙ্কর-বেদান্ত বুঝিতে হইলেও শঙ্কর-প্রণীত প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্যই অবলম্বনীয়। তাঁহার প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থ যদি থাকেও, তথাপি তাঁহার ভাষ্যত্রয়ই তদীয় মতের নিশ্চিত প্রমাণ। বিশেষতঃ তিনি বেদান্তমতের যথাযথ ব্যাখ্যা করিয়াছেন কিনা ইহার বিচার কেবল এই ভাষ্যত্রয় অবলম্বনেই হইতে পারে। সুতরাং আমরা তদীয় মতব্যাখ্যায় এই ভাষ্যত্রয়ের প্রমাণেই আবদ্ধ থাকিব।

২। ব্যাখ্যা-প্রণালী।

শঙ্করের গ্রন্থাবলী বুঝিবার এবং তদীয় দর্শনতন্ত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার একটী বিশেষ বিঘ্ন এই যে তিনি তদীয় মতব্যাখ্যায় কোন বিশেষ প্রণালী অবলম্বন করেন নাই, কেবল ব্যাখ্যাত গ্রন্থ সমূহের বিষয়-বিন্যাস অনুসারে নিজ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মূলসূত্র অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ যুক্তি ও দৃষ্টান্তের সহিত সমগ্র তন্ত্রের

বিকাশ,—প্রত্যেক দার্শনিকের নিকট এই প্রণালীর প্রত্যাশা করা যায়। বিশেষতঃ যাঁহারা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শন অধ্যয়নে অভ্যস্ত তাঁহারা দেশীয় দর্শন গ্রন্থেও এরূপ অপ্রণালী দেখিবার আশা করেন। কিন্তু দেশীয় অনেক গ্রন্থেই, বিশেষতঃ শঙ্কর-প্রণীত গ্রন্থসমূহে, এই এই প্রণালী অবলম্বিত হয় নাই। যাহা হউক, গভীর অভিনিবেশের সহিত আচার্য্যের গ্রন্থাবলী পাঠ করিলে তিনি কি প্রণালীতে তদীয় সিদ্ধান্ত সমূহে উপনীত হইয়াছেন তাহা বুঝিতে বাকি থাকে না। সেই প্রণালী আধুনিক পাশ্চাত্য প্রণালী হইতে মূলতঃ ভিন্ন নহে। অন্ততঃ একজন আধুনিকের পক্ষে তদীয় মত সমূহকে অধুনাতন দার্শনিক প্রণালীতে সন্নিবিষ্ট করা সম্পূর্ণরূপেই সম্ভব। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে কিয়ৎ পরিমাণে তাহাহ করিতে চেষ্টা করিব। আধুনিক পাঠককে শঙ্কর দর্শন বুঝাইবার পক্ষে ইহাই একমাত্র উপযুক্ত প্রণালী বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এই প্রণালী অবলম্বন করিতে যাইয়া আমরা শঙ্করের মত হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইব না, তাঁহার উপর কোন আধুনিক মত আরোপ করিব না; আমাদের ব্যাখ্যার যথার্থতা তদীয় গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত বাক্য দ্বারা প্রতিপদেই সপ্রমাণ করিব।

৩। শ্রুতি প্রমাণ সম্বন্ধে শঙ্করের মত।

শঙ্কর তদীয় দর্শন ব্যাখ্যায় প্রতিপদেই শ্রুতির দোহাই দেন। অন্যান্য দর্শনের ন্যায় তাঁহার দর্শন যে কেবল অনুমানসিদ্ধ মত নহে, ইহা শ্রুতিপ্রতিষ্ঠিত ও শ্রুতিসম্মত মত,—ইহা তাঁহার পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করেন। আধুনিক স্বাধীন চিন্তাশীল পাঠকের নিকট এরূপ পদে পদে শাস্ত্রের দোহাই শ্রদ্ধার কারণ না হইয়া সন্দেহের কারণ হওয়াই সম্ভব। কেহ শাস্ত্রের দোহাই দিলেই মনে হয় এই লোক নিজ মতের অনুকূল প্রত্যক্ষ বা আনুমানিক কোন

প্রমাণ দিতে অসমর্থ, কেবল অন্ধভাবে পরমতের অনুসরণ করিতেছে ও অন্তকে অনুসরণ করিতে বলিতেছে। ফলতঃ শাস্ত্র প্রমাণ সম্বন্ধে প্রচলিত খৃষ্টীয় মত এরূপ অন্ধ অনুসরণ বতীত আর কিছুই নহে। খৃষ্টীয় মতের সহিত বিশেষ পরিচয় এবং দেশীয় মতের সহিত অল্প পরিচয় বা অপরিচয় বশতঃ আধুনিক হিন্দুর পক্ষে দেশীয় আচার্য্যদিগের উপর খৃষ্টীয় মতের আরোপ কিছুই বিচিত্র নহে। কিন্তু দেশীয় আচার্য্যদিগের শাস্ত্রের দোহাই এবং খৃষ্টীয় প্রচারকের শাস্ত্রের দোহাই সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। বেদ কি অর্থে অপৌরুষেয়, কি অর্থে ও কোন বিষয়ে প্রমাণ; ইহা কি পরিমাণে গ্রাহ্য, কি পরিমাণে অগ্রাহ্য, এই সকল বিষয়ে জৈমিনি, পানিনি এবং শঙ্কর প্রভৃতি আচার্য্যদিগের মত অবগত হইলে ইহার সহিত প্রচলিত খৃষ্টীয় মতের ভিন্নতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়, এবং দেখা যায় আধুনিক স্বাধীন চিন্তার সহিত উক্ত আচার্য্যদিগের মতের মৌলিক প্রভেদ নাই। এই বিষয়ে আমি এই প্রবন্ধে বিস্তৃত ভাবে কিছু বলিব না। যাঁহার ইচ্ছা হয় আমার "The Vedanta and its Relation to Modern Thought" নামক পুস্তকের দ্বিতীয় বক্তৃতায় এই বিষয়ে একটী বিস্তৃত আলোচনা দেখিতে পারেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বেদ সম্বন্ধে শঙ্করের মত এই :— বেদ শব্দময়। শব্দ নিত্য। ইহার ঐন্দ্রিয়ক অংশ পরিবর্ত্তন ও বিনাশশীল, কিন্তু ইহার ভাবাংশ অপরিবর্ত্তনীয় ও কালাতীত। ইহা পরমাত্মার অংশীভূত। জীবোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই শব্দময় বেদের কিয়দংশ জীবাত্মার অঙ্গীভূত হইয়া প্রকাশিত হয়। জীবাত্মার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ হইতে উচ্চতর ভাবাত্মক বেদ জীবের বুদ্ধিতে বিকশিত হয়। উচ্চ সাধন সম্পন্ন আত্মার নিকট ব্রহ্মাত্মক বেদ প্রতিভাত হয়। অনুন্নত আত্মাকে শ্রুতিবাক্যসমূহ মোহ নিদ্রা হইতে জাগ্রত করে এবং সাধনে প্রবৃত্ত করে; কিন্তু এরূপ আত্মা ব্রহ্মাত্মিকা শ্রুতির অর্থ হৃদয়ঙ্গম

করিতে পারে না। সাধনের উচ্চ সোপানে অধিরূঢ় হইলেই এরূপ শ্রুতির অর্থবোধ হয়। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ গ্রাহ্য নহে। এরূপ বিষয়ে শ্রুতিতে যাহা কিছু আছে তাহা অবান্তর বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। অতীন্দ্রিয় বিষয়েই শ্রুতি প্রমাণ। প্রমাণ অর্থ এই নহে যে আমার বস্তু দর্শন হইবে না, অথচ আমাকে অন্ধভাবে শ্রুতিবাক্য গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রুতি সাক্ষাৎ বিজ্ঞানোৎপত্তির নিমিত্ত মাত্র। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লীর ষষ্ঠ অনুবাকের ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন,—"শ্রুতিশ্চ নোঽতীন্দ্রিয়-বিজ্ঞানোৎপত্তৌ নিমিত্তম্," অর্থাৎ "শ্রুতি আমাদের অতীন্দ্রিয় বিষয়ক বিজ্ঞান উৎপত্তির নিমিত্ত।" পুনশ্চ, প্রশ্নোপনিষদ্ ষষ্ঠ প্রশ্নের দ্বিতীয় শ্রুতির ভাষ্যে বলিয়াছেন,—"নহি বচনং বস্তুনোঽন্যথাকরণে ব্যাপ্রিয়তে, কিন্তুর্হি যথাভূতার্থাবদ্যোতনে," অর্থাৎ "বস্তুর অন্যথাকরণ শ্রুতির কার্য্য নহে, বস্তুকে প্রকৃতরূপে প্রকাশিত করাই ইহার কার্য্য।" মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ সাধনের যে সোপানে অধিরূঢ় হইয়া বেদমন্ত্রসমূহ দর্শন করিয়াছিলেন, সেই সোপানে যিনি অধিরূঢ় হইবেন তাঁহারই সমক্ষে ঐ সকল মন্ত্র বা মন্ত্রাত্মিকা অনুভূতি প্রাদুর্ভূত হইবে। তৈত্তিরীয় উপনিষদের শিক্ষাবল্লীর দশম অনুবাকের ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন,—"এবং শ্রৌতস্মার্ত্তেষু নিত্যেষু কর্ম্মসু যুক্তস্য নিষ্কামস্য পরং ব্রহ্মবিবিদিষোরার্ষাণি দর্শনানি প্রাদুর্ভবন্ত্যাত্মাদিবিষয়ানীতি," অর্থাৎ "যিনি এইরূপে শ্রুতি ও স্মৃতিবিহিত নিত্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া নিষ্কাম হন এবং পরব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছুক হন, তাঁহার নিকট আত্মাদি বিষয়ে ঋষিদিগের দর্শন সমূহ প্রাদুর্ভূত হয়।" বোধ হয় এখন পাঠক বুঝিতে পারিলেন শঙ্কর শব্দপ্রমাণ বলিতে কি বুঝেন। তাঁহার নিকট শব্দ বা শ্রুতি প্রত্যক্ষ আধ্যাত্মিক অনুভূতির নামান্তর মাত্র। প্রচলিত বেদচতুষ্টয় ঋষিদিগের অনুভূতির লিপি বা বাহ্যিক আকার মাত্র। এই বাহ্যিক বেদ আমাদের সাক্ষাৎ অনুভূতির সহায় বা নিমিত্ত মাত্র;

অনুভবাত্মক বেদ যথাকালে সকল সাধকেরই নিকট সাক্ষাৎ ভাবে প্রকাশিত হয়। এই সাক্ষাৎ অনুভবকে শঙ্কর 'প্রত্যক্ষ' বিশেষণ না দিয়া 'অপরোক্ষ' বিশেষণ দেন। তাহার কারণ এই যে প্রত্যক্ষ কথাটী সাধারণতঃ ঐন্দ্রিয়ক অনুভবেই প্রযুক্ত হয়। এই ঐন্দ্রিয়ক অনুভব বা 'প্রত্যক্ষ' হিন্দুদর্শনের গৃহীত দ্বিতীয় প্রমাণ। তৃতীয় প্রমাণ নানাবিধ অনুমান। যাহা হউক, বেদের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব সম্বন্ধে শঙ্করের মত ও বিচার পাঠক বিস্তৃত আকারে তদীয় সূত্র ভাষ্যের প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ২৮ হইতে ৩০ ভাষ্যে পাইবেন। এই বিষয়ে জৈমিনি ও পানিন দর্শনের মত মাধবাচার্য্যকৃত "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" পাওয়া যাইবে। সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ পাঠক অধ্যাপক গফ্ ও কাউয়েল-কৃত এই গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ পাঠ করিতে পারেন।

৪। আত্মপ্রত্যয় ও আত্মজ্ঞান।

শাঙ্করদর্শনের মূলসূত্র আত্মপ্রত্যয়। আত্মপ্রত্যয়ের অর্থ আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস। শঙ্কর বলেন আত্মপ্রত্যয় মূল প্রত্যয়, ইহা অন্য কোন প্রত্যয় বা প্রমাণের উপর নির্ভর করে না; অন্য সমুদয় প্রত্যয় ও প্রমাণের মূলে এই প্রত্যয় বর্ত্তমান রহিয়াছে। অপর যাহা কিছু জানি তৎসঙ্গে এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞানের ভিত্তিরূপে জ্ঞাতৃরূপী আমি বা আত্মার জ্ঞান নিহিত থাকে; সূত্র-ভাষ্যের দ্বিতীয়াধ্যায় তৃতীয় পাদে সপ্তম সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন,—"ন হ্যাত্মাগন্তুকঃ কস্যচিৎ স্বয়ংসিদ্ধত্বাৎ। ন হ্যাত্মাত্মনঃ প্রমাণমপেক্ষ্য সিধ্যতি। ......ন হ্যাকাশাদয়ঃ পদার্থাঃ প্রমাণনিরপেক্ষাঃ স্বয়ংসিদ্ধাঃ কেনচিদভ্যুপগম্যন্তে। আত্মাতু প্রমাণাদিব্যবহারাশ্রয়ত্বাৎ প্রাগেব প্রমাণাদিব্যবহারাৎ সিধ্যতি। ন চেদৃশস্য নিরাকরণং সম্ভবতি। আগন্তুকং হি বস্তু নিরাক্রিয়তে, ন স্বরূপম্। য এব নিরাকর্ত্তা তদেব তস্য স্বরূপম্।"[৮] অর্থাৎ—"কাহারও

পক্ষে আত্মা আগন্তুক (contingent) নহে, কেননা ইহা স্বয়ং সিদ্ধ আত্মা আত্মার প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় না। আকাশাদি পদার্থ প্রমাণ নিরপেক্ষ ও স্বয়ং সিদ্ধ এরূপ কেহ মনে করে না, কিন্তু আত্মা প্রমাণাদি ব্যবহারের আশ্রয় বলিয়া প্রমাণাদি ব্যবহারের পূর্ব্বেই সিদ্ধ, এবং এরূপ আত্মার নিরাকরণও সম্ভব নহে। আগন্তুক বস্তুরই নিরাকরণ সম্ভব। যাহা নিরাকর্ত্তার স্বরূপ তাহার নিরাকরণ সম্ভব নহে। যিনি আত্মার নিরাকর্ত্তা, আত্মা তাঁহার স্বরূপ।" সুতরাং সমুদয় জ্ঞান ও প্রত্যয়ের মূলরূপী আত্মপ্রত্যয় সকলের বুদ্ধিতেই নিহিত আছে, ইহা সিদ্ধান্ত হইল। এই আত্মপ্রত্যয়কে যদি জ্ঞান বলা যায় তবে আত্মজ্ঞান সকলেরই আছে ইহা বলিতে হইবে। কিন্তু এই জ্ঞান অনেকের মধ্যেই অতি অস্ফুট। এই অস্ফুট জ্ঞান সম্যক্ জ্ঞান হইতে অত্যন্ত ভিন্ন। আত্মার প্রকৃত স্বরূপ অনেকেরই পক্ষে গভীর কোষ বা আবরণে আচ্ছাদিত। বেদান্ত এবং বেদান্তব্যাখ্যাকার শঙ্করের মতে এই কোষ বা আবরণ পঞ্চবিধ:—(১) অন্নময় কোষ, (২) প্রাণময় কোষ, (৩) মনোময় কোষ, (৪) বিজ্ঞানময় কোষ ও (৫) আনন্দময় কোষ। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ আনন্দবল্লী ও ভৃগুবল্লী এবং এই বল্লীদ্বয়ের শাঙ্কর-ভাষ্যে পাঠক এই পঞ্চকোষের বিশেষ বিবরণ পাইবেন। আত্মোন্নতির ভিন্ন ভিন্ন সোপানে আত্মাকে ভিন্ন ভিন্ন কোষের সহিত এক বলিয়া বোধ হয়। নিম্নতম সোপানে বোধ হয় আত্মা অন্নময় অর্থাৎ জড়ময়,— আমি শরীর, শরীর বই কিছুই নহি। এই সোপানের লোকেরাই চার্ব্বাকদর্শন-প্রণেতা। ইহাঁদের মতে শরীরাতিরিক্ত কোন আত্মা নাই। এই মত খণ্ডন করিতে যাইয়া শঙ্কর কি বলিয়াছিলেন তাহা আমরা ক্রমশঃ দেখিব। উন্নতির দ্বিতীয় সোপানের বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। তৃতীয় সোপানে মনে হয় আত্মা মনোময়—অস্থায়ী ও প্রবাহশীল মনোবিকার-পরম্পরা মাত্র। এই সোপানেই বৌদ্ধদর্শনের

অনুভবাত্মক বেদ যথাকালে সকল সাধকেরই নিকট সাক্ষাৎ ভাবে প্রকাশিত হয়। এই সাক্ষাৎ অনুভবকে শঙ্কর 'প্রত্যক্ষ' বিশেষণ না দিয়া 'অপরোক্ষ' বিশেষণ দেন। তাহার কারণ এই যে প্রত্যক্ষ কথাটী সাধারণতঃ ঐন্দ্রিয়ক অনুভবেই প্রযুক্ত হয়। এই ঐন্দ্রিয়ক অনুভব বা 'প্রত্যক্ষ' হিন্দুদর্শনের গৃহীত দ্বিতীয় প্রমাণ। তৃতীয় প্রমাণ নানাবিধ অনুমান। যাহা হউক, বেদের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব সম্বন্ধে শঙ্করের মত ও বিচার পাঠক বিস্তৃত আকারে তদীয় সূত্র ভাষ্যের প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ২৮ হইতে ৩০ ভাষ্যে পাইবেন। এই বিষয়ে জৈমিনি ও পানিন দর্শনের মত মাধবাচার্য্যকৃত "সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে" পাওয়া যাইবে। সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ পাঠক অধ্যাপক গফ্ ও কাউয়েল-কৃত এই গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ পাঠ করিতে পারেন।

৪। আত্মপ্রত্যয় ও আত্মজ্ঞান।

শাঙ্করদর্শনের মূলসূত্র আত্মপ্রত্যয়। আত্মপ্রত্যয়ের অর্থ আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস। শঙ্কর বলেন আত্মপ্রত্যয় মূল প্রত্যয়, ইহা অন্য কোন প্রত্যয় বা প্রমাণের উপর নির্ভর করে না; অন্য সমুদয় প্রত্যয় ও প্রমাণের মূলে এই প্রত্যয় বর্ত্তমান রহিয়াছে। অপর যাহা কিছু জানি তৎসঙ্গে এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞানের ভিত্তিরূপে জ্ঞাতৃরূপী আমি বা আত্মার জ্ঞান নিহিত থাকে; সূত্র-ভাষ্যের দ্বিতীয়াধ্যায় তৃতীয় পাদে সপ্তম সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন,—"ন হ্যাত্মাগন্তুকঃ কস্যচিৎ স্বয়ংসিদ্ধত্বাৎ। ন হ্যাত্মাত্মনঃ প্রমাণমপেক্ষ্য সিধ্যতি। ......ন হ্যাকাশাদয়ঃ পদার্থাঃ প্রমাণনিরপেক্ষাঃ স্বয়ংসিদ্ধাঃ কেনবিদভ্যুপগম্যন্তে। আত্মাতু প্রমাণাদিব্যবহারাশ্রয়ত্বাৎ প্রাগেব প্রমাণাদিব্যবহারাৎ সিধ্যতি। ন চেদৃশস্য নিরাকরণং সম্ভবতি। আগন্তুকং হি বস্তু নিরাক্রিয়তে, ন স্বরূপম্। য এব নিরাকর্ত্তা তদেব তস্য স্বরূপম্।" অর্থাৎ—"কাহারও

পক্ষে আত্মা আগন্তুক (contingent) নহে, কেননা ইহা স্বয়ং সিদ্ধ। আত্মা আত্মার প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় না। আকাশাদি পদার্থ প্রমাণ-নিরপেক্ষ ও স্বয়ং সিদ্ধ এরূপ কেহ মনে করে না, কিন্তু আত্মা প্রমাণাদি ব্যবহারের আশ্রয় বলিয়া প্রমাণাদি ব্যবহারের পূর্ব্বেই সিদ্ধ, এবং এরূপ আত্মার নিরাকরণও সম্ভব নহে। আগন্তুক বস্তুরই নিরাকরণ সম্ভব। যাহা নিরাকর্ত্তার স্বরূপ তাহার নিরাকরণ সম্ভব নহে। যিনি আত্মার নিরাকর্ত্তা, আত্মা তাঁহার স্বরূপ।” সুতরাং সমুদয় জ্ঞান ও প্রত্যয়ের মূলরূপী আত্মপ্রত্যয় সকলের বুদ্ধিতেই নিহিত আছে, ইহা সিদ্ধান্ত হইল। এই আত্মপ্রত্যয়কে যদি জ্ঞান বলা যায় তবে আত্মজ্ঞান সকলেরই আছে ইহা বলিতে হইবে। কিন্তু এই জ্ঞান অনেকের মধ্যেই অতি অস্ফুট। এই অস্ফুট জ্ঞান সম্যক্ জ্ঞান হইতে অত্যন্ত ভিন্ন। আত্মার প্রকৃত স্বরূপ অনেকেরই পক্ষে গভীর কোষ বা আবরণে আচ্ছাদিত। বেদান্ত এবং বেদান্তব্যাখ্যাকার শঙ্করের মতে এই কোষ বা আবরণ পঞ্চবিধ:—(১) অন্নময় কোষ, (২) প্রাণময় কোষ, (৩) মনোময় কোষ, (৪) বিজ্ঞানময় কোষ ও (৫) আনন্দময় কোষ। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ আনন্দবল্লী ও ভৃগুবল্লী এবং এই বল্লীদ্বয়ের শাঙ্কর-ভাষ্যে পাঠক এই পঞ্চকোষের বিশেষ বিবরণ পাইবেন। আত্মোন্নতির ভিন্ন ভিন্ন সোপানে আত্মাকে ভিন্ন ভিন্ন কোষের সহিত এক বলিয়া বোধ হয়। নিম্নতম সোপানে বোধ হয় আত্মা অন্নময় অর্থাৎ জড়ময়,—আমি শরীর, শরীর বই কিছুই নহি। এই সোপানের লোকেরাই চার্ব্বাকদর্শন-প্রণেতা। ইহাঁদের মতে শরীরাতিরিক্ত কোন আত্মা নাই। এই মত খণ্ডন করিতে যাইয়া শঙ্কর কি বলিয়াছিলেন তাহা আমরা ক্রমশঃ দেখিব। উন্নতির দ্বিতীয় সোপানের বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। তৃতীয় সোপানে মনে হয় আত্মা মনোময়—অস্থায়ী ও প্রবাহশীল মনোবিকার-পরম্পরা মাত্র। এই সোপানেই বৌদ্ধদর্শনের

উৎপত্তি। শঙ্কর কিরূপে বৌদ্ধদর্শন খণ্ডন করিয়াছেন তাহাও আমরা পরে দেখিব। উন্নতির চতুর্থ সোপানে মনে হয় আত্মা বিজ্ঞানময়,—ইহা ভিন্ন ভিন্ন মনোবিকারি ও সংস্কারের স্থায়ী আধার ও ভোক্তা; ইহা নানা কার্য্যের কর্ত্তা, বহু, এবং জ্ঞান ও শক্তিতে সীমাবদ্ধ। সাংখ্য-দর্শন এবং অনেক পরিমাণে ন্যায় ও পাতঞ্জলদর্শনও এই সোপানের অন্তর্গত। আত্মাকে বিজ্ঞানের সহিত এক মনে করাতেই বহু আত্মবাদ উৎপন্ন হয়। পঞ্চম সোপানের বিশেষ বর্ণনা অনাবশ্যক। আত্মাকে যখন পঞ্চ কোষের অতীত, পঞ্চ কোষের অবভাসক বলিয়া দেখা যায়, তখন প্রতীত হয় যে ইহা দেশ, কাল ও সংখ্যার অতীত,—ইহা একমাত্র, অখণ্ড, অনন্ত ও অদ্বিতীয়; ইহার অতিরিক্ত কোন বস্তু নাই। তখনই 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম,' 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম,' 'অহং ব্রহ্মাস্মি,' 'তত্ত্বমসি'—অর্থাৎ 'এই আত্মাই ব্রহ্ম,' 'এই সমুদয় ব্রহ্ম,' 'আমি ব্রহ্ম,' 'তুমি তিনি'—এই সকল উপনিষদুক্ত মহাবাক্যের প্রকৃত অর্থ বোধ হয়। ইহাই সম্যক্ আত্মজ্ঞান।

৫। চার্ব্বাকমত খণ্ডন।

এখন আমরা দেখাইব কিরূপে শঙ্কর বেদান্তবিরোধী মত সমূহ খণ্ডনপূর্ব্বক নিজ মত স্থাপন করিয়াছেন। পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ক্রম অনুসারে প্রথমেই চার্ব্বাকমতের উল্লেখ করিব। ব্রহ্মসূত্র, দ্বিতীয়াধ্যায়, তৃতীয় পদে ৫৩ ও ৫৪ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর এই মত খণ্ডন করিয়াছেন। এই খণ্ডনের প্রধান কথা এই—চার্ব্বাক অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে জড় ও জড়ীয় বস্তুর অনুভবকেই চৈতন্য বলে। চার্ব্বাকের মতে এই চৈতন্য জড়েরই ধর্ম্ম। কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভব? চৈতন্য বিষয়ী, জড় বিষয়; বিষয়ী কিরূপে বিষয়ধর্ম্মবিশিষ্ট হইবে? ফলতঃ বিষয়-বিষয়ীর ভেদ স্পষ্টরূপে উপলব্ধি না করাতেই জড়বাদ আসে; এই ভেদ বুঝিলে আর জড়বাদ থাকিতে পারে না। দ্বিতীয় কথা এই,

নানা অবস্থা-পরিবর্ত্তনের মধ্যেও আত্মা একরূপ থাকে। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থাতেই আত্মা নির্ব্বিকার, অপরিবর্ত্তনীয় থাকে বলিয়াই স্মৃতি প্রভৃতি সম্ভব হয়। ঘটনাপ্রবাহ বহিয়া যায়, কিন্তু উপলব্ধিস্বরূপ আত্মা অপ্রবাহিত থাকে। ইহাতেই প্রমাণ হয় আত্মা নিত্য, কালাতীত, জড় হইতে অত্যন্ত ভিন্ন। "উপলব্ধিস্বরূপমেব চ ন আত্মা, ইত্যাত্মনো দেহব্যতিরিক্তত্বং নিত্যত্বং, উপলব্ধেরৈকরূপ্যাৎ। 'অহম্ ইদম্ অদ্রাক্ষম্' ইতি চাবস্থান্তরযোগেঽপ্যুপলব্ধৃত্বেন প্রত্যভিজ্ঞানাৎ স্মৃত্যাদ্যুপপত্তেশ্চ।" অর্থাৎ—"আমাদের আত্মা উপলব্ধিস্বরূপ, ইহাতেই বুঝা যায় ইহা দেহব্যতিরিক্ত ও নিত্য, কেননা উপলব্ধি একরূপ। আর, অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইলেও 'আমি ইহা দেখিয়াছিলাম' এইরূপে আত্মাকে উপলব্ধৃরূপে পুনরায় চেনা যায়, আর এরূপ চেনাতেই স্মৃতিপ্রভৃতি সম্ভব হয়। ইহাতেই আমার দেহব্যতিরিক্তত্ব ও নিত্যত্ব সপ্রমাণ হয়।" এইরূপে শঙ্কর প্রমাণ করেন আত্মা শরীর নহে, জড় নহে, ইহা অন্নময় কোষের অতীত। এই প্রণালীকে 'ব্যতিরেক' প্রণালী বলা যায়। ইউরোপীও দর্শনে ইহাকে Method of Antithesis বলে। দার্শনিক চিন্তার নিম্ন সোপানে এই প্রণালীই অবলম্বনীয়। কিন্তু যথাস্থানে শঙ্কর 'অন্বয়' বা Synthesis প্রণালীও অবলম্বন করিয়াছেন। ব্যতিরেক প্রণালীতে দেখা গেল জড় আত্মা হইতে ভিন্ন, বিষয় বিষয়ী হইতে ভিন্ন। অন্বয়-প্রণালীতে দেখা যাইবে জড়, অথবা যাহা উন্নতির নিম্ন সোপানে জড় বলিয়া বোধ হয়, তাহা আত্মার সহিত এক,—বিষয় বিষয়ীর সহিত এক—অথবা বিষয়-বিষয়ীর ভেদ মৌলিক নহে। কিন্তু শঙ্কর অস্থানে ও অসময়ে অন্বয়প্রণালী অবলম্বনের বিরোধী, সুতরাং ক্ষণবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ যে নিম্ন সোপানে দাঁড়াইয়াই বিষয়-বিষয়ীর ভেদ উড়াইয়া দিতে উদ্যত, তাহাতে শঙ্করের ঘোর আপত্তি। এখন বৌদ্ধের সহিত তাঁহার বিবাদ কিঞ্চিৎ দেখা যাক্।

৬। বৌদ্ধমত-খণ্ডন।

বৌদ্ধ দার্শনিক মত নানা প্রকার; কিন্তু আমরা কেবল ক্ষণবিজ্ঞান-বাদী বৌদ্ধের মতই আলোচনা করিব। এরূপ বৌদ্ধ প্রথমে অন্বয়-প্রণালীতে দেখাইতে চেষ্টা করেন যে বাহ্য বা জড়জগৎ বলিয়া কোন জগৎ নাই; যাহা বাহ্য বা জড় বলিয়া বোধ হয় তাহা বস্তুতঃ চৈতন্য বা জ্ঞানেরই অন্তর্গত। তিনি বৈদান্তিকের নিজ কথায়ই তাঁহাকে বুঝাইতে চান যে এই বিষয়ে বেদান্ত ও বৌদ্ধ মতে কোন প্রভেদ নাই। পাঠক দেখিয়াছেন, শঙ্কর বলেন আমরা যাহা কিছু জানি তৎসঙ্গে আত্মাকে জ্ঞাতৃরূপে জানি। এই কথাটিই বিষয়ের দিক দিয়া বলিলে এই ভাবে বলিতে হয় যে আমরা যাহা কিছু জানি তাহাই জ্ঞেয়, জ্ঞানের বিষয়, জ্ঞানের সহিত অন্বিত বলিয়া জানি, জ্ঞানের সহিত অসম্বদ্ধ বলিয়া জানিনা। যাহা কিছু জানি তাহাই দৃষ্ট, শ্রুত, আঘ্রাত, আস্বাদিত বা স্পৃষ্ট বলিয়াই জানি; অদৃষ্ট, অশ্রুত, অনাঘ্রাত, অনাস্বাদিত বা অস্পৃষ্ট বলিয়া কোন বিষয়ই জানিনা। আর, যাহা জানি কেবল তাহাই কল্পনা করিতে পারি, বিপরীত কল্পনা করিতে পারি না। অর্থাৎ আমরা কোন বিষয়কে অদৃষ্ট, অশ্রুত, অনাঘ্রাত, অনাস্বাদিত বা অস্পৃষ্ট বলিয়া কল্পনা করিতে পারিনা। আর যাহা কল্পনা করিতে পারি না তাহা বিশ্বাসও করিতে পারি না। সুতরাং বিষয় অজ্ঞাত হইয়া আছে, কোন না কোন বিষয়ীর জ্ঞানগোচর নহে, ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। বিষয় মাত্রকেই আমাদিগকে জ্ঞানের সহিত অন্বিত বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়। এখন দেখ, যাহা জ্ঞানের সহিত অন্বিত, জ্ঞানের সহিত অসম্পর্কিতভাবে যাহাকে জানা যায় না, ভাবা যায় না, বিশ্বাস করা যায় না, তাহা বস্তুতঃ জ্ঞানের অন্তর্গত, জ্ঞান হইতে অভিন্ন। আত্মার স্বরূপ জ্ঞান, সুতরাং আত্মা

হইতে অভিন্ন বলিয়া কিছুই ভাবা যায় না। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এই সমুদয় প্রকৃত পক্ষে আত্মার অন্তর্গত, আত্মারই স্বরূপ। এই সমুদয়কে জানিতে যাইয়া আত্মা নিজের অতিরিক্ত কোন বাহ্য বস্তুকে জানে না, আপনাকেই জানে, নিজস্বরূপকেই জানে। সুতরাং বিষয়-বিষয়ীতে প্রকৃত পক্ষে কোন ভেদ নাই। অসম্যক্ জ্ঞানেই ভেদ, সম্যক্ জ্ঞানে অভেদই প্রতিভাত হয়। প্রতি জ্ঞানক্রিয়াতে একটী অভিন্ন বস্তুই প্রকাশিত হয়; সেই বস্তুতে বিষয়-বিষয়ীর ভেদ নাই। সেই বস্তু আমাদের আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এই সকল কথায় শঙ্করের আপত্তি থাকা দূরে থাক্, এই সকল কথা তাঁহারই কথা। প্রশ্নোপনিষদ্ দ্বিতীয় প্রশ্নের ষষ্ঠ শ্রুতির ভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন, "বস্তুচ ভবতি ন কিঞ্চিন্ন জ্ঞায়তে, ইতি চানুপপন্নম্। রূপঞ্চ দৃশ্যতে ন চাস্তি চক্ষুরিতিযৎ।.. নহি জ্ঞানেঽসতি জ্ঞেয়ং নাম ভবতি।" অর্থাৎ "বস্তু আছে অথচ কিছু জানা যাইতেছে না, ইহা অসম্ভব। রূপ দেখা যাইতেছে, অথচ চক্ষু নাই, ইহা সেরূপ কথা। জ্ঞান না থাকিতে জ্ঞেয় থাকিতে পারে না।" পুনশ্চ, তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ব্রহ্মানন্দ বল্লীর দ্বিতীয়া শ্রুতির ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন,— "আত্মনঃ স্বরূপং জ্ঞপ্তির্ন ততো ব্যতিরিচ্যতেঽতো নিত্যৈব তথাপি বুদ্ধেরুপাধিলক্ষণায়াশ্চ চক্ষুরাদি-দ্বারৈর্বিষয়াকার-পরিণামিন্যা যে শব্দাদ্যা-কারাবভাসাস্তে আত্মবিজ্ঞানস্য বিষয়ভূতা উৎপদ্যমানা এবাত্মবিজ্ঞানেন ব্যাপ্তা উপপদ্যন্তে। তস্মাদাত্মবিজ্ঞানাবভাসাশ্চ তে বিজ্ঞানশব্দবাচ্যাশ্চ ধাত্বর্থভূতা আত্মন এব ধর্ম্মা বিক্রিয়ারূপা ইত্যবিবেকিভিঃ পরি-কল্প্যন্তে।" অর্থাৎ—"আত্মার স্বরূপ জ্ঞান। জ্ঞান হইতে আত্মা কখনও বিচলিত হয় না, সুতরাং জ্ঞান নিত্য। তথাপি আত্মার উপাধিরূপিনী যে বুদ্ধি, যে বুদ্ধি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়যোগে বিষয়াকারে পরিণতা হয়, সেই বুদ্ধির শব্দাদি অবভাস সমূহকে আত্মবিজ্ঞানের

বিষয় (সুতরাং আত্মবিজ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র) এবং উৎপদ্যমান বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বস্তুতঃ এই সকল আভাস, যাহারা বিজ্ঞানশব্দ বাচ্য, এবং ধাত্বর্থ ধরিলেও আত্মার ধর্ম্ম, তাহাদিগকে অবিবেকিগণ বিকার বলিয়া কল্পনা করে।” এখন কথা এই, জড়জগৎ যদি বিজ্ঞানরূপীই হইল, তবে শঙ্কর সূত্র-ভাষ্যের দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের সহিত এত বিবাদ করিলেন কেন? তাঁহার ও বৌদ্ধের মত কি মূলে একই নহে? তিনি বৌদ্ধের বিজ্ঞানবাদের প্রতিবাদ করিতে যাইয়া কি প্রচলিত দ্বৈতবাদের প্রশ্রয় দেন নাই? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে বৌদ্ধ জগৎকে বিজ্ঞানরূপী বলিতে যাইয়া যদি বিজ্ঞানের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতেন, যদি বিজ্ঞানকে স্থায়ী ও এক বলিয়া বুঝিতেন, তবে শঙ্করের সহিত তাঁহার কোন মৌলিক প্রভেদ থাকিত না। কিন্তু বৌদ্ধ যে বিজ্ঞানে সমুদয় পরিণত করিলেন সেই বিজ্ঞানকেই আবার ক্ষণিক ও প্রবাহশীল বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। এখানেই তাঁহার সহিত শঙ্করের প্রভেদ। ‘বিজ্ঞান’ বলিতে বৌদ্ধ একটী অস্থায়ী ক্রিয়া বুঝেন এবং সেই ক্রিয়াকেই বিষয় বিষয়ীর মিলনরূপী অভেদ বস্তু বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। দৃষ্টি ক্রিয়াতেই দ্রষ্টা এবং দৃষ্ট পর্য্যবসিত। এই ক্রিয়া হইয়া গেলে দ্রষ্টাও নাই, দৃষ্টও নাই। তেমনি ক্ষণস্থায়ী শ্রবণক্রিয়াতেই শ্রোতা ও শ্রুত পর্য্যবসিত, ইত্যাদি। ‘বিজ্ঞানের’ অর্থ যদি ইহাই হয়, তবে বিজ্ঞান ছাড়াও যে জগৎ আছে এবং আত্মা আছে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। উক্ত ভাষ্যে শঙ্কর তাহাই বলিয়াছেন। আমার দৃষ্ট পুস্তক খানি আমার দৃষ্টি ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে না; বরঞ্চ পুস্তকখানি থাকাতেই আমার দৃষ্টি ক্রিয়া সম্ভব হইয়াছে। তেমনি দৃষ্টি ক্রিয়ার উপরে দ্রষ্টার অস্তিত্ব নির্ভর করে না; বরঞ্চ দ্রষ্টা থাকাতেই দৃষ্টি ক্রিয়া সম্ভব হয়। ক্রিয়া হইয়া গেলেও বিষয় থাকে, বিষয়ীও থাকে;

অথবা, মূল কথা বলিতে গেলে, সেই বস্তু থাকে যাহাতে বিষয়-বিষয়ী একীভূত। সেই বস্তু থাকাতেই পূর্ব্বদৃষ্ট পুস্তককে পরদৃষ্ট পুস্তকের সহিত এক বলিয়া চেনা যায় এবং পূর্ব্বের দ্রষ্টার সহিত পরের দ্রষ্টার একত্ব উপলব্ধ হয়। প্রতি জ্ঞানক্রিয়াতে এমন একটী জ্ঞানবস্তু প্রকাশিত হয় যাহাতে সমুদয় বিষয়-বিষয়ী নিত্যরূপে বর্ত্তমান, যাহা থাকাতে সমুদয় জ্ঞাতৃত্ব ও জ্ঞেয়ত্ব সম্ভব হয়। জ্ঞান যদি কেবল ক্রিয়ারূপী হইত, কেবল জ্ঞাতৃত্ব ও জ্ঞেয়ত্ব হইত তবে ক্রিয়ার অবসানে কোন বস্তুই থাকিত না। তাহা হইলে অন্যান্য অবস্থা ছাড়িয়া দিলেও—সুষুপ্তির সময়ে একেবারে প্রলয় উপস্থিত হইত। সুষুপ্তির সময়ে জ্ঞাতৃত্ব জ্ঞেয়ত্ব উভয়েরই অবসান হয়; তখন জীব জ্ঞানক্রিয়া করে না, বিষয়ও জ্ঞানক্রিয়ার বিষয়ীভূত হয় না। অথচ তখন যে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়ের মূলীভূত জ্ঞানবস্তু বর্ত্তমান থাকেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই; কেন না সুষুপ্ত্যন্তে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ই পুনঃ প্রকাশিত হইয়া নিজ নিজ একত্বের পরিচয় দেয়। সুতরাং বৌদ্ধ যে বিজ্ঞানকে ক্রিয়া ও প্রবাহ বলিয়া বর্ণনা করেন, ইহাতে কেবল তাঁহার স্থূলদর্শিতাই প্রকাশ পায়। বিজ্ঞান অস্থায়ী ও প্রবাহশীল হইলে সাদৃশ্য, একত্ব, স্মৃতি, বুদ্ধি কিছুই সম্ভব হইত না। "নহি কালত্রয়-সম্বন্ধিন্যেকস্মিন্ অন্বয়িন্যসত কূটস্থেবা সর্ব্বার্থদর্শিনি দেশকালনিমিত্তাপেক্ষবাসনাধীন-স্মৃতি-প্রতি-সন্ধানাদি-ব্যবহারঃ সম্ভবতি।" অর্থাৎ—"কালত্রয়-সম্বন্ধী, একমাত্র কূটস্থ বা সর্ব্বার্থদর্শী একজন সংযোগকারী না থাকিলে দেশ, কাল, ও নিমিত্ত সাপেক্ষ এবং সংস্কারাধীন স্মৃতি ও পরিচয় প্রভৃতি ব্যাপার সম্ভব নহে।" পূর্ব্বোক্ত বিচার ছাড়া শঙ্কর ঐতরেয় উপনিষদ্ দ্বিতীয়াধ্যায়ের ভাষ্যে এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। সেই আলোচনায় তিনি ইন্দ্রিয়-ঘটিত ক্রিয়ারূপী জ্ঞান, যে জ্ঞান বিষয়-বিষয়ীর সংযোগে উৎপন্ন বলিয়া বোধ হয়—এবং এই জ্ঞানের মূলীভূত

আত্মগত জ্ঞান, যাহা নিত্য, প্রবাহাতীত, অপরিবর্ত্তনীয়—এই দ্বিবিধ জ্ঞানের প্রভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা এই বিস্তৃত বিচার হইতে দুই চারিটী মাত্র কথা উদ্ধার করিলাম,—"দ্বে দৃষ্টী, চক্ষুষোঽনিত্যাদৃষ্টিঃ, নিত্যাচাত্মনঃ। তথা চ দ্বে শ্রুতী, শ্রোত্রস্যাঽনিত্যা, আত্মস্বরূপস্য চ নিত্যা। তথা মতী বিজ্ঞাতী বাহ্যাবাহ্যে।" অর্থাৎ— "দ্বিবিধা দৃষ্টি আছে, এক চক্ষুর অনিত্যা দৃষ্টি, আর আত্মার নিত্যা দৃষ্টি। তেমনি শ্রুতি দ্বিবিধা, শ্রোত্রের অনিত্যাশ্রুতি, আর আত্মস্বরূপের নিত্যা শ্রুতি। তেমনি বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে মতি ও বিজ্ঞানও দ্বিবিধ।"

৭। সাংখ্যমত খণ্ডন।

আচ্ছা, বৌদ্ধের ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ যেন খণ্ডিত হইল, তাহাতে সাংখ্য প্রভৃতির স্থায়ী বিজ্ঞানবাদের কি হইল? বৌদ্ধ 'বিজ্ঞান' কথাটী ব্যবহার করিলেও তাঁহার চিন্তা প্রকৃত পক্ষে বিজ্ঞান সোপানের চিন্তা নহে। তিনি 'বিজ্ঞান' বলিতে অস্থায়ী মনোবিকার বুঝেন, তাই আমরা তাঁহার দর্শনকে নিম্ন হইতে তৃতীয় সোপানে রাখিয়াছি। কিন্তু সাংখ্যের চিন্তা বস্তুতঃই চতুর্থ সোপানের। সাংখ্য আত্মাকে স্থায়ী বলিয়া স্বীকার করেন। এমন কি ইহাকে বুদ্ধির অতীত, কাল ও পরিবর্ত্তনের অতীত নিত্য, নিষ্ক্রিয় বলিয়াও অঙ্গীকার করেন। কিন্তু তিনি ইহাকে অদ্বিতীয় বলেন না। তিনি ইহাকে ইহার অতিরিক্ত অচেতন প্রকৃতির সহিত সম্পর্কিত—এমন কি ভোগ সম্বন্ধে তাহার অধীন বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। আর ইহাকে সংখ্যাতে বহু মনে করেন। সাংখ্যের মতে আত্মা বহু, এবং বহু আত্মার মিলন স্থান কোন পরমাত্মার প্রমাণাভাব। এই দুই বিষয়ে আত্মাতিরিক্ত প্রকৃতি স্বীকারে এবং আত্মার বহুত্ব কল্পনায়—সাংখ্যের সহিত শঙ্করের বিরোধ।

সাংখ্যের বিপক্ষে শঙ্করের কি বলিবার আছে তাহা এখন শুনিতে হইবে। কিন্তু বোদ্ধের সহিত জড়ের জড়ত্ব অস্বীকার করিতে যাইয়া, জড়কে আত্মাতে ডুবাইতে যাইয়াই কি শঙ্কর সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ খণ্ডন করেন নাই? এই প্রপঞ্চ জগৎ যদি আত্মবিজ্ঞানব্যাপ্ত এবং আত্মার ধর্ম্মই হইল, তবে আর ইহাকে আত্মাতিরিক্ত শক্তিবিশেষের বিকার বলিয়া বর্ণনা করিবার অবকাশ কোথায়? প্রতি জ্ঞানক্রিয়াতে যদি বিষয় বিষয়ীর মিলন স্থান, বিষয় বিষয়ী ভেদের অতীত এক অদ্বিতীয় বস্তুই প্রকাশিত হয়, তবে আর সাংখ্যের দ্বৈতবাদের স্থান কোথায়? সাংখ্য বলিবেন স্থান যথেষ্ট আছে। তুমিই নিজেই স্বীকার করিতেছ, আত্মা নির্ব্বিকার, নিত্য, নিষ্ক্রিয়, অভেদ। অথচ দেখিতেছ, জগৎ বিকারময়, অনিত্য ক্রিয়াময়, ভেদযুক্ত। সুতরাং তোমার বুঝা উচিত যে এরূপ জগতের কারণ কখনও আত্মা হইতে পারেন না। আত্মাকে জগতের কারণ হইতে হইলে নিজস্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইতে হয়। সুতরাং প্রপঞ্চ জগতের কারণরূপে আত্মাতিরিক্ত একটী শক্তি স্বীকার করিতে হয়। আমার কল্পিত প্রকৃতি সেই শক্তি। আর, আত্মার বহুত্বের প্রমাণ ত পড়িয়াই আছে। আমাদের ভোগ ভিন্ন ভিন্ন, উন্নতির পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন; বহু আত্মা স্বীকার না করিলে এই ভিন্নতার কোন ব্যাখ্যাই হয় না। সাংখ্যের এই সকল কথার উত্তর (১) শঙ্করের মায়াবাদ, (২) তাঁহার বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ। এই দুটী মতের বিশদ ব্যাখ্যার জন্য একটী বা ততোঽধিক স্বতন্ত্র প্রবন্ধের প্রয়োজন; সুতরাং বর্ত্তমান প্রবন্ধ এখানেই শেষ করিলাম।

শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ।

উজির নুরুদ্দিন।

(গল্প)

বোগদাদের খলিফা আমির হুসেনের অভ্যাস ছিল, তিনি ছদ্মবেশে একাকী রাজধানীর সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিয়া লোকের কথাবার্ত্তা গোপনে শুনিতেন; ইহা কতকটা তাঁহার ন্যায়পরায়ণতার আনুকূল্য করিত এবং অনেকটা তাঁহার কৌতূহল চরিতার্থ করিত।

একদা অন্ধকার রাত্রে এই অভিপ্রায়ে তিনি তাঁহার প্রিয়পাত্র উজির নুরুদ্দিনের বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। যে গৃহে উজির ও তাঁহার স্ত্রী শয়ন করিতেন, সেই গৃহের সন্নিহিত হইয়া ইঁহাদের আলাপ শুনিবার জন্য বিশেষ কৌতূহলী হইয়া পড়িলে সেই অন্ধকার রাত্রে একটা পেচকের তীব্রকণ্ঠ যেন তাঁহার এই অনু কৌতূহলকে ভর্ৎসনা করিল। দেয়ালের ছায়া যে স্থানে রা আঁধারকে নিবিড়তা প্রদান করিয়াছিল, সেই স্থানে অপরাধীর বাদসাহ দাঁড়াইয়া উজিরের গবাক্ষে কর্ণ পাতিয়া রহিলেন, উজি প্রিয়ম্বিনী বলিতেছিলেন—

"আর বাচালতা কর্ত্তে হ'বে না, এখন ঘুমিয়ে পড়, আবার প্রাতে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিলেই তো দরবারে ছুটতে হবে। দিনের বেলায় তোমার বিশ্রামের অবসর নাই, কাল ঢের রা'ত জেগে কি লিখেছ এখন ঘুমাও।"

উজির।—না গো, কাল না হয় নথি লিখে জেগেছি, আজ তোমা চন্দ্রমুখ দেখে জাগ্‌ব; গায়িকাদের ডেকে পাঠাই, অনেক দিন গা বাজনার চর্চ্চা হয় নাই—আজ ঘুমুচ্ছি না।

উজির-পত্নী।—আর রসিকতা কর্ত্তে হবে না—ঢের হয়েছে, রাত জেগে জেগে অসুখ হয়ে পড়বে।

উজির।—কাল দরবারে যাব না।

উজির-পত্নী।—বাদসাহ তোমায় বরতরফ কর্ব্বেন।

উজির।—বাদসাহকে আমি বরতরফ কোর্ব্ব।

উজির-পত্নী।—দরবারে না গেলে কৈফিয়ত দিতে হবে না?

উজির।—সম্রাট আমির হুসেনের কাছে আমার কৈফিয়ৎ! তিনি বাদসাহ আমি উজির, এ সম্বন্ধ ভুলে গেছি,—তিনি পিতার চক্ষে আমায় দেখেন।

উজির পত্নী।—তা কি আমি জানি না!

এই সময়ে ঈষদুন্মুক্ত গবাক্ষের পার্শ্বে সম্রাট একটু উঁকি মারিয়া দেখিবার চেষ্টা পাইতেছিলেন, প্রখর দীপের আলো তাঁহার মুখের উপর পড়িল; উজির-রমণী সহসা অতি মৃদুস্বরে স্বামীকে বলিলেন, "একটা কে জানেলা হ'তে দেখ্‌ছে!"

উজির শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন ও আস্তে আস্তে দরজা খুলিলেন—সম্রাট তাহা দেখেন নাই। উজির দরজা খুলিয়াই তাঁহার সম্মুখান হইয়া দেখিলেন,—একটা লোক সন্দেহাত্মকভাবে তাঁহার গৃহের জানেলার পার্শ্বে মুখ বাড়াইয়া আছে। উজির "গোলাম চোর, অন্দরমহলে ঢুকেছিস্" বলিয়া উন্মুক্ত তরবারীর আঘাতে একেবারে তাঁহার শিরশ্ছেদ করিয়া ফেলিলেন। সম্রাটের বাক্য বাহির হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল।

সেই অন্ধকার রাত্রে সহসা একটা হত্যা করিয়া উজির কতকটা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন—উজির-রমণী আতঙ্কে দীপহস্তে বাহির হইলেন—আবার সেই দীপশিখা সম্রাটের মুখের উপর পতিত হইল। বাদসাকে চিনিতে পারিয়া উজির স্তম্ভিত হইয়া গেলেন—সকল কথা

মনে হইল—বাদসাহ ছদ্মবেশে রাত্রে অনেক স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, কতদিন উজির নিজে তাঁহার সঙ্গী হইয়াছেন।

নিঃশব্দে স্বামী-স্ত্রী তৎক্ষণাৎ একটা স্থান খনন করিয়া বাদসাহকে সমাহিত করিলেন। উজির সজলচক্ষে স্ত্রীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন—"এ কথা কাহাকেও বোল না, আমি চলিলাম, এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া আমি ফিরিব না, আমি রাজহত্যা—পিতৃহত্যা করেছি। তুমি কা'ল রটিয়ে দিও, বাদসাহ উজিরকে লইয়া মৃগয়ায় গেছেন।"

উজির বনে বনে দেশে দেশে ঘুরিতে লাগিল—বাদসাহ-হীন বোগ্দাদে পুনর্ব্বার যাওয়ার কথা তিনি ভাবিতে পারিতেন না—তাঁহার অন্তর্দাহ হইত; তিনি বোগ্দাদে যাইয়া কল্যই প্রচার করিতে পারিতেন, বাদসাহ শিকার করিতে যাইয়া ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন—তাহা হইলেই বেগমমহলের কান্নাকাটি ও প্রজাগণের আর্ত্তি কয়েক দিন সজাগ থাকিয়া অপনাআপনি থামিয়া যাইত; কিন্তু তিনি আবার কোন্ প্রাণে নূতন এক বাদসাহের পার্শ্বে উজির হইয়া বসিবেন। রাজহত্যা অপরাধের একটা দণ্ডের জন্য যেন তাঁহার মন ব্যগ্র হইয়া পড়িত। তিনি তিন দিন—তিন রাত্রি নিরম্বু উপবাস করিয়া একটা গভীর জঙ্গলের মধ্যে যাইয়া পড়িলেন। তখন সন্ধ্যা এই মাত্র নামিতেছে, অস্তোন্মুখ সূর্য্যের রক্তিমাভা সন্ধ্যার নীলবসনপ্রান্তে সোহাগের বিদায়-স্পর্শ জানাইয়া নিঃশব্দে গমনোন্মুখ হইয়া রহিয়াছে—উজির কোথায় থাকিবেন—এই নিবিড় জঙ্গলে কি ভাবে রাত্রি যাপন করিবেন—তাহা ক্ষণতরেও ভাবিতেছেন না; তাঁহার প্রাণের ভিতর একটা "কি হইল, কি হইল" ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। সহসা এই সময় একটি মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া অশ্বের গতি থামাইলেন।

তাহার বয়স ২৪এর কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে হইতে পারে। একখানি মাত্র বস্ত্র দেহের নগ্নতা কোনওরূপে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, মুখে মনস্বীতার

প্রভা—কেশ জটাবদ্ধ। অপর কেহ এই ব্যক্তিকে দেখিলে মনে করিত, সে একজন তরুণ তপস্বী। বিশেষরূপ লক্ষ্য করিবার তাহাতে কিছুই ছিল না; কিন্তু উজির আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন—এ যেন মৃত বাদসাহের একটা প্রতিচ্ছায়া—তাদৃশ গঠন, তাদৃশরূপ, তাদৃশ হাঁটিবার ভঙ্গি. আমির হুসেনের বয়ক্রম ৫৪ বৎসর ছিল: তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার বিংশতি বৎসর পূর্ব্বের মূর্ত্তি যদি কেহ কল্পনা করিতে চাহিত, তবে অনেকটা এই ফকিরের মতনই একটি মূর্ত্তি মনে গড়িতে হইত। তিনি এই তরুণ তাপসকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন—প্রীত হইলেন। তিনি কি যেন খুঁজিতেছিলেন—সেই সন্ধানের ফল-স্বরূপ তাঁহার মন এই মূর্ত্তিটি বরণ করিয়া লইল।

অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক উজির ফকিরকে বলিলেন—

"তুমি কে, কোথায় যাচ্ছ?"

ফকির—যাচ্ছি সংসারে—অনেকদিন সংসার দেখিনি, একবার দেখ্‌ব।

উজির—আচ্ছা বেশ, আমি তোমায় সংসার ভাল ক'রে দেখাব। শুন ফকির, আমি তোমাকে বাদসাহ কোর্ব্ব, তুমি রাজতক্তে ব'সে রাজ্যশাসন কর্ত্তে পার্ব্বে?

ফকির—বেশতো, ফকির ছাড়া এ কার্য্যের যোগ্য লোক তুমি আর পেলেনা?

উজির—সে সকল বিচার তোমার সঙ্গে এখানে কর্ত্তে হবেনা। বাদসাহ হ'তে হোলে আমি যা' যা' বল্‌ব, সেই রকম সই কর্ত্তে হবে।

ফকির স্বীকৃত হইল। উজির পথে এক সহর হইতে মূল্যবান পরিচ্ছদ ক্রয় করিয়া তাহাকে পরাইলেন, আর একটা আচ্ছাদন প্রস্তুত করিয়া লইলেন—তদ্দ্বারা ফকিরকে বোগদাদে প্রবেশের সময় একবারে আশীর্ষ ঢাকিয়া লইয়া গেলেন।

বোগদাদে আসিয়া উজির রটনা করিয়া দিলেন, বাদসাহকে এক

ফকির এরূপ ঔষধ দিয়াছেন যে তাহাতে তিনি নব যৌবন লাভ করিবেন—তাঁহার যৌবন ফিরিবে কিন্তু পূর্ব্ব স্মৃতি অনেকটা লুপ্ত হইবে। বাদসাহ একমাস ঔষধ সেবন করিবেন, এই একমাস উজির ভিন্ন কেহ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে পারিবেন না।

একমাসে উজির ফকিরকে রাজ্য শাসন সম্বন্ধে সকল ব্যাপার বুঝাইয়া দিলেন, কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, শিখাইলেন, এবং মাসান্তে একদিন তাঁহাকে দরবারে আনিয়া উপস্থিত করিলেন; সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেল;—খোদার করামতে কি না হইতে পারে, বলিয়া বড় বড় মোল্লারা গুম্ফ ও শ্মশ্রুতে তা' দিতে লাগিল, তৃতীয় পক্ষের অধিকারভুক্ত অনেক বৃদ্ধ এই মহৌষধ প্রাপ্তির জন্য উজির সাহেবের দরবারও করিয়াছিল—উজির তাহাদিগকে হাঁকাইয়া দিলেন।

রাজ্যে এখন উজিরই সর্ব্বেসর্ব্বা। ফকির উজির-কর্ণধারের সাহায্যে শাসনতরণী বেশ দক্ষতার সহিত চালাইতে লাগিলেন।

কিন্তু উজির মনে মনে ফকিরকে ঘৃণা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না,—তিনি ভাবিতেন, "এটাকে বন হইতে ধরিয়া আনিয়া বাদসাহের তক্তে বসাইয়াছি, এটা যে কি' তা' আমি জানি।" তিনি সর্ব্বদা একটা উপেক্ষার সহিত দরবারে বাদসাহকে কথা বলেন; বাদসাহের মনোরঞ্জন করা দূরে থাকুক, তাঁহার প্রীতিভঞ্জনের যাহা কিছু অনুষ্ঠান—ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু স্পর্দ্ধায় তিনি তাহার কিছুই করিতে বাকী রাখিলেন না। করায়ত্ত ক্ষমতায় ফকির ক্রমে একজন পূর্ণাঙ্গ বাদসাহ হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রথম প্রথম উজিরের কথায় তিনি ততটা বিরক্তি দেখাইতেন না; কিন্তু শেষে উজিরকে দেখিলেই যেন তিনি একটু আতঙ্কিত হইয়া পড়িতেন; তাঁহার কথায় বাদসাহের মুখে কখন মনঃপীড়ার বিবর্ণতা, কখনও বা ক্রোধের রক্তিমাভা ফুটিয়া উঠিত। দরবারে অনেকেই উজিরের প্রভুত্বে ঈর্ষান্বিত ছিল; বাদসাহের বিরক্তির সূক্ষ্মতম অবস্থা লক্ষ্য

করিবার জন্য অনেক পদস্থ ব্যক্তি সেইস্থানে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাদের উত্তেজনায় বাদসাহের ক্রোধ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং একদিন তিনি প্রকাশ্য দরবারে উজিরকে কার্য্য হইতে জবাব দিলেন এবং দরবারে আগমন তাঁহার নিষিদ্ধ এই আদেশ ঘোষণা করিয়া দিলেন। যে উজির ফকিরের রাজতক্ত প্রাপ্তির স্বপ্ন সফল করিয়াছেন ভাবিয়া অহঙ্কারে পর্ব্বতাকারে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি এরণ্ডের মত ক্ষুদ্র হইয়া ম্লান মুখে স্বীয় গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাজকর্ম্মচারীদের ষড়যন্ত্র গৃহ পর্য্যন্ত তাঁহাকে অনুসরণ করিল; নিকাশের দায়ে তাঁহার সম্পত্তি ও গৃহাদি সমস্ত খাসভুক্ত হইয়া গেল। উজিরের পত্নী বলিলেন—"যিনি সিংহাসনে আসীন তাঁহার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করিও না, আমি কতদিন বলেছি—যে ভাবেই সিংহাসন পাইয়া থাকুক না কেন—ফকিরকে এখন ফকির জ্ঞানে তুচ্ছ করা তোমার অন্যায় হইয়াছে। তোমার বিরুদ্ধে যখন ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত হয়, তখনই আমি তোমাকে জানাইয়াছি—তুমি আমার কথা গ্রাহ্য কর নাই—এখন গোষ্ঠী শুদ্ধ অনশনে মৃত্যু নিশ্চিত দেখিতেছি।"

উজির এখন মনে মনে অনুতপ্ত হইয়াছেন কিন্তু উপায়ান্তর নাই। একবার বাদসাহের কাছে নির্জ্জনে যাইয়া তাঁহাকে ধরিতে পারিলে, তাঁহার কৃপা উদ্রেক করিবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তাঁহার বাদসাহকে দেখার কোন সুবিধা নাই—দরবারে প্রবেশ তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ।

একদা অনুতাপ-পীড়িত উজির নদীর তীরে বসিয়া স্বীয় অবস্থা স্মরণ করিতেছিলেন, তাঁহার চক্ষের কোণে গুটিকতক অশ্রু এক একটি করিয়া গণ্ডে পড়িতেছিল তিনি তাহা মুছিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে তিনি নদীর দিকে শূন্য মনে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, এমন সময়ে তিনি দেখিতে পাইলেন দুইটা অতি সুন্দর বৃহৎ ফল নদীতে ভাসিয়া যাইতেছে; তিনি নদী-জলে নামিয়া তাহা তুলিয়া

লইলেন এবং একটির খোসা ছাড়াইয়া তাহা আস্বাদন করিলেন। সেই ফলের অপূর্ব্ব মিষ্টত্ব ও সুরভিতে তাঁহার রসনা মুগ্ধ হইয়া গেল। তিনি একটি ফলের কিঞ্চিৎ আস্বাদন পূর্ব্বক স্বীয় শিশু সন্তান গুলিকে অবশিষ্টাংশ দিলেন কিন্তু বড় ফলটি বাদসাহকে দেওয়ার জন্য দরবারে লইয়া গেলেন।

তখন বাদসাহ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক এই মাত্র দরবারে আসিয়া বসিয়াছেন, তাঁহার চোখের ঘুম এখনও ভাঙ্গে নাই। সুষুপ্তি ও জাগরণ যেন তাঁহার অক্ষিপত্রে তখনও যুদ্ধ করিতেছিল। দৌবারিক উজির-দত্ত ফলটি লইয়া বহুৎ সেলাম পূর্ব্বক তাঁহার পার্শ্বে রাখিল—তাঁহার ঘুম ঘোর ভাঙ্গিয়া গেল। ভৃত্য বলিল "জাঁহাপানা বরখাস্ত উজির সাহেব এই ফলটি জাঁহাপনাকে উপহার দিয়াছেন এবং সাক্ষাতের প্রতীক্ষায় দ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন। বিপক্ষদলের নেতা নব নিযুক্ত উজির বাধা দিয়া বিরুদ্ধে কথা বলিতে যাইবে, তৎপূর্ব্বেই বাদসাহের হুকুম হইল, বরখাস্ত উজিরকে লইয়া এস।

বহুৎ কুর্ণিস করিতে করিতে উজির নুরুদ্দিন সেই দরবারে উপস্থিত হইলেন; তাঁহার শীর্ণ অনশন-ক্লিষ্ট মুখখানি দেখিয়া দরবারে তাঁহার শত্রু পক্ষীয়গণও যেন একটু শিহরিত হইয়া উঠিল। বাদসাহ তাঁহার দিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিলেন—"তোমার ফল পাইয়াছি, বহুৎ আচ্ছা ফল, এইরূপ এক শত ফল যদি এক মাস কালের মধ্যে সংগ্রহ করিয়া না দিতে পার, তবে তোমার গৃহের অবালবৃদ্ধবনিতার সহিত তোমার শির কর্ত্তিত হইবে।" উজিরের নিতান্ত শত্রুও এতটা মনে ভাবে নাই। একটা অস্ফুট আতঙ্কের স্বর সেই সভা গৃহের মধ্যে আকুলি ব্যাকুলি করিতে লাগিল—নবনিযুক্ত উজির সেলাম করিয়া বলিলেন "জাঁহাপনার আদেশ বড় কঠিন হইয়াছে—এবার মাপ করুন।"

বাদসাহ কোন উত্তর দিলেন না, কেবল উচ্চ কণ্ঠে "যাও" এই

কথা বলিয়া নুরুদ্দিনের প্রতি চাহিলেন, ভীত পদে অগ্রসর একখানি শরতের মেঘকে যেরূপ প্রবল কার্ত্তিকের বাত্যা দূর করিয়া দেয়, সেই আদেশ বেপথুমান নুরুদ্দিনকে সেইরূপে দরবার হইতে তাড়িত করিয়া দিল।

নুরুদ্দিন আর গৃহে গেলেন না। এক মাস পরে সকলকে একত্র মরিতে হইবে; শিশুগণের হত্যা তিনি দেখিতে পারিবেন না। সেই ফল দুইটী কোথা হইতে ভাসিয়া আসিয়াছে কে জানে। এই বেগেদাদে জন্ম কাটাইয়াও সেরূপ ফল তিনি চক্ষে দেখেন নাই। এবার নদীগর্ভে তিনি ফল বা মৃত্যুর অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন—যাহা পাইবেন, তাহাই লাভ।

নদীতীরে তিনি বসিয়া বসিয়া দেখিতে পাইলেন, আর একটী ফল বহুক্ষণ পরে ভাসিয়া আসিতেছে। নদীর উজানদিকে তিনি ক্রমে চলিতে লাগিলেন। ঐ ফল নদীতীরবর্ত্তী কোন বৃক্ষ হইতে পতিত হইতেছে কি না, তাহাই আবিষ্কার করিবার জন্য তিনি ক্রমাগত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে দুই তিনটি করিয়া সংগৃহীত ফলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তাঁহার নিরাশ হৃদয়ে ক্ষীণ আশার সঞ্চার হইল। ক্ষুধাতৃষ্ণার প্রতি একান্ত উপেক্ষা করিয়া তিনি দশ বার দিন পর্য্যটন করিল এবং ২৫।৩০টি ফল সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন। সহসা একদিন নদীগর্ভ হইতে উত্থিত একটী মস্‌জিদ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। নদীর এক তীরে উৎপন্ন একটি বৃক্ষ বক্ষ-বিস্তার পূর্ব্বক জননীর বাহুর ন্যায় শাখাপল্লব দ্বারা সেই মস্‌জিদটিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে—তাহা হইতে অজস্র স্বর্ণবর্ণাভ সুরভি ফল মন্দিরে ও জলে পতিত হইতেছে। উজির হৃষ্ট মনে সন্তরণপূর্ব্বক সেই মস্‌জিদে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন তাহার তিনটি দ্বার। দুই দ্বারে দুই জন দরবেশ নিমীলিতনেত্রে তপস্যা করিতেছেন এবং তৃতীয় দ্বারে একটি অতি সমুন্নত আসন শূন্য রহিয়াছে।

উজির সেই স্থান হইতে বৃক্ষের ফল সংগ্রহে ব্যস্ত হইলেন। তখন দুইজন সাধুর তপোভঙ্গ হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা উজিরের প্রতি স্মিত মুখে দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক বলিলেন—"ফল সংগ্রহের জন্য কষ্ট করিতে হইবে না, আমরাই ফল দিতেছি।" উজির সেই শূন্য আসনটির উপর পদ রক্ষা করিয়া ফল পাড়িতেছিলেন, সাধুরা বলিলেন—"এই আসনে পাদস্পর্শ করিও না ইহা আমাদের গুরুর।"

উজির সম্ভ্রমের সহিত সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং করজোড়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনাদের গুরু কোথায়, একজন সাধু উত্তর করিলেন—"গুরুদেবের পাদস্খলন হইয়াছে। বহু বৎসর তপস্যার পর তাঁহার সহসা পার্থিব ঐশ্বর্য্যের কামনা হইয়াছিল, তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। তিনি এখন বোগদাদের খলিফা; তুমি এই ফল ও আমাদের লিখিত পত্র তাঁহার নিকট লইয়া যাও।" উজির মনে মনে নিজের ক্ষুদ্রত্ব এখন অশেষরূপে উপলব্ধি করিলেন। এই বিশ্বনিয়ন্তার রাজ্যে স্বীয় বিরাট কর্ম্মফলের স্তুপের উপর দাঁড়াইয়া প্রত্যেকে তাহার ভাগ্যের দান লাভ করিতেছে। উজির তপস্বীর কামনা-সিদ্ধির পক্ষে একটা সামান্য তৃণের মত উপলক্ষ হইয়া অহংকারে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেই স্পদ্ধা তাঁহার একবারে নির্ম্মূল হইয়া গেল। তিনি নিজে জগতে কত ক্ষুদ্র, তাহা বুঝিতে পারিলেন।

ফল লইয়া যখন এবার উজির দরবারে উপস্থিত হইলেন, তখন বাদসাহ নিজে আসিয়া তাঁহাকে সাদরে সভাগৃহে লইয়া গেলেন এবং দুর্ব্বোধ অক্ষরে লিখিত তাপস-প্রদত্ত লিপির প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক উজিরকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "এই বোগদাদের সিংহাসন উজির নুরুদ্দিনের প্রাপ্য—আমি ভগবৎ আরাধনার জন্য বনে চলিলাম।"

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

বেদে পৃথিবীর গতি।

অগ্রহায়ণের ভারতীতে শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী পৃথিবীর বৈদিক নাম বিচার করিয়া স্পষ্টই দেখাইয়াছেন পৃথিবীর গতি ঋষিগণের অজ্ঞাত ছিল না।

শুক্ল যজুর্ব্বেদ-সংহিতার নিম্ন শ্রুতিতে উহা স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে, যথা—

সমাববর্ত্তি পৃথিবী সমুষা সমুসূর্য্যঃ। সমুবিশ্বমিদং জগৎ॥ (২০অঃ। ২৩)

অর্থাৎ পৃথিবী সম্যক আবর্ত্তন করিতেছে, উষা বা দিবস, সূর্য্য এবং সমস্ত জগৎও আবর্ত্তন করিতেছে। যদিচ মহীধর স্বীয় কালের সংস্কার অনুযায়ী পৃথিবীর আবর্ত্তনের অর্থ বোধ করিতে না পারিয়া সম্যক আবর্ত্তনের ভাবার্থ "নাশ হয়" এইরূপ মনে করিয়াছেন কিন্তু তাহা না করিলে কিছু ক্ষতি হয় না। পৃথিব্যাদি সচল এরূপ করিলেও অর্থের সঙ্গতি হয়।

ঐতরেয় আরণ্যকে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে সূর্য্যের প্রকৃত উদয় বা অস্ত নাই। ইহাও পৃথিবীর দৈনিক গতিজ্ঞানের পরিচায়ক। Haug's Aitareya Brahman Vol. I. p. 242 note দ্রষ্টব্য।

ঋগ্বেদের অনেক স্থলেই সূর্য্য যে পৃথিবীর ধারক তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। যদিচ প্রায়শ ধারণ অর্থে তাপাদি দিয়া প্রাণিদের রক্ষা করা এরূপ অর্থ অনেক স্থলে সুসঙ্গত কিন্তু ১০ মণ্ডলের ১৪৯ সূক্তের একটী ঋক্ স্পষ্টই অন্যরূপ অর্থের। সেই ঋকৃটি এই, সবিতা যন্ত্রৈ পৃথিবী মরম্নাদ্ধা স্কম্ভনে সবিতা দ্যাম দৃং হৎ।

অর্থাৎ সবিতা যন্ত্রসকল (সংযমন শক্তি) দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, রোধশূন্য হইয়া সবিতা দ্যুলোককে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ইহা কি মাধ্যাকর্ষণের সূচক নহে? এতদ্ব্যতীত প্রাচীনগণের আরও কয়েকটি অসাধারণ পর্য্যবেক্ষণ কথিত হইতেছে।

চন্দ্র যে নিজ কক্ষ ভ্রমণকালে একবার আবর্ত্তিত হয় তাহাও তাঁহারা জানিতেন। পিতৃগণ চন্দ্রের অপর দিকে থাকেন; অমাবস্যার সময় তাঁহাদের দিন এবং পূর্ণিমায় তাঁহাদের রাত্রি। এই সিদ্ধান্ত চন্দ্রের আবর্ত্তন জ্ঞান ব্যতীত হইতে পারে না।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের সর্ব্ববাদিসম্মত মত এই যে, পৃথিবী পূর্ব্বে অগ্নিময় ছিল, পরে ক্রমশঃ তরল ও পরে এইরূপ কঠিন হইয়াছে, এবং ইহা পূর্ব্বে সূর্য্য হইতে বিচ্যুত সূর্য্যাংশ, এই মতও বিজ্ঞানিকগণ প্রায়শ গ্রহণ করিয়াছেন। এবিষয়ে মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে (৭৮ অঃ)

মুমোচ স্বং তদা তেজ স্তেজসাং রাশিরব্যয়ঃ।
যত্তস্য খাম্ময়ং তেজো ভবিতা তেন মেদিনী॥

অব্যয়, তেজ সকলের রাশিস্বরূপ (সূর্য্য) সেই কালে স্বীয় তেজ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই খাম্ময় তেজ হইতে মেদিনী উৎপন্ন হইয়াছে।

মহাভারত মোক্ষ ধর্ম্মে আছে—

সোঽগ্নি-মারুত-সংযোগাৎ ঘনত্বমুদপদ্যতে॥
তস্যাকাশং নিপততঃ স্নেহ তিষ্ঠতি যোঽপরঃ।
স সংঘাতত্বমাপন্ন ভূমিত্বমনুগচ্ছতি॥

অর্থাৎ সেই অগ্নিমারুত সংযোগে ঘনতা প্রাপ্ত হয়। আকাশে নিপতিত সেই অগ্নির যে অন্য স্নেহ ভাব বা তরলাবস্থা হয় তাহা সংঘাত বা কঠিনতা প্রাপ্ত হইয়া ভূমিত্ব প্রাপ্ত হয়।

গত প্রায় ৩০ বৎসর হইতে যে সৌরকলঙ্ক লইয়া য়ুরোপে এত

অনুসন্ধান হইতেছে তাহাও প্রাচীনগণের অজ্ঞাত ছিল না। পুরাণে কথিত আছে বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যকে নির্ম্মান করিয়া চক্রের দ্বারা তাহার অঙ্গের কতক কতক অংশ কাটিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে সূর্য্যের অঙ্গে 'শ্যামকা' হইয়াছে; তাহা যে দেশে দৃষ্ট হয়, তথায় নানা প্রকার দুর্দ্দৈব ঘটে।

পর্য্যবেক্ষক

কাপিলাশ্রম।

ছোটনাগপুরের উৎসবাবলী।

ছোটনাগপুরের পার্ব্বনের মধ্যে করমা, জিতিয়া, দশহারা, গোধন, ছট, ফাগুয়া, প্রভৃতি কয়টীই প্রধান। ভাদ্রমাসে শুক্লপক্ষীয় একাদশী তিথিতে করমা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।—মহিলাগণ সমস্ত দিবস উপবাস করিয়া থাকেন। রজনী সমাগমে যখন সুধাকরের রজতালোকে দশদিক ভিজিয়া উঠে, তখন তাঁহারা স্নানান্তে পূজোপকরণ লইয়া বাহির হন। প্রফুল্ল কুসুম-শোভিত দীর্ঘ-শাখা-বিস্তারী করম বৃক্ষতলে তাঁহাদিগের এই যত্নানীত প্রীতি ও ভক্তির উপহার নীত হয়। তৎপরে পুরোহিত-সাহায্যে যথাবিহিত পূজার পর তাঁহারা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সে দিন আর জলস্পর্শ করেন না। পরদিন প্রাতঃকালে বড় এক মনোহর দৃশ্য দেখা গিয়া থাকে। দুইটী দল বাঁধিয়া স্ত্রীপুরুষে বাহির হইয়াছে, এবং গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমন করিতেছে (নিম্ন শ্রেণীর লোকে)। স্ত্রীলোকেরা মনানন্দে গান গাহিতেছে আর পুরুষেরা মানর* বাজাইতেছে। এই নৃত্য গীত সমাপনের পর তাহারা গৃহে

---

* খোলের ন্যায় এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র।

আসিয়া আহারাদি করিয়া থাকে, এবং এইরূপে করমার পার্ব্বন শেষ হইয়া যায়। ভ্রাতার মঙ্গলার্থে মহিলা গণ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। শুনিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বে অনার্য্য পার্ব্বতীয় জাতিদিগের মধ্যে এই পর্ব্ব প্রচলিত ছিল, কিন্তু এখন ইহা উচ্চ সমাজেও প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

করমার পরই জিতিয়া।, আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষীয় পূর্ণিমা তিথি এই পূজার দিন। পূজা প্রকরণ প্রায় সমস্তই করমার ন্যায়, করম-বৃক্ষের পরিবর্ত্তে এই উৎসবে জিতিয়া দেবী পূজিত হইয়া থাকেন, এইমাত্র প্রভেদ। এই উৎসব উপলক্ষেও ছোটনাগপুরী মহিলাগণ দেবতা পূজনোদ্দেশে নিশীথ সময়েই বাহির হইয়া থাকেন এবং তৎপর-দিবস পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গীত বাদ্যও হইয়া থাকে। সন্তানের মঙ্গল কামনাই এই ব্রতের উদ্দেশ্য।

শারদাগমে বঙ্গ যেরূপ উৎসবের আয়োজনে মাতিয়া উঠে, ছোট-নাগপুরে তাহার কিছুই দৃষ্ট হয় না। প্রতিমা পূজা এখানে প্রচলিত নাই। কিন্তু তাহা হইলেও পূজার দশমীর দিন এখানে আনন্দ কোলাহল শ্রুত হইয়া থাকে। ঐ দিবস তাহারা আত্মীয়, বন্ধু ইত্যাদির সহিত সাক্ষাৎ ও সম্ভাষন করে ও পরস্পরের প্রীতি উৎপাদনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণেরা যবশীষাদি লইয়া গৃহে গৃহে ক্ষত্রিয় বা শূদ্রদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যান, ও তাহারাও তাঁহাদিগের সম্মানার্থে যথাসাধ্য দান করিয়া থাকে। বৈকালে সহরবাসীরা মাঠে বেড়াইতে যান এবং এইরূপে আমোদ প্রমোদে দিনটী কাটিয়া যায়। রাত্রে প্রতি গৃহেই নানাবিধ খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করা হইয়া থাকে, এবং আহারের পূর্ব্বে সকলেই নিয়মানুসারে সামান্য পরিমাণে সিদ্ধি পান করিয়া থাকেন। ছোটনাগপুরবাসীরা এই পার্ব্বনকে দশহারা বলে, বলা বাহুল্য বঙ্গদেশীয় দশহরার সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই।

হিন্দুর গৃহে বার মাসে তের পার্ব্বন। দশহারার পরই গোধন। গোধন বঙ্গের ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সমতুল্য। ভগ্নী কার্ত্তিক মাসের শুক্ল-পক্ষীয় দ্বিতীয়ার দিন স্নানান্তে 'রেঙ্গিনীর কাঁটা লইয়া আথরিতে (চালুনিতে) চোটাইতে থাকে,' অনন্তর সেই কাঁটা ঢেঁকিতে কুটিয়া ফেলিয়া যমের দুয়ারে কাঁটা দিলাম, এই মর্ম্মে মন্ত্রোচ্চারণ করে। ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ হইলে ভগ্নীকে আশীর্ব্বাদ করে এবং তাহার নিকট পরিতোষরূপে ভোজন করে। এতদ্ভিন্ন ঐ দিন ভগ্নীকে ভ্রাতার বিদ্যা-কামনায় মসিপাত্র পূজা করাইতে হয়।

শরৎকালে ছোটনাগপুরে আর একটী উৎসবের অনুষ্ঠান হয়, তাহার নাম ছট। কার্ত্তিক মাসের ১লা হইতে ৬ই পর্য্যন্ত এই পার্ব্বন চলিতে থাকে। ছট উপলক্ষে দলে দলে স্ত্রী ও পুরুষে সমস্ত দিবস উপবাস করিয়া সূর্য্যোপাসনা করিয়া থাকে। ক্রমান্বয়ে ছয় দিবস ব্যাপিয়া এই পূজা চলে। এই ছয়দিনের মধ্যে পাঁচ দিন উপাসনা করিয়া বাটীতে স্নান করে বটে, কিন্তু ষষ্ঠ দিবসে তাহাদিগকে নদীতে স্নান করিতেই হইবে। স্নানান্তে ঠেকুঁয়া* দান করিবার প্রথা আছে, এবং ইহা লইতে অস্বীকার করিলে সূর্য্যদেবকে অবমাননা করা হইয়া থাকে। ছোটনাগপুরের একস্থানে সূর্য্যদেবের একটী মন্দির আছে, এই পার্ব্বন উপলক্ষে তথায় অনেক যাত্রী একত্রিত হইয়া থাকে এবং আপনাদিগের মানসমত পূজাদি করে। এই ব্রতানুষ্ঠানের পর উপাসনাকারীরা আত্মবন্ধুদিগকে ভোজন করাইয়া থাকে, এবং তদুপলক্ষে বহুল নৃত্যগীত হয়। এই সকল গান হিন্দিতে রচিত,

* ঠেকুঁয়া—এক প্রকার পিষ্টক বলিলেও চলে। আটা ও গুড় একত্র মাখিয়া ছাঁচে তোলা হয় এবং উহা ঘৃতে ভাজিয়া লওয়া হইয়া থাকে। শুনিয়াছি ইহার আস্বাদন মন্দ নহে।

পাঠকবর্গকে তাহার নমুনাস্বরূপ যথাস্থানে ফাগুয়ার একটী গান উপহার দেওয়া যাইবে। এই পর্ব্বে মুসলমানেরাও যোগদান করে। ছোটনাগপুরবাসী হিন্দুদিগের ইহা একটী প্রধান উৎসব। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ প্রভৃতি সকল জাতির মধ্যেই ইহা প্রচলিত দেখা যায়।

বসন্ত ঋতুর আগমনে ছোটনাগপুরবাসীদিগের হৃদয়ে যেন আনন্দ ধরে না। ফাগুয়া উপলক্ষে বাঙ্গালার ন্যায় তথায় নিরানন্দের কুণ্ঠিত ছবি নয়নগোচর হয় না, এই দিবস তাহারা প্রাণ খুলিয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকে। মাতা, পুত্র, পিতা, বধূ, সকলে এক নূতন আনন্দে মাতিয়া আবির লইয়া খেলা করে। সে দৃশ্য দেখিলে মনে হয় যেন উল্লাসের পূর্ণচিত্র কল্পনার নয়নে প্রতিভাত হইতেছে। কিন্তু কায়স্থেরা মাদক সেবন করিয়া এই পবিত্র উৎসবে অপবিত্রতা আনয়ন করে, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। ফাগুয়া উপলক্ষে যে নাচ গান হয় তাহার ত আর কথাই নাই। স্ত্রী পুরুষ সকলেই এই গীতে যোগদান করে। নিম্নে একটী হোলির গান দেওয়া গেল।

গোপিনীরা বলিতেছেন,—

বরজো জি যশোদা জি কানা।
হাম দধি বেচত যাতে বৃন্দাবন,
মারগ হাঁটলানা॥
বরবস মোকে তোড় মুচকিয়া,
লে হি মুখমানা॥

যশোদা ইহার উত্তর দিতেছেন,—

তোমায়তি গোরা বহুত হায় রাধিকা,
মের গোপাল না দানা।
কেয়া জানে ইনো রঙ্কি বাতিয়া,
জানত খেলত খানা॥

শ্রীকৃষ্ণ এই অভিযোগ শ্রবণ করিলেন,—

এতনা শুণকে আরে মনমোহন,
মরমোমে রোদন যানা।
হের মেইয়া হামকো বহুত খিজানা,
ম্যুরত যেন নিশানা,
উলট মরদে তোর হানা॥

রাধা তাহাতে বলিতেছেন,—

মুরশ্যাম ব্রজ বসবো না
যাই বসবো কঁহু হানা।
করব আমন মন মানা॥

ফাগুয়া ব্যতীত আর একটী বসন্তোৎসব দৃষ্ট হয়, তাহাকে বসন্ত-পঞ্চমী কহে। এই পার্ব্বন ফাল্গুন মাসে শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমীর দিন পূজা হইয়া থাকে, এবং তদুপলক্ষে বহুল নৃত্যগীত হয়। বাহুল্য ভয়ে এস্থলে বসন্ত পঞ্চমীর গান দেওয়া গেল না। এই উৎসবকালে ছোটনাগপুরে একটী মেলাও হইয়া থাকে। ডালটিনগঞ্জ হইতে ৮৪ মাইল দূরে দেও নামক স্থানে এই মেলা হয়। হাতি, ঘোড়া, গরু প্রভৃতির দৌড় ও অন্যান্য নানা প্রকার কৌতুকজনক ক্রীড়ার এখানে আয়োজন হইয়া থাকে। পালওয়ানদিগের কুস্তিও হয় এবং নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়ার্থ আসিয়া থাকে। এই মেলা বাঙ্গালির নিকট এক অভিনব ব্যাপার।

পূর্ব্বোল্লিখিত উৎসব ব্যতীত ছোটনাগপুরে আরও কয়েকটি পার্ব্বন আছে, যথা—ছাতুয়ান, দোঠান, তিলপার্ব্বন ইত্যাদি। ছাতুয়ান চৈত্র মাসে, দোঠান কার্ত্তিক মাসে ও তিলপার্ব্বন পৌষ মাসে হইয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই ছোটনাগপুরবাসী হিন্দুরা হাসেন হোসেন পর্ব্বে যোগদান করিয়া থাকে। এই হাসেন হোসেন পর্ব্বে

প্রথম দিবস রাত্রিতে গান গাহিত, গাহিতে হিন্দু মুসলমান মিলিয়া নদীতীর হইতে মাটি কাটিয়া আনে। তৎপর দিবস কোন উৎসবের অনুষ্ঠান হয় না। তৎপর দিন রাত্রিকালে সঙ্গীত করিতে করিতে কলাপাতা কাটিয়া আনা হয়। পরদিন প্রাতঃকালে ছোট চৌকি বাহির হয়, এবং তৎপর দিবস মহরম বাহির হইয়া সহর প্রদক্ষিণ করে।

"হোসেন হাসেন দুনো ভেইয়া,
চলে লড়াইয়া," ইত্যাদি।

গাহিতে গাহিতে হিন্দুরাও মুসলমানদিগের অনুবর্ত্তী হয়। ব্রাহ্মণেরা এই উৎসবে যোগদান করেন না। হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতির ইহা একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

পুরিয়া, বমাউত, উওরা, প্রভৃতি প্রেত পূজা করার পদ্ধতিও ছোট নাগপুরে প্রচলিত আছে। বারান্তরে তদুপলক্ষে উৎসবাদির কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য।

ভারতবাসী চিরদিন এরূপ নিদ্রারামশ্লথতনু বা পরকণ্ঠলগ্ন ছিলেন না; পূর্ব্বকালে তাঁহারা বাণিজ্য-ব্যপদেশে বহু দেশদেশান্তরের লোকের সহিত সৌহার্দ্দসূত্রে আবদ্ধ হইতেন। ভারতবর্ষাগত বাণিজ্যসম্ভার ভূমধ্যসাগরোপকূলবর্ত্তী বন্দরসমূহের পণ্যবীথিকায় উচ্চদরে বিক্রীত ও সাদরে ক্রীত হইত। ভারতবাসীর পণ্যতরী সুদূর চীন ও জিপাঙ্গের (জাপানের) সাগরোপকূলে বাণিজ্যার্থে প্রেরিত হইত। মধ্য এসিয়ার ভীষণ শ্বাপদসঙ্কুল প্রান্তর-পথে ভারতবর্ষীয় দ্রব্যজাত বাহিত হইয়া কাস্পীয় সাগরে ও রুশীয় রাজ্যে দেখা দিত। যব ও সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপ সকল হিন্দু ও বৌদ্ধদিগেরই আবাসস্থলী হইয়াছিল; তাহাদের সহিত ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানের এরূপ আদান প্রদান চলিত, যে তদ্দেশীয় বিপণি শ্রেণী দেখিলেই ভারতবর্ষীয় বলিয়া ভ্রান্তি হইত। আমেরিকার আবিষ্কর্ত্তার জন্মগ্রহণের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে আমেরিকার পশ্চিমকূলে ভারতীয় অর্ণবপোতে ধর্ম্ম ব। বাণিজ্য বৈজয়ন্তী উড্ডীন দেখা যাইত।*

ভগবানের অযাচিত পক্ষপাতিতায় ভারতবর্ষের অত্যুর্ব্বর ক্ষেত্রনিচয় অপরিমিত শস্যাদি প্রসব করিত; ধরাগর্ভও ধাতুরত্নদানে কাতর ছিল না। এই সকল পণ্য ও খনিজ বিনিময়ে বহু দেশের ধনরাশি ভারত ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইত। কৃষক কুটীরেও শস্যবিনিময়ে রৌপ্যের অভাব ছিল না; মধ্যাবস্থ গৃহস্থগণ অনেকে স্বর্ণপাত্রে

* John Fryer, LL. D., Professor of Oriental Languages and Literature, University of California. বহু আবিষ্কার পরম্পরার দ্বারা এই উক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

পানভোজন করিত। নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরাও সঞ্চিত রৌপ্য দ্বারা নানা জাতীয় অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিয়া গায়ে পরিত।

যাহার যাহা থাকে, সে তাহারই আদর ও সদ্ব্যবহার করে, সময়ে সময়ে কিছু অত্যধিক ব্যবহারও করিয়া থাকে। যাহার তাহা না থাকে, সে মনে মনে দুঃখিত হয় বটে, কিন্তু বাহিরে পরের কার্য্য সভ্যতাবিরোধী বলিয়া ঘৃণা করিয়া আত্মশ্লাঘা সম্ভোগ করে। সংসারের ইহাই রীতি। ভারতবর্ষে স্বর্ণ রৌপ্য ছিল; এজন্য ভারতবাসিগণ আদর করিয়া তাহা গায়ে পরিত, অনেক সময়ে কিছু অধিক পরিমাণ অলঙ্কার ধারণ করিত, তাহাও সত্য। এইরূপ য়ুরোপাঞ্চলেও নানা দেশাগত কার্পাস ও পশুলোমাদির প্রচুর আমদানী হওয়াতে বস্ত্রের মাত্রাও অনেক সময়ে অনাবশ্যকরূপে অত্যধিক দেখিতে পাওয়া যায়। যখন য়ুরোপীয় কোন রাজমহিলার পশ্চাদ্বিলম্বিত গাউন রাশি দুই তিন জন ভৃত্যের দ্বারা বাহিত হইবার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়, তখন সভ্যতার মাত্রা বস্ত্রের প্রাচুর্য্যে কিংবা অলঙ্কারের প্রাচুর্য্যে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হয়। ভারজিল হইতে মিল্‌টন পর্য্যন্ত যখন সকলেই স্বর্ণকে অসভ্যদেশীয় পদার্থ (barbaric gold) বলিয়া বিকৃতস্বরে বর্ণনা করেন, তখন য়ুরোপাঞ্চলে স্বর্ণের যে অভাব ছিল, তাহাই প্রমাণিত হয়।* এবং ভারতবর্ষীয় সর্ব্বজাতীয় স্ত্রীলোকের অলঙ্কারের বহুলত্ব ও গুরুত্ব হইতে এতদ্দেশের ধন প্রাচুর্য্যের সুন্দর আভাস পাওয়া যায়।

এই ধনসঞ্চয়ের আর একটি প্রধান কারণ প্রাচীন হিন্দুদিগের স্বাবলম্বিতা। তাঁহাদের কঠোর ধর্ম্মনীতিই তাঁহাদিগকে স্বাবলম্বী

* ইতালীয় কবি ভারজিলই প্রথম barbaric gold কথা ব্যবহার করেন। See Æneid II., 504.

"The gorgeous East, with richest hand,
Showers on her Kings *barbaric* pearl and gold."

Milton's "Paradise Lost," Bk. II.

করিয়াছিল। হিন্দু বণিকেরা স্বদেশীয় দ্রব্য-বিনিময়ে পরকীয় অর্থ গৃহে আনিতেন; কিন্তু আপনাদের অর্থ দিয়া পরকীয় দ্রব্যজাত ক্রয় করিতেন না। তাঁহাদের ধর্ম্মবিধিতে পরদেশীয় দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। পরদেশীয় দ্রব্য ব্যবহার না করিয়া পরদেশে গিয়া বাণিজ্য করা শুধু হিন্দুদিগেরই নিকট সম্ভবপর হইয়াছিল। ধর্ম্মবিধিদ্বারা কিরূপে ধনবৃদ্ধি হইতে পারে, এখানে তাহারও একটি প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা সেই প্রাচীন বিধি লঙ্ঘন করিয়াছি বলিয়াই এক্ষণে বিধি আমাদের প্রতি বিমুখ।

প্রাচীন ভারতবাসীগণ জল ও স্থল উভয় পথেই বাণিজ্য করিতেন। ভারতবর্ষের পশ্চিমভাগে সৌরাষ্ট্র (সুরাট) ও গুর্জ্জরাষ্ট্র (গুজরাট), দক্ষিণ ভাগস্থ পাণ্ড্য ও চোলরাজ্য এবং পূর্ব্বভাগে কলিঙ্গ ও বঙ্গ প্রভৃতি স্থানের লোকেরা নৌবিদ্যা ও বাণিজ্য বলে প্রাধান্য লাভ করেন। বঙ্গ হইতে সিংহবংশীয় এক বীর নৃপতি সিংহলে রাজ্যস্থাপন করেন; তদবধি সিংহল দ্বীপস্থ বন্দর সকল বাণিজ্য প্রভাবে খ্যাতি লাভ করে। আরাকান সীমাবস্থিত চট্টগ্রাম এবং কলিঙ্গ কূলবর্ত্তী তাম্রলিপ্ত (তমলুক) প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল। সমস্ত বঙ্গ ও বিহারের পণ্য সম্ভার গঙ্গা ও সরস্বতী দিয়া তাম্রলিপ্তিতে নীত হইত। আরাকান হইতে বাণিজ্য জাহাজ তমলুকে আসিত। তমলুক হইতে পণ্য ভারাক্রান্ত তরণী শ্রেণী দক্ষিণপূর্ব্ব ভারতের কূল বাহিয়া পাণ্ড্য ও চোল রাজ্যে উপস্থিত হইত; তথায় মথুরা (মাদুরা) ও কাঞ্চী (কাঞ্জিভেরম্) নগরীর দ্রব্যভারের সহিত পূর্ব্বদেশাগত পণ্য মালার বিনিময় চলিত এবং তদ্দেশীয় নাববিদ্যাধ্যক্ষ বণিকদিগের সুগঠিত তরণীসমূহ পূর্ব্বোক্ত বাণিজ্য-বহরের কলেবর বৃদ্ধি করিত। এই সকল জাহাজ অবশেষে কালীয়দহ, শঙ্খদহ প্রভৃতি নানা "দহ" পার হইয়া সিংহলে দেখা দিত। সিংহল হইতে বাণিজ্য জাহাজ সকল দুইভাগে

বিভক্ত হইত। যাহারা যব, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে বা শ্যাম, আনাম, চীন প্রভৃতি দূরবর্ত্তী প্রদেশে বাণিজ্য করিতে যাইবে, তাহারা অনুকূল পবন ভরে পূর্ব্বমুখে প্রবাহিত হইত; এবং যাহারা য়ুরোপীয়দিগের সহিত পণ্য বিনিময়ে কৃতসঙ্কল্প থাকিত, তাহারা আবার উত্তর মুখে ভারতের পশ্চিম কূল বাহিয়া কালিকট ও সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি বাণিজ্য বন্দরে উপস্থিত হইত। অবশেষে ঐ সকল স্থান হইতে উহারা উর্ম্মিমালা বিক্ষোভিত আরব সাগরে ভাসমান হইত।

হিন্দু বণিকেরা স্বয়ং গিয়া য়ুরোপাঞ্চলের সহিত বাণিজ্য করিতেন না, কারণ ইউরোপে যাইবার অবিচ্ছিন্ন জলপথ তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। পুরাকালে প্রশান্ত মহাসাগরের অনেকাংশ হিন্দুদিগের পরিজ্ঞাত ছিল বটে, কিন্তু তাঁহারা আট্‌লান্‌টিক্ মহাসাগরের সংবাদ জানিতেন না। আফ্রিকা ঘুরিয়া য়ুরোপে যাইবার পথ অবিদিত থাকাতে, বাণিজ্য পথ প্রথমতঃ লোহিত সাগর দিয়া প্রবর্ত্তিত ছিল। ভারতীয় নাবিকেরা আরব সাগর পার হইয়া কুরিয়া মুরিয়া দ্বীপে * উপনীত হইতেন; তথা হইতে ক্রমে আরবদেশের দক্ষিণ সীমা দিয়া বাবেল মণ্ডপের পথে লোহিত সাগরে প্রবেশ করিতেন। যখন টলেমী বংশীয় পরাক্রান্ত নৃপতিগণ মিসরের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন, তখন ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া নগরী অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল। লোহিত সাগরের উত্তর প্রান্ত হইতে অলেকজেণ্ড্রিয়া অধিক দূরবর্ত্তী নহে; এজন্য লোহিত সাগর হইতে আরব ও মিসর দেশীয় বণিকগণ ভারতীয় পণ্যরাশি ক্রয় করিয়া অলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার বিশ্ব-

* কুরিয়া মুরিয়া নামের উৎপত্তি কি, জানা যায় না। বরিশাল জেলার দক্ষিণাংশে কুকুরি মুকুরি নামক এক দ্বীপাংশ আছে। উভয় শব্দ একই অর্থবোধক এবং এক জাতীয় লোক কর্ত্তৃক গঠিত বলিয়া বোধ হয়, কুকুরি মুকুরি শব্দের অর্থ "কুকুর ও বিড়াল।" See *Beveridge's Backergunj*, Page 168.

বিখ্যাত প্রকাণ্ড বন্দরে আমদানী করিতেন। এইরূপে এশিয়া ও য়ুরোপের যাবতায় বাণিজ্য দ্রব্যের আদান প্রদানের পথে আলেক্‌-জেণ্ড্রিয়া একমাত্র বাণিজ্য স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

এই সময়ে রোমরাজ্য উন্নতির চরমসীমা লাভ করিয়াছিল। য়ুরোপখণ্ডে গ্রীক ও রোমীয়গণই প্রথম জ্ঞানালোকরশ্মি বিকীর্ণ করেন; গ্রীসের জ্ঞানবল ও রোমের বাহুবল ও বাণিজ্যবল ভূমণ্ডলের দূরপ্রান্তেও তাহাদের প্রতিপত্তি সংস্থাপিত করিয়াছিল। লোহিত ও ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্য বিষয়ে রোমীয়গণেরই একাধিপত্য ছিল।* তাহাদের জেনোয়া ও ভিনিস নগরীদ্বয় প্রধান বন্দর ছিল। ভিনিসীয় বণিকের পণ্য জাহাজ জগতের নানা দেশে বাণিজ্যার্থ প্রেরিত হইত।† আলেকজেণ্ড্রিয়ার বাণিজ্য এক প্রকার ভিনিসীয়দিগেরই করায়ত্ত ছিল; তাঁহারাই উক্ত নগরী হইতে ভারতীয় দ্রব্যজাত ক্রয় করিয়া সমগ্র য়ুরোপখণ্ডে বাণিজ্য করিতেন। কিন্তু উদীয়মান আরবীয়-গণের বীর্য্যপ্রতিভা ভিনিসীয়দিগের বাণিজ্য-গৌরব বিলুপ্তপ্রায় করিয়াছিল।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে মহম্মদের মৃত্যুর পর যখন দুর্দ্দান্ত আরবীয়গণ বাহুবলে দেশ জয় ও ধর্ম্মপ্রচার জন্য, কৃপাণ করে দর্পভরে বহির্গত হয়, তখন নিকটবর্ত্তী প্রদেশে তাহাদিগকে বাধা দিবার লোক অতি কমই ছিল। তাহারা "মিশর ও শিরীয় দেশ মহম্মদের মৃত্যুর পর

* এই সময়ে আরব দেশের কোনৈক দেশে এডেন বা আদন নগর স্বর্গতুল্য সুন্দর স্থান ছিল। ইহা বাণিজ্যের জন্য সমধিক খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। এখানে রোমীয় ব্যবসায়ীদিগের এতই প্রভাব ছিল যে এডেন সাধারণতঃ "রোমীয় বাজার" (Roman Mart) বলিয়া কথিত হইত। See "*Arabia and its Prophet,*" Page 16.

† শেক্সপীয়র Merchant of Venice গ্রন্থে লিখিয়াছেন:—He hath an argosy put to Tripoli, another to the Indies; * * He hath a third at Mexico, a fourth for England." *Merchant of Venice*, I. iii.

ছয় বৎসর মধ্যে, পারস্যদেশ দশ বৎসরে, আফ্রিকা ও স্পেন এক এক বৎসরে, কাবুল অষ্টাদশ বৎসরে, তুর্কস্থান আট বৎসরে সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত করে।"* সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বাণিজ্য অনেকাংশে দিগ্বিজয়ী মুসলমানদিগের হস্তগত হইয়া পড়ে। তাঁহারাই লোহিত সাগরের পথ পরিত্যাগ করিয়া পারস্য উপসাগর-পথে বাণিজ্য প্রচলনের প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। ভারতীয় বণিকগণ তখন স্বদেশীয় দ্রব্যসম্ভার উক্ত উপসাগরের তীরবর্ত্তী অরমাজ প্রভৃতি স্থানে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতেন। সুতরাং ভারতীয় সমৃদ্ধিবলে অরমাজের ঐশ্বর্য্য লক্ষগুণ বর্দ্ধিত হইল। এই জন্যই কবিবর মিল্‌টন ধনগৌরবদৃপ্ত দেশের আদর্শ দেখাইতে গিয়া অরমাজ ও ভারতবর্ষের নামোল্লেখ করিয়াছেন।† অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে চতুর্ব্বিংশ খলিফা সুবিখ্যাত হারুণ-উল-রসিদের সময়ে রাজধানী বোগ্দাদ ও বাণিজ্যস্থান মোজাল অতুলনীয় ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠে।‡ নানাবিধ সূক্ষ্মবস্ত্র বঙ্গদেশে ঢাকা অঞ্চলেই প্রস্তুত হইত; উহা চট্টগ্রাম প্রভৃতি বন্দর দিয়া মোজালে যাইত; মোজাল হইতে আরব্যবণিক কর্ত্তৃক উহা ট্রয় প্রভৃতি স্থানে নীত হইত; তথা হইতে য়ুরোপীয় বণিকদিগের যত্নে তদ্দেশের নানাস্থানে প্রেরিত হইত। য়ুরোপীয়েরা ভাবিতেন যে সূক্ষ্মবস্ত্র মোজাল হইতেই আইসে; এজন্য সূক্ষ্মবস্ত্রের নাম মস্‌লিন। মোজাল শব্দ হইতেই মস্‌লিন শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ক্রমে যখন আরবীয়গণ বাণিজ্য বিষয়ে প্রাধান্য লাভ করিল, তখন রোমীয়গণ ক্রোধপ্রযুক্ত আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া নগরী ভস্মসাৎ করেন।

* বঙ্কিমচন্দ্র, বিবিধ প্রবন্ধ, ২১৭ পৃঃ।

† "The wealth of Ormuz and of Ind," *Par. Lost*, Bk. II.

‡ History of Caliphs by Jalálu'ddin—A's—Suyúti translated from the original Arabic by H. S. Jarret.

কিছুদিন পরে বাণিজ্য পথের আবার পরিবর্ত্তন হইল। ভারতপণ্য পাইবার জন্য য়ুরোপীয়দিগকে আরব্যবণিকের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইত। আরব দেশের ভীষণ প্রান্তরে ও মরু-প্রদেশে পথিকের উপর এত অত্যাচার হইত যে ভারতীয় বা য়ুরোপীয় কোনও বণিক-সম্প্রদায়ই সে পথে গমনাগমন করিতে সাহসী হইত না। অথচ একটি দুর্দ্দান্ত জাতির মুখাপেক্ষী থাকা কাহারও নিকট সমীচীন বোধ হইল না। এই সময়ে ভারতবর্ষ ও চীন প্রভৃতি পূর্ব্বদেশ হইতে বাণিজ্য দ্রব্য মধ্য এসিয়ার প্রান্তর মধ্যবর্ত্তী স্থলপথে কৃষ্ণসাগরের তীরবর্ত্তী কনস্তান্তিনোপলে নীত হইতে লাগিল। সুতরাং আরবীয়েরা শিরীয় দেশ দিয়া অরমাজ প্রভৃতি স্থানের বাণিজ্য দ্রব্য ঐ কনস্তান্তিনোপলেই লইয়া যাইতে লাগিল। সুতরাং অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে কনস্তান্তি-নোপলই য়ুরোপীয় বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থান হইয়া দাঁড়াইল।* তুর্ক-স্থানের যবনাধিবাসিগণই ভারতবর্ষজাত দ্রব্য সম্ভোগের সম্পূর্ণ অধিকারী হইল। ভিনিস ও জেনোয়ার ইতালীয় বণিকগণ কনস্তান্তিনোপলে আসিয়া বাণিজ্য করিতে লাগিলেন।

অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলমানেরা স্পেনের দক্ষিণভাগ অধিকার করেন। সাত শত বৎসরেরও অধিক কাল স্পেনরাজ্যের অধিকাংশ মুসলমানদিগের শাসনাধীন ছিল। এই সময়ে ভূমধ্যসাগর তটবর্ত্তী মালাগা নগরী মুসলমানাধিকৃত স্পেনের বিখ্যাত বাণিজ্য-বন্দর ছিল। কনস্তান্তিনোপল হইতে মালাগা পর্য্যন্ত আরবীয় অর্ণবপোত যাতায়াত করিত। পথিমধ্যে জেনোয়া ও মার্সেল প্রভৃতি সহরে তাহাদের বাণিজ্যতরী লাগিত; এবং তত্রত্য বিপণিরাজিতে নানা দিগ্দেশাগত

* "The commerce of Europe centred at Constantinople, in the eighth and ninth centuries, more completely than it has ever done since in any city."

Finlay, *Byzantine Empire*, 248.

পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ার্থ সজ্জিত থাকিত। এই সময়ে গ্রীকগণও বাণিজ্য-ব্যবসায়ে যোগ দিয়াছিলেন। তখন তাঁহাদেরই জাহাজ সকল অর্ণব পথে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।* কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তখন ভূমধ্য-সাগরই য়ুরোপীয় তরণীমালার একমাত্র ক্রীড়াক্ষেত্র ছিল। দূর সমুদ্রে যাইবার কল্পনাও তখন কাহারও মনোমধ্যে স্থানলাভ করে নাই।

অবশেষে কনস্তান্তিনোপলেরও বাণিজ্য-প্রতিপত্তি বিলুপ্তপ্রায় হইল। মুসলমানদিগের প্রবল প্রতাপই তাহাদের বাণিজ্যাবনতির প্রধান কারণ হইয়াছিল। মধ্যএসিয়া হইতে স্পেন পর্য্যন্ত তাহাদের প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল; তাহাদের দুর্দ্দান্ত শাসনে সমগ্র পশ্চিম এসিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বিদেশীয় বণিক সম্প্রদায় পথে ঘাটে বাহির হইতে পারিত না; কারণ তাহাদের পণ্য ও ধনভাণ্ডার লুণ্ঠিত হইত। আরব্য-দস্যুর নৃশংস অত্যাচারে সকলেই থরহরি কম্পিত হইত। অসির সাহায্যে ধর্ম্ম-প্রচার মুসলমান ধর্ম্মনীতির মূল সূত্র।† এজন্য মুসলমানেরা যাহাকেই পাইত, তাহাকে স্বকীয় ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য বল প্রকাশ করিত এবং অভক্ষ্য ভক্ষণ করাইত। এজন্য চীন, তিব্বৎ ও ভারতবর্ষীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ বণিকেরা ধর্ম্মনাশের ভয়ে মুসলমান রাজ্যে গিয়া বাণিজ্য করা হইতে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হইল। এজন্য মধ্য এসিয়ার যে ভূভাগ একদিন রাজবর্ত্ম-সদৃশ সহজগম্য হইয়া উঠিয়াছিল‡ তাহাও পুনরায় দুরতিক্রম্য হইয়া উঠিল। কিছুদিন মধ্যে

---

* "The Greek navy was then the largest in existence." Lyall's *British Dominion in India*, p. 7.

† একথা মুসলমানগণ স্বীকার করেন না। এই বিবদমান মতের জন্য তাঁহারা ক্ষুব্ধ হইবেন না। এইরূপ আলোচনাতেই কোনও তথ্যের স্থির মীমাংসা সম্ভব। ভা. স.

‡ "The Hyrcanian deserts and the vasty wilds
Of wide Arabia are as thoroughfares now"
Shakespeare.

রাজ্যবিজিগীষু যবনসেনাদল ভারতবর্ষের পশ্চিম তোরণে দেখা দিল; সেই দিন হইতে হিন্দুকুলের গিরিদ্বারে যে ভীষণ পদাঘাত শব্দে শান্তির ক্রোড়ে সুষুপ্ত ভারতবাসী প্রবুদ্ধ হইল, সে দ্বারাঘাত শব্দের আর বিরাম হয় নাই। তখন পরদেশার্জ্জিত ধনলাভের প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়া ভারতবাসীগণ স্বকীয় ধর্ম্ম ও প্রাণ রক্ষায় অধিকতর মনোযোগী হইল। বিদেশ গমনোদ্যত বাণিজ্য জাহাজের উপর মুসলমানেরা অমানুষিক অত্যাচার করিত। এজন্য বাণিজ্য বন্ধ হইল; "সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ" বলিয়া নব বিধি লিপিবদ্ধ হইল; "কালাপাণি"তে গেলে জাতি যাইবার ভয়ে ধর্ম্মভীরু ব্যক্তিগণ স্বদেশের সংকীর্ণ কোণে আশ্রয় লইল।

এই সময় হইতে পারস্য ও আরব সাগর হইতে ভারতবর্ষীয় অগণ্য পণ্যতরী অনতিবিলম্বে বিলুপ্ত হইল। সময়ে সময়ে মুসলমানেরা রাজ্য, বাণিজ্য বা দাস সংগ্রহ জন্য সিন্ধু ও সুরাট প্রদেশে আসিত বটে, কিন্তু তাহাদের দ্বারা নীত বাণিজ্য দ্রব্যে পারস্যোপসাগরের বন্দর সমূহের পণ্য ভাণ্ডার পূর্ণ হইত না। মধ্য-এসিয়ার স্থলপথ লোকশূন্য; পশ্চিম সমুদ্র ভারতীয় তরণীশূন্য; আরবীয়গণ বাণিজ্য অপেক্ষা রাজ্যের জন্য অধিকতর উদ্যোগী। এরূপ অবস্থায় ভারতীয় দ্রব্যজাত আর পূর্ব্ববৎ কনস্তান্তিনোপল প্রভৃতি স্থানে যাইত না। য়ুরোপের সহিত ভারতের বাণিজ্য সংক্রান্ত আদান প্রদান এক প্রকার বন্ধ হইয়া গেল। ক্রমে ভারতবর্ষের কথা য়ুরোপে উপকথায় পরিণত হইল। স্বর্ণভূমি (El dorado) ভারতবর্ষ যেন অশান্তি ও অরাজকতার ভীষণ তমসায় হারাইয়া গেল।

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র।

ধরণী।

ধরণী মাঝে যে দিকে দেখি সকলি হেথা সুন্দর,
সকলি হেথা নয়ন-মন-মোহিনী;
ভূধর, তরু, নির্ঝর, মরু, কোমল শষ্প, কঙ্কর;
জলধি বেলা, তরঙ্গ ফেন-নাচনি।

হেথায় পিতা, জননী, ভ্রাতা, ভগিনী, সখা, প্রেয়সী,
উদার চিতে ঢালিছে স্নেহ সতত;
রচিছে ওগো আমারি তরে কি এক স্বর্গ শ্রেয়সী,
ধরণী শুধু আমারি স্বতঃ পরতঃ।

অই দেখ না আমারি তরে কোকিল উঠে কুহরি,
উঠিছে ওগো ঝঙ্কারিয়া পাপিয়া,
নানান রঙা বিহগগুলি সদাই ওগো ফুকরি—
আমারি প্রাণে পুলক দেয় মাখিয়া।

আমারি তরে শতেক গাছে সহাস ফুল ফুটিয়া,
সুরভি মাখা নটীর মত বল্লরী,
প্রজার মত বৃক্ষ শত মধুর ফল বহিয়া
মৌন মুখে দাঁড়ায়ে আছে প্রহরী।

আমারি সভায় চন্দ্রতারা দীপক প্রায় উজ্জ্বল,
বিশ্ব শোভা দেখাতে রবি ফুটিছে,
আমারি পায়ে লুটাতে ছুটে উল্কা মত্ত চঞ্চল,
আমারি তরে বিশ্ব-বাণী বহিছে।

আমারি তরে বিভল বায়ু বহিছে সুধা সঙ্গীত,
সুরভি বহে আমারি তরে কত না,
তটিনী ছুটে গাহিয়া গান হারায়ে নিজ সম্বিত,
তাহার তালে বিশ্বে বাজে বাজনা।

ধরণী মাঝে যা কিছু দেখি সকলি হেথা সুন্দর,
জীবন হ'তে মদির মৃত্যু অবধি,
গড়েছ বিধি এমনি করে' তুষিতে আমার অন্তর
তুঙ্গ অচল হইতে মহাজলধি।

যদিন হেথা থাকিব ধাতা এমনি সুখে কাটিব,
কিসের ব্যথা, কিসের হেথা ভাবনা ?
তুমি　আপন হাতে আমার তরে দিয়েছ যাহা ভুঞ্জিব,
বিলাব আমি তোমারি মাঝে আপনা।

তৃপ্তি নাহি, নাহি হে সখা, তোমার শিল্প ভুঞ্জিয়া,
অসীম ক্ষুধা সদাই মনে জাগ্রত ;
মৃত্যু তোমার শ্রেষ্ঠ দান, তৃপ্তি দেয় ভরিয়া,
তাই সে মৃত্যু ঘুরিছে বিশ্বে সন্তত।

যে দিন মৃত্যু আসিবে সখা, তাহারে লব বরিয়া
আমারি এই তৃষিত বক্ষ মাঝারে ;
মৃত্যু তোমার শ্রেষ্ঠদান, লইব তোমায় স্মরিয়া,
তোমারি কোলে লইও তুলে আমারে।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নারায়ণী।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সিপাহীগণ ও জনতা যে সময় প্রান্তর ছাড়িয়া গেল, তখন রতন প্রতিশ্রুতি পালন করিতে সাহেবের কাছে ফিরিবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে ও অত্যধিক রক্তস্রাবে তিনি বড়ই ক্লান্ত হইয়াছিলেন। কিয়ৎ ক্ষণের জন্য তাঁহার বিশ্রামের প্রয়োজন হইল। তিনি বটবৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইলেন।

বৃক্ষের অনেকগুলি জটা ভূমি স্পর্শ করিয়া, বহুকাল ধরিয়া ভূমির রস গ্রহণে পরিপুষ্ট এক একটী স্তম্ভের আকার ধারণ করিয়াছিল। তাহাদের অন্তরালে বসিয়া, রতন ব্রাউনের দৃষ্টিপথের বাহিরে পড়িয়াছিলেন।

বসিয়া ব্রাহ্মণ নারায়ণীর কথা ভাবিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, ব্রাউন দূর হইতে যে বালিকাকে দেখিয়াছিলেন, সে নারায়ণী। নারায়ণীই আজ রতনের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে। নিজের লাঠিগাছটী পাইতে পলমাত্র বিলম্ব হইলে, আবার তাঁহাকে লাঞ্ছিত হইতে হইত।

কিন্তু কেমন করিয়া কোন পথ দিয়া নারায়ণী আসিল? কে তাহাকে দাদার বিপদের সংবাদ দিল? আসিল ত এত শীঘ্র ফিরিল কেন?

রতনের বড় সাধ হইল, পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন গুলার মীমাংসা করিবেন। কিন্তু নারায়ণী আসিল না। বটবৃক্ষের পাশ দিয়া ব্রাউন যাইতেছিলেন। রতন দেখিলেন, কিন্তু দেখা দিলেন না। কিয়ৎক্ষণ অন্বেষণ করিতে করিতে, ব্রাউন সুবর্ণরেখার দিকে চলিয়া গেলেন।

পশ্চাৎ হইতে সদাশিব আসিয়া ডাকিল—"পণ্ডিত জী!"

রতন মুখ ফিরাইলেন, এবং সদাশিবকে ফিরিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"পথে আসিতে সাহেবকে দেখিয়াছ?"

সদা। কোন সাহেব? যে এইমাত্র চলিয়া গেল, না, যে আপনার অপমান করিয়াছে?

রতন। আমি তাহারই কথা বলিতেছি।

সদা। সে এখনও সেখানে পায়চারি করিতেছে।

রতন। একটী বালিকাকে দেখিয়াছ?

সদা। বালিকা অনেক দেখিয়াছি। আপনার লাঞ্ছনার কথা শুনিয়া, অনন্তপুরের বালক বালিকা পর্য্যন্ত আপনাকে দেখিতে আসিয়াছিল। আপনি বোধ হয় রাজকুমারীর কথা বলিতেছেন।

রতন। তুমি তাহাকে চেনো?

সদা। দেখিয়া অনুমান করিয়াছি।

রতন। আমাকে লাঠী দিয়া বালিকা কোথায় গেল? আমি তার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছি।

সদা। উৎকণ্ঠার কারণ নাই,—তিনি ঘরে ফিরিয়াছেন।

সাগ্রহে রতন জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি দেখিয়াছ?"

সদাশিব বৃদ্ধকে আশ্বাস দিয়া বলিল—"আমি তাঁহাকে বাড়ীতে রাখিয়া আসিলাম।"

ব্রাহ্মণ নিশ্চিন্ত হইলেন। তাঁহার শ্রান্তি দূর হইয়াছে। এইবারে তিনি হারলির কাছে যাইবার উদ্যোগ করিলেন।

সদাশিব কিন্তু অনেক কথা জানিবার জন্য ব্রাহ্মণের কাছে আসিয়াছে। প্রাতঃকালে—কোথাও কিছু নাই সহসা নিরীহ ব্রাহ্মণের এ লাঞ্ছনা হইল কেন? রাজকুমারীই বা ঘরের বাহিরে কেন আসিলেন? সদাশিব এ সমস্ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না।

ভদ্রোচিত হয় না বলিয়া সদাশিব এ সকল কথা নারায়ণীকে

জিজ্ঞাসা করে নাই। এখন সে ব্রাহ্মণের কাছে আসিয়া সকল কথা জানিবার জন্য প্রশ্ন করিল। রতন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা তাহাকে বিবৃত করিলেন। সদাশিব বলিল, সাহেব ব্রাহ্মণেরই অপেক্ষায় এক স্থানে পায়চারি করিতেছে। তাই রতনকে উঠিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"সে নরাধমের কাছে আবার আপনার যাইবার প্রয়োজন।"

রতন প্রয়োজনের কথাও তাহাকে বলিলেন। শুনিয়া, সদাশিব কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া রহিল। রতন দেখিলেন, যুবকের প্রশস্ত ললাট গভীর চিন্তায় কুঞ্চিত হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সদাশিব! কি ভাবিতেছ?"

সদাশিবের চমক ভাঙিল। বলিল—"এ কার্য্যের ভার দাসকে দিলে ক্ষতি কি?"

রতন বলিলেন—"ক্ষতি কিছুই নাই। বরং তুমি যদি সাহেবের কাছে যাও, এবং আমার হইয়া দু'কথা বল, তাহইলে আমি নিশ্চিন্ত হই।"

সদাশিব বলিল—"আমিই যাইতেছি। তবে আমার ফিরিবার পূর্ব্বে আপনি অনন্তপুর ত্যাগ করিবেন না।"

রতন বুঝাইলেন, অনন্তপুরে আর বেশি ক্ষণ থাকা যুক্তিযুক্ত নয়। থাকিলে, আরও বিপদ যে না ঘটিবে, তা কে বলিতে পারে?

তথাপি সদাশিব ব্রাহ্মণকে থাকিতে অনুরোধ করিল। বলিল, কাশীপুরে আমার শ্বশুরালয়। আপনাকে তাহারই নিকট দিয়া যাইতে হইবে। আমি শ্বশুর মহাশয়কে একখানি পত্র দিব। আপনি যদি দয়া করিয়া পত্র খানি লইয়া যান।"

এরূপ অনুরোধে রতন "না" বলিতে পারিলেন না তিনি সেই খানেই বসিয়া রহিলেন। সদাশিব সাহেবের কাছে চলিয়া গেল। উভয়ে কি কথা বার্ত্তা হইয়াছিল, পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

সাহেবের সঙ্গে কথা সারিয়া সদাশিব চিঠি লিখিতে ছুটিল, চিঠি

লিখিয়াই, ব্রাহ্মণের কাছে ছুটিয়া আসিল। ব্রাহ্মণ তাহার হস্ত হইতে পত্র গ্রহণ করিলেন, এবং উষ্ণীশের ভিতর রাখিলেন।

সদাশিব অনেকদূর পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের সঙ্গে গেল। অনন্তপুরের প্রান্তে আসিয়া রতন দুই বিন্দু অশ্রুপাত করিলেন। সদাশিব ভূমিষ্ঠ হইয়া গুরুদেবকে প্রণাম করিল। তাহার মস্তকে করস্পর্শ করিয়া ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ করিলেন। বিদায়কালে গুরু-শিষ্যে কোনও কথা হইল না। রতন নীরবে মুখ ফিরাইলেন। সদাশিব প্রত্যাশা করিল, ব্রাহ্মণ নারায়ণী সম্বন্ধে কোনও কথা বলিবেন—এক আধবার তার তত্ত্ব লইতে আদেশ করিবেন। প্রত্যাশায় সদাশিব অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। ব্রাহ্মণ আর ফিরিলেন না। সদাশিবের চক্ষু অল্পক্ষণ পরেই ব্রাহ্মণের পবিত্রমূর্ত্তির দর্শনসুখ হইতে বঞ্চিত হইল।

সাহেবদের আর শিকারে যাওয়া হইল না। ব্রাউন এদিক ওদিক ঘুরিয়া বাংলায় ফিরিলেন। ব্রাহ্মণকেও দেখিতে পাইলেন না, বালিকারও দেখা মিলিল না।

অল্পক্ষণ পরে হারলিও ফিরিয়া আসিলেন। আনন্দদেবের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইয়াছিলমাত্র—কোনও কথা হয় নাই। পালঙ্কের তলায় পড়িয়া শারীরিক যন্ত্রণায় ও প্রাণভয়ে দেওয়ান একরূপ অজ্ঞানই হইয়া পড়েন। ভৃত্যেরা আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিলেও, সম্পূর্ণ-প্রকৃতিস্থ হইতে তাঁহার অনেক সময় অতিবাহিত হয়। হারলি, তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া যথাযথ উত্তর পাইলেন না। অগত্যা তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইল। তবে আসিবার সময় আদেশ করিলেন, যেন পিতা ও পুত্রে তাঁহার সহিত বাংলায় সাক্ষাৎ করে।

বাংলায় ব্রাউনের সহিত হারলির পুনঃ সাক্ষাৎ হইল। অপরাধ স্বীকার করিয়া, তিনি সহচরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। দুই বন্ধুতে আবার সদ্ভাব স্থাপিত হইল।

বীরচন্দ্র সম্বন্ধে যতদূর জানা ছিল, সমস্ত ব্রাউনকে বলিয়া, হার্‌লি রাজার উপকারে প্রতিশ্রুত হইলেন। বলিলেন, "যেরূপ করিয়া পারি, রাজ পরিবারের কষ্টের লাঘব করিব।"

অপরাহ্ণে ব্রাউন ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। বালিকার পুনর্দ্দর্শনের আশা এখনও তিনি ত্যাগ করিতে পারেন নাই। হার্‌লি আনন্দদেবের আগমন প্রত্যাশায় বাংলাতেই বসিয়া রহিলেন।

তখন ফাল্গুনের শেষ—বসন্তের পূর্ণযৌবন। রাজবাটী সংলগ্ন উদ্যানের বৃক্ষ সকল নবপল্লবশোভিত। আম্রবৃক্ষের কতকগুলি মুকুলিত, কতকগুলি তাম্রোদর কিসলয় সমাচ্ছন্ন।

সমীরাভিহত বৃক্ষশাখা ঈষৎ ঈষৎ দুলিতেছিল। দিগন্তলম্বী সূর্য্যের কিরণ পল্লবে পল্লবে প্রতিফলিত হইতেছিল। উদ্যানটী দূর হইতে সফেন-তরঙ্গতাড়িত প্রবালদ্বীপের ন্যায় শোভা পাইতেছিল।

দেখিতে দেখিতে ব্রাউন অগ্রসর হইতেছিলেন। একটী জঙ্গমা উদ্যানলতার অভাবে সে সৌন্দর্য্য তাহার চক্ষে যেন যেন অসম্পূর্ণ বোধ হইতেছিল। চলিতে চলিতে তিনি সুবর্ণরেখার তীরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বামে কিছুদূরে রতনের কুটীর। আরও কিছুদূরে বীরচন্দ্রের প্রাসাদ। দক্ষিণভাগে সুবর্ণরেখা বক্রগতিতে অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

প্রাসাদটী দেখিতে ব্রাউনের ইচ্ছা হইল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তিনি বুঝিলেন, সেদিকে প্রাসাদ প্রবেশের দ্বার নাই। কোন দিকে যে দ্বার তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন না। প্রাসাদ প্রাচীর সুবর্ণরেখার জলস্পর্শ করিয়াছিল। ব্রাউন দেখিলেন, একটী হরিণ জলের উপর হাঁটিয়া প্রাচীরের অপর দিক হইতে এদিকে আসিল। তিনি বুঝিলেন, নদীতে অতি অল্প জল। প্রাচীর প্রান্তদিয়া জলের উপর হাঁটিয়াই পার হওয়া যায়।

পার হওয়াই তিনি যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। প্রাচীরে হাত রাখিয়া ধীরে ধীরে তীর হইতে অবরোহণ করিতে লাগিলেন। হরিণটা তাঁহাকে দেখিয়া আবার একলাফে প্রাচীর পারে অদৃশ্য হইল।

ব্রাউন জলে নামিলেন। হাঁটু পর্য্যন্ত জল হইল। এইখানে প্রাচীরের শেষ। তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সে স্থানটী বীর চন্দ্রের অন্তঃপুরসংলগ্ন ঘাট। একটী অনতিবৃহৎ দ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া শ্বেতপ্রস্তর সোপানাবলী নদীজলে প্রবৃষ্ট হইয়াছে। অন্তপুর-চারিণীরা সেই ঘাটে স্নানাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। পুরুষমাত্রেরই সে স্থানে প্রবেশাধিকার ছিল না। ব্রাউন এদেশের আচার ব্যবহারে সম্পূর্ণ অপরিচিত; তথাপি তিনি বুঝিতে পারিলেন, যে এখানে আসা তাঁহার অনধিকার প্রবেশ হইয়াছে।

দ্বার বন্ধ ছিল। সেখানে জনপ্রাণীর অস্তিত্ব-চিহ্ন ছিল না। পুরী নিস্তব্ধ। কেহ দেখিবার পূর্ব্বেই তিনি স্থান পরিত্যাগ করিবেন স্থির করিলেন। ফিরিবার পূর্ব্বে, সেই স্থান হইতেই তিনি একবার চারি-দিকে দেখিয়া লইলেন; বুঝিলেন, স্থানটী পূর্ব্বে অতি মনোরম ছিল; এখন যত্নের অভাবে তাহার পূর্ব্বশ্রী ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছে।

ব্রাউন ফিরিতেছেন, এমন সময়ে, দ্বারের কবাটে শব্দ হইল। তিনি বুঝিলেন, ভিতর হইতে কে দ্বার খুলিতেছে। মুহূর্ত্তমধ্যে তিনি প্রাচীর-পারে পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেন।

নারায়ণী দ্বার খুলিতেছিল। সে সমস্ত দিন তাহার প্রিয় হরিণটীর সংবাদ লইতে পারে নাই। বালিকা সমস্ত দিনটা অতি মনোকষ্টেই যাপন করিয়াছিল। দাদার অপমান দর্শনে, অবশেষে তাঁহার বিচ্ছেদে সে মর্ম্মাহত হইয়াছিল। সমস্তদিন সে ব্রাহ্মণের বিষয়ই ভাবিয়াছিল। হরিণের চিন্তা করিবার অবকাশ পায় নাই। রাজা ও রাণী তাহারই মতন মর্ম্ম-পীড়ায় দিন যাপন করিয়াছেন। হরিণের কথা কাহারও মনে ছিল না।

এখন মনে পড়িয়াছে, তাই নারায়ণী খাদ্য লইয়া হরিণটীকে খুঁজিতে আসিয়াছে। বাহিরে আসিয়া নারায়ণী ডাকিল, "শারী"।

"শারী" কোথায় ছিল, ছুটিয়া আসিল। এক বৎসর পূর্ব্বে শারীর সহিত পাঠকের সাক্ষাৎ হইয়াছে। এই এক বৎসরে, সে অনেকটা বড় হইয়াছে। সমস্ত দিবসের পর নারায়ণীকে দেখিয়া "শারীর" আনন্দ উথলিয়া উঠিয়াছে। সে নারায়ণীর সম্মুখে আসিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। নারায়ণী দুই হাতে পাত্রটী ধরিয়া তাহার মুখের কাছে তুলিয়া রহিল। "শারী" আহারে নিযুক্ত হইলে, তাহার সঙ্গে কথা আরম্ভ করিল। সুখ দুঃখের কথা শুনিতে "শারী" এখন বালিকার এক মাত্র সঙ্গী।

"শারী" কথা ব্রাউনের কাণে গেল। কি বীণার কোমল ঝঙ্কার! সমীরণে মাখামাখি হইয়া সে মধুময় কণ্ঠস্বর অপর পারের নদীসৈকতে যেন খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ব্রাউন প্রাচীর পার্শ্বে জলের উপর দাঁড়াইয়া। ফিরিতেও পারেন না, অগ্রসর হইয়া দেখিতেও পারেন না! পিছাইতে শক্তি নাই, অগ্রসর হইয়া দেখিতেও সাহস নাই। চুরি করিয়া দেখা অসভ্যতা। ব্রাউন বড়ই বিপন্ন হইলেন। কেহ দেখিলে, লজ্জার কথা। ফিরিয়া আসাই কর্ত্তব্য বোধ করিয়া, তিনি উপরে উঠিতে লাগিলেন।

আবার কণ্ঠস্বর! এবারে সুধার স্রোত ছুটিল। যুবক তাহাতে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান ভাসিয়া গেল। সুধার প্রস্রবিণী-টীকে দেখিতে তাঁহার বড়ই ইচ্ছা হইল। তিনি ভাবিলেন, চুরি করিয়া দেখিয়া, চলিয়া যাই।

অতি ধীরে ব্রাউন্ জলে পদবিক্ষেপ করিলেন পাছে জলের শব্দে কথার স্রোত রুদ্ধ হয়।

নারায়ণী "শারীর" সঙ্গে কত কথাই কহিতেছিল। "দাদা আমা

হইতেও তোমাকে অনেক ভাল বাসিত, অধিক যত্ন করিত, আমাকে মাঝে মাঝে তিরস্কার করিত, কিন্তু তোমাকে করিত না। শারী! সেই দাদা চলিয়া গিয়াছে,—উভয়কেই ভুলিতে চলিয়াছে, আর বুঝি আসিবে না, গাছের ডাল নোয়াইয়া, আর তোমাকে আম্রের মুকুল খাওয়াইবে না”—এইরূপ নানা দুঃখের কথা সঙ্গটীকে শুনাইতেছিল। “শারী” একবার করিয়া নারায়ণীর মুখপানে চাহিতেছিল। ধীরে ধীরে মুখ বাড়াইয়া ব্রাউন এই ছবিটি দেখিতে পাইলেন।

বালিকার ঈষন্নমিত অঙ্গযষ্টি—দুই হাতে ধরা থালা—সম্মুখে মুখ তুলিয়া, চোখের পানে চাহিয়া, চোখে চোখে সাদৃশ্য খুঁজিতে অবস্থিত হরিণ!—চারিদিক বেড়িয়া নিম্নে, উপরে, অস্তগামী সূর্য্যকিরণে অরুণিম দিগ্‌বলয়,—সুন্দর ছবি! নবযৌবনশ্রী—সুবর্ণময়ী প্রকৃতির উপহার, চারিদিক হইতে ভারে ভাবে আসিয়া, বালিকার দেহযষ্টি নোয়াইয়া দিয়াছে।

এক দৃষ্টে ব্রাউন নারায়ণীর মুখ দেখিতে লাগিলেন! হরিণের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে বালিকার মধুময় কণ্ঠস্বর, হৃদয়গত আবেগরাশির সঙ্গে সঙ্গে পরদায় পরদায় উঠিতেছিল।

ব্রাউন এরূপ মূর্ত্তিও কখন দেখেন নাই, এরূপ স্বরও কখন শুনেন নাই। তিনি এদেশের ভাষা জানিতেন না, সুতরাং নারায়ণীর কথার এক বর্ণও বুঝিতে পারিতেছিলেন না। বুঝিতে পারিতেছিলেন না বলিয়া, সে স্বর তাঁহার পক্ষে বড়ই মধুর লাগিতেছিল—স্বর্গচ্যুতা কল্পনাময়ী দেবগীতির ন্যায় তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল।

স্বদেশে, “হ্রদপ্রদেশের” সুনীল-জল শৈল-সরোবরের তীরে বসিয়া কতদিন তিনি বাসন্তী সন্ধ্যার অভ্যুদয় দেখিয়াছেন। অরুণিম গগনের যবনিকান্তরাল হইতে, প্রহেলিকাময়ী 'চাতকীর অজস্র বর্ষিত স্বরসুধার, কতদিন নিজের হৃদয়সিক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এমন সন্ধ্যাও কখন দেখেন নাই, এমন তৃপ্তিও কখন পান নাই।

সূর্য্য, অস্ত যাইবার পূর্ব্বে, নারায়ণীর মুখে একবার কিরণ মাখাইয়া দিল। সোনার কমল সহস্র গুণ শোভা ধারণ করিল। আত্মহারা যুবক বলিয়া উঠিল—"আহা! কি দেখিলাম!"

ব্রাউন সম্ভ্রান্ত ইংরাজের উত্তরাধিকারী—রূপবান, গুণবান যুবক। এরূপ পাত্রে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিলে, বিলাতের বহু সুন্দরী আপনাদিগকে ভাগ্যবতী বিবেচনা করিতেন। বিলাতে, ব্রাউনের বহু সুন্দরীর দর্শন লাভ ঘটিয়াছিল। স্বদেশে, তিনি অনেক বরাঙ্গনাকে সন্ধ্যারুণে সুন্দর মুখশ্রী রঞ্জিত করিতে দেখিয়াছেন; কিন্তু কষিত কাঞ্চন-গৌরী অরুণ কিরণে প্রতিফলিত হইলে কিরূপ দেখায়, তাহা তিনি স্বপ্নেও কখন অনুভব করেন নাই। নারায়ণীর সৌন্দর্য্য, ও চিত্র-লিখিতবং অবস্থানভেদ ব্রাউনের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত করিয়াছিল। মুগ্ধ যুবক বলিয়া উঠিল, "আহা কি দেখিলাম!"

একটা কিম্ভূত দুর্ব্বোধ্য স্বর শুনিয়া নারায়ণী চমকিয়া উঠিল। প্রাচীরের দিকে মুখ ফিরাইয়া, যেমনি ব্রাউনকে দেখিল, অমনি বালিকা সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। হাত হইতে থালা পড়িয়া গেল। পলাইবার জন্য যেমন ঘরের দিকে ছুটিবে, অমনি দ্বারের চৌকাঠে মাথা ঠেকিয়া 'মা' বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। "ভয় নাই, ভয় নাই" বলিয়া, কারণ নির্দ্ধারণের জন্য, অন্তঃপুর হইতে রাণী ছুটিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, প্রাণপ্রতিমা নারায়ণী, বিলুপ্তসংজ্ঞায় ভূলুণ্ঠিতা। রাণী কাঁদিয়া ফেলিলেন। নাতিনীকে বুকে তুলিয়া ডাকিলেন, "মা আমার!" উত্তর পাইলেন না। তখন কোলে তুলিয়া, রাজাকে ডাকিতে ডাকিতে গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

হতবুদ্ধি ব্রাউন, চোরের ন্যায়, সেস্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। বালিকার কি ঘটিল—বাঁচিল কি মরিল, জানিতে তাঁহার সাহসে কুলাইল না।

নারায়ণীর চীৎকার শুনিয়া, রাজাও ছুটিয়া আসিতেছিলেন। আসিতে আসিতে উপর হইতে তিনি দেখিলেন, একজন সাহেব সুবর্ণরেখার তীর ধরিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। ইতিমধ্যে রাণী নারায়ণীকে কোলে লইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। নারায়ণী তখনও মূর্চ্ছিতা। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"হইল কি!" রাণী নারায়ণীর মূর্চ্ছার কথা মাত্র জ্ঞাপন করিলেন। কারণ জানেন না, সাহেবকে তিনি দেখেন নাই, কাজেই আর কিছুই বলিতে পারিলেন না।

পলায়নপর সাহেবকে দেখিয়া, রাজা বুঝিতে পারিয়াছেন, নারায়ণীর মূর্চ্ছার কারণ কি। তিনি ভাবিলেন, একি অত্যাচার! আর কোন্ কাপুরুষইবা এ অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতে পারে? প্রভাতে ব্রাহ্মণের অপমানে তিনি আপনাকেই অপমানিত বোধ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের অঙ্গে প্রহারযাতনা তাঁহার শরীরে বিষের জ্বালা উৎপন্ন করিয়াছিল। এখন আবার একি! তাঁহারই পৌত্রীর উপর অত্যাচারের উদ্যোগ! বৃদ্ধ রাজার অবসাদময় নিষ্ক্রিয় ধমনীতে উষ্ণ রক্তের স্রোত ছুটিল। একবার ভাবিলেন, ছুটিয়া গিয়া এই মুহূর্ত্তেই এই বিষম অপমানের শোধ লই। কিন্তু ব্রাউন তখন বহুদূরে, দেখিতে দেখিতে দৃষ্টিপথের অন্তরালে। রুদ্ধবীর্য্য সর্পের ন্যায়, তিনি অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

পিতামহীর কোলে থাকিতেই নারায়ণীর সংজ্ঞা ফিরিল। রাণী তাহাকে ভয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; রাজা নিষেধ করিলেন, বলিলেন, কারণ আমার কাছে শুনিও; বালিকাকে প্রশ্নে পীড়িত করিও না—গৃহে লইয়া সুশ্রুষা কর। আর সতর্ক থাকিও, নারায়ণীকে কখন একা গৃহের বাহিরে আসিতে দিওনা।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সমস্ত রাত্রি ব্রাউনের নিদ্রা হইল না। নীচ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া, তিনি যে কার্য্য করিয়াছেন, মনকে অশেষ প্রবোধ দিয়াও, তিনি

সে কার্য্যের সমর্থন করিতে পারিলেন না। অনুতাপে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। বালিকার কোনও অনিষ্ট ঘটিল কিনা জানিবার উপায় নাই। দেশীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ তিনি কাহাকে কি বলিবেন! কেমন করিয়া নিজের নির্দ্দোষতা প্রতিপন্ন করিবেন! কেই বা তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিবে! সহচরের কাছে মনোভাব প্রকাশ করিতে তাঁহার সাহস হইল না। প্রকাশে কোনও ফল নাই, পরন্তু নিরপরাধ হইয়াও, অপরাধী হার্‌লির কাছে তাঁহাকে মাথা হেঁট করিয়া থাকিতে হইবে। অনুতাপ-দগ্ধ যুবক সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় যাপন করিলেন।

প্রভাতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া, পদব্রজেই ব্রাউন রাঁচি প্রস্থান করিলেন। স্থির করিলেন, "দেশীয় ভাষায় অভিজ্ঞ হইয়া, আর একবার আমি অনন্তপুরে ফিরিব। বালিকার হৃদয়ে পিশাচ মূর্ত্তির ছবি রাখিয়া জীবন ধারণ করিব না।"

হার্‌লিও বিশেষ কোন কাজ করিতে পারেন নাই। আনন্দদেব আসিয়া তাঁহাকে বুঝাইল, রাজ কুমারীর জন্য অতিরিক্ত ব্যয় কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষ। সাহেব যদি আদেশ দিতে পারেন, তাহা হইলে দেওয়ানও রাজকুমারীর জন্য যত ইচ্ছা দাসী নিযুক্ত করিতে পারে। হার্‌লি সে আদেশ দিতে সাহসী হইলেন না। স্থির করিলেন, "ডেপুটী কমিসনারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, আদেশ দিব।"

আহারের সময় উভয় বন্ধুতে একত্রিত হইলেন। নিজ নিজ মনোভাব পরস্পরের কাছে গোপন করিয়া কথাবার্ত্তা কহিলেন।

প্রভাতে উঠিয়া হার্‌লি সহচরকে দেখিতে পাইলেন না। ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কিছু বলিতে পারিল না। ভাবিলেন, ব্রাউন বেড়াইতে গিয়াছেন; অনন্তপুরের মধ্যেই কোথাও আছেন। প্রাতরাশের সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও যখন দেখিলেন ব্রাউন আসিলেন না, তখন তাঁহার মনে সন্দেহ হইল, হয়ত তাঁহার

উপর ব্রাউনের ঘৃণা এখনও দূর হয় নাই। তথাপি তিনি ব্রাউনের সন্ধানে লোক নিযুক্ত করিলেন। মুকুন্দ আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন; সে বলিতে পারিল না। লোক সকল ফিরিয়া আসিল; তাহারা সাহেবকে দেখিতে পাইল না। একজন কেবল ব্রাউনের রাঁচিগমনের সংবাদ দিল। কতকগুলা কোল মজুরা করিতে অনন্তপুরে আসিতেছিল, তাহারা সাহেবকে রাঁচির পথে দেখিয়াছে।

তথাপি হার্লি ব্রাউনের অপেক্ষায় সেদিনের মত অনন্তপুরে থাকিবেন স্থির করিলেন। বিকালে রাঁচি হইতে এক পত্র আসিল। ডেপুটী কমিসনর তাঁহাকে অচিরে রাঁচি ফিরিতে আদেশ করিয়াছেন।

পত্র পাঠে হার্লি বিস্মিত হইলেন। তাঁহার এত শীঘ্র রাঁচি ফিরিবার প্রয়োজন ছিল না। অনিচ্ছায় তাঁহাকে অনন্তপুর ত্যাগ করিতে হইল। ত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে আনন্দদেব তাঁহাকে বিদায় দিতে আসিলেন। অশুভশঙ্কী মন লইয়া, হার্লি দেওয়ানের কাছে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

কাশীপুর পৌঁছিতে রতনের দুই দিন লাগিল। গ্রামের বহিস্থ প্রান্তরে যখন ব্রাহ্মণ পা দিলেন, তখন সূর্য্য প্রান্তর সীমায় ঢলিয়া পড়িয়াছে। গ্রামে উপস্থিত হইতে সন্ধ্যা হইল।

কাশীপুরে একজন সমৃদ্ধিশালী জমীদারের বাস। এবং তাঁহাকেই উপলক্ষ করিয়া বহুলোক এই স্থানে অবস্থিতি করে। অনেকেই সঙ্গতিসম্পন্ন। কেহ রাজার আত্মীয়, কেহবা কর্ম্মচারী। সুন্দর সুন্দর অট্টালিকায় রাজবাড়ী, কাছারীবাড়ী, দেবালয় প্রভৃতিতে সুসজ্জিত এই ক্ষুদ্র গ্রাম, দূর হইতে একখানি ছবির ন্যায় দেখাইত।

কাশীপুরের শোভা দেখিতে দেখিতে ব্রাহ্মণ গ্রামে উপস্থিত হইলেন।

সদাশিবের শ্বশুরের নাম শৈলজানন্দ সিংহ। পত্রের পৃষ্ঠে ওই নামই লেখা ছিল। তবে অতবড় নামটা সর্ব্বদা মুখে আনা সুবিধা হয়না বলিয়া, লোকে নামটাকে খাটো করিয়া 'শলুই' করিয়া লইয়াছিল। ক্রমে 'শলুই' আখ্যাটাই প্রাধান্য লাভ করিল। এমন কি, দুই চারি জন আত্মীয় ও ভদ্রলোক ছাড়া অনেকেই ভাল নামটা ভুলিয়া গিয়াছিল। গ্রামের মধ্যে পশার প্রতিপত্তি থাকিলেও, শৈলজানন্দ বলিলে অনেকেই তাঁহাকে চিনিতে পারিত না।

রতন একজন আগন্তুককে শৈলজানন্দের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল—"শৈলজানন্দ বলিয়া কেহ সে গ্রামে নাই।" রতন মনে করিলেন, লোকটা গ্রামবাসী হইলেও গ্রামের সকলকে চিনে না। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করাতে, সে বলিল, "শৈলজানন্দ বলিয়া রাজার একটা হাতী ছিল; তা সেটা বছর খানেক হইল মরিয়া গিয়াছে।"

এইরূপ, ব্রাহ্মণ যাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, সেই ব্যক্তিই একটা উদ্ভট রকমের উত্তর দেয়। কেহ বলে, "শৈলজানন্দ রাজার পূর্ব্ব পুরুষ। তিনি শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের অঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন।" কেহ বলে, "সে একজন বড় গোছের জোয়ারী। এক দিন রাজার সঙ্গে প্রেমারা খেলিতে খেলিতে লাখো টাকা জিতিয়া লয়। রাজা তাঁহাকে খেলা হইতে নিবৃত্ত হইতে বলেন। লোকটা কিন্তু লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, আরও খেলিতে লাগিল। শেষে এক ডাকে সমস্ত টাকা হারিয়া গেল। রাজার হাতে ছিল "মাছ," আর তার হাতে ছিল "কাতুর"। লোকটা কাতুর কাতুর করিয়া দম ফাটিয়া মরিয়া গেল। এখন আর শৈলজানন্দ নাই—তাহার ভূত আছে। সে এখনও রাজবাড়ীর কানাচে রাত্রিকালে কাতুর কাতুর বলিয়া চীৎকার করে।" এইরূপ নানা কথা শুনিতে শুনিতে রতন অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

তিনি বিস্মিত হইলেন, ভাবিলেন, "সদাশিব কি শ্বশুরের নাম লিখিতে ভুলিয়া গেল।"

পথের ধারে একটী সুন্দর সরোবর দৃষ্ট হইল। রতন মনে করিলেন, শৈলজানন্দের সংবাদ লইতে আর বৃথা রাত্রি কেন? এই বেলা সময় থাকিতে থাকিতে রাজার দেবালয়ে অতিথি হই। সমস্ত দিন পথে আহার করিবার সুবিধা পান নাই। পূর্ব্ব দিন সামান্য আহার জুটিয়াছিল মাত্র। ব্রাহ্মণের হাঁটু পর্য্যন্ত ধূলা। পদ ধৌত করিতে তিনি সরোবরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

সেখানে, সরোবর সোপানে একটী যুবতী একটী বালককে প্রহার করিতে নিযুক্ত ছিল। বালক দৃঢ়রূপে রমণীর অঞ্চল ধরিয়াছিল। রমণী তাহার হস্ত হইতে অঞ্চল চ্যুত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল। বালকও অঞ্চল ছাড়ে না, রমণীরও প্রহার কার্য্যের বিরাম নাই।

ঘাটে নামিতে নামিতে রতন তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া বুঝিলেন, উভয়েই বিপন্ন। বালক নিজের জেদ কিছুতেই ছাড়িবে না, রমণীরও প্রহার ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

বিপন্ন বুঝিয়া তিনি তাহাদের কাছে চলিলেন। নিকটে গিয়া দেখেন, যুবতীটী যেমন সুন্দরী, বালকটীও তেমনি সুন্দর। রমণীর বয়স অনুমান পঞ্চবিংশতি, বালকের বয়স দশ। বালক কর্তৃক আকৃষ্ট বসন, অঙ্গ হইতে অর্দ্ধ বিচ্ছিন্ন চেলাঞ্চল, আলু থালু কেশ পাশ, আলু থালু বেশ—পূর্ণ যৌবন-লাবণ্যে ঢলঢল সুন্দরী, সম্মুখে ক্রোধরাগরঞ্জিত মুখ-খানি লইয়া চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া গড়া পুতুল—অপূর্ব্ব জেদী দুরন্ত বালক! যেন পূর্ণ প্রস্ফুটিত কমলের পার্শ্বে নবাবতার কমল-কোরক মুখামুখি দাঁড়াইয়া যে যার রূপ কাড়াকাড়ি করিতেছে।

নীরবে প্রহার কার্য্য চলিতেছিল। সরোবরের পার্শ্ব দিয়া কত লোক যাতায়াত করিল, কেহ দেখিল না। রতন তাহাদের সমীপস্থ

হইলেও, তাহারা ফিরিয়া চাহিল না। রমণী বালকের পৃষ্ঠে যেমন চাপড় মারিতেছিল তেমনই মারিতে লাগিল; বালক যেমন কাপড় ধরিয়া টানিতেছিল, তেমনই টানিতে লাগিল।

রতন আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। যুবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"কর কি মা! বালক যে মারা যায়!" অপরিচিত পুরুষকে সমীপস্থ দেখিয়া, রমণী অঙ্গ ঢাকিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু বালক কিছুতেই তাহা করিতে দিল না। রতন তখন বুঝিলেন যে, রমণীই অধিকতর বিপন্না। তিনি আর সময়ক্ষেপ না করিয়া বালকের হাত ধরিলেন, অতি কষ্টে কাপড় হইতে হাত ছাড়াইলেন। বালক কাপড় ছাড়িয়া, রতনকে ধরিল। হাত ছুঁড়িয়া, পা ছুঁড়িয়া, ক্ষুদ্র মুষ্টিদ্বারা অবিরত প্রহার করিয়া রতনকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল; নখাঘাতে জর্জরিত করিল। বালকের অত্যাচারে রতন বড়ই আনন্দ অনুভব করিলেন। নারায়ণীর পরে, আর কেহ তাঁহাকে এরূপ মধুময় অত্যাচারে উৎপীড়িত করে নাই। বৃদ্ধের লাঞ্ছনা দেখিয়া রমণী কিন্তু লজ্জিতা হইল। সর্ব্বগাত্র সাবধানে আবৃত করিয়া আঁচলে কোমর বাঁধিয়া, আগে সে আপনাকে বালকের সহিত যুঝিবার উপযোগী করিয়া লইল। তারপর বালককে পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিল। বলিল—"এ দুষ্ট বালক আপনি রাখিতে পারিবেন না, আমাকে দিন।"

রতন বলিলেন—"আমি ইহাকে আয়ত্তে আনিয়াছি। কোথায় যাইতে হইবে বল, কোলে লইয়া যাই।"

বস্তুতঃ, বালক তখনও পর্য্যন্ত আয়ত্তে আসে নাই। রতন ইচ্ছা পূর্ব্বক তাহাকে আয়ত্তে আসিতে দেন নাই। বালককে তাঁহার বক্ষে, স্কন্ধে, মস্তকে যথেচ্ছা প্রহার করিতে অনুমতি দিয়াছেন। এই অল্পমাত্র সময়ের মধ্যে তাঁহার উষ্ণীশটী মৃত্তিকা আশ্রয় করিয়াছে, মাথার দুই চারি গুচ্ছ পক্ক কেশ স্থানচ্যুত হইয়াছে।

যুবতী ব্রাহ্মণের কথার প্রতিবাদ করিল না। বৃদ্ধের উষ্ণীশটী ধূলায় মাথামাখি হইতে ছিল, সেইটী তুলিয়া তাঁহার হাতে দিতে গেল। উষ্ণীশ তুলিতে দেখিতে পাইল, সেই সঙ্গে একখানি পত্রও পড়িয়া রহিয়াছে। উষ্ণীশের সঙ্গে পত্রখানি ব্রাহ্মণের হাতে দিতে গিয়া, সে দেখিতে পাইল, পত্র শিরে "শৈলজ্ঞানন্দ সিং" নাম লেখা।

যুবতী বৃদ্ধের মুখ পানে চাহিল। ব্রাহ্মণ তখনও বালকের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। অবসর পাইয়া,সে শিরোনামটা ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। চারিদিক হইতে অন্ধকার মেদিনীকে আবৃত করিতে আসিতেছিল; তাহার কিছু অংশ পত্রশিরে পতিত হইল, এবং রমণীর পিপাসিত দৃষ্টিকে অতৃপ্ত রাখিয়া, অক্ষরগুলির সমীপ হইতে ধীরে ধীরে সরাইয়া দিল। ব্রাহ্মণ উষ্ণীশের সঙ্গে পত্রখানি গ্রহণ করিতে গিয়া বুঝিলেন, রমণীর হস্ত ঈষৎ কম্পিত হইতেছে।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তোমার মতন রসজ্ঞ হইলে স্থির করিতেন, অক্ষর কয়টীর গায়ে একটু সোমরস মাখান ছিল। দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হইয়া, যুবতীর মনে একটু মাদকতার সঞ্চার করিয়াছিল। হৃদয়তরঙ্গের একটু অংশ বাহুবল্লীতে ভর করিয়া পত্রপুষ্পখানিকে ঈষৎ ঈষৎ আন্দোলিত করিয়াছিল। রসহীন ব্রাহ্মণ স্থির করিল, ওটা অতি পরিশ্রমের ফল, বালকের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরিশ্রান্তা রমণীর হাতখানি প্রহারপ্রযত্নে অবসন্ন হইয়াছে।

পত্রখানি পুনর্গ্রহণ করিয়া রতন যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"শৈলজ্ঞানন্দকে জান ?"

"জানি।"

"বাঁচাইলে। তাহার অনুসন্ধান করিয়া আমি হতাশ হইয়াছি।"

"আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন ?"

"বহুদূর হইতে। দুই দিন ধরিয়া পথ চলিতেছি।"

"আমার সঙ্গে আসুন।"

রমণী, শৈলজানন্দের ঘর দেখাইতে ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া চলিল। প্রহারে প্রতিপ্রহার না পাইয়া, বৃদ্ধকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অনভিজ্ঞ জ্ঞানে, বালক দয়া করিয়া রণে ক্ষান্ত দিল। এবং অনন্যোপায় হইয়া ব্রাহ্মণের কাঁধে মাথা রাখিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করিল।

[ক্রমশঃ।]

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ।

শাসনকর্ত্তারা বলিতেছেন, যে বঙ্গদেশটি দ্বিখণ্ডিত করিয়া শাসন করিতে পারিলে তাঁহাদের সুবিধা হয়। কিন্তু প্রজা সাধারণ সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতেছে, এমন কার্য্য করিও না; আমাদের বড় অসুবিধা হইবে। প্রজার সমবেত প্রার্থনা যদি যুক্তি সঙ্গতও না হয়, তাহা হইলেও স্বাধীনদেশে উহা উপেক্ষিত হইতে পারে না। শাসনকর্ত্তাদের সুবিধা অসুবিধা লইয়াই এখানকার সকল বিধি-ব্যবস্থা; তবে, প্রজার রোদনে যদি তাঁহাদের হৃদয় কদাচিৎ আর্দ্র হয়, তাহা হইলে কথঞ্চিৎ পরিমাণে ঐ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন প্রত্যাশা করা যায়। গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ করিয়া লোক সাধারণের অভিমতি জানিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই, লোকে কথা কহিতেছে; অভিপ্রেত ব্যবস্থার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন বলিয়াই, তাহার সমালোচনা হইতেছে। যদি সহসা এই ব্যবস্থাটি হুকুম বলিয়া জারি হইত, আমরা তাহা হইলে চিরদিন নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াই সকল অসুবিধা মাথা পাতিয়া লইতাম।

যে যুক্তির সংযোজনী শক্তিতে, প্রাচীন ত্রিকলিঙ্গ এক সঙ্গে গ্রথিত হইবে বলিয়া শুনিতেছি, সেই যুক্তিরই ক্ষুরধারে বঙ্গদেশের অঙ্গ ছিন্ন হইতে বসিয়াছে। লীলাময়ের হাতের যন্ত্র, কখনও বাঁশী হয়, কখনও অসি হয়। দেশের যে অংশের নামে সমগ্র বঙ্গদেশ, বঙ্গ নামে আখ্যাত হইয়াছে, তাহা বঙ্গের অঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে। কিন্তু এটা প্রাচীন ইতিহাসের কথা; এটা ভাবপ্রধানতার কথা; যুক্তিবাদীর দরবারে উহা অগ্রাহ্য।

একটি প্রাদেশিক শাসনের অধীনে ছিল বলিয়াই, পূর্ব্ব পশ্চিমের বিরোধ বিদ্বেষ তিরোহিত হইত; চাকুরী ওকালতি ও ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য সকল জেলার লোকই বিভিন্ন জেলায় বাস করিয়া, বিশেষ ভাবে সামাজিকতা এবং বন্ধুতায় বদ্ধ হইতেছিল; এবং পরস্পরের সংঘর্ষণে দূর প্রাদেশিকতা দূরীভূত হইয়া, সাহিত্য এবং কথাবার্ত্তার ভাষা, একটি আদর্শে গঠিত হইতেছিল। শাসন বিভিন্ন হইলে, হুগলি জেলায় আর বিক্রমপুরের ডিপুটির দর্শন পাওয়া যাইবে কি? আসামের কজন লোক, বঙ্গদেশে চাকুরী করিতে আসে? তবুও এখনও আসাম সম্পূর্ণরূপে বঙ্গদেশের বহির্ভূত নহে। কলিকাতার সভা সমিতি, সমাজ সামাজিকতা, তুল্যভাবে পূর্ব্ব পশ্চিমের লোক লইয়া চলিতেছে। এ মিলন ও এ বাঁধন, একেবারে টুটিয়া না গেলেও, যে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে শ্লথ হইয়া পড়িবে, তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? তবুও কিন্তু ক্ষমতাশীল শাসনকর্ত্তা বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিবেন, যে আমাদের সকল চীৎকারই ভাবপ্রধানতার ফল। প্রভো! যাহা করিতে হয় কর, কিন্তু কাটা ঘায়ে আর নুণ ছিটাইয়া দিও না।

বেহার চাই, হাজারিবাগ চাই, উড়িষ্যা চাই; নহিলে ব্যক্তি বিশেষের স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না। কিন্তু এক জনের পৌষ মাসের জন্য কি সকলের সর্ব্বনাশ হইবে? হইবে নাত কি? 'সকলে' বলিতে

যে কৃষ্ণকায় অসভ্য বর্ব্বর বুঝায়, ঐ একজন কি তাহাদের সমবেত সংখ্যার উপর একলক্ষ অধিক নহেন? তবে হউক; উড়িষ্যা লইয়া বাঙ্গালাদেশ গঠিত হউক; এবং বঙ্গ, আণ্ডামানে দ্বীপান্তরিত হউক। যে শ্বেতাঙ্গ কমিশনার, সরকার বাহাদুরের বিরাগভাজন হইবেন, অথচ যাঁহাকে উন্নীত না করিলেও নীচের কোন প্রিয় পাত্রকে উন্নীত করা যায় না, তাহাকে জলাভূমির মেলেরিয়া নাশ করিবার জন্য পূর্ব্বাঞ্চলের শাসন কর্ত্তা করা চলিবে। এদেশে দিন দিন নেটিভ সিবিলিয়ানের দল বাড়িয়া উঠিতেছে; সে গুলিকেও দু চারিজন এলেন ডিলনের তত্ত্বাবধানে ঐ প্রদেশে সুরক্ষিত করা চলিবে। সকল-দিকেই সুবিধা হইবে; এখন প্রজার ক্রন্দন শোনে কে?

সহস্র সহস্র সভাসমিতি হইতে অগণ্য আবেদন পত্র প্রেরিত হইতেছে; এবং সেগুলি গবর্ণমেণ্টের সিংহাসনতলে ধূলিধুসরিত হইতেছে। ঐ সকল আবেদনে যখন যুক্তি তর্কের কথা প্রচুর পরিমাণে আছে, তখন আর সে সকল কথা লিখিবার কোন প্রয়োজন নাই। যুক্তি তর্কের আদৌ কোন প্রয়োজন নাই; কেন না উহা হইতেই অধিক অমঙ্গল উপস্থিত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট বড় অভিমানী। কেহ যদি তাঁহার যুক্তিগুলির ছিদ্র দেখাইয়া দেয়, তিনি রাগ করিয়া বর্ব্বরের যুক্তি পায়ে ঠেলিয়া, গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার ব্যবস্থা করেন। আমরা বলিলাম, যে ঢাকা ময়মনসিংহ বিচ্ছিন্ন করা চলে না; গবর্ণমেণ্ট অমনি ক্ষমতা ব্যঞ্জক হাসি হাসিয়া বলিলেন, যে বাকরগঞ্জ ফরিদপুর প্রভৃতিকেও কালাপানিতে পাঠাইব। এরূপ স্থলে কেবল যুক্ত করে বিনীতস্বরে বলিতে পারি, 'হে প্রভু তোমার রুদ্রমূর্ত্তি সংহার কর।'

গবর্ণমেণ্টের অদ্ভুত প্রস্তাবটি যে দিন প্রথম পড়িয়াছিলাম, তখন আমাদের মূর্খতার জন্য, উহা নিতান্ত অসম্ভব কথা বলিয়া মনে হইয়াছিল। পড়িয়াই ভাবিয়াছিলাম, যে ঢাকা ও ময়মনসিংহ আসামে

যাইবে বলিয়া গোল তুলিয়া দিলে, চট্টগ্রামাদির কথা চাপা পড়িবে; এবং গবর্ণমেণ্টও তখন কেবল চট্টগ্রামটি লইয়া আসাম ভুক্ত করিয়া দিবেন। এখন দেখিতেছি, যে গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে আমাদের যে গুরুতর সম্বন্ধ, তাহাতে পরিহাসটা চলে না; গবর্ণমেণ্টও করেন নাই। এখন উপায় কি?

এদেশের লোকদের মধ্যে যাহাতে রাজনৈতিক আন্দোলন করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি না পায়, তাহাই নাকি গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বাঞ্ছনীয়। যদি তাহাই হয়, তবে একটা প্রস্তাব তুলিয়া গ্রামে গ্রামে নিরক্ষর কৃষক-দিগকেও সমবেত আন্দোলন করিতে শিখান, ভাল হইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট যে প্রকার প্রত্নতত্ত্বপটু এবং নূতন ব্যবস্থা-কুশল, তাহাতে এ দিকেও একটু দৃষ্টি থাকিলে ভাল হইত। এই যে দেশব্যাপী আন্দোলন, ইহাতে কি গবর্ণমেণ্ট বুঝিতে পারিতেছেন না, যে এই দুর্ব্বল ও ভীরু জাতির রোদনের অন্তরালে অভিসম্পাত আছে? স্বীকার করি, যে অভিসম্পাতে বিশ্বাস করা কুসংস্কার। প্রতিদিনের টেলিগ্রামগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, স্বতঃই যেন মনে হয়, যে বৃথাই গবর্ণমেণ্ট প্রজাকুলের কাছে বিশ্বাস শ্রদ্ধা ও ভক্তি হারাইতেছেন। রাজভক্ত জাতির অন্তঃকরণ হইতে শ্রদ্ধা ভক্তি তাড়াইয়া দেওয়া ভাল, না একটু ক্লেশকর হইলেও, বিস্তৃত রাজ্যশাসন করা ভাল?

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বসন্ত।

আসিবা মাত্র ফাল্গুন চৈত্র
এস তুমি ; কভু না দেখি ভ্রম।
এবং সঙ্গে আনগো রঙ্গে
বিরহী জনার যতটা যম।

যথা :—

আমের মুকুল, এবং বকুল,
ভাল ফুল আরো পাঁচ রকম,
অলিগুঞ্জন, কোকিল কূজন
আর পায়রার বক্‌বকম্ ;
মৃদু সমীরণ, চাঁদের কিরণ,
গগনে মাখানো সুনীল রং ;
অপিচ নব্য কবির কাব্য
হা হুতাশ লাগা বেতর ঢং।

আমরা যা হোক্ বুড়সুড় লোক,
ওগুলো সহিতে পারি বরং ;
কিন্তু মেলাই ধূলার জ্বালায়
অন্ধ আঁখি ও বন্ধ দম্।
তাছাড়া আবার আছে যে তোমার
গায়ে-পড়া রোগ ভারি বিষম ;
জগৎ সুদ্ধ আবাল বৃদ্ধ
টিকে দিয়ে টিঁকে থাকে তখন।

কুসুমে মর্ম্ম— -ভেদন কর্ম্ম
লয়ে বসন্ত থাক কি সন্।
ভেদিয়া চর্ম্ম ছাপিয়া অঙ্গ
উঠোনা মূর্ত্তি লয়ে ভীষণ।

বঙ্গমাতা।

হে জননি, সপ্তকোটি অক্ষম সন্তানে
পালন করিছ নিত্য স্তন্য-সুধা দানে।
স্নেহের মধুর স্বরে করিয়া আহ্বান
সকলেরে সমভাবে কোলে দাও স্থান,
নীরবে বহিছ শিরে শত দুঃখ ভার,
সন্তান কল্যাণ শুধু কামনা তোমার।
নহ তুমি রাজেন্দ্রাণী—সৌভাগ্য-গর্ব্বিতা
নহ মাতঃ মণিমুক্তা-মাণিক্য-মণ্ডিতা ;
তবু সন্তানের শত অভাব মোচন
করিতেছ, স্নেহময়ি, করি' প্রাণপণ।
এ বিশ্ব সমাজে আজি তুমি অবজ্ঞাতা,
ভিখারিণী—দীনহীন সন্তানের মাতা।
তা বলে' কি ভুলি' তোমা', ভুলি' আপনায়
মা বলিব বিমাতায়—অপরের মায় ?

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ

ভারতে য়ুরোপীয়।

যখন নববিধি-বারিত ভারতীয় আর্য্যগণ বিদেশগমন বন্ধ করিলেন, তখন তাঁহাদের বাণিজ্যও বন্ধ হইয়া আসিল। শাস্ত্র-শাসন-ভীরু ভারতবাসী সমুদ্র-যাত্রা বন্ধ করিলে য়ুরোপে ভারত-পণ্য আর যায় না; অগণ্য য়ুরোপীয় বণিকের দৈন্যদশা আর ঘুচে না, অথচ ভারতবর্ষের ধনৈশ্বর্য্যের স্মৃতিও জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। এদিকে মার্কো পোলো প্রভৃতি পর্য্যাটকগণ এশিয়াখণ্ডের বহুস্থল পরিভ্রমণ করিয়া ভারতবর্ষের সমৃদ্ধি ও স্থলপথের দুর্গমতার সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। তখন ভারতবর্ষে আসিবার নূতন পথ আবিষ্কার করিবার জন্য য়ুরোপীয় নাবিকেরা ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ভারতবর্ষ য়ুরোপ হইতে পূর্ব্বদিকে অবস্থিত; কিন্তু পূর্ব্বদিকের স্থলপথ, নানা কারণে একেবারেই রুদ্ধ। সুতরাং উত্তর, পশ্চিম বা দক্ষিণ দিক দিয়া জলপথে ভারতবর্ষে পৌঁছিবার চেষ্টা হইতে লাগিল।

কেহ কেহ অনুমান করিলেন, য়ুরোপের উত্তরদিকে সুমেরুর সন্নিকটবর্ত্তী সমুদ্রপথে চীন সীমায় উপনীত হওয়া যাইবে। অনুমান কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে আয়োজনের অভাব হইল না। কিন্তু সেই চিরতুষারাচ্ছন্ন দুরধিগম্য মেরু প্রদেশে কয়েকটি দুঃসাহসিক অভিযানের শোচনীয় পরিণাম হইল। কত লোক অর্ণবপোত সহ বরফ-প্রোথিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল; আর কত লোক ভগ্নতরী ও ভগ্নমনোরথ লইয়া রুগ্নদেহে দেশে ফিরিল। উত্তরদিক দিয়া চীন বা ভারতভূমিতে পদার্পণ করা যাইবে না, ইহা এক প্রকার স্থিরীকৃত হইয়া গেল।

এই সময়ে রোম ও গ্রীসের পূর্ব্ব প্রতিভা বিলুপ্ত হইয়াছিল; স্পেন উন্নতিশিখরে সমারূঢ় ছিল। উত্থান ও পতন জগতের

নিয়ম। যাহার অধিক উন্নতি হয়, তাহার পতনও অধিক হয়। আবার যে পতিত হইয়া উঠিতে পারে, বিধির কৃপায় তাহার বলের পরিমাণও অধিক। স্পেন বহুদিন মূরীয় বা মুসলমানদিগের পদানত ছিল; বহুদিন পরে যখন স্পেন স্বীয় স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইল, তখন স্পেনীয়দিগের নবপ্রতিভা নানা পথে প্রধাবিত হইল। জ্ঞান ও শিল্পোন্নতি বিষয়ে যে স্পেনীয়গণ তাহাদের মূরীয় সুলতানগণের নিকট বহু পরিমাণে ঋণী তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।* নববল-দৃপ্ত স্পেন এরূপ নবোদ্যমে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল যে, পরবর্ত্তী কয়েক শতাব্দী মধ্যে ভূমণ্ডলের বহু অজ্ঞাত ও অগম্য প্রদেশে স্বীয় বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। বস্তুতঃ দুঃসাহসিক অভিযানে য়ুরোপ খণ্ডে স্পেন ও পর্টুগালের লোকেরাই প্রথম হস্তক্ষেপ করেন। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক যুগের দুইটি অদ্ভুত ক্রিয়া এই দুই জাতি দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। স্পেনীয়দিগের দ্বারা আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়; পর্টুগীজেরা ভারতবর্ষে আসিবার জলপথ বাহির করিয়া সভ্য-জগৎকে চমকিত করেন।

য়ুরোপের অন্যান্য প্রদেশে যে সকল বিষয়ের অনুশীলনের অভাব লক্ষিত হইত, নবোদ্গতভাগ্য স্পেন তদ্বিষয়ে উৎসাহ দিতে কাতর ছিল না। ইতালীয় কলম্বস, স্পেনে আসিয়া তত্রত্য নৃপতির নিকট ভারতবর্ষে আসিবার পথ আবিষ্কারের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। মহামতি ফর্ডিনাণ্ড ও মহারাণী ইসাবেলা তখন স্পেনের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। তাঁহারা প্রশান্ত হৃদয়ে কলম্বসকে আবশ্যকীয় সাহায্য প্রদান করিলেন। কলম্বস পশ্চিমমুখে সমুদ্র বাহিয়া ভারতবর্ষে যাইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি তিনখানি সুসজ্জিত তরণি

* *"The Moors in Spain"* by Stanley Lane-Pool.

সমভিব্যাহারে সমুদ্রযাত্রা করিয়া ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা আবিষ্কার করিলেন। আমেরিকা রাজ্য তখন য়ুরোপীয়দিগের নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল; বিশেষতঃ কলম্বস প্রকৃতপক্ষে নূতন মহাদেশ আবিষ্কারের জন্য বহির্গত হন নাই; ভারতবর্ষই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। এজন্য তিনি যে দ্বীপপুঞ্জে প্রথম অবতরণ করেন, তাহারই নাম ভ্রান্তি বশতঃ "ইণ্ডিয়া" রাখিলেন। কিছুদিন পরে যখন ভ্রম সংশোধিত হইয়াছিল, তখন ভারতবর্ষ হইতে বিশেষ করিবার জন্য সেই নবাবিষ্কৃত দ্বীপপুঞ্জের নাম রাখা হইল—"ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া"; আর সেই য়ুরোপীয় ভ্রান্তির প্রায়শ্চিত্ত ফলে ভারতবর্ষের নাম হইল—"ইষ্ট ইণ্ডিয়া"।

উত্তরমুখে বহু অভিযান ব্যর্থ হইয়াছিল; পশ্চিমমুখে স্পেনের অভিযানে আমেরিকা আবিষ্কৃত হইল বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের পথ বাহির হইল না; এক্ষণে কেবলমাত্র দক্ষিণদিক বাকী রহিল। পর্টুগালের নৃপতি হেন্‌রী এ বিষয়ে প্রথম মনোযোগী হন। তাঁহার সময়ে আফ্রিকার উপকূল ও নিকটবর্ত্তী সমুদ্রবক্ষ পর্য্যবেক্ষণের জন্য কয়েকবার চেষ্টা করা হয়। ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে পিউয়ার্টো স্যাণ্টো (Puerto Santo) দ্বীপ প্রথম্ আবিষ্কৃত হয়। পর বৎসর মদিরা দ্বীপ পর্টুগীজদিগের করায়ত্ত হয়। পরবর্ত্তী অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়াও সমভাবে চেষ্টা চলিতেছিল; কিন্তু তাহা বিশেষ ফলোপধায়ক হয় নাই। আফ্রিকার স্বর্ণোপকূলে গিয়া পর্টুগীজ বণিকেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাচপাত্র বা অপদার্থ খেলেনা বিনিময়ে যথেষ্ট স্বর্ণ সংগ্রহ করিল বটে, কিন্তু স্বর্ণপ্রসূ ভারতবর্ষে আসিবার পথ আবিষ্কাররূপ প্রধান উদ্দেশ্য এখনও অপূর্ণ রহিল।

অবশেষে পর্টুগালের অধীশ্বর দ্বিতীয় জনের রাজত্বকালে বারথলোমিউ ডিয়াজ্ (Bartholomew Diaz)* নামক এক উদ্যমশীল পর্টুগীজ

* Thornton's *British Empire*, Vol. I., Page 7.

নাবিক ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে আফ্রিকার দক্ষিণ সীমায় উপনীত হন এবং তত্রত্য অন্তরীপ অতিক্রম করেন। ঐ স্থানের সমুদ্র ঝটিকাসঙ্কুল বলিয়া ডিয়াজ্ আবিষ্কৃত দক্ষিণ সীমার নাম রাখেন—"ঝটিকাময় অন্তরীপ" (Stormy Cape)*। ডিয়াজ্ আর অধিকদূর অগ্রসর হন নাই। যখন তিনি সানন্দে স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া, উদ্গ্রীব নৃপতিকে সুসংবাদ দিলেন, তখন তাঁহার মনে ভারতবর্ষে যাইবার পথ আবিষ্কারের আশা জাগিল—তখন তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ঐ বিপদসঙ্কুল অন্তরীপের নাম রাখিলেন—"উত্তমাশা অন্তরীপ" (Cape of Good Hope)†। অল্পদিন মধ্যে জনের মৃত্যু হইল, এম্যানুয়েল রাজ-সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। নূতন আবিষ্কারের সদ্ব্যবহারের জন্য পর্টুগালে বিরাট আয়োজন হইতে লাগিল।

কয়েকখানি জাহাজ সুসজ্জিত হইল; নানাদেশীয় নৃপতিকে উপঢৌকন দিবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সুন্দর সুন্দর সখের দ্রব্য সংগৃহীত হইল; বিদেশ গমনোন্মুখ পর্টুগীজ নাবিকবৃন্দের সর্ব্ববিধ অসুবিধা দূরীকরণার্থ রাজভাণ্ডার উন্মুক্ত হইল। ভাস্কো-ডা-গামা নামক এক ভাগ্যবান উদ্যমশীল সম্ভ্রান্ত যুবক এই অভিযানের সর্ব্বাধ্যক্ষ নিয়োজিত হইলেন। জাহাজগুলির অগ্র ও পশ্চাতে পর্টুগীজ রাজপতাকা উড্ডীয়মান হইল; ভাস্কো-ডা-গামাকে যাবতীয় বিষয়ে ক্ষমতাপন্ন করিবার জন্য রাজপ্রদত্ত সনন্দ অর্পিত হইল; নবাবিষ্কৃত নানা দেশে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য খৃষ্টধর্ম্মচিহ্ন বহুসংখ্যক ক্রুশ প্রস্তুত হইল; স্পেনের

---

* ডিয়াজ্ ইহাকে Cabo Tormontoso এই পর্টুগীজ নাম প্রদান করেন; উহারই ইংরাজ অনুবাদ করিলে Stormy Cape হয়। See "*With our soldiers in the Front*," page 4.

† জান ইহাকে Cabo De Bona Esperanza এই পর্টুগীজ নাম প্রদান করেন; উহারই ইংরাজী অনুবাদে অবিকল Cape of Good Hope হয়।

গর্ব্বগৌরব খর্ব্ব করিবার জন্য পর্টুগীজগণ উন্মত্ত হইল। জগতের কোনও অভিযান এতদপেক্ষা অধিকতর আশা, আনন্দ ও উৎসাহ উদ্দীপন করিতে সক্ষম হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

ভাস্কো-ডা-গামা ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুলাই তারিখে জয়োল্লাস-মত্ত স্বজাতিবৃন্দের আনন্দধ্বনির মধ্যে লিসবন পরিত্যাগ করিলেন; পরবর্ত্তী ২০শে নভেম্বর তারিখে উত্তমাশা অন্তরী[illegible] অতিক্রম করিলেন; এবং ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ভারতবর্ষের প[illegible]মোপকূলে কালিকট্ বন্দরে অবতরণ করিলেন। এই প্রথম যুরোপী জাহাজ ভারতীয় বন্দরে দেখা দিল। ইয়ুরোপীয়দিগের পক্ষে এ অতি শুভদিন।

বিস্তীর্ণ-বীচিমালা-বিক্ষোভিত বারিধিদ্বার উন্মুক্ত হইল; পথের সন্ধান পাইয়া ক্রমে ক্রমে হলণ্ড, ডেনমার্ক, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের বণিক সম্প্রদায় ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিতে লাগিলেন। বহুদেশের সহিত বাণিজ্য করিয়া অত্যুর্ব্বর ও খনিজ-বহুল ভারতভাণ্ডারে বহু কাল ধরিয়া যে ধনরাশি সঞ্চিত হইতেছিল, মুসলমান শাসকের অবিরত আক্রমণ ও অত্যাচারে এবং অজস্র বিলাস স্রোতেও যাহা স্বল্প পরিমাণেই নিঃশেষিত হইয়াছিল, ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে তাহা বহু বিদেশীয় পণ্য-বিপণিতে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। ভাটার সময়ে নানা স্রোতোপথে যেরূপ চতুর্দ্দিক হইতে জলরাশি সমুদ্রে গিয়া সঞ্চিত হয়, সেইরূপ যখন ইউরোপের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সংস্রব আরম্ভ হইয়াছে তখন হইতেই, তরঙ্গে তরঙ্গে মন্দান্দোলিত হইতে হইতে ভারতৈশ্বর্য্যরাশি নানা বিদেশীয় বন্দরের ভাগ্যলক্ষ্মী আনিয়া দিতেছে।

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র।

জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড।

যখন মানুষ কোন স্বাধীনজাতির মধ্যে বিচরণ করে, তখন তাহার মনে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড কোথায়? যে শক্তির মহিমায় মানবহৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, উহার মূল কোথায়? প্রকৃতির জগতে অনুসন্ধিৎসু হইয়া যতই অন্তর হইতে অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করা যায়, ততই এই মহিমাময় গূঢ়তত্ত্বের জাজ্বল্যমান লিপি নয়নপথে পতিত হয়; ততই এক অজানিত দুঃখ ভরে এই আকাঙ্ক্ষিত চিরদীন হৃদয় অবনত হইয়া পড়ে। যে নরনারী লইয়া একটি জাতি সংগঠিত, উহাদের উভয়ের আত্মবিকাশের অসদ্ভাবে জাতীয় পতন এবং উহাদের আত্মবিকশিত হৃদয়ের সম্মিলনে জাতীয় উত্থান। আজ যে এই সুদূর প্রাচ্যজগতের একমাত্র আশা ও ভরসাস্থল জাপানের গৌরবকাহিনী, দূর হইতে দূরান্তরে, মেরু হইতে মেরুপ্রান্তরে, প্রতিধ্বনিত হইতেছে উহার অর্থই নরনারীর সমঞ্জস্যীভূত বিকাশ। এই জাতীয় উন্নতির ইতিহাস ঝঞ্ঝাবাত বিরহিত নহে। যে জাতীয় বিপ্লব জাতির মূলে নবশক্তি আনয়ন করে সে ভীষণ স্রোত জাপানের উপর দিয়া বহমান হইয়া গিয়াছে। সেই বিপ্লবের মধ্যে দিয়া জাপানের দূরদর্শী মনীষীগণ দেখিয়াছিলেন যে ইতরবিশেষ নির্ব্বিশেষে নরনারীর উচ্চশিক্ষা ব্যতীত সাময়িক উন্নতি চিরস্থায়ী হইতে পারে না। তাই, মহা বিপ্লবের শোনিত ধরণী হইতে মুছিয়া যাইতে না যাইতেই জাপানের মাতৃভক্ত কর্ম্মীগণ প্রাণপণে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াসী হইলেন। তাঁহারা আরও জানিয়াছিলেন, শিক্ষা কোন দেশ বিদেশের বিশেষ সম্পত্তি নহে। যে সব জাতি শিক্ষাকে জীবনের উপযোগী করিয়া লইয়াছে, তাহারা গুরুস্থানীয়, তাই বিনী

গর্ব্বগৌরব খর্ব্ব করিবার জন্য পর্টুগীজগণ উন্মত্ত হইল। জগতের কোনও অভিযান এতদপেক্ষা অধিকতর আশা, আনন্দ ও উৎসাহ উদ্দীপন করিতে সক্ষম হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

ভাস্কো-ডা-গামা ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুলাই তারিখে জয়োল্লাস-মত্ত স্বজাতিবৃন্দের আনন্দধ্বনির মধ্যে লিসবন পরিত্যাগ করিলেন; পরবর্ত্তী ২০শে নভেম্বর তারিখে উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করিলেন; এবং ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ভারতবর্ষের পশ্চিমোপকূলে কালিকট্ বন্দরে অবতরণ করিলেন। এই প্রথম য়ুরোপীয় জাহাজ ভারতীয় বন্দরে দেখা দিল। ইয়ুরোপীয়দিগের পক্ষে এ অতি শুভদিন।

বিস্তীর্ণ-বীচিমালা-বিক্ষোভিত বারিধিদ্বার উন্মুক্ত হইল; পথের সন্ধান পাইয়া ক্রমে ক্রমে হলণ্ড, ডেনমার্ক, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের বণিক সম্প্রদায় ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিতে লাগিলেন। বহুদেশের সহিত বাণিজ্য করিয়া অত্যুর্ব্বর ও খনিজ-বহুল ভারতভাণ্ডারে বহু কাল ধরিয়া যে ধনরাশি সঞ্চিত হইতেছিল, মুসলমান শাসকের অবিরত আক্রমণ ও অত্যাচারে এবং অজস্র বিলাস স্রোতেও যাহা স্বল্প পরিমাণেই নিঃশেষিত হইয়াছিল, ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে তাহা বহু বিদেশীয় পণ্য-বিপণিতে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। ভাঁটার সময়ে নানা স্রোতোপথে যেরূপ চতুর্দ্দিক হইতে জলরাশি সমুদ্রে গিয়া সঞ্চিত হয়, সেইরূপ যখন ইউরোপের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সংস্রব আরম্ভ হইয়াছে তখন হইতেই, তরঙ্গে তরঙ্গে মন্দান্দোলিত হইতে হইতে ভারতৈশ্বর্য্যরাশি নানা বিদেশীয় বন্দরের ভাগ্যলক্ষ্মী আনিয়া দিতেছে।

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র।

জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড।

যখন মানুষ কোন স্বাধীনজাতির মধ্যে বিচরণ করে, তখন তাহার মনে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড কোথায়? যে শক্তির মহিমায় মানবহৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, উহার মূল কোথায়? প্রকৃতির জগতে অনুসন্ধিৎসু হইয়া যতই অন্তর হইতে অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করা যায়, ততই এই মহিমাময় গূঢ়তত্ত্বের জাজ্বল্যমান লিপি নয়নপথে পতিত হয়; ততই এক অজানিত দুঃখ ভরে এই আকাঙ্ক্ষিত চিরদীন হৃদয় অবনত হইয়া পড়ে। যে নরনারী লইয়া একটি জাতি সংগঠিত, উহাদের উভয়ের আত্মবিকাশের অসদ্ভাবে জাতীয় পতন এবং উহাদের আত্মবিকশিত হৃদয়ের সম্মিলনে জাতীয় উত্থান। আজ যে এই সুদূর প্রাচ্যজগতের একমাত্র আশা ও ভরসাস্থল জাপানের গৌরবকাহিনী, দূর হইতে দূরান্তরে, মেরু হইতে মেরুপ্রান্তরে, প্রতিধ্বনিত হইতেছে উহার অর্থই নরনারীর সমঞ্জস্যীভূত বিকাশ। এই জাতীয় উন্নতির ইতিহাস ঝঞ্ঝাবাত বিরহিত নহে। যে জাতীয় বিপ্লব জাতির মূলে নবশক্তি আনয়ন করে সে ভীষণ স্রোত জাপানের উপর দিয়া বহমান হইয়া গিয়াছে। সেই বিপ্লবের মধ্যে দিয়া জাপানের দূরদর্শী মনীষীগণ দেখিয়াছিলেন যে ইতরবিশেষ নির্ব্বিশেষে নরনারীর উচ্চশিক্ষা ব্যতীত সাময়িক উন্নতি চিরস্থায়ী হইতে পারে না। তাই, মহা বিপ্লবের শোনিত ধরণী হইতে মুছিয়া যাইতে না যাইতেই জাপানের মাতৃভক্ত কর্ম্মীগণ প্রাণপণে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াসী হইলেন। তাঁহারা আরও জানিয়াছিলেন, শিক্ষা কোন দেশ বিদেশের বিশেষ সম্পত্তি নহে। যে সব জাতি শিক্ষাকে জীবনের উপযোগী করিয়া লইয়াছে, তাহারা গুরুস্থানীয়, তাই বিনীত

শিষ্যের ন্যায় নতশিরে ইউরোপ ও আমেরিকার নিকট শিক্ষার্থি হইয়া উপস্থিত হইলেন। যে আদর্শ ধরিয়া ইউরোপ ও আমেরিকা জগতে অতুলনীয় শক্তির রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছে, সেই পথে প্রাচ্য জগতের বিশেষত্বকে বজায় রাখিয়া এ জাতিকে না চালাইলে ইহা দাঁড়াইতে পারিবে না। তাঁহারা রাজনীতির এই সূক্ষ্মতত্ত্বটুকু অবগত না হইলেই আজ এই জাপানের ইতিহাস বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত হইত, হয়ত ইউরোপের অগ্রসর-নীতির করাল গ্রাসে পতিত হইয়া জাতীয় জীবনের শেষ আলোকটুকু নির্ব্বাপিত হইয়া যাইত।

জগতে যে সব জাতি কর্ম্ম হইতে ধর্ম্মকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, তাহারাই কর্ম্মময় জাতির উপপ্লাবনে আপনাদের শেষ সম্পত্তি অমূল্য স্বাধীনতা রত্নটুকু হারাইয়া ফেলিয়াছে। জগতের ইতিহাস উহার সাক্ষ্য প্রদান করে। নব্য জাপান, তাহার নবশক্তির অভ্যুদয়ে বুঝিয়াছিল কর্ম্মই ধর্ম্ম। কর্ম্ম হইতে যে রজোগুণের বিকাশ হয় উহাই মানুষকে ধর্ম্মের উচ্চাঙ্গ সত্ত্বগুণের প্রশান্ত অনন্তবিস্তার বিশ্বপ্রেমে আনিয়া ফেলে। ভারতের প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ এই সত্য যে প্রকার উপলব্ধি করিয়াছিলেন, জগতে এমন আর কেহ তেমন করে নাই। জাপানের এই কর্ম্মময় জাতীয় জীবন কেবল সেই প্রাচীন ভারতের প্রতিধ্বনি তুলিয়া দিয়া যাইতেছে। কর্ম্ম হইতে যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়া উঠে উহা মানুষকে মনুষ্যত্ব প্রদান করে। মনুষ্যত্ব ব্যতীত কেহ কি কখনও জগতের বুকে দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছে? যেখানে মনুষ্যত্বের অভাব সেইখানেই নীচতা, স্বার্থপরতা, হেয়বৃত্তিসমূহের দুর্দ্দান্ত প্রতাপ; সেখানেই স্ত্রীপুরুষের মধ্যে এক প্রকাণ্ড ব্যবধান সৃষ্ট হইয়াছে। এই স্বার্থপরতার কর্ম্মফল জগতে অনেক জাতিই হাতে হাতে পাইয়াছে।

প্রতিধ্বনিত হইয়াছে যে, মাতৃজাতির উন্নতি ব্যতীত জাতীয় কল্যাণ সম্ভবে না। শৈশব হইতে জননীরা সন্তানের অন্তরে যে বীরত্বের এক অমর তেজ জাগাইয়া দেন, উহারই পরিচয় জগৎ কর্ম্মক্ষেত্রে পাইয়া থাকে। এই জননীশক্তির নামই আর্য্য ঋষিগণ আদ্যাশক্তি নামে অভিহিত করিয়াছেন। যখন ভীষণ দুর্দ্দান্ত অসুরভয়ে ধরা প্রকম্পিত হইতে থাকে, তখনই আদ্যাশক্তি রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে নায়িকা হইয়া অবতীর্ণ হন। জাপানীরা উহার গূঢ়তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন বলিয়াই স্ত্রীশক্তিকে এমন ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত সম্বর্দ্ধনা করিতে পারিয়াছেন। যে দেশে, যে জাতিতে একশত জন স্ত্রীলোকের মধ্যে নব্বুই জন শিক্ষার্থিনী হইয়া স্কুল কলেজ আগমন করিতে পারে, সে দেশ, সে জাতি কি জগতের মধ্যে গর্ব্ব করিতে পারে না? যেখানে স্ত্রীলোকদের উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত সেখানে কি নূতন ইতিহাসের সৃষ্টি হইতে পারে না? যেখানে জননীরা আশৈশব শৌর্য্যবীর্য্য-কাহিনা ধমনী মজ্জাতে গাঁথিয়া রাখিতেছে, সেখানে সন্তানেরা কি মাতৃস্তন পানের সঙ্গে সঙ্গে বীরত্বের অমরতেজে অনুপ্রাণিত হইতে পারে না? এ সব য়ুরোপীয় মহিলার মত উচ্চ শিক্ষিতা রমণীদের ভারতের জননীদের মত সাংসারিক কার্য্যে নিরত দেখিলে, উচ্চশিক্ষার মহিমা কি স্বতঃই মনে উদিত হয় না? এক কথায় বলিতে গেলে এই জাতির ভিতর উচ্চচিন্তা ও উচ্চভাবের এক সুমহান দ্বার খুলিয়া গিয়াছে। মাতার চরিত্রে যদি জাতীয় চরিত্র বিকাশ না হইল, তবে সে জাতির আশা কোথায়? যে জাতির মাতারা উচ্চ চিন্তা ও উচ্চ শিক্ষা হইতে বঞ্চিতা, সে জাতির সন্তানেরা কর্ম্মক্ষেত্রের তূর্য্য ও দুন্দুভিনিনাদ শ্রবণ করিয়া ভীত ও সঙ্কুচিত হইবে সে আর আশ্চর্য্য কি? মানুষ চিন্তা ও যুক্তির দ্বারা এই সত্যকে খণ্ডন করিতে পারে, কিন্তু উহা কার্য্যকরী হইবে না। সত্য যাহা তাহা চিরকালই

সত্য। উহা কোন দেশকালপাত্রের বিশেষ সম্পত্তি নহে। যাহা এক দেশের পক্ষে সত্য উহা অন্য দেশের পক্ষেও সত্য। প্রত্যেক কারণের কার্য্য সকল সময়েই ও সকল দেশেই এক প্রকার। জাতীয় উন্নতিকল্পে স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ শিক্ষায় যদি কোন মাহাত্ম্য থাকে উহাকে সকল সময়েই সকল অবস্থাতেই আহ্বান করা উচিত। স্ত্রীলোকদিগের উচ্চশিক্ষার কুফল প্রদর্শন করিয়া আমরা যে যুক্তির অবতরণা করিতেছি, উহা জগতের নিকট আমাদের দুর্ব্বলতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। ব্যক্তিগত জীবন দেখিয়া উচ্চশিক্ষার দোষ কীর্ত্তন করা কোন মতেই উচিত নহে। ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য মানুষের মনে যে কল্পনার জগৎ ফুটাইয়া তোলে, উহারই নাম প্রকৃত জীবন। উহারই অমৃতনিঃস্যন্দী উৎস হইতে জাতীয় জীবনের প্রবাহ বহির্গত হয়। আমরা মানুষকে যাহা দেখি উহা তাহার চিন্তা ও কল্পনার সমষ্টি মাত্র। যে জাতি এই কল্পনা ও চিন্তাকে উচ্চ আদর্শে ধরিতে পারিয়াছে, সেই জাতিই অনন্তকালের বুকে অমরকীর্ত্তির বিজয়ধ্বজা উড্ডীয়মান করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই জাতীয় আদর্শের অভাব যেখানে, সেইখানেই অনন্ত দুঃখের প্রস্রবণ প্রবাহিত। এই জাতীয় আদর্শের ভিত্তি জননীর জাতীয়-প্রেমভরা উদার প্রশান্ত হৃদয়ে। যে স্ত্রীজাতি রণে, বনে, দুঃখে, দুর্দ্দিনে পুরুষকে মাভৈঃ বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিতেছে, সেই রমণীহৃদয়ের মহাশিক্ষা জাতীয় উন্নতির পক্ষে কখনও বিফল হয় নাই।

অনেক দেশে দেশাচার বলিয়া বর্ত্তমানে যাহা দেখা যায়, উহা পুরাতন সনাতন নীতির ব্যভিচার মাত্র। যাঁহারা দেশাচারের সেবক বলিয়া বর্ত্তমানের স্রোতকে বদ্ধ করিতে চান, তাঁহাদের এই সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত জাপানের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করা উচিত। যে

বলিয়া সম্মান করিবে? সুনীতির পরিবর্দ্ধক বলিয়া যে স্বাধীনতাকে আমরা পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া রাখিতে শিখিয়াছি, তাহা কি সুনীতির ব্যভিচার নহে? যেখানে নরনারীর সমঞ্জসীভূত বিকাশের দুর্জ্জয় বাধা, সেখানে স্বাধীনতার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন জীবনে নরনারীকে অধঃগামী করিয়াছে, এমন ত কখনও শুনি নাই। যেখানে পারিবারিক স্বাধীন জীবনের এমন অসদ্ভাব, সেখানে স্বাধীনতার সম্মান মানব হৃদয়কে উচ্ছ্বসিত করিতে পারে না। স্ত্রী-স্বাধীনতার দোষ কীর্ত্তন করিয়া যাঁহারা উহা হইতে বিরত হইতে চান, তাঁহাদের স্বার্থ জাতিগত নহে, ব্যক্তিগত। মানবসমাজ চিরকালই আদর্শের দিকে চলিয়া থাকে, সেইহেতু যদি কখনও কিছু ভুল ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায়, সেজন্য দুঃখিত বা নিরাশ হইবার কোন কারণ দেখি না। মানুষ যে পর্য্যন্ত অপূর্ণ থাকিবে সে পর্য্যন্ত ভাল মন্দ তাহাকে ঘেঁসিয়া থাকিবেই। যাঁহারা জাতীয় কল্যাণ প্রার্থনা করেন, তাঁহাদের উচিত পারিবারিক স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। এ কথাতে বুঝিতে হইবে না যে, স্বাধীনতার অপব্যবহার করিতে হইবে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও সময়োপযোগী এই স্বাধীনতার সীমা নির্দ্দেশ করিলে, দেশ কখনও নির্জ্জীব ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া থাকিতে পারে না।

পরাধীন জাতির স্বাধীনতার সম্মান শিক্ষা করিবার স্থান কোথায়? যেখানে স্বাধীনতার অটল সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত সেখানে নয় কি? কিন্তু তাই বলিয়া বলিনা যে, আপনার দেশের মহত্ত্ব ও গৌরব বিস্মৃত হইয়া আত্মহারা হইয়া যাইতে হইবে। সুদূর অতীতের গৌরবকাহিনী আছে বলিয়াই, মানুষ স্বাধীনতার সম্মান করিতে পারে। অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, অবস্থা ও সময়ের গতিতে অনেক উন্নতিশীল জাতির স্বাধীন চিন্তা ও ভাবগুলি শুষ্কপ্রায় হইয়া গিয়াছে।

মুক্ত আকাশে বিচরণ করা উচিত। আমরা যে 'অতীত অতীত' বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকি, সে অতীতের সম্মান আমরা কয়জনে দিতে পারি? যাহাতে আত্ম-সম্মান বোধ জন্মে উহারই অনুশীলন সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। নতুবা বৃথা দাম্ভিকতা জাতীয় হৃদয়ে প্রবেশ করিলে, উহাতে অমঙ্গল বই মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি মানবের হৃদয়কন্দর হইতে প্রতিধ্বনি না উঠে "তোমার অতীত পুণ্যকাহিনীতে পরিপূর্ণ—অগ্রসর হও", তাহা হইলে বাহ্যিক আড়ম্বরে ও শুধু বাক্যবিন্যাসে মানবকে অন্তঃসারবিহীন করিয়া ফেলে। ব্যক্তিগত স্বার্থের কবাটে যখন আঘাত পড়িতে থাকে, তখন কয়জন আমরা জাতীয় স্বার্থের পায়ে আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত? স্বাধীন ভাব ও বৃত্তি মানব হৃদয়ের নীরব লিপি। সেই স্বাক্ষর হৃদয়ে যতদিন জাজ্জ্বল্যমান থাকে, ততদিন মানব অমর তেজে বলীয়ান, মানব ভীরুতা ও কাপুরুষতার বুকে দাঁড়াইয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করে—'জাতীয় প্রত্যেক নরনারীর সমঞ্জসীভূত শিক্ষা ও স্বাধীনতার প্রতি কেহ কুঠারাঘাত করিও না। যাহাতে জাতির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, সে মৃত্যুকে স্ব-ইচ্ছায় আহ্বান করিও না। পরিশ্রান্ত জীবনের আরাম-ভবন যেখানে, এ জাতিকে সেইদিকে যাইতে দাও। জাতীয় উন্নতির মেরুদণ্ড দৃঢ় ও অক্ষয় করিবার চেষ্টা কর।"

জাপান-প্রবাসী—

শ্রীসত্যসুন্দর দেব।

ভোরের স্বপন।

তখনও ভোর হয় নাই। গৃহিণী বলিল, "যাই ?"

আমি ফিরিয়া শুইলাম। কোনও উত্তর দিয়াছিলাম কিনা মনে নাই। নিদ্রালস কর্ণে শব্দটা প্রবেশ করিয়াছিলাম মাত্র।

কিছুকাল পরে গৃহিণী আসিয়া বলিল, "ওগো, ওঠ; দেখ এসে, বা'র বাড়ীতে কয়েকজন ভদ্রলোক এসেছেন। তাঁরা তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে চাচ্ছেন।"

আমি তাড়াতাড়ি বহির্ব্বাটীতে গমন করিলাম। দেখিলাম তিনজন ভদ্রবেশধারী ব্যক্তি বৈঠকখানা ঘরে চেয়ারে উপবিষ্ট রহিয়াছে। আমি প্রবেশ করিবা মাত্রই তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবীণ ব্যক্তিটী আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—

"আউকা, বউকা। ওরে ও রামদোন, বান্দরের বেটা, মাইচা ছইর‍্যা দেও; ঐ খাটের উপর গিয়া বও; তালই মশারকে দেখিতে পাওনা; তানাকে বস্‌তে দেও।"

আমি তো অবাক্; এরা কারা, কোথায় বাড়ী, আমার এখানে এদের কি প্রয়োজন, তা ছাড়া আমি কি ক'রে রামধনের তালৈ হইলাম, কিছু বুঝিতে পারিলাম না। ইতিপূর্ব্বে আমি এপ্রকার কথা আর কখনও শুনি নাই। অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণের এরূপ অপূর্ব্ব সম্মিলন, এরূপ অদ্ভুত কথনভঙ্গী ইতোপূর্ব্বে আমার কর্ণগোচর হয় নাই। আমি বিস্ময়াবিষ্টের ন্যায় চেয়ারে উপবেশন করিয়া, সেই প্রবীণ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনাদের নিবাস ? আপনারা কি চান ?"

প্রবীণ ব্যক্তি। সে কথা পরে অইবে, বেয়াই; আগে, পান

তামাক আন্‌তি কউকা; বহুদ্দূর থাকি গামাই আইচি। আমাগরে গর অইচে গিয়া লক্ষ্মীপুর; রামদোন আমার ছাইলা। আর ইনির বাড়ী অইচে কামরূপ, কামাখ্যা; ইনিরা বেরাহ্মণ।

আমি অধিকতর বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। হরিচরণকে পান ও তামাক আনিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"মশাই মাপ কর্‌বেন; আমি আপনাকে চিনতে পার্‌ছি না। লক্ষ্মীপুরে আমার কোন বেয়াই আছে বলেতো স্মরণ হয় না। আপনি কি চান?"

প্রবীণ ব্যক্তি। শুইনাছি আপনকার নাকি বিয়া দিবার যুগ্য এউগ্‌লা মেয়া আছে। আমাগরে মধ্যম ছাইলা বারত চান্দের লগে তার বিয়া অইতে পারে কিনা, তার লাগি আইচি।

এতক্ষণে "বেয়াই" সম্বন্ধের কারণ বুঝিলাম। ধীরভাবে বলিলাম—"মশাই, বরের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়াতে সম্প্রতি আমাদের ঢাকা অঞ্চলের কেহ কেহ কুমিল্লা, নোয়াখালী অঞ্চলে কন্যাদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সত্য; কিন্তু সেজন্য এ পর্যন্ত লক্ষ্মীপুরে কেহ কন্যা সম্প্রদান করিয়াছে বলিয়া তো জান না। তা অন্যে করে করুক্‌, আমার এখন এমন কোনও অভাব বা প্রয়োজন হয় নাই, যাহাতে আমি লক্ষ্মীপুরে আমার কন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইতে পারি। মশাই অন্যত্র চেষ্টা করুন্‌।"

আমার কথা শুনিয়া প্রবীণ ব্যক্তিটীর মুখ রাগে লাল হইয়া উঠিল। সে কি একটা উত্তর করিতে যাইতেছিল, এমন সময় তাহার সঙ্গী ব্রাহ্মণটী তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া আমাকে বলিতে লাগিল—

"মশায়, ইতান্‌ কিতা কও? রাজদানীর সন্নিকটবর্ত্তী গর অইয়া আপনকার সাতে কিরা কর্‌তি আইচে, এই তো আপনাকে বাগ্যিমান্‌ মনে করা উচিত হয়। কেবল আপনকার মেয়া পরম সুন্দর্য্য এর লাগি। তারি মধ্যে ইতান কিতা কইবার লাগ্‌চেন?"

রাজধানীর সান্নকটবর্ত্তী ?—আমি ভ্যাছি না। আমার মেয়েকে এমন সময় হরিচরণ একখানি রেকাবে কয়েকটা দণ্ডে বিদায় হউন। এক ছিলিম তামাক দিয়ে গেল। পানের খিলি দেখিয়া একেবারে হাসিয়া উঠিল, বলিল—

"গ্যাকেন্ দিকি, আপনাগরে সব্যতা। বদ্দরলোকের সাম্‌নে খিলি বানাইয়া দিবেন্। (একটী খিলি খুলিয়া) হা বগমান্! গ্যাকেন্ পানের মদ্যে শুক্‌না গুয়া কাটি কুচি কুঁচি করি দিইবেন্। ওকি, আপিংও দিবেন্ নাকি? গ্যাকেন্, এ রাজদানীর রীত নয়। আস্তা পান অর্দ্ধেক করিয়া ছিড়িয়া, কাঁচা গুয়া অর্দ্ধেক করিয়া দেওয়াই অইচে বদ্রগরের নিয়ম। আর রাজদানীর লুকেরা আপিং খায় না।"

রাজধানীর নিয়ম শুনিয়া তো অবাক্। কিছু আর বুঝিতে বাকী রহিল না। খয়ের আফিম হইয়াছে। আমি বিনীতভাবে বলিলাম, "মশাই, অপরাধ মাপ কর্‌বেন। আমরা আপনাদের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনের যোগ্য নই। যোগ্যতর লোকের অনুসন্ধান করুন্।"

এবার প্রবীণ ব্যক্তিটী রুষ্টভাব পরিত্যাগ করিয়া হাসিতে হাসিতে একেবারে আমার গায়ে আসিয়া পড়িল। বলিল, "বেয়াই, এতক্ষুণ আসি দরিয়া রাক্‌ছিলাম। অথন আর পার্‌চি না। বেয়াই বুজি জীবনে রাজদানী গ্যাকেন্ নাই। আপনকার কতা একটুও বদল অয় নাই। সেই বাঙ্গাইলা টান রইচে। স্রেই "কর্‌বেন", "করুম্"—রাজদানীর কতা একটু-ও শিক্কা অয় নাই।"

আমি মনে মনে বলিলাম, "তা হয় নাই বটে!"

প্রবীণ ব্যক্তি পুনরায় বলিল, "তা যাউক্, অথন আসল কতা কউক্কা।"

বুঝিলাম ইহাদিগকে সহজে বিদায় করা যাইবে না। বলিলাম, "আচ্ছা, আপনারা কোন্ বংশ?"

তাম প্রবীণ ব্যক্তি। "আমরা যে কি জ্বালামুকের সাজি বংশ।"

গর সাহা বংশ? একি আন্তর্জাতিক বিবাহের দেশ, যে কায়স্থের

বাড় কন্যা সাহা বংশে অর্পণ করিব? আমার আর সহ্য হইল না;

বলিলাম—

"মশাই, এখনই আমার গৃহ পরিত্যাগ করুন্, নতুবা অপমানিত হ'য়ে যেতে হবে।"

তখন প্রবীণ ব্যক্তিটী অতিশয় রুষ্ট হইয়া বলিল, "আয় তো রে রামদোন্; বেটার তামাসা দেখাই ছাড়্মু। বদ্রলোকের অপমান! জান যে আমাগরে ডিপ্টী কমিশন সাইবের চাপরাশী অইচে গিয়া আমার বাইগনা, আর আমাগরে কলই খেতে দারোগা বাবুর গোড়ায় গাস খায়। রাজদানীতে মামলা কর্‌ত্তি যইবা না, তখন দেখাইমু।" বলিয়া দ্রুতপদবিক্ষেপে রামধনের সহিত চলিয়া গেল। কেবল ব্রাহ্মণটী তখনও বসিয়া রহিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—

"এখন আপনার আর কি প্রয়োজন?"

তখন ব্রাহ্মণ ধীরভাবে বলিতে লাগিল—

"মশায়, এত রাগ কর্‌তি অয় না। রাজদানী অঞ্চলে কত বদ্দর গরের মেয়া সাজি বংশে বিয়া দেয়। মেয়া বাপ মার সঙ্গে থাক্তি পারে না বটে, তা অইলেও সুখে থাকে। তা যাউক, সাউগরে যখন আপনকার মেয়া দিতে নারাজ, তখন না কর্‌লেই অইত। অত্ত কোরোদ্ করবার উচিত অয় নাই। আচ্ছা, খাপা অইবেন না, বেরাম্মণ বংশে মেয়া দিবার আপত্তি আছে কি? আমরা অইচি গিয়া বরদ্বাজ।"

ক্রোধে ক্ষোভে আমার জ্ঞানলোপ পাইবার উপক্রম হইল, আমি বলিলাম—

"আপনি ভরদ্বাজ, আপনাকে কয় বা শাণ্ডিল্য বিধান করা

উচিত, তা আমি ঠিক করিতে পারিতেছি না। আমার মেয়েকে আপনার সেবাদাসী ক'রে দিব, নয়? আপনি এই দণ্ডে বিদায় হউন। ব্রাহ্মণ ক্রোধে ছাতা বগলে করিয়া প্রস্থান করিলেন।

এমন সময় বাড়ীর ভিতর ক্রন্দনের রোল উঠিল। বিরক্ত ও ব্যস্ত হইয়া ভিতরে গিয়া দেখি মা মাটীতে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছেন। আমার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা হতবুদ্ধি হইয়া নিকটে দাঁড়াইয়া আছে। আমার একমাত্র ভগিনীর ফরিদপুর, ইদিলপুরে বিবাহ হইয়াছিল। সে তাহার স্বামীর সহিত বর্দ্ধমানে থাকিত। বহুদিন পরে বাড়ী আসিয়াছে। মা তাহাকে আনিবার জন্য নরেন্দ্রকে পাঠাইয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তাঐ মহাশয় সৌদামিনীকে পাঠাইতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। অধিকন্তু মাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে জামাতা তো দূরের কথা, মেয়েকে আনিতেও যেন আর কেহ কখনও না যায়। আসামী আমাদের সহিত উহাঁরা আর কোনও সম্পর্ক রাখিতে ইচ্ছা করেন না।

মহাবিপদ! মাকে যে কিছুতেই সান্ত্বনা করা যায় না।

স্নানাহার করিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ মনে বাসয়া রহিলাম। কতক্ষণ পরেই ডাক আসিবার কথা। দেখিলাম ভায়া দ্বিজেন্দ্র ডাকের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত। আমি তাহাকে ব্যস্ততার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "আজ চাটগাঁ গেজেট আসিবার কথা। দেখি, কোনও নূতন খবর আছে কিনা। সবে হাইকোর্ট খুলিয়াছে।" ভায়া মুন্সেফীর জন্য এনরোল্ড হইয়া বসিয়া আছেন। কোনও অফিসিয়েটিং কাজ পাইয়াছেন কি না জানিবার জন্য ব্যগ্র। বাস্তবিক, কিছুকাল পরে পিয়ন গেজেট ও কয়েকখানা পত্র দিয়া গেল।

গেজেট খুলিয়াই ভায়া একেবারে "Undone" বলিয়া বসিয়া পড়িল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপার কি?"

দ্বিজেন্দ্র। আর ব্যাপার কি! হাইকোর্ট নিয়ম করিয়াছেন, আর এ প্রদেশের লোকদিগকে Bengalএর মুন্সেফী দেওয়া হইবে না। এতকাল প্রায় ৫০টা জেলার কাজে আমাদের অধিকার ছিল। এখন এখন ৭ জেলায় আর কয়জন লোক নিযুক্ত হইবে? আমাদের আর আশা ভরসা নাই। বাংলায় ওকালতী করিতে দেওয়া হইবে কি না, সে বিষয় এখন বিচারাধীন।

আমি একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলাম। বলিলাম, "আর খবর কি?"

দ্বিজেন্দ্র। আর হাইকোর্টের কার্য্যভার অত্যন্ত গুরুতর হইয়া পড়িয়াছে। জজ সাহেবেরা আর আমাদের আপীল শুনিতে রাজি নহেন। তজ্জন্য অন্য বন্দোবস্ত করিতে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন।

আমি চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। আমাদের গতি কি হইবে? এতক্ষণ পত্রগুলির কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এখন একে একে খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলাম। একখানি ভায়া হেমেন্দ্রের। সে লিখিয়াছে—

"দাদা! আপনি জানেন Executive Engineerএর সঙ্গে একটা সামান্য বিষয় নিয়া মতান্তর হওয়ায় আমি নওগাঁতে বদলী হই। আমি তখনই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, আজ হউক, দুদিন পরে হউক, শীঘ্রই আমাকে কার্য্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। নওগাঁতে এখন কালাজ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। এমন বাড়ী নাই যাহাতে জ্বরে ২।১টী লোক না মরিয়াছে। সহর শুদ্ধ লোক প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছে। গতকল্য আমার "আপা" দ্বয় আমাকে না বলিয়াই কোথায় চলিয়া গিয়াছে। মফঃস্বলেও অনেক গ্রাম প্রায় উজাড় হইয়া গিয়াছে। এখন যে কি ভাবে আছি, তাহা [illegible]

জানেন। কেবল আপনার অনুমতির অপেক্ষায় এখনও কর্ম্মে ইস্তফা দেই নাই।"

মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। প্রাণ থাকিলে তো চাকরী? তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাম করিয়া দিলাম—"Wire resignation. Start at once." বস্তুতঃ, যারা Overseer, তাহাদের আর চাকরী ছাড়িতে ভয় কি? আর কিছু না হউক, কনুট্রাক্টরী করিয়াও বেশ খাইয়া থাকিতে পারে।

আর একখানি ভায়া বীরেন্দ্রের। ভায়া F. A. পাশ করিয়া কলিকাতা Medical Collegeএ ভর্ত্তি হইতে গিয়াছিল। লিখিয়াছে—

"দাদা! এখানে প্রতিবৎসর নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র নেওয়া হয়। আমার সমান Qualificationএর বাঙালী ছাত্রেই সেই সংখ্যা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কাজেই আমাকে ভর্ত্তি করা হয় নাই।"

হায়! কি দুর্দ্দৈব! ভায়াকে লিখিয়া দিলাম—"অবিলম্বে চলিয়া আইস। দেখি কোনও জমিদারীর সরকারে প্রবিষ্ট করা.. দিতে পারি কি না।" পত্র সমাপ্ত করিয়াই দুই চক্ষু দ্বারা দেশ হাত্‌ড়াইয়া দেখিলাম। ২।১টী ব্যবীত বড় রাজা জমিদার বা অন্য সম্ভ্রান্ত লোক তো দেখিতে পাইলাম না!

শেষ চিঠিখানা টাকীর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র গুহ মহাশয় লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"মহাশয়, ইতোপূর্ব্বে নানা কারণে আপনার কনিষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রের সহিত আমার কন্যার সম্বন্ধ করা স্পৃহণীয় মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি কোনও বিশেষ কারণে উক্ত অভিলাষ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। আপনার ভ্রাতা উপযুক্ত, আশা করি আপনারা যোগ্যতর পাত্রীলাভে সমর্থ হইবেন।" আর উপায় নাই! হা জগদীশ্বর!

মনের ভার লাঘব করিবার জন্য সন্ধ্যার প্রাক্কালে বেড়াইতে বাহির

হইলাম। পথে কামাখ্যা বাবুর সহিত দেখা হইল। ইহাঁর কতকগুলি স্কুল পাঠ্য পুস্তক আছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, বাল্যবোধের নূতন সংস্করণ দেখিয়াছ ?"

আমি। কেন? কোনও পরিবর্ত্তন হইয়াছে না কি ?

কামাখ্যা বাবু। আমূল পরিবর্ত্তন! কোন খবরই রাখ না দেখ্‌চি ? সম্প্রতি Director সার্কুলার দিয়াছেন যে গোয়ালপাড়া অঞ্চলে যে ভাষা প্রচলিত, শুধু সেই ভাষার পুস্তকই পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইবে। অন্য পুস্তক নহে। হুজুরের মর্‌জি। আমিও সেই ভাষাই অবলম্বন করিয়াছি। দেখ দেখি, কেমন হইয়াছে ?

বলিয়া পকেট হইতে একখানা বাল্যবোধ বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন। আমি ২।১ পৃষ্ঠা পড়িয়া শিহরিয়া উঠিলাম। উহা Hebrew না Laplandএর ভাষা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, অথচ সেই ভাষাই আমাদের বালকদিগকে শিখিতে হইবে! সমগ্র দেশের ভাষা এক হওয়া রাজনৈতিক হিসাবে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শুনিলাম সেই জন্যই এই ব্যবস্থা!

রাত্রিতে তাড়াতাড়ি কয়েকটা ভাত মুখে দিয়া লেপ গায়ে দিয়া শুইয়া পড়িলাম। ঘুম আসিল না। চক্ষু মুদিত করিয়া নানা বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। কতক্ষণ পরে গৃহিণীর পদশব্দে চক্ষু মেলিলাম। আমার দিকে চাহিয়াই গৃহিণী এক গাল হাসিয়া ফেলিল। আমি বলিলাম, "অসময়ে এত রৌদ্র কেন ? ব্যাপার কি ?"

গৃহিণী। রায়েদের বাড়ীর সতীশ বাবু সস্ত্রীক বাড়ী এসেছে, শুনেছ তো ?

আমি। হাঁ, শুনেছি।

গৃহিণী। আজ সেই নূতন বউকে দেখ্‌তে গিয়েছিলুম। আঃ! কি সুন্দর চাটগাঁয়ের কথা বলে! শুন্‌লে কান জুড়িয়ে যায়।

আমি। বল কি? সত্যি নাকি?

গৃহিণী। সত্যি না কি মিথ্যা? সতীশ বাবু নিজেও বেশ চাটগাঁয়ের কথা বলতে পারেন। আমাদের ঠাকুরপোরা সকলেই বলতে পারেন। কেবল পার না তুমি। কাজেই আমিও পারি না। আমি তো আর কখনও চাটগাঁয়ে যাই নাই?

আমি। লোক সাক্ষাতে পারি না বটে লজ্জা বোধ হয়। তা ব'লে কি একেবারেই পারি না?

গৃহিণী। তবে আজ অবধি আমার সঙ্গে চাটগাঁয়ের কথা কইতে হবে। রাঙ্গাবৌর থেকে আমি ৭।১টা কথা শিখেচি। আচ্ছা এখনই আরম্ভ করা যাক্ না কেন? তুমি যেন অনেক বেলা পর্য্যন্ত শুয়ে আছ। আমি যেন তোমাকে জাগাচ্চি।—

"বন্দু আমার, নাগর আমার; ওট।"

আমি। দূর অও, বন্দ্রের বেটী, আমি অখন উঠ্তি পারমু না।

গৃহিণী। ওগো ওঠ।

আমি। দূর অ, পুয়ার মা, দূর অই যা।

গৃহিণী। ওগো, বেলা হয়েচে, ওঠ। পিয়ন অনেকক্ষণ ডেকে চিঠি রেখে চলে গেছে।

আমি। তোরে ঘমে নেউক, আবাগীর মা।

গৃহিণী। মরণ আর কি? এ আবার কোন দেশী ভাষা গো? বুঝেচি, দুষ্ট সরস্বতী মাথায় চেপেছে। লক্ষ্মীর বাসি ঠাণ্ডা জল মাথায় না পড়্লে নাম্বে না।

গৃহিণীর তর্জ্জনে নিদ্রা সত্রাসে পলায়ন করিল। সভয়ে গাত্রোত্থান করিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে বহির্ব্বাটীতে গেলাম। দেখিলাম একখানা চিঠি পড়িয়া রহিয়াছে। খুলিয়া দেখিলাম অনাথ দাদা তাঁহার বাকী টাকা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। গৌরমুদী ও নবদ্বীপ সাহা টাকার

তাগাদায় বসিয়া রহিয়াছে। তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিয়া গত রাত্রের কথা স্মরণ করিতে লাগিলাম। মনে পড়িল অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কাল রিজলী সাহেবের বঙ্গবিভাগ সম্বন্ধীয় পত্রখানা পড়িয়াছিলাম। বোধ হয় সেই জন্যই গৃহলক্ষ্মী সরস্বতীর উপর এত চটিয়াছেন! কিন্তু মনে মনে বড় ভয়ও হইল লোকে বলে ভোরের স্বপ্ন সত্য হইয়া ফলিয়া যায়। এ দুঃস্বপ্নের প্রতিকার গোবিন্দের সাধ্যায়ত্ত কিনা আমার সংশয়বাদী মন ঠিক করিতে পারিল না।

শ্রীভূপেন্দ্র নাথ দাস।

নারায়ণী।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

এমন সুন্দর শ্রুতিমধুর "শৈলজানন্দ" নাম, ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া, সুতীব্র কটকটে "শলুই" হইল কেন? শৈশবের "গুয়ী," কৌমারে "গোবরা", কিঞ্চিৎ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অলঙ্কারশোভিত "গোবর্দ্ধন" হয়। আর শৈলজানন্দের অদৃষ্টে, এমন অনুলোমপ্রক্রিয়া কোন্ দৈব-দুর্ব্বিপাকে বিলোম হইল! আদ্যন্ত বিচ্ছিন্নাঙ্গ হইয়া, নাম বেচারী, কি ঘোর অপরাধে এমন বিপন্ন হইল! শ্রীভ্রষ্ট—গ্রামবাসীর পর্য্যন্ত অপরিচিত, একজন রমণীর নির্দ্দেশে, নামটীকে যদি অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে সে নামের মূল্য কই! রমণীর দর্শনলাভ না ঘটিলে, ব্রাহ্মণকে আজ অতিথিশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত! চিন্তার কথা। ব্রাহ্মণও পথ চলিতে চলিতে, বিষম চিন্তায় আক্রান্ত হইলেন। গ্রামবাসী যার নাম জানেনা, সে কেমন লোক!

একবার মনে করিলেন রমণীকে জিজ্ঞাসা করি। আবার ভাবিলেন, একটু পরেইত শৈলজানন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইবে; তখনই সন্দেহটা মিটাইয়া লইব।

রমণী দূর হইতে শৈলজানন্দের বাড়ী দেখাইয়া দিল। বলিল, "চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে যে দ্বার, তাহা দিয়া বাটীতে প্রবেশ করিবেন না। আরও কিছু আগে, একটা সরু পথের ধারে একটী ক্ষুদ্র দ্বার আছে। সেই দ্বার দিয়া ভিতরে যাইবেন। নতুবা দেখা হইবেনা।" রতনের বিস্ময় বাড়িয়া গেল।

জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন?"

রমণী উত্তর দিলনা। বালককে ব্রাহ্মণের কোল হইতে নামিতে আদেশ করিল।

রতন বলিলেন, "অতি পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া, বালক আমার কাঁধে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়াছে।"

তখন তাঁহার কোল হইতে বালককে গ্রহণ করিয়া, রমণী অন্য পথে প্রস্থান করিল।

রমণী যদি নিষেধ না করিত, তাহা হইলে বোধহয় রতন ছোট দ্বারটী দিয়াই বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিতেন। রমণীর নিষেধে, রতনের কৌতূহল হইল। তিনি ভাবিলেন, সদর দরজা দিয়াই বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিনা কেন?

দরজার দুই পার্শ্বে বাঁধান রোয়াক। একটীর উপর বসিয়া, একজন লোক সিদ্ধি ঘুঁটিতেছিল। আর চারি পাঁচজন তাহাকে ঘেরিয়া গল্প জুড়িয়াছিল। গল্পের বিষয় অবশ্য সিদ্ধি। এবং সেই সঙ্গে মিশ্রিত 'সেকাল' ও 'একাল'। 'সেকাল'টা চিরদিন ভদ্রলোক; কিন্তু দুঃখের বিষয় 'একাল' কিছুতেই সেরূপটী হইতে পারিলনা। সেকালের সিদ্ধি ছুঁইলেই নেশা হইত, একালের সিদ্ধি এক পেট খাইলেও নেশার

আমেজটা পর্য্যন্ত আসে না। বেশি যে আহার করিয়া নেশাটা গুছাইয়া লইবে, তাহারও উপায় নাই। কেননা, একালের উদর কত তফাৎ! সেকালের উদর স্থিতিস্থাপক, অনন্ত আহার্য্যের স্থান ছিল। একালের উদর সঙ্কোচব্যাধিগ্রস্ত—খাদ্য আছে, রাখিবার স্থান নাই। আর খাদ্যই বা দেয় কে। সেকালের লোক পরকে খাওয়াইতেই তৃপ্তিলাভ করিত, একালের লোক পরের অন্ন কাড়িয়া খায়। তারপর, কে কার কাড়িয়াছে, কেমন করিয়া কাড়িয়াছে, ইত্যাদি নানা কথার ভিতরে শৈলজানন্দ সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা অনতিউচ্চস্বরে চলিয়া গেল। এমন সময় রতন তাহাদের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গল্পে সন্নিবিষ্টচিত্ত, তাহারা প্রথমে রতনকে দেখিতে পাইল না, আপনার মনে কথাই কহিতে লাগিল। কথার মধ্যে, দুই চারিটা 'শলুই' শব্দ রতনের কাণে গেল। সুতরাং তাহাদের গল্প রতনের সম্যক বোধগম্য হইল না। তিনি আর অপেক্ষা না করিয়া তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই কি শৈলজানন্দ সিংএর বাড়ী?'

একজন উত্তর দিল—"না।"

ইহাদের মধ্যে একজনের সঙ্গে রতনের পূর্ব্বে দেখা হইয়াছিল। সে পরিচিতস্বর শুনিয়া মাথা তুলিয়া বলিল—"এখনও তুমি ঘুরিয়া বেড়াইতেছ?"

রতন বলিলেন, "শৈলজানন্দের গৃহ অন্বেষণ করিতেছি।"

ব্রাহ্মণের মুখে দ্বিতীয়বার শৈলজানন্দের নাম শুনিয়া, লোকটা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। বলিল—"তাহাকে খুঁজিতে চাও, যমের বাড়ী যাও; এখানে কেন? বন্ধুবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"শৈলজানন্দ বলিয়া যে ভূতটা রাজার বাড়ীর কানাচে ঘুরিয়া বেড়ায়, এ বৃদ্ধ তাহারই অন্বেষণ করিতেছে।"

বন্ধুবর্গ বৃদ্ধের দুঃসাহসিকতার পরিচয় পাইয়া বড়ই বিস্মিত হইল;

এবং লোকটাকে উন্মাদ স্থির করিল। তখন সকলেই সেই প্রেতাত্মা সম্বন্ধে দুই একটা গল্প করিল। একজন তাহার সানুনাসিক স্বর শুনিয়াছিল, একজন গাছের ডাল ভাঙ্গিতে দেখিয়াছিল, আর একজন তালবৃক্ষসম জঙ্ঘাদ্বয়ের চাপে একটা হাতীকে মারিয়া ফেলিতে দেখিয়াছে। সকলেই বৃদ্ধকে শৈলজানন্দের অনুসন্ধানে ক্ষান্ত হইতে বন্ধুভাবে নিষেধ করিল।

রতন, বাটীর মালিকের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকগুলা নাম বলিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

একজন জিজ্ঞাসা করিল—"এ বাটীর মালিকের সঙ্গে তোমার কি প্রয়োজন?"

রতন বলিলেন,—"প্রয়োজন না থাকিলেও, নাম জানিতে দোষ কি?"

প্রয়োজন নাই শুনিয়া, সে লোকটা নাম বলিল, "শলুই সিং।"

তখন, রতনের বুঝিতে আর কিছু বাকী রহিল না। "শলুই" নাম এই একটু আগে তিনি শুনিয়াছেন। বুঝিলেন, শলুই শৈলজানন্দের অপভ্রংশ।

আর কোনও কথা না বলিয়া, ব্রাহ্মণ দ্বারসমীপে উপস্থিত হইয়া কবাটে ঘা মারিলেন। দ্বার ভিতর হইতে বদ্ধ, দুই চারিবার ঘা দিলেন, "ভিতরে কে আছ, দুয়ার খোল"—বলিয়া বার দুইচার চীৎকার করিলেন—দ্বারমুক্ত হইবার লক্ষণ দেখা গেল না। রোয়াকের লোকগুলা চুপ করিয়া দেখিতে লাগিল। বিফলমনোরথ হইয়া, যখন রতন ফিরিলেন, তখন সকলে 'হো হো' করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রতন ভাবিলেন, "ভ্যালা আপদ! সারাদিন উপবাসী থাকিয়া, এ কোথায় আসিলাম!" চিঠিখানা দিতে পারিলেও, নিশ্চিন্ত হইতে পারেন ভাবিয়া, তিনি কুদ্রদ্বারের সন্ধানে চলিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

অন্ধকার গাঢ়তর হইয়াছিল। সদরপথ ছাড়িয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতে রতনের পদস্খলন হইতে লাগিল। ক্রমে তিনি রমণীকল্পিত সঙ্কীর্ণপথে উপস্থিত হইলেন। পথ এত সরু, যে দুই-জনের পাশাপাশি চলা অসম্ভব। দুইধারেই ছোট জঙ্গল—ঘন-সন্নিবিষ্ট গুল্মরাজি—অধিকাংশই কণ্টকময়। মধ্যে ভূমিপৃষ্ঠে মনুষ্যের পদপ্রহারজাত একটী মাত্র ক্ষীণরেখা, কোন স্থানে দৃশ্য, কোন স্থানে লুপ্তপ্রায়।

সেই সঙ্কীর্ণপথে পদ দিতে বৃদ্ধ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, এরূপ পথে চলিয়া কি সাপের মুখে প্রাণ দিব! সদাশিবের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ না হইলে, রতন ফিরিতেন। সমস্তদিন অনাহারে পথ চলিয়া, তিনি বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্রামের বড়ই প্রয়োজন হইয়াছিল। তথাপি রতন অগ্রসর হইলেন। কিছুদূর যাইতেই, একজনের সঙ্গে দেখা হইল। সে বিপরীত দিক হইতে আসিতেছিল। রতনকে দেখিয়াই সে প্রশ্ন করিল "কে তুমি?" রতন প্রথমে কোনও উত্তর দিলেন না, চলিতে লাগিলেন। পরস্পরে মুখোমুখি হইলেন। তখন একজনকে পথ ছাড়িয়া না দিলে অন্যের চলা অসম্ভব। লোকটা উত্তর না পাইয়া পুনঃপ্রশ্ন করিল, "কে তুমি?"

রতন এবারেও উত্তর দিলেন না, যথাসম্ভব সরিয়া লোকটাকে যাইতে পথ দিলেন।

উত্তর না পাইয়া লোকটা বিরক্ত হইল। কিঞ্চিৎ রুক্ষস্বরে বলিল, "উত্তর দাওনা কেন, চোর নাকি?"

"আমি বিদেশী"।

"পথ ভুলিয়াছ; ফিরিয়া যাও।"

"এ পথে কি কোথাও যাওয়া যায় না? কোন গৃহস্থের বাড়ী—যেখানে অন্ততঃ একরাত্রের জন্য বিশ্রাম করিতে পারি?"

"তোমার কি দৃষ্টিভ্রম হইয়াছে? এ জঙ্গল দেখিতেছ না? এখানে বাড়ী কোথা!"

"তুমিও কি জঙ্গলের সামিল? না গাছের ডালে ডালে বাস কর। বাড়ী যদি না থাকে, পথ যদি না থাকে, ত তুমি কেমন করিয়া আসিলে?

লোকটা এবারে বড়ই রাগিল। তাহার রাগ হইবারই কথা! একটা কোথাকারকে বিদেশী আসিয়া তাহাকে সমান উত্তর দিতে সাহস করে! অন্ধকারে সে ব্রাহ্মণের মুখখানা একটু কষ্ট করিয়া দেখিয়া লইল—দেখিল বৃদ্ধ। তখন ক্রোধ-কর্কশস্বরে বলিল "বৃদ্ধ বয়সে অপঘাতে মরিবে কেন? মানে মানে ফিরিয়া যাও।"

রতন ধীরভাবেই উত্তর দিলেন—বলিলেন "যথেষ্ট পথ দিয়াছি, ইচ্ছা হয় যাইতে পার।"

তাহার যাইবার উদ্দেশ্য ছিল না; রতনকে ফিরানই উদ্দেশ্য। সে অগ্রসর হইয়া রতনকে ধাক্কা দিল। রতন তাহার কথার ভাবে পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়াছিলেন; বুঝিয়া ধাক্কা খাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। লোকটা ধাক্কা মারিয়া নিজেই পা সামলাইতে পারিল না, পড়িয়া গেল। পথের পার্শ্বের ত্রিশিরার কাঁটায়, সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। রতন তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন। হাতধরা ও তোলাতেই সে রতনের শক্তি বুঝিল। রতন বলিলেন "দেখাইয়া দাও, কোন দরজা দিয়া গেলে শৈলজানন্দের সঙ্গে দেখা হয়।"

লোকটা শৈলজানন্দেরই ভৃত্য, জাতিতে কাহার,—বলিষ্ঠ। যে গুপ্তদ্বার দিয়া রতন প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন, সেই দ্বার রক্ষা করাই তাহার কার্য্য ছিল। রতনের আদেশ শুনিয়া লোকটা ফাঁফরে পড়িল।

কাতরস্বরে বলিল "প্রভু! সে পথ দিয়া আপনাকে লইয়া গেলে যে আমার চাকরী যাইবে।"

"যাহাতে না যায়, তাহার ব্যবস্থা করিব। আমি তার জামাতার নিকট হইতে পত্র আনিয়াছি। তাহাকে দিয়া চলিয়া যাইব।"

"তাহা হইলে, পত্রপাঠ আমার চাকরি যাইবে। শুধু চাকরি—হয়ত প্রাণে মরিব। জামাতার সঙ্গে তার সদ্ভাব নাই।"

"জামাতার সঙ্গে সদ্ভাব নাই!"

"দুনিয়ার কারও সঙ্গে সদ্ভাব নাই।"

"ঐরূপ লোককে দেখিতে রতন কৃতনিশ্চয় হইলেন। বলিলেন, বাপু! তোমার চাকরি থাক্ আর যাক্, আমি তাকে দেখিব।"

লোকটা কপালে হাত দিল; আর বলিল,—"এতকাল পরে দেখিতেছি, আমার রুটী মারা গেল।" রতন বলিলেন, "সহজে মারা যাইতে দিব না। তবে একান্তই যদি যায়, তোমার দুরদৃষ্ট।"

বাধ্য হইয়া সে ব্যক্তি রতনকে দ্বারটী দেখাইতে অগ্রসর হইল। রতন পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কিছুদূর যাইতে না যাইতে উভয়ের সম্মুখে একটী পরিখা পড়িল। পরিখা পার হইতে পারিলেই দ্বার। দ্বারটী দেখাইয়া লোকটা স্থানত্যাগের উদ্যোগ করিল। রতন বলিলেন —"দ্বারত দেখাইলে; এখন পরিখা পারের উপায় বলিয়া দাও।" সে ব্যক্তি জল দেখাইল, আর বলিল—"সাঁতারিয়া পার হউন।" রতন তাহার বস্ত্র দেখিলেন। দেখিয়া বুঝিলেন, এ ব্যক্তি অন্য কোন উপায়ে পার হইয়া থাকিবে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেমন করিয়া পার হইলে?" সে চুপ করিয়া রহিল। রতন আর কালক্ষেপ না করিয়া, তার ঘাড়টা ধরিয়া ফেলিলেন; এবং বলিলেন, "যদি উপায় বলিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব কর, ত তোমাকে পাঁকে পুতিয়া রাখিব।"

ঘাড় ধরাতেই তার অর্দ্ধেক প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

তখন সে করজোড়ে বলিল, "ভৃত্যকে ছাড়িয়া দিন; পারের ব্যবস্থা করিতেছি।" রতন পরিত্যাগ করিলে, সে জঙ্গলের ভিতর হইতে একখানি ছোট ডোঙা বাহির করিয়া ভাসাইল। রতন তাহাতে চড়িয়া পার হইলেন; এবং এক ধাক্কা দিয়া ডোঙাখানাকে পরপারে ভাসাইয়া দিলেন। ভৃত্য সেটাকে আবার জলের ভিতরে ডুবাইয়া রাখিল; আর বলিল, "হুজুর! মনিবের কাছে আমার নাম করিবেন না।" রতন আশ্বাস দিলেন। ভৃত্য চলিয়া গেল, রতন ও উপরে উঠিলেন।

কিন্তু হইল কি। এখানেও যে দরজা ভিতর হইতে বন্ধ! ব্রাহ্মণ এবারে যথার্থই বিপন্ন। আশ্রয় গ্রহণেরও উপায় নাই, ফিরিবারও উপায় নাই। চারিদিকে বন, লতা-গুল্মমধ্যে সর্পভয়, সমস্ত দিবসের উপবাসে ক্ষুধার্ত্ত, পথপর্য্যটনে ক্লান্ত—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ব্রাহ্মণ নিরাশায় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। যে পথে আসিয়াছেন, সে পথ দিয়া ফেরা সহজ কথা নয়—বিশেষতঃ হতাশের হৃদয় লইয়া দ্বারে করাঘাত করিলেই যে কেহ খুলিয়া দিবে, এরূপ বিশ্বাস তাঁহার ছিল না।

ব্রাহ্মণ সেই অন্ধকারময়, আবর্জনাময়, ভীষণ স্থানে দাঁড়াইয়া নিজের দুরদৃষ্টচিন্তায় নিবিষ্ট হইলেন। মনে মনে বলিলেন—"কি কুক্ষণেই বাড়ীর বাহিরে পা দিয়াছিলাম। বিনাপরাধে একটা কাপুরুষ ম্লেচ্ছ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইলাম। তাহাতেও ত ভোগের শেষ হইল না! অবশেষে, কোন দূরদেশে, কোন অপরিচিত, অনাতিথেয়, দুর্ব্বোধ্য, নরাধমের বাড়ীর দ্বারে নরকতুল্য স্থানে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে আসিলাম!

একমাত্র আশা, ভৃত্যটা যদি ফিরিয়া আসে। তাহারই আগমন প্রত্যাশায়, ব্রাহ্মণ কবাটে পৃষ্ঠ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সে স্থানে বসিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না।

চারিদিক নিস্তব্ধ। বাটীর ভিতরের একটা স্বরের অপেক্ষায়, ব্রাহ্মণ ভিখারীর ন্যায় কাণ পাতিয়া রহিলেন; প্রহরেক অতীত হইয়া

গেল, সেখানে জীবের অস্তিত্ব অনুভূত হইল না। লোকটাও ফিরিয়া আসিল না।

ব্রাহ্মণ বুঝিলেন, এইভাবে দাঁড়াইয়া রাত্রি যাপন করা অপেক্ষা, পরিখা পার হইয়া কোন বৃক্ষতলে রাত্রি যাপন করাও শ্রেয়স্কর। বুঝিলেন, যুবতীর কথায় এ অরণ্যপথে প্রবিষ্ট হইয়া ভাল কাজ করেন নাই। তাঁহার বোধ হইল, শৈলজ্ঞানন্দের চরিত্রজ্ঞা রমণী দুষ্টামি করিয়া তাঁহাকে বিপদে ফেলিয়াছে। রমণীর উপর তাঁহার ক্রোধ হইল। ভাবিলেন, কেন আপনাকে বিপন্ন করিতে তাহাকে দুষ্ট বালকের হাত হইতে নিষ্কৃতি দিলাম। সর্ব্বনাশীকে দেখিতে পাইলে, আবার তাহাকে তদবস্থায় সরোবরতীরে বালকের হাতে সমর্পণ করিয়া আসি। এমন কোমল সৌন্দর্য্যের ভিতরে এমন নিষ্ঠুরতা ও অকৃতজ্ঞতা!

সদাশিবেরও উপর তাঁহার ক্রোধ হইল। জানিয়া শুনিয়া, সে মূর্খ এমন নরাধম শ্বশুরের কাছে তাঁহাকে প্রেরণ করিল কেন? আর সেই পাপিষ্ঠ শ্বশুরটার উপর তাঁহার ক্রোধের সমস্ত ভারটা চাপিয়া পড়িল! ব্রাহ্মণের বড়ই আক্ষেপ, এখনও পর্য্যন্ত তাহাকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে পারিতেছেন না। দুই একবার শৈলজ্ঞানন্দকে শিক্ষা দিবার ব্যগ্রতা আসিল। ব্রাহ্মণ একবার মনে করিলেন, "এই ক্ষুদ্র দ্বারটা এক পদাঘাতে ভাঙ্গিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করি। এবং শৈলজ্ঞানন্দের গলদেশ ধরিয়া, মুষ্ট্যাঘাতে তার পৃষ্ঠদেশের কতকটা স্থান, অপরাংশ হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক্ করিয়া দিই।" আবার ভাবিলেন, শৈলজ্ঞানন্দকে ধরিতে, যদি কোন গবানন্দকে ধরিয়া ফেলি! এই মুষ্ট্যাঘাত কার্য্যটা যদি তাহারই পৃষ্ঠে নিষ্পন্ন হইয়া যায়!"

পরিখা পার হওয়াই ব্রাহ্মণ যুক্তিযুক্ত বোধ করিলেন। গৃহ-প্রবেশের আশায় এতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি সান্ধ্যকৃত্য সমাধা করিতে পারেন

নাই। তিনি সেই অন্ধকারে হাতে ভর দিয়া, তীর হইতে অবরোহণ করিলেন। হস্তপদ প্রক্ষালিত করিয়া ভগবানের ধ্যানে নিযুক্ত হইলেন।

ধ্যান করিতে গিয়া, ভগবানের উপর ব্রাহ্মণের অভিমান আসিল। তাঁহার মুদ্রিত অক্ষিপক্ষ্মমধ্যে অশ্রুর রাশি সঞ্চিত হইল। ধ্যানান্তে যেই ব্রাহ্মণ চক্ষু মেলিলেন, অমনি দুটি গণ্ড দিয়া জল বহিয়া গেল।

চক্ষু মুছিয়া জলে পদক্ষেপ করিতে রতন দেখিলেন, পরপারে কে আলোক লইয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণ বুঝিলেন, এইবারে প্রাণ পাইলাম। আশার পুনঃসঞ্চারে হৃদয়নিবদ্ধ বায়ুরাশি নাসিকারন্ধ্র হইতে প্রবল বেগে বাহির হইয়া গেল। করজোড়ে তিনি ইষ্ট-দেবের কাছে ভিক্ষা চাহিলেন, "প্রভো! এ দুর্দ্দশা হইতে আমাকে রক্ষা কর।"

আলোক ক্রমশঃই তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সেই সঞ্চারিণীদীপশিখাপুলকিত পরিখাতীরে দাঁড়াইয়া, রতন দীপ্যমান শৈলজানন্দের প্রাসাদের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। দেখিলেন, উচ্চ প্রাচীরের উপরে মাথা তুলিয়া, সেই অতিথিসঙ্গে অনভ্যস্ত নির্ম্মম প্রাসাদচূড়া নীরব অবজ্ঞার হাসির সহিত তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। শৈলজানন্দের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া রতন বিস্মিত হইলেন! এরূপ ধনীর জামাতা, সামান্য অর্থের জন্য নরাধম আনন্দদেবের কিনা দাসত্ব করিতেছে! শৈলজানন্দকে দেখিতে তাঁহার জেদ হইল। মনে করিলেন, অপমানিত লাঞ্ছিত হইয়াও যদি পুরী প্রবেশ করিতে হয়, অনাহারে অনিদ্রায় সমস্ত রাত্রি যাপন করিতে হয়, তথাপি লোকটাকে না দেখিয়া আমি কাশীপুর ত্যাগ করিব না।

অন্ধকার স্তূপাকারে পশ্চাতে রাখিতে রাখিতে, আলোকটা পরিখার পারে রতনের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। রতন দেখিলেন, আলোধারিণী সেই দৃষ্টপূর্ব্ব রমণী।

দেখিয়াই রতন ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলেন,—"বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মরিয়াছে কিনা দেখিতে আসিয়াছ।"

রমণী। আমি না বুঝিতে পারিয়া অপরাধ করিয়াছি, আপনি চলিয়া আসুন।

রতন। কেমন করিয়া যাই। ডোঙা ওপারে জলের ভিতরে লুকান আছে।

রমণী জলে নামিল; ডোঙাটাকে উঠাইবার চেষ্টা করিল,—পারিল না। তখন ব্রাহ্মণকে আরও কিয়ৎক্ষণের জন্য অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিল। বলিল, "জলে নামিবেন না; কণ্টকাদিতে ঝিল পরিপূর্ণ, চরণ বিক্ষত হইবে। আমি শীঘ্র ভৃত্যকে লইয়া ফিরিতেছি"—বলিয়াই রমণী স্থান ত্যাগ করিল, রতনের নিকট উত্তরের অপেক্ষা রাখিল না।

রূপেই হউক, কি আলোকেই হউক, কিয়ৎক্ষণের জন্য সেই প্রাণ-হীন প্রদেশের জীবন সঞ্চার করিয়া, আবার সুন্দরী গাঢ় অন্ধকার ঢালিয়া গেল। রতন আবার যে তিমিরে সেই তিমিরে। যুবতীকে দেখিয়াই রতন সাহায্যের প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। এখন আবার তাহার কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন, তাহার উপকারের চেষ্টা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তাহার উপর যে এতটুকু অভিমান আসিয়াছিল, তাহা সেই তিমিরে বিসর্জ্জন দিলেন। বলিলেন—"আয় মা—শীঘ্র ফিরিয়া আয়, আমাকে কষ্ট বন্ধন হইতে মুক্ত কর্।"

খুট্ করিয়া কবাটে শব্দ হইল। রতন বুঝিলেন, এইবার বোধ হয় ভিতর হইতে কে দ্বার খুলিতেছে। মুহূর্ত্তমধ্যে নিঃশব্দ ক্ষিপ্রগতিতে তিনি দ্বারের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

দ্বার উন্মুক্ত হইল। একজন খর্ব্বকায় কৃষ্ণবর্ণপুরুষ বাতি হস্তে বাহিরে আসিল; এবং রতন যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহার পার্শ্বদিয়া

কি যেন অন্বেষণ করিতে করিতে, কতকটা দূর চলিয়া গেল। অবকাশ পাইয়া তিনি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহার কথা শুনিয়াই লোকটা বাহিরে আসিয়াছিল। সে অনুচ্চ গম্ভীর স্বরে ডাকিল—"ঝম্মন্!" উত্তরের অপেক্ষায় ক্ষণেক দাঁড়াইল। আবার বলিল—"কে কথা কহিল ? ঝম্মন্ ?"

রতন শুনিলেন ; গ্রাহ্য না করিয়া শৈলজানন্দনের সন্ধানে চলিলেন।

একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

চলিতে চলিতে রতন শৈলজানন্দের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। কি বিস্তীর্ণ শিলাবদ্ধ প্রাঙ্গণ! কৃষ্ণপক্ষীয়া রজনীর অন্ধকার ভেদ করিয়া, ব্রাহ্মণের দৃষ্টি প্রাঙ্গণপ্রান্তে পহুঁছিতে সমর্থ হইল না। প্রাঙ্গণ বেড়িয়া উচ্চ প্রাচীর। প্রাচীরগাত্রে সংলগ্ন শস্যসম্পত্তির নিদর্শনস্বরূপ অসংখ্য মরাই। মধ্যে সুচিত্রিত সুনির্ম্মিত দেবমন্দির। পরিখাতীরে দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মণ তাহারই অগ্রভাগ দেখিতে পাইয়াছিলেন। দেবালয়ের সম্মুখেই নাটমন্দির। ব্রাহ্মণ প্রথমেই দেবদর্শনোদ্দেশে সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন মন্দিরদ্বার রুদ্ধ। নাটমন্দিরেও জনপ্রাণীর সমাগম নাই। উদ্দেশেই ব্রাহ্মণ, মন্দিরাভ্যন্তরস্থ অজ্ঞাত দেবতাকে প্রণাম করিলেন। আর বলিলেন, "ঠাকুর" তুমি ত নিজেই এক সময় বলিয়াছ :—

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।

সুতরাং তোমার মূর্ত্তি লইয়া, তোমার নাম লইয়া কথা নয়। তুমি যে মূর্ত্তিতেই এই মন্দির মধ্যে অবস্থান কর,—পিতাই হও, কি মাতাই হও—বিষ্ণুই হও, শিবই হও, কি অনন্ত-শক্তিধারিণী জগদ্ধাত্রীই হও, অন্ধকারে অপরিচিত পরগৃহে বিপত্তিভীত বৃদ্ধ আজ তোমার শরণাগত।" বলিয়াই ক্লান্ত, অবসন্ন দেহ ব্রাহ্মণ মন্দির সম্মুখে চত্বরে বসিয়া পড়িলেন।

স্থির করিলেন, দেবতা উঠাইয়া দেন উঠিব, নতুবা এ রাত্রির মত আর স্থানত্যাগ করিতেছি না।

অজ্ঞাত-দেবতা-সম্মুখে, দেবতা-প্রীত্যর্থ বারকতক ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া, ব্রাহ্মণ মৃগচর্ম্ম খুলিয়া বিছাইলেন। উষ্ণীষমধ্যস্থ পত্র পরিধেয় বস্ত্রে বাঁধিবার জন্য বাহির করিলেন। অপঠিতাক্ষর, অজ্ঞাতমর্ম্ম পত্রখানিকে বার দুই নাড়িয়া বলিলেন, "হে লিপি, কোথা হইতে কোথায় আনিয়া, কত প্রকারের অবস্থায় ফেলিয়া, তুমি আমার পক্ষে পরিদৃশ্যমানা বিধিলিপির কার্য্য করিয়াছ। শেষে তোমার কৃপায় আমি দেবতার দ্বারে। বলপূর্ব্বক অনাহারে রাখিয়া তুমি আমার জন্য পুণ্যপুঞ্জ সঞ্চিত করিলে। তোমায় আমি পরিত্যাগ করিতে পারি না। তুমি এই দেবতার সম্মুখে আজই যা হউক একটা অদৃষ্টের মীমাংসা করিয়া ফেল।"—এই বলিয়া, পত্র বাঁধিয়া, কাপড়ের পুঁটুলীটী মাথায় দিয়া, ব্রাহ্মণ শয়নের ব্যবস্থা করিলেন। অল্প সময় মধ্যেই ব্রাহ্মণের নিদ্রা আসিল। নিদ্রার মুখে স্বপ্নরাজ্যের প্রবেশদ্বারেই এক মধু-নিস্যন্দিণী বাণী তাঁহার সুষুপ্তকর্ণে ধ্বনিত হইল। "ঠাকুর! আলোক আনিয়াছি, পারের ব্যবস্থা করিয়াছি, উঠিয়া আসুন।" স্বর যেন পরিচিত, কথা যেন শোনা, লোক যেন চেনা; স্থান যেন কতদিন হইতে, কত যুগের সম্বন্ধ বহন করিয়া কত ক্লান্ত অনাহার পীড়িত বিপন্নের আশ্রয়! রতন স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

প্রথম সত্যের সঙ্গে স্বপ্নরূপসীর কতকটা বাগ্‌বিতণ্ডা চলিল—কতকটা কলহের ভাব ধারণ করিল। সত্য নির্গুণ পুরুষ; সুতরাং কতকটা রসশূন্য। কোন গুণ নেই, তার কপালে আগুন। করুণাময়ী, রসময়ী স্বপ্নসুন্দরী ব্রাহ্মণের ক্ষুধা ভুলাইয়া, তৃষ্ণা ভুলাইয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য তাঁহাকে মধুময় রাজ্যে লইয়া যাইবে, নীরস সত্যপুরুষটা তাহা কিছুতেই সহিতে পারিল না।

স্বপ্ন বলিল, "ব্রাহ্মণ! চাহিয়া দেখ, কোথায় আসিয়াছ।"

সত্য বলিল, "আর চাহিতে হইবে না; তুমি সেই মন্দির সম্মুখেই ড়িয়া আছ।"

স্বপ্ন। দেখিতেছ না, কেমন স্থিরছায়াক্রমাকীর্ণ, সর্ব্বর্ত্তু ফলশোভিত, শ্যামল দেশ!

সত্য। মিছা কথা—মরুভূমি। তুমি নির্ম্মম নির্দ্দয় হৃদয়হীন স্থের আশ্রয়ে ক্ষুৎপিপাসাকাতর, শক্তিহীন।

ব্রাহ্মণ স্বপ্নপ্রলোভনে আকৃষ্ট হইলেন না। তিনি চোখ মেলিয়া হলেন;—দেখিলেন, সম্মুখে সেই মন্দির, নিদ্রিত দেবতাকে হৃদয় নে শায়িত করিয়া মৃত্তিকা স্তূপের ন্যায় জড় অস্তিত্ব বহন করিতে কাশে মাথা লুকাইয়াছে। মন্দির সম্মুখে সেই নাটমন্দির; আর রের ভিতরে রাশীকৃত, স্তরের পর স্তরে সজ্জিত, গাঢ় অন্ধকার।

ব্রাহ্মণ আবার চক্ষু মুদিলেন। সেই অবস্থাতেই মনে মনে দেবতাকে লেন—"ঠাকুর! সুস্বপ্ন দাও, আর আমাকে প্রলোভনে আকৃষ্ট ও না। করুণায় জীবের অস্তিত্ব। করুণায়, মরজগৎ সহস্র য়িকার আলয় হইলেও জীবযোগ্য সুখস্থান। করুণার পরিবীক্ষণে ৃষ্ট বলিয়াই জড়প্রকৃতি লাবণ্যময়ী। মৃত্তিকা বৃক্ষলতায় ফলফুলে প্রসবিনী; শিলাস্তূপ নির্ঝর সৌন্দর্য্যে মুক্তবেণী শিখরিণী। সত্যময় ুরুষ নিষ্ক্রিয়, নিগুর্ণ—অগণ্য নিরুপসর্গ স্কন্ধে লইয়া কোন নিরালম্ব নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে, সৃষ্টি জন্মমুহূর্ত্তেই লয় প্রাপ্ত । করুণা, শুধু করুণা—করুণার ধারাবর্ষণে নিত্যস্নাত সংসার ন মরণে শুধু অনন্ত অস্তিত্বের পথেই অগ্রসর হইতেছে।

ভগবানের করুণায় ব্রাহ্মণ আবার কিয়ৎক্ষণের জন্ত ক্লেশের হাত নিষ্কৃতি পাইলেন—আবার তাঁহার নিদ্রা আসিল। নিদ্রার সঙ্গে আবার স্বপ্ন। কি সুখের স্বপ্ন! মধুনিষিক্ত কুঙ্কুম-কেশরা

কুহেলিকার ন্যায় চারিদিক হইতে স্বপ্নসৌন্দর্য্য ভারে ভারে যেন তাঁহার প্রাণটী আবৃত করিয়া বসিল।

ব্রাহ্মণ দেখিলেন, তিনি একটী খরস্রোতা নদীতীরে দাঁড়াইয়া। পরপারে শোভাময়ী নগরী, উপরে নীল মেঘ। মেঘ বেড়িয়া, অনাবৃতা উদ্দীপিত লাবণ্যে চিরাবস্থিতা বিদ্যুৎ। যেন রজতরেখাপ্রান্ত নীল শাড়ী হেমাঙ্গিনীর অঙ্গ ঢাকিয়া আছে। নগরী মধ্যে, হেমকিরীট তুল্য স্নিগ্ধোজ্জ্বল কাঞ্চনমন্দির, অজ্ঞাতনাম্নী দেবতাকে হৃদয়ে নিবদ্ধ করিয়া জগতের কাছে লুকাইয়া, আপনার রূপোল্লাসে আপনিই তন্ময়—আপনিই ভোগ্য, আপনিই ভোক্তা; নিস্পন্দ যোগীর ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে।

ব্রাহ্মণের বড়ই ইচ্ছা পরপারের কাম্যনগরে কোনও ক্রমে একবার উপস্থিত হন। কেন না সেখানে শুধু নগর আছে, আর দেবতা আছে। দেবতার ঘরে রাশি রাশি প্রসাদ। সোণার থালায় সঞ্চিত পঞ্চাশদ্ব্যঞ্জনোপকরণ সঘৃত অমৃতোপম অন্ন। ব্রাহ্মণ দেখিলেন, সে সোণার নগরে সব আছে, কেবল দেবীর প্রসাদ পাইবার লোক নাই। তাঁহার বড় ইচ্ছা কোনও ক্রমে নগরের সেই অভাবটা পূরণ করেন। এমন সুদৃশ্য নগরের অঙ্গহানি তাঁহার প্রাণে সহিতেছিল না। কিন্তু সম্মুখে নদী; তিনি আবার বিক্রুতগামিনী তরঙ্গিনী। মাঝে মাঝে দুই একটা হাঙ্গর কুম্ভীর জলের উপর মাথা তুলিয়া তীরস্থ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, ভাল বিপদ! আমার হাত রহিয়াছে, মুখ রহিয়াছে—দেহে অসীম ক্ষমতা, ভ্রমণে অতুলনীয় শক্তি—সবই আছে। সম্মুখেও যথেষ্ট অন্ন—দেবতার প্রসাদ; তথাপি কি না আমি খাইতে পাইলাম না!

"হে ভবসাগর পারকর্ত্রী! আমাকে ক্ষুদ্র নদীটা পার করিয়া দাও।" কাতরকণ্ঠে ব্রাহ্মণ মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী দেবতার আবাহণ করিলেন। দেবতার চরণোদ্দেশে কত অশ্রুবিন্দুর অঞ্জলি দিলেন।

কোথা হইতে কে যেন বলিল—"ঠাকুর, পারের ব্যবস্থা করিয়াছি; ঠিয়া আসুন।" কাতরপ্রাণে ব্রাহ্মণ অদৃশ্যমানাবয়বা সুধাস্রোত-স্বনীর মূলান্বেষণে চারিদিকে চাহিলেন। দেখিলেন, দেখিতে দেখিতে াণার মন্দির যেন গলিয়া গেল। চারিদিক হইতে গলিত সুবর্ণস্রোত ারায় ধারায় নিবদ্ধ হইয়া, পরস্পরে জড়াজড়ি করিয়া, দেখিতে খিতে মূর্ত্তিমতী দেবী হইল। তাঁর পৃষ্ঠে ঘন মেঘের আবরণ, সম্মুখে বোদিত অরুণ-কিরণ। অলকাবৃত মুখে শতস্থানে প্রতিফলিত হইয়া ত স্থির দামিনীরেখায় দিগন্তে রূপ ছড়াইয়া সৌন্দর্য্যময়ী কথা কহিল, ঠাকুর! উঠিয়া আসুন।"

রতনের ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিনি চারিদিক চাহিলেন। দেখিলেন, দতলে উপবিষ্টা অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা রমণী।

"কে মা তুমি?"

"উঠিয়া আসুন, পারের ব্যবস্থা করিয়াছি।"

রতন উঠিয়া বসিলেন; দুই হাতে চক্ষু মুছিলেন। স্বপ্নটা তখনও র্য্যন্ত তাঁর মস্তিস্কের উপর অধিকার ত্যাগ করিতে ইতস্ততঃ করিতে-ল। সেই গলিত মন্দিরটা তখনও পর্য্যন্ত তাঁহার অন্তশ্চক্ষুর চারিধারে রিতেছিল। সেই জঙ্গমা শাললতা-পুষ্প-পত্রশোভিনী—তখনও পর্য্যন্ত নাবৃত, স্ফুটন্ত রূপমাধুরী লইয়া থাকিয়া থাকিয়া জাগিয়া উঠিতেছিল। তরাং রমণীর পারের ব্যবস্থাটায় তাঁহাকে কিছু গোলে ফেলিল—তিনি ক্ষু মুছিতে মুছিতে স্বপ্নটাকে নিষ্পীড়িত করিতে লাগিলেন, আর লিতে লাগিলেন,—"মন্দির ভাঙিয়া বাহির হইলি; তার সমস্ত পাদান নিজস্ব করিয়া, গায়ে মাখিয়া নিজেই নিজের মূর্ত্তি গড়িলি; ান ভাগ্যবলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখা দিলি; এখন কি মা তার ভবপারের বস্থা করিতে আসিয়াছিস্? রমণী এ কথার কোন উত্তর দিল না, াহ্মণ কি বলিল, বুঝিতে পারিল না। সে গলবস্ত্রে ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে

প্রণতা হইল ; আর বলিল—"আমি আপনাকে বড়ই কষ্ট দিয়াছি। কন্যার অপরাধ ক্ষমা করিয়া, তার গৃহে পদধূলি প্রদান করুন।"

এতক্ষণে ব্রাহ্মণের সমস্ত ঘুমের ঘোরটা কাটিয়া গিয়াছে। তিনি তখন মনে মনে কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন ; বুঝিলেন, ভাল ক'রে চোখ না মুছিয়া, এ রমণীর কাছে এ প্রকার বেদান্ত ব্যাখ্যাটী ভাল হয় নাই। তিনি বেদান্তকে স্বপ্নের সঙ্গে বিদায় দিয়া, সহজ কথায় উত্তর দিলেন,—"তোমার ঘর এখান হইতে কতদূর ?"

রমণী। আপনি কি পথশ্রমে বড়ই ক্লান্ত ?

রতন। পথশ্রমে ক্লান্ত, ক্ষুধায় জর্জরিত। মনের কথা যদি জানিতে চাও, তা হ'লে বলি, দেবতার পদপ্রান্তে স্থান লইয়াছি, আজ রাত্রের মতন উঠিতে ইচ্ছা নাই।

রমণী। তবে কি হবে প্রভু ! আমিই যে আপনার এই অবস্থার কারণ ! আপনি এখানে অনাহারে রাত্রি যাপন করিলে, আমার যে সেই ক্ষুদ্র বালকটীর অকল্যাণ হইবে ; গৃহস্থের অকল্যাণ হইবে !

রতন। তোমার বালকটীর কথা বলিলে আমাকে উঠিতে হয় ; কিন্তু গৃহস্থের অকল্যানে তোমার কি ? যে পামর অনাহার প্রপীড়িত অতিথির প্রতি বিমুখ—সাধ্বী ! তার কল্যাণ তুমি কামনা কর কেন ?

রমণী। গৃহস্থ আপনার আগমন সংবাদ পাইলে, হয়ত প্রত্যাখ্যান করিতেন না।

রতন। গৃহস্থের ভৃত্যত সংবাদ পাইয়াছিল। সে ব্যক্তি আথিতেয় হইলে, নিশ্চয় ভৃত্য তাঁহাকে সংবাদ দিত।

রমণী। সেটা ভৃত্যের অপরাধ। আমার বোধ হয়, গৃহস্থ এ কথা শুনিলে, সে ব্যক্তি তিরস্কৃত হইবে।

রতন। সে যা হউক, তোমার অতিথিসৎকারে গৃহস্থের কি ? তুমি সেবা করিবে, তাহাতে গৃহস্থের কল্যাণ হইবে কেন ?

রমণী। আমি তাঁর কন্যা।

রতন। তাঁর কন্যা! তুমিই সদাশিবের স্ত্রী।

রমণী আরও কিঞ্চিৎ মাথায় কাপড় টানিয়া মুখ অবনত করিয়া বসিল। ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন,—"তুমিই মা লক্ষ্মী; সদাশিবের স্ত্রী! আর সেই সুন্দর বালক? সেটী কি মা, তোমার পুত্র?

রমণী মুখ তুলিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল,—"সেটী আমার দেবর। আমার স্বামীর বিমাতার গর্ভজাত সন্তান।"

শুনিয়া ব্রাহ্মণের মুখে হাসি আসিল। সেই সরোবর তীরের ছবিটী আবার তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "তবেত দেখিতেছি, তোমাকে রহস্য করিবার তার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।"

রমণী। আমি তাহাকে সূতিকা ঘর হইতে মানুষ করিয়াছি।

রতন। কেন? তার মা?

রমণী। তিনি পুত্র প্রসব করিয়াই দেহত্যাগ করিয়াছেন।

রতন। তাহা হইলে তুমিই বালকের মা?

রমণী। সে আমাকে ভিন্ন জগতের আর কাহাকেও জানে না। আমাকেই মাতৃ সম্বোধন করে। আমার শ্বশুর জীবিত নাই, স্বামী থাকেন বিদেশে। শ্বশুরের শূন্যগৃহে সেই বালকই আমার একমাত্র অবলম্বন, একমাত্র সঙ্গী। যেখানে যাই, তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়।

ব্রাহ্মণ এইবার বুঝিলেন, বালক এত দুষ্ট হইল কেন। জননী-স্থানীয়া ভ্রাতৃজায়ার অত্যধিক আদরে সে অসহনীয় অত্যাচারী হইয়াছে।

রমণী। প্রভুর কি আমার স্বামীর সঙ্গে পরিচয় আছে?

রতন। পরিচয় আর কি বলিব মা! সদাশিব আমার শিষ্য।

সদাশিব পত্নী ভূলুণ্ঠিতা হইয়া ব্রাহ্মণের চরণে প্রণতা হইল। ব্রাহ্মণও তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আর বলিলেন, "আমি তাহারই [illegible]

রমণী। পত্রের শিরোনামে আমি স্বামীর হস্তাক্ষর অনুমান করিয়াছিলাম; কিন্তু অসম্ভব বলিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হই নাই।

রতন। যাক্, তাহ'লে আমাকে যাইতেই হইবে?

রমণী। এখন আর আমি কি বলিব? সে বালকত এখন আপনারই সম্পত্তি।

রতন আর কথা কহিলেন না। বিছানো মৃগচর্ম্ম আবার বাঁধিতে আরম্ভ করিলেন। রমণীও উঠিয়া দাঁড়াইল।

বন্ধনকার্য্য সমাধা করিয়া রতনও দণ্ডায়মান হইলেন। রমণী বলিল, "ক্ষণেক অপেক্ষা করুন; বাহিরে আলোক রাখিয়াছি, লইয়া আসি।"

রতন কিন্তু এতই ক্লান্ত যে, তাঁহার উঠিতে বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা ছিল না। রমণীর আগ্রহে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে চলিতে হইতেছিল। পিতার গৃহে আশ্রয় মিলিল না; কন্যাও অতিথিসৎকার কার্য্যে পিতার নাম পর্য্যন্ত মুখে আনিল না। পিতাপুত্রীর সম্বন্ধ, রতনের কেমন দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিল। তিনি রমণীকে জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন—"এমন ঐশ্বর্য্যবান পিতা তোমার, তুমি বালকটীকে লইয়া একা অবস্থান কর; ইহার কারণত আমি বুঝিতে পারিলাম না।"

"আমার অদৃষ্ট।"—এই বলিয়া সদাশিব-পত্নী আলোক আনিতে চলিল। অতৃপ্তকৌতূহলে ব্রাহ্মণ সেই অন্ধকারাবৃত চত্বরে রমণীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় পুনরুপবিষ্ট হইলেন। দাঁড়াইয়া থাকিতে তাঁহার ক্লেশ বোধ হইতেছিল। সেস্থান ত্যাগ করিতেও তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। তাঁহার ইচ্ছা, কোনও প্রকারে রাত্রিটা যাপন করিতে পারিলে, প্রভাতে শৈলজানন্দকে একবার দেখিয়া যান। তাহার সঙ্গে দেখা না হইলেও

ত রতনের কার্য্য সিদ্ধি হইল না। সদাশিবপ্রেরিত পত্র তিনি শৈলজানন্দ ভিন্ন আর কাহাকেও দিবেন না। শুধু ক্ষুধার পীড়নে ও সদাশিব-পত্নীর আগ্রহেই তিনি সে স্থান ত্যাগ করিতেছিলেন।

একটু পরেই সদাশিব-পত্নী ফিরিয়া আসিল ; এবং বলিল ঠাকুর আলোক দেখিতে পাইতেছিনা যে!

রতন। কোথায় রাখিয়াছিলে ?

রমণী। দ্বারের কাছে রাখিয়াছিলাম।

রতন। নিবিয়া গেল নাকি ?

রমণী। নিবিবার ত উপায় নাই! আমি একটী সুগঠিত লণ্ঠনের ভিতরে পুরিয়া দীপ আনিয়াছি। নিশ্চয় কেহ লইয়াছে।

রতন। তাহা হইলে করিবে কি ? আমিত সে বনপথে এ বিষম অন্ধকারে চলিতে পারিব না!

রমণী। আমি যে বালককে একা ঘরে রাখিয়া আসিয়াছি!

রতন। তুমিই বা এ অন্ধকারে কেমন করিয়া ফিরিবে ?

রমণী। তাহ'লে কি হবে প্রভু! আমি যে বড়ই বিপদে পড়িলাম!

রতন। আমি একজন খর্ব্বাকৃতি কৃষ্ণকায় পুরুষকে দ্বার খুলিয়া বাহির হইতে দেখিয়াছিলাম।

রমণী। কোন দিকে দেখিয়াছেন প্রভু ?

রতন। দ্বার খুলিয়া সে বামদিকের পথ অবলম্বন করিয়াছিল।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ার ন্যায় সদাশিব-পত্নী পুনরায় সে স্থান ত্যাগ করিল। রতন বুঝিলেন, বিধাতা তাঁহার অদৃষ্টে আজি আর আহার লেখেন নাই।

পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার গলা চাপিয়া ধরিল। ব্রাহ্মণ দেখিলেন, এতক্ষণে বিধাতা তাঁহার আহারের একটা ব্যবস্থা করিয়াছেন। তবে অদৃষ্টবশে আহার্য্য গলাধঃকৃত না হইয়া, গলপৃষ্ঠে সংলগ্ন! ক্ষুন্নিবৃত্তি

উদরের নয়—অন্তরের! তিনি প্রতি মুহূর্ত্তেই একটা ঘোরতর দুরবস্থার আশঙ্কা করিতেছিলেন। সুতরাং এরূপ অবস্থায় পড়িয়াও তিনি বিস্মিত কিংবা বিচলিত হইলেন না। ঘাড় ফিরাইয়া লোকটাকে দেখিবার জন্যও তিনি ব্যগ্রতা দেখাইলেন না। কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে বাপু তুমি?" লোকটা কর্কশস্বরে বলিল—"তুই কে?"

"আমি একজন অতিথি।"

"তুই কেমন করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলি?"

"তা যেমন করিয়াই প্রবেশ করি; তোমাদের কি অতিথিসেবার এইরূপই ব্যবস্থা? ক্ষুধার্ত্ত হইয়া দেবালয় সম্মুখে আহারের প্রত্যাশায় বসিয়াছিলাম। বড় বাড়ী, বড় মন্দির দেখিয়া অনেক প্রকার চর্ব্যচোষ্যের আশা করিয়াছিলাম। তা বাপু, তোমরা কি দেবতাকে নিত্য এইরূপ গলাধাক্কার ভোগ দাও?"

লোকটা অপ্রতিভ হইয়াই যেন গলা হইতে হাত ছাড়িয়া দিল। রতন মুখ ফিরাইলেন। দেখিলেন, এ ব্যক্তি সেই দীর্ঘ যষ্টিধারী খর্ব্বকায় প্রহরী। সে অন্ধকারে বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণের মুখ দেখিবার চেষ্টা করিল; ব্রাহ্মণের মুখের কাছে মুখ লইয়া গেল।

রতন বলিলেন, "পরিতোষ করিয়াত খাওয়াইলে; এখন কি আবার মুখশুদ্ধির ব্যবস্থা করিতেছ?"

"মুখশুদ্ধি এখানে মিলিবে না থানায় মিলিবে। তুমি এত রাত্রে গৃহস্থের বাড়ী প্রবেশ করিয়াছ। তুমি যে চোর নও, আমি কেমন করিয়া বুঝিব?"

"কেন বৎস বাঁটুল! যে সময় তুমি লণ্ঠনটী চুরি করিয়াছ; সেই সময়েই তোমার বোঝা উচিত ছিল, আমি চোর নই।"

একজন ভিক্ষুবেশী অপরিচিতের এরূপ তীব্ররহস্যে লোকটা বড়ই

ক্রুদ্ধ হইল। রুক্ষস্বরে বলিল—"সাবধান হইয়া কথা ক'। জানিস্ আমি কে?"

"দুর্ভাগ্য আমার, জানিনা। তুমি নিজেই পরিচয়টা দিয়া আমাকে ভাগ্যবান কর।"

আত্মমর্য্যাদার প্রতিষ্ঠা করিতে, ও ব্রাহ্মণকে ভয় দেখাইতে, প্রহরিবর গুরুগম্ভীরস্বরে বলিল,—"আমি মুন্না।"—নাম বলিয়াই মুন্না, রতনের মুখে বিস্ময়চিহ্ন দেখিবার জন্য তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

রতন মুন্নার নাম শুনিয়াছিলেন। মুন্না কোল জাতীয় প্রসিদ্ধ দস্যু। ছোটনাগপুরের আবালবৃদ্ধবনিতা তাহার নাম জানিত। সকলেই তাহাকে ভয় করিত। প্রসূতি দুরন্তবালককে ঘুম পাড়াইতে মুন্নার নাম গ্রহণ করিত। এখন তাহার বয়স হইয়াছে। ছোটনাগপুর ইংরাজ-হস্তে আসিবার পর, সে দস্যুব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া চাকুরি বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। শৈলজানন্দের গৃহে সে বহুকাল হইতে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত।

যোগ্যের সম্মুখেই যোগ্যতার অভিমান হয়। সামান্য প্রহরী জানে, রতন মুন্নার সহিত এতক্ষণ রহস্যের কথা কহিতেছিলেন; এখন নাম শুনিয়া গম্ভীর হইলেন; এবং মুন্না হইতেও গম্ভীরতর স্বরে বলিলেন—"আর, তুই জানিস্ আমি কে?"

স্বরের পরিচয় পাইয়াই, মুন্না বুঝিল, সম্মুখের বৃদ্ধটী সহজ লোক নয়। সে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। যেন কোন অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের আশঙ্কা করিল? কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া, অবশেষে অনুচ্চস্বরে জিজ্ঞাসিল—"কে তুমি?"

"আমি রতন রায়"—বলিয়াই রতন দণ্ডায়মান হইলেন।

রতনের নাম মুন্নার অবিদিত ছিলনা। তাঁহার শক্তির কথা, তাঁহার গুণগ্রাম, সে, তাহার দস্যুসহচরদিগের মুখে অনেক বার শুনিয়াছে।

প্রভু-জামাতা সদাশিবও অনেকবার তাহার কাছে রতনের নাম করিয়াছে। কিন্তু তাঁহার সহিত দেখার সুযোগ হয় নাই। আজ সে "যুগব্যায়তবাহুয়ংশলঃ কবাটবক্ষা পরিণদ্ধকন্ধরঃ" গুরুপ্রকৃষ্টবপুঃ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণবীরকে জীবনে প্রথম দর্শন করিল। দেখিয়াই চরণে লুটাইল। বলিল "দেবতা! না বুঝিয়া চরণে অপরাধ করিয়াছি, ক্ষমা কর।"

রতন মুন্নার হাত ধরিয়া তুলিলেন; এবং বলিলেন, "মুন্না! তুমি গাত্রোত্থান কর। প্রভুর কার্য্যে নিযুক্ত আছ, তোমার অপরাধ কি? উঠিয়া তোমার প্রভু-কন্যার সন্ধান কর। তিনি আমার সঙ্গে এখানে আসিয়াছেন। তাঁহার লণ্ঠন কে অপহরণ করিয়াছে, সেইজন্য আমরা স্থানত্যাগ করিতে পারিতেছিনা।"

মুন্না বলিল, "লণ্ঠন আমি লইয়াছি; আপনি আমার সঙ্গে আসুন।"

রতন মুন্নার সঙ্গে চলিলেন। পূর্ব্বোক্ত দ্বারসমীপে উপস্থিত হইতেই, সদাশিব-পত্নীর সহিত পুনঃসাক্ষাৎ হইল। মুন্না তাঁহাদিগকে দ্বারসমীপে অবস্থিত থাকিতে অনুরোধ করিয়া লণ্ঠন আনিতে প্রস্থান করিল। লণ্ঠনের দীপ নির্ব্বাপিত করিয়া সে একটা মরাইয়ের তলে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। অল্পক্ষণ পরেই আলো জ্বালিয়া মুন্না লণ্ঠনটী ফিরাইয়া দিল।

দুইজনে বাহিরে আসিবামাত্র মুন্না দ্বার রুদ্ধ করিল। সদাশিব-পত্নী ও মুন্না কেহ কাহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিল না। রতন বড়ই বিস্মিত হইলেন। কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ বৃথাপ্রশ্নে সময়ক্ষেপ করিতে অভিলাষী হইলেন না, সদাশিব-পত্নীর সহিত নীরবে পরিখা পার হইলেন।

দ্বাবিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

পরদিবস অপরাহ্নে মন্দিরপ্রাঙ্গণে বিচরণ করিতে করিতে বয়োভারাবনত শৈলজানন্দ দেখিতে পাইলেন, একটী দীর্ঘ ছায়া কোথা

হইতে তাঁহার পদপ্রান্তে সমুপস্থিত হইতে ছুটিয়া আসিতেছে। মাথা তুলিয়া তিনি দেখিলেন, ছায়ানুরূপ উন্নত দেহ এক অদৃষ্টপূর্ব্ব বৃদ্ধ, মন্দিরপার্শ্বস্থদ্বারের দিক হইতে তাঁহার দিকে আসিতেছে। তিনি অনিমেষ দৃষ্টিতে তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। আগন্তুক ধীর পাদক্ষেপে তাঁহার সমীপস্থ হইল। আসিয়া কোনও কথা না কহিয়া, তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিল। পত্র দিয়া নীরবে সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। শৈলজানন্দ আগন্তুকের আচরণে বিস্মিত হইলেন। নিজেও কিয়ৎক্ষণ নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া, তাহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

আগন্তুকই কথা কহিয়া নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। বলিল, "তোমার জামাতার নিকট হইতে এই পত্র আনিয়াছি। কল্য রাত্রে তোমার কন্যার সহিত এখানে আসিয়াছিলাম। তোমার দেখা না পাইয়া, ফিরিয়া তাহার পর্ণকুটীরেই আশ্রয় লইয়াছিলাম। দেখিলাম, রাজযোগ্য প্রাসাদাধিষ্ঠিত শৈলজানন্দের সমস্ত ঐশ্বর্য্য সেই পর্ণকুটীরেই লুকায়িত আছে। তাহার উচ্চপ্রাচীরবেষ্টিত, দেবমন্দিরশোভিত সুসজ্জিত গৃহ, অসংখ্য রত্নরাজি গর্ভে ধারণ করিয়াও দরিদ্র,—ক্ষীণ জীবন, কীটাবরণ হৃদয়হীন।"

শৈলজানন্দ তথাপি নিস্তব্ধ। রতন তাহাকে অনেক কথা শুনাইবেন বলিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু শৈলজানন্দকে দেখিয়া, তিনি আর বেশি কিছু বলিতে পারিলেন না। শৈলজানন্দের মূর্ত্তি দেখিয়াই ব্রাহ্মণ বুঝিলেন, বৃদ্ধ দারুণভূকম্প-শিথিলিত, অঙ্গসন্ধি কোন্ পূর্ব্বকালের অসংলিহগৌরীশঙ্করের ভগ্নাবশেষ। সংসারের ঘটনা বৈচিত্র্যের ঘাতপ্রতিঘাতে, শোকদুঃখমর্ম্মবেদনার রেখাসম্পাতে, এক সময়ের দেবতুল্য কান্তি, আজ নিষ্প্রভ, ভূপতিত উল্কাপিণ্ডের ন্যায় কেবল পূর্ব্বকালের উচ্চসংস্থান সূচিত করিতেছে। ব্রাহ্মণ আর কিছু বলিতে পারিলেন না। শৈলজানন্দকে দেখিতে দেখিতে তাঁর মনে

দুঃখ উপস্থিত হইল। কন্যার নিকটে তিনি পিতৃপরিচয় অবগত হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। পথে আসিতে আসিতে, তিনি কন্যাত্যাগী এই কঠোর বৃদ্ধের এক অপ্রীতিকর মূর্ত্তি কল্পনায় আঁকিয়া দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন; কিন্তু আসিয়া তাহা দেখিতে পাইলেন না।

শৈলজানন্দ কোনও কথা না কহিয়া পত্র খুলিতে লাগিলেন। রতন বলিলেন,—"আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে; এখন আমি আসিতে পারি

অতি ধীরভাবে শৈলজানন্দ বলিলেন, "ক্ষণেক অপেক্ষা করুন!"— এই বলিয়া তিনি ভৃত্যকে ডাকিলেন। পূর্ব্ব রাত্রের ঝম্মন আসিয়া উপস্থিত হইল। সে প্রভুর সম্মুখে ব্রাহ্মণকে দেখিল। ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। শৈলজানন্দ তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন—"কাল তুলসী এখানে আসিয়াছিল?" শৈলজানন্দের কন্যার নাম তুলসী। ভীতিকম্পিত কণ্ঠে ঝম্মন বলিল—"কই প্রভু! আমি ত তাহাকে দেখি নাই!"—

রতন বাধা দিয়া বলিলেন—"ভৃত্য শুধু আমাকে দেখিয়াছিল, দেখিয়া বাধাও দিয়াছিল; আমি বাধা মানি নাই। তুলসীকে ও ব্যক্তি দেখে নাই।"

শৈ। আপনি—

র। ব্রাহ্মণ।

শৈলজানন্দ হাত তুলিয়া প্রণাম করিলেন, আর ভৃত্যকে আসন আনিতে আদেশ করিলেন। ভৃত্য প্রাণ পাইল। সে আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া আসন আনিতে ছুটিল।

রতন বলিলেন, "আমার আর অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন কি?"

শৈ। "আমার প্রয়োজন আছে।"

র। আমি তীর্থে যাইবার জন্য বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছি। পথে বিলম্ব হইয়াছে। এখানেও একদিন বিলম্ব হইল।

শৈ। আর একদিন বিলম্ব করুন।

এই বলিয়া বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণের জন্য নীরবে পত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। রতন দেখিলেন, বৃদ্ধের মুখের ভাব দেখিতে দেখিতে পরিবর্ত্তিত হইল; চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ঝম্মন আসন লইয়া আসিল, শৈলজানন্দেরও পত্রপাঠ সমাপ্ত হইল। অতি কষ্টে মনোভাব গোপন করিয়া তিনি রতনকে বলিলেন, "আপনি কি একান্তই যাইতে ইচ্ছা করেন?"

রতন। তুমি যে কি প্রয়োজনের কথা বলিলে?

শৈ। তাহা একদিনে নিষ্পন্ন হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছিনা।

রতন। ভাল, দুইদিন না হয় রহিয়াই গেলাম।

শৈলজানন্দ, ঝম্মনকে বলিলেন, "আসন আমার ঘরে লইয়া যা—আর মুন্না কোথায় আছে, ডাকিয়া দে।"

মুন্নাকে আর ডাকিতে হইল না। সে আপনা হইতেই তাঁহাদের দিকে আসিতেছিল। ঝম্মন শুধু আসন রাখিতে চলিয়া গেল।

মুন্না নিকটে আসিলে, শৈলজানন্দ বলিলেন—"মুন্না! সম্মুখে এই যে বৃদ্ধটীকে দেখিতেছ, ইনিই বাঙ্গালী-বীর রতন রায়। ইনি মুলুক ছাড়িয়া চলিয়াছেন। বোধ হয় আর ফিরিবেন না। বাঙ্গালা তীর্থস্থ দেবতার পায়, এ পুষ্প অঞ্জলি দিতে চলিয়াছে।—আর পাইবেনা।"

একটী গভীর দীর্ঘশ্বাসতরঙ্গে শৈলজানন্দের কথা কিয়ৎক্ষণের জন্য যেন আন্দোলিত হইয়া উঠিল। দীর্ঘশ্বাস মুন্নার। শৈলজানন্দের কণ্ঠ কম্পিত। রতন বার্দ্ধক্যনমিতাঙ্গ বৃদ্ধের মুখের প্রতি চাহিয়া নির্ব্বাক, নিশ্চল।

কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া শৈলজানন্দ বলিতে লাগিলেন—"শোন

মুন্না! এ দেশে এরূপ সামগ্রী আর মিলিবে না। বাঙ্গালীর এ মূর্ত্তি জন্মের মত চলিয়া যায়। দুই দিন প্রাণ ভরিয়া সেবা করিয়া লও।"—বলিতে বলিতে বৃদ্ধ একবার ব্রাহ্মণের দিকে মুখ ফিরাইলেন। ব্রাহ্মণ দেখিলেন, বৃদ্ধের কঠোর দৃষ্টি, হৃদয়ের আবেগভরে কোমলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। যে মুখে তিনি হাস্যির অস্তিত্ব কল্পনায়ও আনিতে পারিতে-ছিলেন না, তাহা আজ শিলাবিদ্রাবী, নিরাশার তুষারকণসঞ্চয়ে কি মধুর সৌন্দর্য্যে সুপ্রসন্ন!

রতন সে মুখ দেখিয়া বৃদ্ধের মনোভাব সমস্তই যেন বুঝিতে পারিলেন। তিনিও নীরব থাকিতে পারিলেন না।

—"যথার্থ বলেছ শৈলজানন্দ! আর আসিবে না।"

শৈ। "আর আসিবে না। রতন রায় এ মুলুকে আর আসিবে না।

র। শৈলজানন্দও আসিবে না, মুন্নাও আসিবে না।

শৈলজানন্দ আর কথা কহিলেন না। ব্রাহ্মণকে লইয়া যাইতে মুন্নাকে ইঙ্গিত করিলেন। মুন্না ব্রাহ্মণকে সঙ্গে চলিতে অনুরোধ করিল। রতন বলিলেন, "একবার দেবতা দর্শন করিয়া আসি।"

শৈ। কোথায় দেবতা? আপনি তীর্থদর্শনে চলিয়াছেন, কিন্তু তীর্থে দেবতা নিদ্রিত! এই মন্দিরে পূর্ব্বে অষ্টভুজার অধিষ্ঠান ছিল, শত্রুহৃদয়-শোণিতে তাঁহার পিপাসা মিটিত, এখন দেবতা নিদ্রিত।"

র। আছে ত?

শৈ। ছিল ত জানি।

রতন দেবীদর্শনে চলিলেন। শৈলজানন্দ মুন্নাকে বলিলেন—"চাবী আনিয়া মন্দির দ্বার খুলিয়া দে। ব্রাহ্মণকে অষ্টভুজার কঙ্কাল দেখাইয়া, আমার গৃহে লইয়া আয়।"

চলিতে চলিতে রতন শৈলজানন্দের কথা কয়টী শুনিলেন। প্রহেলিকাময় শৈলজানন্দকে তিনি বুঝিয়াও বুঝিতে পারিলেন না।

[ক্রমশঃ]

বাঞ্ছিতার প্রতি।

(১)

আমি ওগো, এজীবনে করি নাই আশা
কখনো পাইব দেবি ! তব ভালবাসা ;
ভ্রমেও অশোক-তরু মরম-প্রাঙ্গনে
করিনি রোপণ,—তব চরণ তাড়নে
সরক্ত হৃদয়সম কুসুম উচ্ছ্বাসে
অঙ্গন করিতে পূর্ণ রক্ত হাস্যরাশে।
যে উষায় সুকোমল তব মুখখানি
প্রসন্ন ধবল জ্যোতি দিতেছিল আনি
আমার বেতসী কুঞ্জে, প্রথম দর্শনে
তোমারে দেবতা বলি করেছিনু মনে।
আমার এ পূতিগন্ধ সংকীর্ণ কোটরে
স্থাপি তব দেবমূর্ত্তি—এ ভাব অন্তরে
নাহি ছিল লেশমাত্র ; তখন হইতে
তোমার সে দেবরাজ্যে প্রবেশ লভিতে
ভেবেছি লাগিবে মোর যুগান্ত সাধনা ;
লক্ষবার বহ্নি মাঝে শোধিয়া আপনা
যদি যোগ্য হই, তবে তোমার দুয়ারে
প্রবেশ মাগিব দেবি ! নিশীথ আঁধারে।

(২)

সে নিবিড় নিশাকালে সুষুপ্ত গহন
সহস্র কলস মুখে ধরণী, গগন
দিবে পরিপূর্ণ করি' স্নিগ্ধ শান্তিজলে ;
তাহার প্লাবনখণ্ড তব কক্ষ তলে
সকলি করিবে পূর্ণ ; হেমদীপাধার
স্থির, শান্ত, সমুজ্জল, নীরব সভার
রাজচক্রবর্ত্তীসম, পূর্ণ মহিমায়
বিনিদ্র আনন তব সুবর্ণপ্রভায়
দিবে ধৌত করি ; আলেখ্য সকল
যেন সুর-সুন্দরীর গুপ্ত অন্তস্তল
বিচিত্র নীরব বর্ণে দিবে প্রকাশিয়া।
আয়ত দর্পণ খানি নয়ন খুলিয়া
সাকূত রভস বেগে করিবে আহ্বান
সুবিজনে অয়ি দেবি ! তোমার বয়ান।
স্বর্ণলতিকার মত তব দেহলতা
হিরণ্যপর্য্যঙ্ক'পরে রহিবে মুদিতা।
সুপ্ত, অনবদ্য তব যৌবন নন্দনে
সকলি' জাগিয়া রবে নীরব স্বপনে !

(৩)

ধীরে ধীরে প্রবেশিব অলস চরণে
তব সুপ্ত কক্ষ মাঝে সে অমৃতক্ষণে ;
হেরিব কিরূপে রাণি ! নিদ্রার অঞ্চলে
চঞ্চল সৌন্দর্য্যলীলা কোন্ পুণ্যফলে
অঙ্গে অঙ্গ আলিঙ্গিয়া ধ্রুব হ'য়ে যায় !
সে নির্জ্জন শর্ব্বরীর বিজন গুহায়
নেহারিব তব বিশ্ববিজয়িনী বেণী
শিথিল শয়নে পড়ি',—অলস রাগিণী
ছন্দের উদার কোলে ; দীপ্ত হিরণ্ময়
মেখলা, নূপুর শ্রেণী, কাঞ্চন বলয়

চন্দ্রহার, একাবলী, গুর্জরী মুখরা,
তব গৌর দেহতটে, লজ্জায় প্রখরা
মিলায়ে রহিবে স্তব্ধ ; চঞ্চল নিয়ত
তব নেত্রনীলিমার অধিবাসী কত
নয়ন অঞ্জন ছাড়ি মরমের কোণে
শত সুখস্বপ্নজাল রচিবে গোপনে।
সে শুভ মাহেন্দ্রযোগে লয়ে প্রাণ মম,
দেখা দিব তোমা মাঝে সুখস্বপ্ন সম।

(৪)

যখন জাগিবে দেবি ! বিমল উষায়,
সব মোর দেহ প্রাণ যেন উড়ে' যায়
তব সুখ স্বপ্ন সাথে ; মৃন্ময় প্রাচীরে
যেন আর বদ্ধ রহি, উত্তপ্ত সমীরে
তিল তিল নিত্য নিত্য মরিনা শুকায়ে !
তব মনোমন্দিরের সুপবিত্র বায়ে
শতকোটি রেণুরূপে সৌরভের মত
সাধ মোর নিত্য হয়ে থাকিব সতত।
নিদ্রা জাগরণে তব গুপ্ত জ্ঞানরূপে
রক্তব সাথে সাথে অতি চুপে চুপে !
মোর এই দেহ সনে লয়ে গুরুভার
যেন আর নাহি হই শত লক্ষবার
স্খলিত চরণ, ব্যর্থ, উপল-বন্ধুর
বিশ্বের জটিল পথে দুর্গম, সুদূর !
হে দেবী ! আশিষ কর জন্মজন্মান্তরে,
তপোবলে ছাড়ি' এই দেহের নির্ভর
পারি যেন একদিন ফলপুষ্পভারে
সাজায়ে বরণডালা আসিতে দুয়ারে।

শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত।

চীন-প্রবাসীর পত্র।

(১)

পৃথিবীর যাবতীয় স্বাধীন ও সুসভ্য জাতির সমাবেশ মধ্যে প্রবাস জীবনের দেড় বৎসর কাটিল। ইতিমধ্যে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহার প্রায় সকলগুলিই অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অভিনব। এ সকল জাতি যে কেন ও কিসে এত উন্নত এবং কোন মহামন্ত্রে স্থলে-জলে সমান আধিপত্য করিতেছে, তাহার একটী অব্যক্ত বিকাশ যেন সর্ব্বত্র সুপরিস্ফুট।

এই স্বাধীন সমষ্টির উৎসাহ, উত্তম, আবিষ্কার, কর্ত্তব্যবোধ, কার্য্য-কুশলতা, সাহস, সম্পদ, শৃঙ্খলা ও শূরত্ব দেখিলে বিস্ময়-বিমূঢ়ের স্থায় স্তম্ভিত হইতে হয়, এবং চিন্তা করিলে অবসাদ আসিয়া অবিভূত করে। তখন আমাদের নির্জ্জীব আস্ফালন গুলা যেন বিপক্ষের তীব্র ব্যঙ্গোক্তিতে পরিণত হইয়া লজ্জা ও ধিক্কার আনিয়া দেয়। কেবল জাপানই সে অবসন্নতার মধ্যে একটু আনন্দ আনিয়া ক্ষণেকের জন্ত আশার আশ্বাস দিয়া থাকে। সম্পর্কটা সম্পূর্ণই সুদূর, কিন্তু "গরজ বড় বালাই"! তাই আজ এসিয়ার জাপান,—"আমাদের জাপান"।" তদ্ব্যতীত, ভারতের বুদ্ধদেব যখন জাপানের গুরুদেব তখন জাপানকে আপনার বলিবার ইচ্ছাটা প্রাণ যেন স্বতঃই অযাচিতভাবে পোষণ করে। বাস্তবিকই, জাপান এক্ষণে নিজ উত্তম ও অধ্যবসায় বলে পৃথিবীর সুসভ্য শক্তি সমূহের অন্ততম;—কর্ম্মক্ষেত্রে বা রণক্ষেত্রে, স্থলে বা জলে সমসামর্থ্যবান। এত অল্পদিন মধ্যে, তাহাদের এই আকস্মিক অভ্যুত্থান সত্য সত্যই সভ্যজগৎকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, সমগ্র যুনানী ও মার্কিন শক্তিপুঞ্জের সহিত জাপানকে যখন সমগৌরবে একাসনে দেখিতে পাই, তখনই একটু আনন্দ আসিয়া কিছুক্ষণের জন্ত অবসাদটা দূর করিয়া দেয়।

যেমন প্রকৃতিভেদে রুচিভেদ, তেমনি দেশ ও সংসর্গভেদে মানসিক ভাবেরও অল্পাধিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে; এমন কি, স্বাধীন ও বহুপুষ্ট চিন্তাগুলিও অজ্ঞাতে ভিন্নপথে প্রবাহিত হয়। দুঃখ-দারিদ্র্যের কঠিন হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার ও উন্নত হইবার চিন্তা ও চেষ্টাগুলি দেখিতেছি ভারতের একরূপ এবং অন্তত্রে অন্তরূপ। বাস্তবিকই তাহারা দেশভেদে মনমধ্যে বিভিন্নভাব ধারণ করে। কর্ম্মক্ষেত্রে, সমসামর্থ্য, উচ্চপদ, উচ্চক্ষমতা, বড় চাকুরী ও আনুসঙ্গিক উন্নতি প্রভৃতি লাভের জন্ত, ভারতে সদুপায় খুঁজিতে হইলে, কতকটা শিক্ষা,

সুপারীস্, আবেদন, নিবেদন, প্রার্থনা, মুখাপেক্ষা, ভিক্ষা ও ক্রন্দনই বিশিষ্ট উপায়রূপে উপস্থিত হয় এবং প্রকৃষ্ট পথ হইয়া দাঁড়ায়; কিন্তু এই স্বাধীন শক্তিসমূহের মধ্যে থাকিলে, তাহা মনমধ্যে উদয় হয় না,—স্বতঃই যেন তাহা স্বাধীন স্রোতের অধীন হইয়া পড়ে এবং আত্ম-নির্ভর করিতে বলে। এখানে, শিক্ষিতের সম্মান, গুণীর গৌরব এবং উপযুক্তের উপাসনায় কাহারও নিকট জাতিভেদ দেখিলাম না। কিন্তু প্রার্থনা, মুখাপেক্ষা বা ভিক্ষায় ঘৃণাটা সকলেরই সমান,—কারণ তাহাদের নিকট মানুষ মাত্রেই সমর্থ জীব, ভিক্ষাটা অমানুষের লক্ষণ, তাই ভিক্ষায় এত উপেক্ষা—তাই তাহাদের নিকট অমানুষ মানুষের সহানুভূতির যোগ্য নহে।

এই প্রবন্ধটীর বিষয়ীভূত না হইলেও, প্রসঙ্গক্রমে একটী বিষয় উল্লেখ করিতেছি। বাসায় বসিয়া লিখিতেছি (এই মাত্র) একটী জাপানী যুবক আসিয়া অভিবাদন জানাইল। যুবাটি যে গরীব বা কষ্টে পড়িয়াছে; তাহা তাহার পোষাক পরিচ্ছদই প্রমাণ দিতেছিল। হাতে, সঙ্কোচিতভাবে পরিষ্কার রুমালে বাঁধা একটী ক্ষুদ্র বাক্স। বেশ বিনয়নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি সিগারেট ব্যবহার করেন কি? তাহা হইলে আমার কাছে লইলে আমি একটু উপকৃত হই।" আবশ্যক না থাকিলেও, ক্লিষ্টের এরূপ সঙ্গত আবেদন, কাহার সাধ্য অগ্রাহ্য করে! কারণ, সে আবেদনটি ভিক্ষুকের আবেদনের ন্যায়, দারিদ্র্য ও দুঃখ পরিস্ফুট করত হৃদয়কে দ্রব করিয়া দান গ্রহণ করে না; কিন্তু তাহার ভাব ও ভাষায় এমন একটু মনস্বিতা আছে; যাহাতে স্বতঃই হৃদয়কে মোহিত করিয়া তাহাকে সর্ব্বাগ্রে ঋণী করে, পরে দানের প্রতিদান স্বরূপ যথাযথ মূল্য গ্রহণ করে মাত্র। যাহা হউক, আমি কয়েক প্যাকেট সিগারেট লইলাম; ইহাতে আমার বিন্দু মাত্র ত্যাগস্বীকার ছিল না—কারণ, সিগারেট আমার নিত্যসেব্য বস্তু।

যুবাটি যথোচিত বিনম্রভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া চলিয়া গেল তাহার অবস্থা খুবই যে হীন তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই;—কিন্তু তাহাতে বিনয় পাইলাম, দীনতা পাইলাম না; আত্মনির্ভর পাইলাম, অনাথ ও অসহায়ভাব পাইলাম না; দীপ্তি পাইলাম, দৌর্ব্বল্য পাইলাম না। কিছুক্ষণ অবাক হইয়া ব্যাপারটি উপভোগ করিতে হইল। পরে, বন্ধুদিগের সহিত কথায় কথায় শুনিলাম, কোন ব্যক্তি ভিক্ষুকের অবস্থাগ্রস্ত হইলে, ইহাদের স্বদেশবাসীর মধ্যে কেহ তাহাকে কোন একটী দ্রব্য দিয়া তাহারই লাভের উপর জীবিকার্জ্জন ও সঞ্চয়ের পথ দেখাইয়া দেয়,—বাঁকিটা নিজের হাত। ইহাতে এক ক্ষেত্রে অনেকগুলি শিখিবার জিনিস পাই। (১) ভিক্ষা করিতে নিষেধ ও ঘৃণা (২) নিশ্চেষ্ট ও অলসভাবের অপ্রশ্রয়, (৩) আত্মনির্ভর, (৪) অল্প আয়ের মধ্যে নির্ব্বাহ ও সঞ্চয়, (৫) স্বাধীন ব্যবসার সহিত পরিচয়; ইত্যাদি জিনিস গুলিও জাপানের, সুতরাং তাহাতেও দেশের জিনিসের প্রচলন ও কাটতির পক্ষে গৌণভাবে সাহায্য করা হইতেছে। তাই বলিতেছিলাম এ সব দেশে কর্ত্তব্যবিচার ও উপায়চিন্তা প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

দেখিতেছি—এই সব স্বাধীন দেশে ও স্বাধীন সমষ্টির মধ্যে থাকিলে জড়েও জীবনীশক্তি আসে; যে কখন কোন বিষয় ভাবে না তাহাতেও আপনা হইতে ভাবনার সঞ্চার হয়;—এমন কি, জাতির ও দেশের হীনাবস্থার কথাও সেই অনুর্ব্বর মস্তিষ্কে কে যেন অলক্ষ্যে অঙ্কুরিত করিয়া দেয়! কাজেই তাহাকে সেই অদৃশ্য শক্তির অধীন ও বাধ্য হইয়া তাহারই অনুসরণ করিতে হয়। ক্রমে মনমধ্যে প্রশ্ন হইতে আরম্ভ হয়,—"কিসে ইঁহারা এত উন্নত হইল? সে পথটি প্রারম্ভ কোথায়?" কিন্তু ক্ষোভের বিষয়, তাহার সুনিশ্চিত সূত্র ও সোপানটি বাছিয়া বাহির করা কঠিন। এ স্থলে আমাদের চির-প্রচলিত "বাঁশ বনে ডোম কানা," এই গ্রাম্য কথাটি, খুবই খাটে। সূক্ষ্মের ক

সুদূর, কিন্তু যে সকল স্থূল বিষয় স্পষ্টতঃ চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে, তাহারই একটি লইয়া একটু আলোচনা করিতে ক্ষতি কি ?

আমাদের পুরাণাদিতে শক্তিস্থষ্টি নারীতেই কল্পিত হইয়াছে ; দৈত্যাধিপ মহিষাসুরের নিধন জন্য সর্ব্বস্থানে প্রভাবার লোকত্রয়ব্যাপী, সর্ব্বদেবতার শরীর হইতে উদ্ভূত সেই অতুল তেজঃ একত্র হইয়া নারী হইল। * * * "। বাইবেলেও দেখিতে পাই, আদিপুরুষ Adam, সহকারী (help-mate) না পাওয়ায়, ঈশ্বর, পুরুষের অংশ লইয়া নারী সৃষ্টি করিলেন। সেই স্ত্রীজাতি লইয়া জগৎ সম্পূর্ণ ও পুষ্ট, তাহাদের ছাড়িয়া দিলে বিশ্বের আশু পরিসমাপ্তি সূচীত হয়। সকল সমাজেই তাহারা অল্পাধিক বিভিন্নতার অন্তরালে, পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গিনী সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে, সহচরী ও সহধর্ম্মিণী ; পুরুষের প্রধান সহায় এবং মানবীতে শক্তি অধিষ্ঠাত্রীর সুপ্রকাশ ; সুতরাং তাহারা কখনই অসহায়া ও অশক্তা হইবার যোগ্য নহে, এবং তাহা হইতেও পারেনা।

আলোচ্য সম্প্রদায়গুলির রমণীমণ্ডলী মধ্যে তাহার বহু আভাস পাওয়া যায়। ইহারা কর্ম্মক্ষেত্রে, কর্ত্তব্যে বা কমনীয়তায় ; বীর্য্যে বা বিনাশে ; সামর্থ্যে বা সৌন্দর্য্যে ; শিক্ষা, শিল্প বা সাহিত্যে—সম-তেজস্বিনী। ইহারা কেবল পুরুষের সহকারী নহে—বরং সমকক্ষ সহকারী। এরূপ সহকারী না পাইলে, এ সকল জাতি এত দ্রুত উন্নত হইতে পারিত কি না সন্দেহ। স্বভাবতঃ পিতার প্রকৃতি অপেক্ষা মাতার গুণই সন্তানে অধিকমাত্রায় সংক্রামিত হইতে দেখা যায়। যোগ্য পিতার উপযুক্ত সন্তান অপেক্ষা, সুমাতার সন্তানই অনুপাতে অধিক। ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর, রণবীর ও মহাত্মাগণের জীবন বৃত্তান্তে ইহার বহু নিদর্শন বর্ত্তমান। অতএব, এই সকল রমণীগণের সন্তান সন্ততিগণ, মাতার তেজদীপ্ত প্রকৃতি ও গুণসকলের অধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করে, ক্রমে শিক্ষার সুবাতাসে তাহা মার্জ্জিত হইয়া জাতীয়

সমষ্টিকে পুষ্ট, উন্নত ও দৃঢ় করিতে থাকে। বীজ, সুক্ষেত্রেই সুফল প্রদান করে; সুক্ষেত্র না হইলে ইচ্ছানুরূপ ফলের আশা বিড়ম্বনা মাত্র।

এই সব চিন্তা করিলে কতকটা মনে হয়, এই সকল জাতির রমণী-গণ যদি আত্মনির্ভরসক্ষমা না হইত, তাহা হইলে এরূপ তেজস্বিনী হইতে পারিত কি না সন্দেহ। শক্তিঅংশরূপিণী রমণীতে তেজও একটি রমণীয়তা,—তাহার উগ্রতাই রমণীতে পুরুষতা। তাই তেজঃ-দৃপ্তা চাঁদবিবির প্রতিমূর্ত্তি দর্শনে কর্ণেল মেডোজ টেলর "a resolute womanly air" কথাটির ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

বংশগৌরবটা সাধারণে প্রযোজ্য নহে, সুতরাং তাহা উহ্য রাখিয়া বলিতে গেলে আত্মনির্ভরতাই রমণীকে তেজস্বিনী করিবার একটি প্রধান উপাদান বলিয়া বোধ হয়; ক্রমশঃ তাহা সন্তানাদিক্রমে সংক্রামিত হইয়া প্রকৃতিতে পরিণত করে। এক্ষণে কথা এই যে, সে আত্মনির্ভর আসে কোথা হইতে? ধনরত্নে ও পরোক্ষ পরমুখাপেক্ষায় যাহা আসে তাহা প্রকৃতপক্ষে আত্মনির্ভরতা নহে, এবং তাহা হইতে উৎপন্ন যে তেজঃ তাহা অধম প্রকৃতির;—তাহা তমেরই নামান্তর মাত্র। য়ুনানী ও মার্কিন রমণীগণকে দেখিয়া বোধ হয়, ইহারা শিক্ষা ও শিল্পের সাহায্যে আত্মনির্ভরটি আয়ত্ব করিয়াছে, এবং তাহার অনুরূপ তেজটিও পাইয়াছে। ইহাদের মধ্যে এরূপ রমণী অতি বিরল যাহার দুই চারিটি অর্থকরী বিদ্যা ও শিল্প জানা নাই; সুতরাং নিজের অন্ন বা অন্যান্য অভাব মোচনের জন্য অপরের মুখাপেক্ষাও নাই; তাই ইহারা স্বতঃই একটি স্বাধীন তেজের প্রকৃত অধিকারিণী। আবশ্যক থাকুক অথবা না থাকুক, ইহারা সকলেই আত্মনির্ভর সক্ষমা। ইহারাই এই সকল জাতির পুরুষের যথার্থ বল, এবং এই বলেই পুষ্ট হইয়া এই সকল জাতির জাতীয় বল।

সর্ব্বত্র এবং সকল ক্ষেত্রেই ইহাদিগকে পুরুষের সমকক্ষ সহচরী রূপে দেখিতে পাই। কি অশ্বপৃষ্ঠে, কি উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে, কি উত্তাল-

তরঙ্গবিক্ষোভিত মহাসমুদ্রবক্ষে, কি মনুষ্যসমাগমশূন্য বিজনবনে, কি নররক্তপ্লাবিত সমরক্ষেত্রে,—ইহাদের গতি সর্ব্বত্রই স্বাধীন ও নিঃশঙ্ক। আবার, সাহিত্য, শিল্প, কলাবিদ্যা, গণিৎ, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, দর্শন, অনুসন্ধিৎসা, আবিষ্কার প্রভৃতি কোন চর্চ্চারই অনাটন, ইহাদের মধ্যে দেখিতে পাই না। অতএব—প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে স্ত্রীজাতিকে যোগ্যা সহকারী পাইয়া (বা করিয়া লইয়া)—উভয়ের ধনে, এই সকল জাতি এত বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং হইতেছে। ইহাই এই সকল জাতির সিদ্ধির মূল মন্ত্র, এবং এইখানেই সাধনার গুপ্তবীজ উপ্ত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।

সকল দেশে ও সকল সমাজেই ঐশ্বর্য্যশালী আছেন; অনুপাতে তাঁহাদের সংখ্যা অধিক নহে; আবার অনেক বিবাহিতা রমণী আছেন, যাঁহাদের নিজের কিছুই করিবার আবশ্যক হয় না, সুতরাং তাঁহাদের কথা গণনার মধ্যেই নহে। কিন্তু মধ্যবিত্ত ও সাধারণ সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক রমণীই আত্মউপার্জ্জনে নির্ভর করিয়া,—সমালোচিত সভ্যভাবে থাকা, সন্তানাদির শিক্ষায় বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া তাহার গুরুভার বহন, তাহাদের উচ্চশিক্ষার জন্য এবং সর্ব্বাংশে পারদর্শী করিবার জন্য স্থানান্তরে প্রেরণ প্রভৃতি নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। স্বামীর উপার্জ্জন অল্প হইলে, স্ত্রী, কোন একটি কর্ম্ম স্বীকার করিয়া অথবা গৃহে বসিয়াই শিল্পাদির সাহায্যে সংসারটিকে সচ্ছল করিয়া রাখেন। এরূপ না হইলে, সম্ভবতঃ সেই পরিবার ভদ্রলোকের মত থাকিতে পারিত না, পুত্র-কন্যাগণকে যথোচিত শিক্ষা দিতে পারিত না, এবং অনেক বিষয়ে আপনাদের বঞ্চিত করিতে হইত। দারিদ্র্যদোষ, সকল গুণকে নষ্ট করে, তাহার উপর ঋণগ্রস্ত হইলে প্রতিভাবানও হীনপ্রভ ও তুচ্ছ হইয়া নষ্ট হয়; ইহজীবনে তাহার আর বিকাশের অবসর হয় না; মৌলিকতা তাহাকে একেবারে ত্যাগ করে, এবং এরূপ পরিবারের পুত্রকন্যাগণ প্রায়ই অবহেলিত হইয়া দরিদ্রের দলপুষ্টি করে। কিন্তু

এই সকল জাতির ভদ্র পরিবার মধ্যে সহজে তাহা হইতে পারে না; কারণ, পিতা ও মাতা উভয়েই উপার্জ্জনক্ষম এবং উভয়েরই স্বভাবগত চেষ্টা যাহাতে পুত্রকন্যা সুশিক্ষা লাভ করিয়া সর্ব্বগুণে সমুজ্জ্বল হয়।

যে দেশের স্ত্রীজাতি এতটা সামর্থ্য ধরে সে জাতির পুরুষের সামর্থ্যটা অনুমানের বস্তু, এবং তাহাদের পুত্রকন্যারা কি আদর্শ লইয়া বৰ্দ্ধিত হয়, তাহাও ভাবিবার জিনিস! যাহারা আত্মনির্ভরে নিজের সংসারকে সম্পূর্ণ ও উন্নত করিতে পারিয়াছে তাহাদের হৃদয়ে সকল প্রকার বলই বর্ত্তমান;—হতাশের তপ্তশ্বাস, অবসন্নের আলস্য-অধীনতার অবসাদ তাহাদের স্পর্শ করিতে পারে না। প্রত্যেক পরিবার সচ্ছল ও উন্নত হইয়া—গ্রাম সচ্ছল ও উন্নত হইয়াছে; প্রত্যেক গ্রাম সচ্ছল ও উন্নত হইয়া, প্রত্যেক নগরকে সচ্ছল ও উন্নত করিয়াছে; প্রত্যেক নগর সচ্ছল ও উন্নত হইয়া প্রত্যেক প্রদেশকে অবশেষে দেশকে সচ্ছল ও উন্নত করিয়া মহাশক্তিতে পরিণত করিয়াছে;—অপরাপর উন্নতিগুলি তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফল।

এই সকল জাতির সহিত কথাবার্ত্তায় এইরূপ অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় যে, যে স্ত্রীজাতি গণনায় পুরুষ অপেক্ষা অধিক; তাহারা যদি কেবল শোভার সামগ্রী হইয়া---ভোজন, ভূষণ, বিলাস ও ব্যসন লইয়াই রহিল, তাহা হইলে দেশের অৰ্দ্ধাধিক শক্তি নষ্ট হইল এবং দেশও অৰ্দ্ধাধিক উন্নতি হইতে বঞ্চিত হইল। কেবল তাহাই নহে—তাহাতে দেশ ক্রমশঃ অন্তরে অন্তরে জীর্ণ হইয়া হীনতাই প্রাপ্ত হয়; কারণ, স্ত্রীজাতি একটি হানিকর আসবাব হইয়া থাকিবার জন্য কখনই সৃষ্ট হয় নাই।

তাই, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ সকল জাতির মহাসাধনার অন্যতম মূলমন্ত্র—শক্তিরূপা তেজদৃপ্তা, জ্যোতির্ম্ময়ী রমণী।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাতিমোক্ষ।

বিনয় পিটকের প্রথম অংশের নাম পাতিমোক্খ। মহাবগ্গের (২-৩) মতে পাতিমোক্খ শব্দটী পতিমুখ শব্দ হইতে উৎপন্ন; সকল ধর্ম্মের প্রতিমুখ বা অগ্র বলিয়া বিনয় পিটকের প্রারম্ভে উল্লিখিত নিয়মগুলিকে পাতিমোক্খ বলে। এই মতে পালি ভাষার পাতিমোক্খ ও সংস্কৃত ভাষার প্রাতিমুখ্য এই দুইটি একই শব্দ। কিন্তু উদীচ্য বৌদ্ধ গ্রন্থে পাতিমোক্খ শব্দের পরিবর্ত্তে প্রাতিমোক্ষ এই শব্দ দৃষ্ট হয়। এই মতে, যে নিয়ম সমূহের প্রতিপালন দ্বারা পাপ সমূহের প্রতিমোচন বা উদ্ধার হয় তাহাকে প্রাতিমোক্ষ বলে। শেষোক্ত মতটী অধিকতর সমীচীন বলিয়া, পালিভাষার পাতিমোক্খ শব্দটীকে এখানে আমি প্রাতিমোক্ষ এই নামে প্রকাশিত করিলাম।

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা পবিত্র তিথি বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। বেদে দর্শপূর্ণমাস বিধির পুনঃপুনঃ উল্লেখ আছে। বৌদ্ধশাস্ত্রেও অমাবস্যা পূর্ণিমার ভূয়সী প্রশংসা দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ এই দুই তিথিতে উপবাস ও অতিসংযত ভাবে জীবনযাপন করিতেন। অতীত চতুর্দ্দশ দিনের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম তাঁহারা এই দুই দিনে স্মরণ করিতেন। যদি জ্ঞানপূর্ব্বক বা অজ্ঞান পূর্ব্বক কোন পাপ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলীর নিকট তাঁহারা উহা অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিন ব্যক্ত করিতেন। আর যদি তাঁহারা কোন পাপ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মৌনভাবে বসিয়া থাকিতেন। সকল ভিক্ষুর মধ্যে যিনি প্রধান তিনি সংঘনায়কের পদে অধিষ্ঠিত হইতেন এবং উপস্থিত ভিক্ষুমণ্ডলীর অনুমতি লইয়া প্রাতিমোক্ষের নিয়মগুলি পাঠ করিতেন। প্রাতিমোক্ষ পাঠের প্রণালী নিম্নে লিখিত হইল।

নিদান।

প্রথমে সংঘনায়ক ভিক্ষুমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন—"হে ভিক্ষুগণ, আপনারা শ্রবণ করুন। অদ্য অমাবস্যা (বা পূর্ণিমা)। যদি আপনাদের সুযোগ হয়, অদ্য উপবাস-ব্রত আচরণ ও প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করুন। হে মাননীয় ভিক্ষুগণ, আপনারা আপনাদের পাপ বা নিষ্পাপত্ব খ্যাপন করুন, আমি আপনাদের সমক্ষে প্রাতিমোক্ষ পাঠ করিতেছি।" ভিক্ষুগণ উত্তর করিতেন, "আমরা সকলেই সাবধানে ও সানন্দে শ্রবণ করিতেছি।" তদনন্তর সংঘনায়ক বলিতেন—"যিনি কোন পাপ করিয়া থাকেন, খ্যাপন করুন; আর যদি কোন পাপ না করিয়া থাকেন, নীরবে বসিয়া থাকুন।" কিয়ৎকাল পরে সংঘনায়ক পুনরায় বলিতেন, "হে মাননীয় ভিক্ষুগণ, আপনাদের মৌনভাব দেখিয়া জানিলাম আপনারা পরিশুদ্ধ আছেন।" তাহার পর সংঘনায়ক বলিতেন,—"ভিক্ষুগণ, এক্ষণে আপনাদের নিকট এক একটী প্রশ্ন তিনবার জিজ্ঞাসা করিব, আপনারা তিনবার প্রশ্ন শুনিয়াও যদি স্বীয় দোষ খ্যাপন করিতে বিমুখ হন, তাহা হইলে আপনারা জ্ঞানপূর্ব্বক মিথ্যা কথা বলার অপরাধের অপরাধী হইবেন। আপনারা জানেন, ভগবান বলিয়াছেন, জ্ঞানপূর্ব্বক মিথ্যা কথা বলায় নিজেরই মহা অনিষ্ট ঘটে। অতএব, হে মাননীয় ভিক্ষুগণ, আপনারা যদি কোন পাপ করিয়া থাকেন এবং উহা যদি আপনাদের স্মরণ থাকে, খ্যাপন করুন। ইহা দ্বারা আপনারা বিশোধিত হইতে পারিবেন, কারণ লোকের নিকট খ্যাপন করিলে পাপ লঘু হইয়া যায়।" তদনন্তর সংঘনায়ক পুনরায় বলিতেন "হে মাননীয় ভিক্ষুগণ আমি আপনাদের নিকট নিদান অর্থাৎ প্রাতিমোক্ষের ভূমিকা পাঠ করিলাম, এক্ষণে আপনাদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করি 'এ বিষয়ে আপনারা পবিত্র আছেন কি না?'" দ্বিতীয়

প্রাতিমোক্ষ।

বিনয় পিটকের প্রথম অংশের নাম পাতিমোক্‌খ। মহাবগ্‌গের (২-৩) মতে পাতিমোক্‌খ শব্দটী পতিমুখ শব্দ হইতে উৎপন্ন; সকল ধর্ম্মের প্রতিমুখ বা অগ্র বলিয়া বিনয় পিটকের প্রারম্ভে উল্লিখিত নিয়মগুলিকে পাতিমোক্‌খ বলে। এই মতে পালি ভাষার পাতিমোক্‌খ ও সংস্কৃত ভাষার প্রাতিমুখ্য এই দুইটি একই শব্দ। কিন্তু উদীচ্য বৌদ্ধ গ্রন্থে পাতিমোক্‌খ শব্দের পরিবর্ত্তে প্রাতিমোক্ষ এই শব্দ দৃষ্ট হয়। এই মতে, যে নিয়ম সমূহের প্রতিপালন দ্বারা পাপ সমূহের প্রতিমোচন বা উদ্ধার হয় তাহাকে প্রাতিমোক্ষ বলে। শেষোক্ত মতটী অধিকতর সমীচীন বলিয়া, পালিভাষার পাতিমোক্‌খ শব্দটীকে এখানে আমি প্রাতিমোক্ষ এই নামে প্রকাশিত করিলাম।

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা পবিত্র তিথি বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। বেদে দর্শপূর্ণমাস বিধির পুনঃপুনঃ উল্লেখ আছে। বৌদ্ধশাস্ত্রেও অমাবস্যা পূর্ণিমার ভূয়সী প্রশংসা দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ এই দুই তিথিতে উপবাস ও অতিসংযত ভাবে জীবনযাপন করিতেন। অতীত চতুর্দ্দশ দিনের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম তাঁহারা এই দুই দিনে স্মরণ করিতেন। যদি জ্ঞানপূর্ব্বক বা অজ্ঞান পূর্ব্বক কোন পাপ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলীর নিকট তাঁহারা উহা অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিন ব্যক্ত করিতেন। আর যদি তাঁহারা কোন পাপ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মৌনভাবে বসিয়া থাকিতেন। সকল ভিক্ষুর মধ্যে যিনি প্রধান তিনি সংঘনায়কের পদে অধিষ্ঠিত হইতেন এবং উপস্থিত ভিক্ষুমণ্ডলীর অনুমতি লইয়া প্রাতিমোক্ষের নিয়মগুলি পাঠ করিতেন। প্রাতিমোক্ষ পাঠের প্রণালী নিম্নে লিখিত হইল।

নিদান।

প্রথমে সংঘনায়ক ভিক্ষুমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন—"হে ভিক্ষুগণ, আপনারা শ্রবণ করুন। অদ্য অমাবস্যা (বা পূর্ণিমা)। যদি আপনাদের সুযোগ হয়, অদ্য উপবাস-ব্রত আচরণ ও প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করুন। হে মাননীয় ভিক্ষুগণ, আপনারা আপনাদের পাপ বা নিষ্পাপত্ব খ্যাপন করুন, আমি আপনাদের সমক্ষে প্রাতিমোক্ষ পাঠ করিতেছি।" ভিক্ষুগণ উত্তর করিতেন, "আমরা সকলেই সাবধানে ও সানন্দে শ্রবণ করিতেছি।" তদনন্তর সংঘনায়ক বলিতেন—"যিনি কোন পাপ করিয়া থাকেন, খ্যাপন করুন; আর যদি কোন পাপ না করিয়া থাকেন, নীরবে বসিয়া থাকুন।" কিয়ৎকাল পরে সংঘনায়ক পুনরায় বলিতেন, "হে মাননীয় ভিক্ষুগণ, আপনাদের মৌনভাব দেখিয়া জানিলাম আপনারা পরিশুদ্ধ আছেন।" তাহার পর সংঘনায়ক বলিতেন,—"ভিক্ষুগণ, এক্ষণে আপনাদের নিকট এক একটী প্রশ্ন তিনবার জিজ্ঞাসা করিব, আপনারা তিনবার প্রশ্ন শুনিয়াও যদি স্বীয় দোষ খ্যাপন করিতে বিমুখ হন, তাহা হইলে আপনারা জ্ঞানপূর্ব্বক মিথ্যা কথা বলার অপরাধের অপরাধী হইবেন। আপনারা জানেন, ভগবান বলিয়াছেন, জ্ঞানপূর্ব্বক মিথ্যা কথা বলায় নিজেরই মহা অনিষ্ট ঘটে। অতএব, হে মাননীয় ভিক্ষুগণ, আপনারা যদি কোন পাপ করিয়া থাকেন এবং উহা যদি আপনাদের স্মরণ থাকে, খ্যাপন করুন। ইহা দ্বারা আপনারা বিশোধিত হইতে পারিবেন, কারণ লোকের নিকট খ্যাপন করিলে পাপ লঘু হইয়া যায়।" তদনন্তর সংঘনায়ক পুনরায় বলিতেন "হে মাননীয় ভিক্ষুগণ আমি আপনাদের নিকট নিদান অর্থাৎ প্রাতিমোক্ষের ভূমিকা পাঠ করিলাম, এক্ষণে আপনাদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করি 'এ বিষয়ে আপনারা পবিত্র আছেন কি না?'" দ্বিতীয়

বার জিজ্ঞাসা করি "এ বিষয়ে আপনারা পবিত্র আছেন কি না?" তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করি "এ বিষয়ে আপনারা পবিত্র আছেন কি না?" তিনবার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার পর সংঘনায়ক পুনরায় বলিতেন "হে মাননীয় ভিক্ষুগণ, আপনারা নীরবে বসিয়া আছেন, ইহা দ্বারাই বুঝিলাম আপনারা এ বিষয়ে পবিত্র আছেন।"

উল্লিখিত প্রশ্ন প্রণালীর নাম নিদান বা প্রাতিমোক্ষের ভূমিকা।

পারাজিক ধর্ম্ম।

নিদান পাঠের পর সংঘনায়ক পারাজিক ধর্ম্মের নিয়ম পাঠ করিতেন। পারাজিক ধর্ম্মের চারিটী নিয়ম বিগুমান আছে, যথা—

১। যিনি ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, এবং পরে উহা ত্যাগ করেন নাই বা ভিক্ষুব্রত পালনের অসামর্থ্য প্রকাশ করেন নাই, এরূপ ভিক্ষুমাত্রই ব্যভিচার হইতে বিরত হইবেন। যে ভিক্ষু ঈষৎ পরিমাণেও উহাতে রত হইয়াছেন, তিনি পারাজিক পাপে অপরাধী ও সংঘ হইতে বিচ্যুত।

২। যে ভিক্ষু গ্রাম বা অরণ্য হইতে অদত্ত বস্তু গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি পারাজিক পাপে অপরাধী এবং সংঘ হইতে ভ্রষ্ট। "অদত্ত বস্তুর গ্রহণ" ইহার অর্থ চৌর্য্য। যে বস্তু গ্রহণ করিলে গৃহীতাকে রাজা চোর বলিয়া ধৃত করেন অথবা উহাকে বধ, বন্ধন বা নির্ব্বাসন করেন, এবং যাহা গ্রহণ করিলে লোক চোর, নির্ব্বোধ, মূর্খ বা অসাধু বলিয়া নিন্দিত হয়; এমন বস্তু মাত্রের গ্রহণকেই "অদত্ত বস্তুর গ্রহণ" বা চৌর্য্য বলা যায়।

৩। যে ভিক্ষু জ্ঞানপূর্ব্বক নরহত্যা করেন; বা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিবার নিমিত্ত নরঘাতুকের অন্বেষণ করেন, অথবা যিনি "হে বন্ধো, এই পাপপূর্ণ দুঃখময় জীবনে তোমার লাভ কি?

মৃত্যুর প্রশংসা করেন বা আত্মহত্যার প্রলোভন জন্মান; তিনি পারাজিক পাপের অপরাধী এবং সংঘ হইতে ভ্রষ্ট।

৪। যে ভিক্ষু অলৌকিক ক্ষমতা লাভ না করিয়াও বলেন অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন; এবং যিনি "আমি এইরূপে জানি, এইরূপে প্রত্যক্ষ করি" ইত্যাদি প্রকারে আর্হত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন বলিয়া প্রচার করেন; তিনিও পারাজিক পাপে অপরাধী এবং সংঘ হইতে ভ্রষ্ট।

উদ্ধৃত চারিটী পারাজিক ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া সংঘনায়ক সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলীকে বলিতেন—"মাননীয় ভিক্ষুগণ! আপনাদিগের নিকট পারাজিক ধর্ম্ম পাঠ করিলাম, যিনি ইহার একটীও উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন, তিনি পারাজিক পাপে অপরাধী এবং সংঘ হইতে ভ্রষ্ট। হে ভিক্ষুগণ, উল্লিখিত চারিটী পারাজিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি আপনারা এ বিষয়ে পবিত্র আছেন কি না? দ্বিতীয়বার আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি এ বিষয়ে আপনারা পবিত্র আছেন কি না? তৃতীয় বার আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি এ বিষয়ে আপনারা পবিত্র আছেন কিনা?"

কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া থাকিবার পর, সংঘনায়ক বলিয়া উঠিতেন, "হে মাননীয় ভিক্ষুগণ, আপনাদের মৌনভাব দেখিয়া বুঝিলাম আপনারা এ বিষয়ে পবিত্র আছেন।"

উদ্ধৃত প্রশ্নোত্তর প্রণালীর নাম পারাজিক পাঠ।

সংঘাদিশেষ।*

পারাজিক ধর্ম্ম পাঠ করিবার পর, সংঘনায়ক সংঘাদিশেষ ধর্ম্ম পাঠ করিতেন। সংঘাদিশেষ ধর্ম্মের ১৩টী নিয়ম ছিল, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে উল্লিখিত হইল—

* আমার বোধ হয় সংস্কৃতে ইহাকে সংঘাতিশেষ বলে। দ=ত, যেমন গোদম=গোতম।

১। নিদ্রাবস্থায় ভিন্ন অন্য সময়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যহানি দ্বারা ভিক্ষু সংঘাদিশেষ পাপে অপরাধী হন।

২। যে ভিক্ষু দূষিত অন্তঃকরণে কোন স্ত্রীলোকের হস্তধারণ, কেশস্পর্শ বা অন্য কোন অঙ্গ স্পর্শ করেন, তিনি সংঘাদিশেষ পাপে অপরাধী।

৩। যে ভিক্ষু দূষিত অন্তঃকরণে দুষ্টবাক্ প্রয়োগ দ্বারা কোন স্ত্রীলোককে সম্বোধন করিয়া উহার কামোত্তেজন করেন, তিনি সংঘাদিশেষ পাপে অপরাধী।

৪। যে ভিক্ষু দূষিত অন্তঃকরণে কোন স্ত্রীলোককে শুনাইবার নিমিত্ত ব্যভিচারের কথা উল্লেখ করেন, তিনি সংঘাদিশেষ পাপে অপরাধী।

৫। যে ভিক্ষু স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর আসক্তি উৎপাদনের সহায়তা করেন, তিনি সংঘাদিশেষ পাপে অপরাধী।

৬। যে ভিক্ষু ভিক্ষা করিয়া উপাদান সংগ্রহ করতঃ নিজের ব্যবহারের নিমিত্ত কুটীর নির্ম্মাণ করিতে চাহেন, তিনি যেন উক্ত কুটীরের দৈর্ঘ্য ও বিস্তারের পরিমাণ পূর্ব্বেই নির্দ্ধারণ করেন। উক্ত কুটীরের দৈর্ঘ্য ১২ বিতস্তি* অর্থাৎ ৬ হাত ও বিস্তার ৭ বিতস্তি অর্থাৎ ৩॥০ হাত হওয়া উচিত। যে স্থানে কুটীর নির্ম্মিত হইবে ঐ স্থানের চতুর্দ্দিকে যথেষ্ট পরিমাণে অনাবৃত ভূমি থাকিবে এবং ঐ স্থানে বর্ত্তমান কালে বা ভবিষ্যৎ কালে কোন বিপদের সম্ভাবনা আছে কি না তাহা নির্দ্ধারণ করিবার নিমিত্ত ভিক্ষুমণ্ডলীকে আহ্বান করিতে হইবে। যিনি ভিক্ষুমণ্ডলীকে আহ্বান না করিয়া, চতুর্দ্দিকে অনাবৃত ভূমি না

* অধুনা লঙ্কাদ্বীপের ভিক্ষুগণ বলেন এক বিতস্তির পরিমাণ বুদ্ধদেবের পাদচিহ্নের তুল্য। এই ভাবিয়া তাঁহারা বলেন এক বিতস্তির পরিমাণ=চারি হাত।

রাখিয়া অথবা উপরি লিখিত পরিমাণের অপেক্ষা বৃহত্তর করিয়া কুটীর নির্ম্মাণ করিবেন ; তিনি সংঘাদিশেষ পাপে অপরাধী হইবেন।

৭। যে ভিক্ষু নিজের ও পরের ব্যবহারের নিমিত্ত কোন স্থানে একটী সুবৃহৎ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে চাহেন, তিনি যেন উক্ত গৃহের চতুর্দ্দিকে যথেষ্ট অনাবৃত ভূমি রাখিয়া দেন এবং উক্ত স্থানটী পূর্ব্বেই ভিক্ষুমণ্ডলীর অনুমোদিত করিয়া লয়েন। তিনি যদি এই নিয়মের ব্যতিক্রম করেন, তাহা হইলে সংঘাদিশেষ পাপে অপরাধী হইবেন।

৮। যদি কোন ভিক্ষু পারুষ্য, ঈর্ষ্যা বা ক্রোধ বশতঃ অপর কোন ভিক্ষুর বিরুদ্ধে পারাজিক অপরাধের অভিযোগ আনয়ন করেন এবং পরবর্ত্তী কালে প্রকাশ পায় যে উক্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন—তাহা হইলে সেই ভিক্ষু সংঘাদিশেষ পাপে অপরাধী হইবেন।

৯। যে ভিক্ষু পারুষ্য, ঈর্ষ্যা বা ক্রোধ বশতঃ পারাজিক অপরাধের অভিযোগ আনয়ন করিয়া অন্য ভিক্ষুককে উপদ্রুত করেন এবং প্রমাণ স্বরূপে দুই একটী অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ করেন এবং পরবর্ত্তীকালে প্রকাশিত হয় যে উক্ত বিষয় গুলির সহ উক্ত অভিযোগের কোন সম্বন্ধ নাই, সেই ভিক্ষু সংঘাদিশেষ পাপে অপরাধী।

১০। যদি কোন ভিক্ষু কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদ সংঘটন করিবার নিমিত্ত বিচরণ করেন, অথবা যদ্দারা কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদ সংঘটিত হয় এমন বিষয়ের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তাহা হইলে সমাপস্থ ভিক্ষুমণ্ডলী উক্ত ভিক্ষুকে বলিবেন "মহাশয়, সাম্প্রদায়িক ভেদ সংঘটন করিয়া বেড়াইবেন না, যদ্দারা ভেদ সংঘটন হয় এরূপ বিষয়ের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন না ; মহাশয়, উক্ত সম্প্রদায়ের প্রতি সখ্য স্থাপন করুন। সম্প্রদায়ের লোকসকল পরস্পরের প্রতি নির্বিরোধে ও বন্ধুভাবে থাকিলে সুখে বাস করিতে পারে"। যদি ভিক্ষুমণ্ডলী কর্ত্তৃক তিনবার উপদিষ্ট হইয়াও ঐ ভিক্ষু

সাম্প্রদায়িক ভেদ সংঘটন হইতে নিবৃত্ত না হন, তাহা হইলে তিনি সংঘাদিশেষ পাপে অপরাধী।

১১। যদি কোন ভিক্ষু সাম্প্রদায়িক ভেদ সংঘটন করিয়া বেড়ান, এবং অপর এক, দুই বা তিনজন ভিক্ষু উক্ত ভিক্ষুর সহায়তা করেন, তাহা হইলে এই সহায়কারী ভিক্ষুগণও সংঘাদিশেষ পাপে অপরাধী হইবেন।

১২। যদি কোন ভিক্ষু সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলীর বাক্যে কর্ণপাত না করেন, এবং বলেন, "হে মহাশয়গণ, আপনারা ভালই হউক মন্দই হউক আমাকে কোন কথা বলিবেন না, আমিও ভালই হউক বা মন্দই হউক আপনাদিগকে কোন কথা বলিব না, হে মহাশয়গণ, আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমার বিষয়ে বাঙ্নিষ্পত্তি করিবেন না"; তাহা হইলে ঐ ভিক্ষুকে সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলী এইরূপ ভাবে উত্তর দিবেন, "হে মহাশয়, আপনি দুর্বচ হইবেন না। আমরা যাঁহাতে আপনার সহ কথা বলিতে পারি এইরূপ ভাবে অবস্থিত হউন, মহাশয় ভিক্ষুগণের সহ ধর্ম্মানুসারে কথা বলুন। ভিক্ষুগণও ধর্ম্মানুসারে আপনার সহ কথা বলিবেন, পরস্পরের কথালাপ ও পরস্পরের সহায়তায়ই তথাগতের ধর্ম্ম-পরিষদ্ জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, অতএব, মহাশয়, যাহাতে আমরা আপনার সহ কথা বলিতে পারি এরূপ করুন"। যদি সেই ভিক্ষু ভিক্ষুমণ্ডলীর কর্ত্তৃক এইরূপে তিন বার উপদিষ্ট হইয়াও তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করেন, তাহা হইলে তিনি সংঘাদিশেষ পাপে অপরাধী।

১৩। যদি কোন ভিক্ষু কোন জনপদের নিকটে বাস করিয়া পাপময় জীবন যাপন করেন, এবং তাঁহার দুষ্কীর্ত্তি সমূহ লোকের দর্শন ও শ্রবণ গোচর হয়, তাহা হইলে সমীপস্থ ভিক্ষুমণ্ডলী সেই ভিক্ষুকে বলিবেন "মহাশয়, আপনার জীবন পাপময়; আপনার দুষ্কীর্ত্তি লোকের দর্শন ও শ্রবণ গোচর হইয়াছে; মহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া এস্থান ত্যাগ

করুন, এখানে আপনি অনেক দিন বাস করিয়াছেন, আর এখানে আপনার বাস করিবার প্রয়োজন নাই”। যদি, ভিক্ষুমণ্ডলীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই ভিক্ষু প্রতিশোধ লইবার জন্য বলেন, “এখানকার ভিক্ষুমণ্ডলী রাগ দ্বেষ ও মোহে মগ্ন আছেন, পাছে ইহাঁদের দুষ্কীর্ত্তি প্রকাশ পায় এই ভয়ে ইহাঁরা কাহাকে ও এখান হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দিতেছেন, কাহাকেও বা বাধ্য করিয়া রাখিতেছেন ; তাহা হইলে সেই ভিক্ষুককে সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলী এইরূপ ভাবে উত্তর দিবেন—“হে মহাশয়, এখানকার ভিক্ষুমণ্ডলী রাগ দ্বেষ ও মোহে মগ্ন আছেন এমন কথা বলিবেন না, তাঁহারা স্বীয় দুষ্কীর্ত্তি গোপন করিবার জন্য আপনাকে নিষ্কাশিত করিতেছেন—এমন কথা বলিবেন না ; মহাশয়, আপনার জীবন পাপময়, আপনার দুষ্কীর্ত্তি সমূহ লোকের দর্শন ও শ্রবণ গোচর হইয়াছে, অতএব মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এ স্থান ত্যাগ করুন, এখানে আপনি অনেক দিন বাস করিয়াছেন, আর আপনার এখানে বাস করিবার প্রয়োজন নাই”। যদি সেই ভিক্ষু সেই সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলী কর্ত্তৃক তিনবার উপদিষ্ট হইয়াও তাঁহাদের কথা অনুসারে কার্য্য না করেন, তাহা হইলে তিনি সংঘাদিশেষ পাপে অপরাধী হইবেন।

উল্লিখিত ত্রয়োদশ সংঘাদিশেষ ধর্ম্ম পাঠ করিয়া সংঘনায়ক ভিক্ষু-মণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করিতেন—“হে মহাশয়গণ, আপনারা এ বিষয়ে পবিত্র আছেন কি না ?” দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিতেন—“হে মহাশয়গণ এ বিষয়ে আপনারা পবিত্র আছেন কি না ?” তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করিতেন—“হে মহাশয়গণ এ বিষয়ে আপনারা পবিত্র আছেন কি না ?”

কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিবার পর সংঘনায়ক বলিয়া উঠিতেন, “মাননীয় ভিক্ষুগণের মৌনভাব দেখিয়া বুঝিলাম তাঁহারা এ বিষয়ে পবিত্র আছেন।”

অনিয়ত ধর্ম্ম।

সংঘাদিশেষ ধর্ম্ম পাঠের পর সংঘনায়ক অনিয়ত ধর্ম্ম আবৃত্তি করিতেন। অনিয়ত ধর্ম্ম দুইটী ; যথা—

১। যদি কোন ভিক্ষু, ব্যভিচারের পক্ষে উপযোগী কোন নির্জন স্থানে কোন স্ত্রীলোকের সহিত এক আসনে উপবেশন করেন; এবং যদি অপর কোন বিশ্বস্ত স্ত্রীলোক তাঁহাকে ঐরূপ উপবিষ্ট দেখিতে পাইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে; এবং সেই ভিক্ষু যদি স্বীকার করেন যে তিনি স্ত্রীলোকের সহ এক আসনে উপবেশন করিয়াছিলেন; তাহা হইলে সেই বিশ্বস্ত স্ত্রীলোক তাঁহাকে পারাজিক, সংঘাদিশেষ ও প্রায়শ্চিত্তীয় এই ত্রিবিধ পাপের মধ্যে যে পাপে অপরাধী বলিয়া মনে করিবে, তিনি সেই পাপে অপরাধী সাব্যস্ত হইবেন।

২। যদি কোন ভিক্ষু ব্যভিচারের পক্ষে অনুপযোগী কিন্তু দুষ্টবাক্ প্রয়োগের পক্ষে উপযোগী কোন অনিভৃত স্থানে কোন স্ত্রীলোকের সহ এক আসনে উপবেশন করেন; এবং যদি অপর কোন বিশ্বস্ত স্ত্রীলোক তাঁহাকে ঐরূপ উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে; এবং যদি ঐ ভিক্ষু স্বীকার করেন যে তিনি স্ত্রীলোকের সহ এক আসনে উপবেশন করিয়াছিলেন; তাহা হইলে সেই বিশ্বস্ত স্ত্রীলোক তাঁহাকে সংঘাদিশেষ ও প্রায়শ্চিত্তীয় এই দ্বিবিধ পাপের মধ্যে যে পাপে অপরাধী বলিয়া মনে করিবে, তিনি সেই পাপে অপরাধী সাব্যস্ত হইবেন।

উল্লিখিত দুইটী অনিয়ত ধর্ম্ম আবৃত্তি করিবার পর সংঘনায়ক সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন "হে মাননীয় ভিক্ষুগণ, আপনাদিগের নিকট দুইটী অনিয়ত ধর্ম্ম পাঠ করিলাম, আপনারা এ বিষয়ে পবিত্র আছেন কি না?" দ্বিতীয়বার তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন

"হে মাননীয় ভিক্ষুগণ, আপনারা এ বিষয়ে পবিত্র আছেন কি না ?" তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করিতেন "হে মাননীয় ভিক্ষুগণ আপনারা এ বিষয়ে পবিত্র আছেন কি না ?"

কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া সংঘনায়ক বলিয়া উঠিতেন "মাননীয় ভিক্ষুগণের মৌনভাবে দেখিয়া বুঝিলাম ইহাঁরা এ বিষয়ে পবিত্র আছেন।"

নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় ধর্ম্ম।

অনিয়ত ধর্ম্ম পাঠের পরে সংঘনায়ক নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় ধর্ম্ম পাঠ করিতেন। উহাতে ত্রিশটী নিয়ম বিদ্যমান ছিল ; যথা—

১। ভিক্ষুগণ তিনটী চীবর ও কঠিন দুষ্য* ব্যতীতও একখানি অতিরেক চীবর বা অতিরিক্ত বস্ত্র দশ দিনের জন্য রাখিতে পারেন। যিনি এই অতিরিক্ত বস্ত্র দশ দিনের অপেক্ষা অধিক দিন রাখেন, তিনি নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী।

২। যে ভিক্ষু ত্রিচীবর ও কঠিন দুষ্য গ্রহণ করিয়াছেন তিনি যেন এক রাত্রির জন্যও উক্ত ত্রিচীবর পরিত্যাগ না করেন। যে ভিক্ষু সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলীর অনুমতি ব্যতীত ত্রিচীবর পরিত্যাগ করেন, তিনি নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী।

৩। যদি কোন ব্যক্তি কোন ভিক্ষুকে অসময়ে কয়েক খণ্ড বস্ত্র প্রদান করে তাহা হইলে উক্ত ভিক্ষু যেন উক্ত বস্ত্র দ্বারা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ

---

* ত্রিচীবর—সজ্ঘাটি, অন্তর্বাসক ও উত্তরাসঙ্গ এই ত্রিবিধ বস্ত্রের নাম ত্রিচীবর। ভিক্ষুমাত্রই এই ত্রিচীবর ধারণ করিবেন।

কঠিন দুষ্য—এক দিন ও এক রাত্রির মধ্যে প্রস্তুত অর্থাৎ সদ্যোনির্ম্মিত কার্পাস বস্ত্রকে কঠিন দুষ্য বলে। যদি কোন গৃহস্থ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কোন ভিক্ষুকে একখানি কঠিন দুষ্য প্রদান করেন তাহা হইলে উক্ত ভিক্ষু উহা গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু এই দান ও গ্রহণ ক্রিয়া অন্ততঃ পাঁচজন সমবেত ভিক্ষুর সমক্ষে নিষ্পন্ন হওয়া আবশ্যক।

প্রয়োজন।” যদি তিনবার এইরূপ বলায় সেই পরিচারক তাঁহাকে পরিচ্ছদ দেন, তাহা হইলে উত্তম। কিন্তু যদি তিনবার প্রার্থনা করিয়াও উক্ত ভিক্ষু পরিচ্ছদ না পান—তাহা হইলে তিনি আর তিনবার উক্ত পরিচারকের নিকট যাইতে পারেন, কিন্তু এ সময়ে কিছু না চাহিয়া তিনি যেন উহার নিকট মৌনভাবে দাঁড়াইয়া থাকেন। এইরূপ দাঁড়াইয়া থাকিয়া যদি পরিচ্ছদ পান, উত্তম। কিন্তু যদি ইহাতেও পরিচ্ছদ না পাইয়া তিনি উক্ত পরিচারককে পীড়াপীড়ি করেন, তাহা হইলে তিনি নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইবেন।

উক্ত ভিক্ষু যদি উক্ত পরিচারকের নিকট হইতে পরিচ্ছদ আদায় করিতে একান্ত অসমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি যেন স্বয়ং যাইয়া বা লোক প্রেরণ করিয়া মূল্যদাতাকে বলেন “মহাশয়, ভিক্ষুর জন্য আপনি যে পরিচ্ছদ মূল্য পাঠাইয়াছিলেন, সে মূল্যে উক্ত ভিক্ষুর কোন উপকার হয় নাই, মহাশয় সাবধান হউন, আপনার অর্থ যেন বৃথা নষ্ট না হয়।”

১১। যে ভিক্ষু শয্যার আস্তরণে রেশম ব্যবহার করেন, তিনি নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইবেন।

১২। যে ভিক্ষু শয্যার আস্তরণে কেবল ছাগকেশ নির্ম্মিত কৃষ্ণ পশম ব্যবহার করেন, তিনি নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইবেন।

১৩। নূতন আস্তরণ নির্ম্মাণকালে ভিক্ষুগণ ছাগকেশ নির্ম্মিত কৃষ্ণ পশম দুইভাগ, শ্বেত পশম এক ভাগ এবং ধূসর পশম এক ভাগ ব্যবহার করিবেন। যদি কোন ভিক্ষু নূতন আস্তরণ নির্ম্মাণ কালে এরূপ না করেন, তাহা হইলে তিনি নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইবেন।

১৪। নূতন আস্তরণ নির্ম্মাণ করিয়া উহা ছয় বৎসর ব্যবহার করিতে হইবে। যদি কোন ভিক্ষু নূতন আস্তরণ নির্ম্মাণ করিবার পর

নির্ম্মাণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইতে হইবে।

১৫। যখন কোন ভিক্ষু উপবেশনের নিমিত্ত নূতন আস্তরণ নির্ম্মাণ করিবেন তখন তিনি যেন পূর্ব্বতন আস্তরণের চতুর্দ্দিক হইতে এক বিতস্তি পরিমাণ সূত্র কাটিয়া লয়েন। যিনি ইহা না করিবেন, তিনি নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইবেন।

১৬। যদি কোন ভিক্ষু বিদেশে যাত্রাকালে পথমধ্যে ছাগের উর্ণা (পশম) প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তিনি ইচ্ছা করিলে উহা গ্রহণ করিতে পারেন; এবং যদি তাঁহার সঙ্গে কোন বাহক না থাকে তাহা হইলে তিনি উহা স্বয়ং হস্তে করিয়া তিন যোজন পথ লইয়া যাইতে পারেন। সঙ্গে বাহক না থাকিলেও তিনি যদি উহা তিন যোজনের অপেক্ষা অধিক দূর বহন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইতে হইবে।

১৭। যদি কোন ভিক্ষু ছাগের উর্ণা (পশম) কোন নিঃসম্পর্কীয় ভিক্ষুণী দ্বারা ধৌত, রঞ্জিত বা মর্দিত করিয়া লয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইতে হইবে।

১৮। যদি কোন ভিক্ষু স্বর্ণ বা রৌপ্য স্বয়ং গ্রহণ করেন অথবা নিজে গ্রহণ করিবেন বলিয়া অন্যকে উহা লইতে বলেন বা অন্যের নিকট গচ্ছিত রাখেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইতে হইবে।

১৯। যে সকল ব্যবসায়ে রৌপ্য ব্যবহৃত হয় এরূপ কোন ব্যবসায়ে যদি কোন ভিক্ষু নিযুক্ত হন তাহা হইলে তাঁহাকে নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইতে হইবে।

২০। যদি কোন ভিক্ষু কোন প্রকার ক্রয় বিক্রয়ে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইতে হইবে।

২১। দশ দিন পর্য্যন্ত একটী অতিরিক্ত ভিক্ষাপাত্র রাখা যাইতে পারে ; যে ভিক্ষু দশ দিনের অধিক কাল উহা রাখেন তাঁহাকে নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইতে হইবে।

২২। ভিক্ষুগণ ভিক্ষাপাত্র অন্ততঃ পাঁচ স্থানে ভগ্ন না হইলে ত্যাগ করিবেন না ; যে ভিক্ষু অন্ততঃ পাঁচ স্থানে ভগ্ন হয় নাই এমন ভিক্ষা-পাত্র বিনিময় করিয়া একটী নূতন ভিক্ষাপাত্র* গ্রহণ করেন। তাঁহাকে নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইতে হইবে।

২৩। ভিক্ষুগণ পীড়িতাবস্থায় ঘৃত, মাখন, তৈল, মধু ও গুড় ভৈষজ্যরূপে ব্যবহার করিতে পারেন ; এবং সাত দিন পর্য্যন্ত উহা সঞ্চিত রাখিয়া ভোগ করিতে পারেন ; যিনি সাত দিনের অপেক্ষা অধিককাল উহা রাখেন তাঁহাকে নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইতে হইবে।

২৪। গ্রীষ্ম ঋতু অতিবাহিত হইবার এক মাস পূর্ব্বেই ভিক্ষুগণ বর্ষা ঋতুর জন্য পরিচ্ছদের উপকরণ সংগ্রহ করিবেন ; গ্রীষ্ম ঋতু অতি-বাহিত হইবার অর্দ্ধ মাস পূর্ব্বেই ঐ উপকরণ দ্বারা পরিচ্ছদ নির্ম্মাণ করিবেন এবং উক্ত পরিচ্ছদ পরিধান করিবেন ; যদি কোন ভিক্ষু এক মাসের অপেক্ষা অধিক পূর্ব্বে উপকরণ সংগ্রহ অথবা অর্দ্ধমাসের অপেক্ষা অধিক পূর্ব্বে বর্ষার উপযোগী পরিচ্ছদ নির্ম্মাণ বা পরিধান করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইতে হইবে।

২৫। যদি কোন ভিক্ষু অন্য কোন ভিক্ষুকে পরিচ্ছদ প্রদান করেন এবং পরবর্ত্তী কালে ক্রুদ্ধ বা অসন্তুষ্ট হইয়া উহা স্বয়ং বা অন্যদ্বারা

---

* যদি সেই ভিক্ষু বিনিময়ে নূতন ভিক্ষাপাত্র প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলী উহা তাঁহার নিকট হইতে লইয়া, উক্ত ভিক্ষুমণ্ডলীর মধ্যে যে নিকৃষ্টতম ভিক্ষাপাত্র আছে তাহা প্রদান করিবেন এবং বলিবেন "হে ভিক্ষো, এই আপনার পাত্র,

কাড়িয়া লয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইতে হইবে।

২৬। যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট হইতে নিজের জন্য স্বয়ং সূত্র চাহিয়া লয়েন এবং পরে তন্তুবায়দ্বারা উক্ত সূত্রের বস্ত্র বয়ন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইতে হইবে।

২৭। যদি কোন গৃহপতি বা গৃহপত্নী কোন ভিক্ষুকে একটী পরিচ্ছদ প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে কোন তন্তুবায়কে বস্ত্র বয়ন করিতে বলেন; এবং উক্ত ভিক্ষু যদি গৃহস্থ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইবার পূর্ব্বেই তন্তুবায়ের নিকট যাইয়া বলেন—"ভাই, এই বস্ত্র আমারই জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ভাল করিয়া ইহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার ঠিক করিও, ইহা যেন মসৃণ হয়, সূত্রগুলি যেন সরলভাবে বিন্যস্ত হয়। ভাই তুমি যদি আমার পরিচ্ছদটি ভাল করিয়া প্রস্তুত কর, কোন সময়ে আমি তোমার কিছু উপকার নিশ্চয় করিব"—এবং সেই ভিক্ষু যদি এইরূপ বলিয়া উক্ত তন্তুবায়কে ভিক্ষাপাত্রে লব্ধ বস্তুমাত্রও প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইতে হইবে।

২৮। যদি কার্ত্তিকী পূর্ণিমার* ১০ দিন পূর্ব্বে কোন ভিক্ষুকে কেহ অত্যেক+ চীবর প্রদান করে তাহা হইলে তিনি উহা (বর্ষা) পরিচ্ছদ

* আষাড় বা শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ৪ মাস বা ৩ মাসকে প্রবারণা কাল বলে। এইজন্য কার্ত্তিকী পূর্ণিমাকে কার্ত্তিকী চতুর্মাসী পূর্ণিমাও বলে।

+ সৈন্যবিভাগে প্রবেশ কালে, বিদেশ যাত্রা সময়ে, রোগ হইলে, স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসবকালে অথবা যখন কোন অশ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির হৃদয়ে ভক্তির উদ্রেক হয় তখন, অথবা যখন কোন শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির সম্যক মঙ্গল হয়, তখন কোন ব্যক্তি কোন ভিক্ষুকে ভিক্ষুমণ্ডলীর সমক্ষে একটী বিশেষ পরিচ্ছদ প্রদান করে, তাহা হইলে সেই পরিচ্ছদকে অত্যেক বা আত্যয়িক পরিচ্ছদ বলে।

পরিত্যাগ কাল পর্য্যন্ত রাখিতে পারেন। যে ভিক্ষু তাহার পরেও উহা রাখেন, তাঁহাকে নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইতে হইবে।

২৯। কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চাতুর্মাসিক বর্ষা যাপনকালে যদি কোন ভিক্ষু অরণ্যমধ্যস্থিত স্বীয় আবাসকে ভগ্ন বা বিপদসঙ্কুল মনে করিয়া নিজের ত্রিচীবরের কোন একটী চীবর নিকটবর্ত্তী জনপদের মধ্যে কোন কুটীরে রাখিয়া আইসেন," তাহা হইলে তিনি ছয় রাত্রি পর্য্যন্ত ঐ চীবর বিরহিত হইয়াও বাস করিতে পারেন; কিন্তু ভিক্ষু-মণ্ডলীর অনুমতি ব্যতীত তাহার অপেক্ষা অধিক কাল ঐ চীবরবিহীন হইয়া বাস করিলে উক্ত ভিক্ষুকে নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইতে হইবে।

৩০। যদি কোন ভিক্ষু সঙ্ঘ বা ভিক্ষুমণ্ডলীর উদ্দেশে অর্পিত বস্তু আত্মসাৎ করিবার প্রয়াস করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় পাপে অপরাধী হইতে হইবে।

উল্লিখিত ত্রিশটী নিয়ম পাঠ করিবার পর সংঘনায়ক বলিতেন—"হে মাননীয় ভিক্ষুগণ, আপনাদের নিকট ত্রিংশৎ নিঃসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তীয় ধর্ম্ম পাঠ করিলাম; আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা এ বিষয়ে পবিত্র আছেন কি না? দ্বিতীয় বার আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা এ বিষয়ে পবিত্র আছেন কি না? তৃতীয় বার আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা এ বিষয়ে পবিত্র আছেন কি না?"

কিয়ৎকাল পরে সংঘনায়ক বলিয়া উঠিতেন—"মাননীয় ভিক্ষুগণের মৌনভাব দেখিয়া বুঝিলাম তাঁহারা এ বিষয়ে পবিত্র আছেন।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

হরিহর বাইতি।

(ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য হইতে গৃহীত।)

দুশ্চর তপঃসাধনার পর, লাউসেন হাকণ্ড নামক স্থানে সূর্য্যদেবের কৃপালাভে সমর্থ হইলেন; সূর্য্যদেব পশ্চিমে উদিত হইয়া গৌড়-বাসিগণের কাছে লাউসেনের তপঃপ্রভাব প্রমাণিত করিবেন, এই বরদান করিয়া ভক্তকে আশ্বস্ত করিলেন।

ধর্ম্মঠাকুরের পূজার অপরাধে গৌড়ে অতিবৃষ্টি হইয়াছিল। অধিবাসিগণ দুর্দ্দশার চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। সহসা এক দিন বিস্মিত কৃষক লাঙ্গল হস্তে দেখিতে পাইল,—উষা পশ্চিমের নভস্থল স্বর্ণবর্ণমণ্ডিত করিয়া অপূর্ব্ব সুন্দরীর বেশে বিশ্বের দিকে চাহিয়াছেন,—এই অচিন্তিত-পূর্ব্ব প্রাকৃতিক লক্ষণে গৌড়ের ঘরে ঘরে শুভ শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। পশ্চিমে উদিত সূর্য্যগোলক দর্শনে গৌড়বাসী হরিহর-বাইতি আনন্দে স্বীয় ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিল। এ দৃশ্য—অসম্ভবের সংঘটন,—এ দৃশ্যের ছটায় হরিহর বাইতি মুগ্ধ হইয়া গেল। যে দিক হইতে উষা প্রতিদিন উদিত হন—আজ সে দিক্ উষার মন্দীভূত প্রতিফলিত কিরণে মণ্ডিত হইয়াছে, কিন্তু পশ্চিম দিক্-বিভাগ তরুণ সূর্য্য অঙ্কে লইয়া একদিনের অপূর্ব্ব গৌরবে উদ্ভাষিত হইয়া উঠিয়াছে। সূর্য্যের এই পশ্চিমোদয়ের প্রধান সাক্ষী হরিহর বাইতি। হরিহর ভাল করিয়া এই অতুল্য তপঃপ্রভাবের মহিমা দেখিয়া রাখ, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে এই আশ্চর্য্য কথা জ্ঞাপন করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিও না। তুমি প্রতিদিন প্রাতে এক লক্ষ হরিনাম জপ করিয়া থাক, তুমি গৌড়ের একজন প্রধান মণ্ডল। আজ যে পুণ্য দৃশ্য দেখিলে, তাহা ভাল করিয়া স্মৃতিতে অঙ্কিত করিয়া রাখ,

রাজদ্বারে এ কথার সাক্ষ্যের জন্য তোমার আহ্বান হইতে পারে, তখন দ্বিধা-কম্পিতস্বরে মার্ত্তণ্ডদেবের এই অসম্ভব কাণ্ডকে চক্ষের ধাঁধা বলিয়া জিহ্বা কলঙ্কিত করিও না।

লাউসেন গৌড়ে প্রত্যাগত হইয়াছেন; উৎকট তপশ্চরণজনিত পুণ্যের জ্যোতি তাঁহার শুভ্র ললাট হইতে শিখার ন্যায় বিচ্ছুরিত হইতেছে; তাঁহাকে দেখিতে লোকে লোকারণ্য; সুমহৎ পুণ্যের প্রভা একটি জ্যোতির্ম্ময় গোলকের সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যস্থ লাউসেনের বরণীয় মূর্ত্তিতে একটি অখণ্ড স্বর্গীয়শ্রী প্রদান করিয়াছে। গৌড়েশ্বর আহ্লাদে লাউসেনকে অভিনন্দন করিয়া লইলেন। মহাপাত্র মাহুদ্যার চক্ষে সেই দৃশ্য অসহ্য হইল; রাজসকাশে অগ্রসর হইয়া মাহুদ্যা নিবেদন করিল—"মহারাজ, বালকের কথায় কি অসম্ভব অলীক গল্পে বিশ্বাস স্থাপন করিতেছেন? পশ্চিমে সূর্য্য উদয় হন, একথা কি বিশ্বাস্য। এই বালক যে সকল কথা আপনাকে বলিল তাহার সমস্তই রূপকথা। নিজের মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া ত্রেতায় রাবণ তপস্যা করিয়াছিল, জগতে এরূপ তপস্যার কথা আর শোনা যায় না। এই বালক স্বীয় শিরশ্ছেদ পূর্ব্বক ধর্ম্মের আরধনা করিয়াছে—এরূপ অসম্ভব কথার সাক্ষী কে? শামুলা স্ত্রীলোক, অতিরঞ্জন ও মিথ্যা রমণীজিহ্বার অলঙ্কার, আপনি কেন এমন সকল কথা বিশ্বাস করিতেছেন? কপিল, পরাশর, মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি ঋষিগণ যাহা পারেন নাই, এই বালক তাহাই সিদ্ধ করিয়াছে! সূর্য্যদেব তো একমাত্র হাকণ্ড কিম্বা ময়না-গড়ের নহেন, বিশ্বের সমস্ত লোক তাঁহার উদয়ের সাক্ষী, কে কবে দেখিয়াছে যে সূর্য্যদেব পশ্চিমে উদিত হইয়াছেন? লাউসেনকে জিজ্ঞাসা করুন, তাহার সাক্ষী কে?

লাউসেন স্থির গাম্ভীর্য্য সহকারে বলিলেন—আমার মিথ্যা বলার অভ্যাস নাই—আমার সাক্ষী হরিহর বাইতি।

রাজা হরিহর বাইতিকে তথনই রাজসভায় উপস্থিত করিতে আদেশ করিলেন। মহাপাত্র মাহুদ্যা অগ্রসর হইয়া বলিল—হরিহর অন্য এক দুর পল্লীতে কোন বন্ধুর পিতৃশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছে, তাহাকে কল্য দ্বিপ্রহরে হাজির করিয়া দিব। যে পর্য্যন্ত হরিহরের প্রমাণ গৃহীত না হয়, সে পর্য্যন্ত লাউসেন এরূপ অসম্ভব গ সৃষ্টি করার অপরাধে বন্দী থাকিবেন।

রাজসভা ভঙ্গ হইল। গৌড়বাসীর শঙ্কিত চক্ষু লাউসেনের জন্য মুহুর্মুহু জলভারাচ্ছন্ন হইতে লাগিল; কিন্তু লাউসেন প্রফুল্লচিত্ত;—দুশ্চরতপা লাউসেন পার্থিব দুঃখ বিপদকে ভ্রূক্ষেপেও গ্রাহ্য করিলেন না; বন্দীর তৃণশয্যা এবং রাজপর্য্যাঙ্ক তাঁহার চক্ষে তুল্য, ধর্ম্মে অচলা ভক্তি তাঁহার আনন্দের চির উৎস স্বরূপ। তিনি যে কারাগৃহে প্রবেশ করিলেন, তথায় তাঁহার সঙ্গে যেন নিবিড় দুর্ভেদ্য অন্ধকারে একটি উজ্জ্বল আনন্দের কিরণ রেখা প্রবেশ করিল!

মাহুদ্যা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া হরিহর বাইতিকে গোপনে ডাকিয়া আনিল। মাহুদ্যা-বর্ণিত তাঁহার বন্ধুর পিতৃশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ ব্যাপার মিথ্যা, হরিহরকে করায়ত্ত করিয়া লওয়ার অবকাশের জন্য এই কথা মহাপাত্রের উদ্ভাবিত একটা ফন্দী মাত্র।

হরিহর উপস্থিত হইলে মাহুদ্যা তাহাকে দুই শত টাকা ও দ্বাদশটি মোহর প্রদান করিয়া বলিল, কল্য রাজসভায় তাহাকে বলিতে হইবে পশ্চিমে সূর্য্য উদিত হয় নাই। এই কথা বলার পর হরিহর বাইতি বিপুল অর্থ পাইবে, অত্যকার এই সামান্য অর্থ তাহার পুরস্কারের সূচনা মাত্র। হরিহর অসম্মত হইল; কিন্তু মহাপাত্র বলিল—"অর্থই সর্ব্ব ধর্ম্মসার, এই অর্থদ্বারা পূজা অর্চ্চনা ও তীর্থ ভ্রমণ করিয়া গৃহস্থগণ পরলোকে স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া থাকে। অর্থোপার্জ্জনকালে কেহই একান্তরূপে সত্যপালন করিতে সমর্থ হয় না—একান্ত-সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির

পক্ষে উপার্জ্জন সম্ভবপর নহে, অথচ অর্থোপার্জ্জন না করিলে সমস্ত ভাবী পুণ্যসঞ্চয়ের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়, তুমি ভাবিয়া দেখ, এই অর্থ উপেক্ষা করা তোমার উচিত কি না, তোমার অবস্থা তেমন ভাল নহে।"

হরিহর বাইতির মনে একটু একটু করিয়া লোভের উদয় হইতেছিল। সন্ধ্যার সম্মুখে সূর্য্যালোকের শেষ রেখা যেরূপ ধরিত্রীর বক্ষ হইতে একটু একটু করিয়া মুছিয়া যায়, অর্থের প্রলোভনে তাহার পুণ্যের বল ও তেমনই ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইতেছিল; এই দুই শত মুদ্রা, দ্বাদশটি মোহর এবং আরও প্রচুর অর্থ মুহূর্ত্তে তাহার করায়ত্ত হইতে পারে এবং তাহা হইলে তাহার অবস্থা কতটা উন্নত ও স্ফীত হইয়া উঠিতে পারে, সে অল্পকালের মধ্যে এই স্বপ্নে বিভোর হইয়া পড়িল। কে যেন তাঁহার হৃদয় হইতে সরিয়া দাঁড়াইল এবং কে যেন তাহার হৃদয়ে আসিল—একটা আঁধারের সত্তায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। মাহুত্তার যুক্তির সারবত্তা সে যত না হৃদয়ঙ্গম করিল, সেই নেত্র সম্মুখে স্থিত অর্থপূর্ণ-থলিয়ার মৌন আমন্ত্রণে সে তদপেক্ষা অধিকতর আকৃষ্ট হইল।

ভাবিয়া চিন্তিয়া হরিহর বাইতি বলিল—"তবে দিন্ থলিয়াটি, আপনার উপদেশ মানিয়া চলাই আমাদের কর্ত্তব্য, আপনি মুনিব। হাঁ কি না বলা যত সহজ, উপার্জ্জন তত সহজ নহে।" হরিহর বাইতি মাহুত্তার নিকট মিথ্যা বলিতে প্রতিশ্রুত হইয়া বাড়াতে ফিরিল।

তখন নিদ্রাদেবী শনৈঃ শনৈঃ গৌড়নগর অধিকার করিয়া লইয়াছেন। মাতৃস্তন মুখে শিশু যেরূপ শান্তিসুধা উপভোগ করে, ব্যথিত ও তাপিত ব্যক্তিগণ নিশীথিনীর ক্রোড়ে সেইরূপ বিশ্রাম পাইয়াছে; একমাত্র হরিহর বাইতির চক্ষে নিদ্রা নাই—তাহার ব্যথা নিবারণের জন্য নিশীথিনী স্বীয় মন্ত্রপূত কর বুলাইয়া দিতেছেন না—তাহার

বালিসের নীচে দ্বাদশটী মোহর ও দ্বিশত মুদ্রা পরম পরিতৃপ্তি ও দুঃসহ ব্যাথায় জড়িত হইয়া যে উৎকট অধৈর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে হরিহর জাগ্রত রহিয়াছে। সে কি যেন পাইয়াছে—তাহা যেমনই আনন্দ সহকারে আস্বাদ করিতে যাইবে, অমনই সে কি যেন হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাহার অস্পষ্ট বেদনাপূর্ণ স্মৃতি সেই আনন্দরসাস্বাদের বিঘ্ন জন্মাইতেছে।

পরদিন প্রাতে রাজার কোটাল হরিহর বাইতির বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া বলিল, "হরিহর তোমার রাজসভায় তলপ্ পড়িয়াছে—তুমি শীঘ্র এস।"

হরিহর বাইতি এক লক্ষবার হরিনাম জপ করিয়া থাকে; নামজপ পূর্ণ হইলে যাইবে, ইহা জানাইল। রাজার কোটাল যমদূতের ন্যায় দ্বারে বসিয়া রহিল।

হরিহর বাইতির স্ত্রী বিমলা আজ বিমনা; তাহার স্বামী মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে যাইবে, বিমলার মুখখানি ছোট হইয়া পড়িয়াছে—সে যেন কি এক গৌরব-স্বর্গে সুখে ছিল, আজ তাহাকে কে সেই সুখের স্থান হইতে তাড়াইয়া দিবে! সে কখনও স্বামীর কার্য্যের প্রতিবাদ করে নাই, কিন্তু আজ মনের কথা না বলিলে বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। সে আজ পড়সীদের সঙ্গে স্নান করিতে গেল না, গৃহের এক প্রান্তে অশ্রু চক্ষে উদাসিনীর মত বসিয়া রহিল; তাহার কিছু ভাল লাগিল না—অবশেষে কুম্ভকক্ষে একাকিনী মন্থর গতিতে সে জয়-সরোবরে স্নান করিতে গেল, তাহার চক্ষুর পক্ষে কয়েকটি অশ্রুবিন্দু সংলগ্ন ছিল, কোটালের সঙ্গে তাহার স্বামী রাজসভায় যাইবে মিথ্যা কথা কহিতে—তাহার মনে হইল, শাক শবজি খাইয়া কুঁড়ে ঘরে থাকিয়া সেতো স্বর্গ সুখে ছিল, সে বড় বাড়ী, ভাল খাওয়া এ সকল চাহে না। "হে ভগবান, আমার সাক শবজী বজায় রাখ, আমি কুঁড়ে ঘরে সুখে আছি, আমার সুখ

ভেঙ্গ না।” বলিয়া বিমলা দুঃখিত চিত্তে শূন্যকুম্ভ জলে ভাসাইয়া একাকিনী জয়-সরোবরের জলে নামিল। সহসা একটা দূরাগত করুণ আর্ত্তস্বরে সে চমকিয়া উঠিল, সে দেখিতে পাইল হঠাৎ গগন প্রান্তে নিরবলম্ব ভাবে কুজ্ঝটিকার অস্পষ্ট আচ্ছাদনে আবৃত সাতটি পুরুষ তাহার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে। তাহাদের ব্যাকুল দৃষ্টিও ক্ষীণদেহ বিমলার মর্ম্মস্থল শেলের মত বিদ্ধ করিল। তাহারা ক্ষীণ আর্ত্তস্বরে বলিল—“বিমলা, আমরা হরিহরের পিতৃপুরুষ, হরিহরের মিথ্যাচরণে স্বর্গ-ভ্রষ্ট হইব—আমাদের আর দাঁড়াইবার স্থান থাকিবে না! বিমলা তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর, আমরা বড় কাতর হইয়া পড়িয়াছি।” তাহাদের বিবর্ণ মুখ শুষ্ক ও বিশীর্ণ, চক্ষু জল-চ্ছায়া বিজড়িত; সপ্তপুরুষ উক্ত কথা বলিয়া শূন্য পথে মিশিয়া গেল। বিমলা স্বপ্নের মত একি দেখিল! সে কাঁদিতে কাঁদিতে শূন্যকুম্ভ কক্ষে লইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল।

তখন হরিহরের লক্ষ নাম জপ শেষ হইয়াছে। কোটালের সঙ্গে রাজদ্বারে যাইতে হরিহর উদ্যত। এমন সময়,—

“আলয় প্রবেশে রামা আউদর চুলে।
পড়িল পতির পায় প্রাণ নাহি বাধে।
কি হ’ল কি হ’ল ব’লে উচ্চস্বরে কাঁদে।
সুবিহিত শুন নাথ সুবিনয়ে বলি।
কি ছার ধনের লাগি ধর্ম্ম দিবে কালী।
ধন কড়ি মান মত্তা সকলি বিফল।
সপ্তম পুরুষ আজ যায় রসাতল।”

এলায়িত কুন্তলে, সাশ্রুনেত্রে, কোমল ভুজলতায় স্বামীর পদ বিজড়িত করিয়া আজ পল্লীর অশিক্ষিতা ললনা স্বামীকে সত্য কহিতে উদ্রিক্ত করিতেছে—“যুধিষ্ঠির স্বয়ং ভগবানের কথায় মিথ্যা বলিয়া শাস্তি হইতে ত্রাণ পান নাই। রাজদ্বারে মিথ্যা বলিও না—আমি

কুলবধূ কি বলিব—” বলিয়া বিমলা কাঁদিতে লাগিল। মিথ্যা না বলিলে হরিহর মাহুদ্যার ক্রোধে প্রাণ হারাইবে—এ সকল কথা বিমলার কর্ণে প্রবেশ করিল না—সে কেবল বলিতে লাগিল—“সত্য পথের সহায় ভগবান, কে কাহাকে মারিতে পারে!”

হরিহর বাইতি বলিল—“অর্থ ভিন্ন পুরুষের জীবন বিফল—আমি তোমার সুন্দর হস্তে সোণার চুড়ী পরাইব, সোণার হার তোমার কণ্ঠে দিব, সুন্দর ও বহুমূল্য সাড়ী দ্বারা তোমার শরীর সাজাইব”—এই সময় কোটাল—“আর বিলম্ব করিও না” বলিয়া হাঁকিতে লাগিল—লক্ষ হরিনাম-জপকারী হরিহর বাইতি রমণীর প্রতি প্রলোভনসূচক বাক্যাবলী অর্দ্ধ সমাপ্ত রাখিয়াই প্রস্থান করিল।

বিমলার কি এক স্বর্গ যেন ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল, অসম্বৃত কেশ পাশে ধুলিলুণ্ঠিত হইয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

হরিহর বাইতি স্ত্রীকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিয়াছিল – সে কি নিজের কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিয়াছে? সে হৃদয়ে একটা গুরুতর ব্যাথা অনুভব করিতে লাগিল। তাহার মন প্রতিমুহূর্ত্তে পূর্ব্ব শান্তি ফিরিয়া পাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল। মহাপাত্র মাহুদ্যার সঙ্গে কথা দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্ব্বে তাহার গৃহে ও মনে যে অব্যাহত একটা শান্তির স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল, তাহাতে অবগাহন করিয়া শীতল হইবার হইবার জন্য তাহার মনে একটা নিরতিশয় প্রবল আকাঙ্ক্ষা কোনভাবে জাগিয়া উঠিল।

রাজসভা লোকপূর্ণ। একদিকে বন্দী লাউসেন দাঁড়াইয়া আছেন। হরিহর বাইতি সভায় প্রবেশ করার সময় জনবৃন্দ একবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে মৌন ভাবে তাকাইল। নির্ম্মল প্রশান্ত দৃষ্টি দ্বারা হরিহরের অন্তঃকরণ ধৌত করিয়া লাউসেন একবার তাহার দিকে চাহিলেন; গৌরজনের আশঙ্কাকাতর দৃষ্টি ও লাউসেনের স্নিগ্ধ

কটাক্ষে সহসা যেন বিমূঢ় হরিহরের কর্ত্তব্য পথ নিরূপিত হইয়া গেল। পশ্চিমের সূর্য্যোদয় দেখিয়াছ কি না, এই প্রশ্ন হওয়া মাত্র অপূর্ব্ব উৎসাহে হরিহর বাইতি বলিয়া উঠিল—"যে পথে সূর্য্যদেব প্রত্যহ অস্ত গমন করেন, আমি সেই পথ হইতে তাঁহার উদয় দেখিয়াছি—দেখিয়াছি পশ্চিম আকাশ তপ্ত স্বর্ণের আভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, প্রত্যূষে আমার গৃহের পশ্চিমের ক্ষেত্র স্বর্ণ-ফসলে আবৃত হইয়া উঠিয়াছিল, এমন দৃশ্য আর কখনও দেখি নাই—লাউসেন-বাহাদূরকে প্রণাম করিতেছি—ইনি তপঃসিদ্ধ মহাপুরুষ; অশ্রুগদগদকণ্ঠে অনুতাপধৌত নির্ম্মলহৃদয়ে—ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া হরিহর বাইতি কৃতাঞ্জলি হইয়া লাউসেনকে প্রণাম করিল; সেই মুহূর্ত্তে তীব্রতম দণ্ডের জন্য হরিহর প্রস্তুত হইয়া নির্ভয় হইল। সভাস্থলে সমাসীন শত শত মুখ-নিঃসৃত অস্পষ্ট গুঞ্জন—মধুকরের সমবেত আনন্দধ্বনির ন্যায় তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল; মরুভূমির তৃষিত ও শ্রান্ত পথিক সুস্নিগ্ধ বারি পান করিয়া যে আনন্দ প্রাপ্ত হয়, হরিহর সেই আনন্দ প্রাপ্ত হইল।

কিন্তু এদিকে মাহুত্তার ক্রোধবিবর্ণ মুখ নিবিড় মেঘমণ্ডলের মত হইয়া গিয়াছিল—সেই ক্রোধোৎপন্ন অশনি হরিহরের মস্তক দ্বিধা বিদীর্ণ করিবে—তাহা হইতে কে তাহাকে রক্ষা করিবে? লাউসেন অভিনন্দিত হইলেন, মাহুত্তা পরাস্ত হইল, হরিহর বাইতি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

সেই দিনই রাজ ভাণ্ডারের দ্বিশত মুদ্রা ও দ্বাদশটি মোহর চুরির অপরাধে হরিহর বাইতি ধৃত হইল; হরিহর সেই অর্থ ফিরাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে যখন মাহুত্তার গৃহাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল—সেই সময় পথে কোটাল তাহাকে চোর বলিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। বিচারে হরিহরের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। অষ্ট হস্ত প্রমাণ তীক্ষ্ণাগ্র শূল তাহার জন্য